কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি

কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি

ডঃ দিলীপকুমার দে

এম.এ., পি.এইচ.ডি., বি.লিব. আই.এসসি

গ্রন্থাগারিক, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

অণিমা প্রকাশনী

১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

COOCH BEHARER LOKASANSKRITI

Written by
Dr. Dilip Kumar Dey

Published by
D. Kar, Anima Prakashani
141, Keshab Chandra Sen Street, Kolkata – 700 009
Phone : 2350 7913 / 2360 8050

Published on
January, 2000

প্রকাশক
দ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী
১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন ঃ ২৩৫০ ৭৯১৩ / ২৩৬০ ৮০৫০

যান্ত্রিক শব্দগ্রন্থক
শিক্ষণ
২০৯/২৩, মহারাজা নন্দকুমার রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যান্ত্রিক মুদ্রক
সাহারা প্রিন্টার্স
১১০/১/১সি, ডাঃ লালমোহন ভট্টাচার্য রোড
কলকাতা - ৭০০ ০১৪

উৎসর্গ

আমার আশৈশব অনুপ্রেরণার উৎস

স্বর্গতা ঠাকুমা স্বর্ণলতা দে

এবং

স্বর্গত পিতৃদেব বৈদ্যনাথ দে-র

উদ্দেশ্যে।

মুখবন্ধ

স্নেহভাজন দিলীপকুমার দে লোকসংস্কৃতিতে নিবেদিতপ্রাণ গবেষক। তাঁর গবেষণা গ্রন্থ "কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি" প্রকাশিত হচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এর পূর্বে কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি নিয়ে এ রকম সর্বাত্মক প্রয়াস আর হয় নি। কোচবিহারে এখনো সনাতনী জীবন ধারা বহমান। স্বভাবতই লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। লোকসংস্কৃতি সত্যিকারেই এখানে অতীতের মায়া নয়।

দিলীপ এই কাজ সমাধা করতে বহু সময় ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ক্ষেত্র-সমীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে যাচাই করে নিয়েছেন। গবেষক ছাত্র হিসেবে তিনি আমাকে মুগ্ধ করেছেন। কোচবিহারের বিচিত্র জনজীবনের প্রাণের কথাই এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মানুষের মন ও কর্মপ্রবাহ যে কত বিচিত্রগামী তা বুঝতে এই লোকসংস্কৃতি গ্রন্থটি গবেষক থেকে সাধারণ পাঠকের অবশ্য পাঠ্য হতে পারে।

বাংলার তো বটেই এই জেলার মানুষও কোচবিহারকে নতুন করে পাবেন এই গ্রন্থপাঠে। গবেষণা গ্রন্থ সচরাচর ছাপা হয় না, ছাপা হলেও জনপ্রিয় হয় না। আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থটি এসব বাঁধা নিজগুণে দূর করতে সক্ষম হবে।

কোচবিহার

আমাদের প্রকাশিত কোচবিহার জেলা সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তকসমূহ

কোচবিহারের লোকনাটক — ড. দিগ্বিজয় দে সরকার

ইতিকথায় কোচবিহার — ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল

ক্যাম্বেলের চোখে কোচবিহার — ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল - সম্পাদিত

বিষয় কোচবিহার — ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল - সম্পাদিত

গোসানীমঙ্গল — রাঁধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী বিরচিত ও
ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল - সম্পাদিত

কোচবিহার হিতৈষিণীসভা বক্তৃতামালা — মূল সম্পাদক - শশিভূষণ হালদার ও
সম্পাদনা - ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও মহারাজা শিবেন্দ্র
নারায়ণের "ভক্তিগীতি সংগ্রহ" — ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল - সম্পাদিত

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের জীবনীবিষয়ক গ্রন্থ
"জীবন স্মৃতি" — দীঁনদয়াল চৌধুরী লিখিত ও
ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত

কোচবিহার রাজজ্ঞানকোষ — অভিজিৎ রায়

প্রাক্‌কথন

ফ্রানজ বোয়াজ-এর শিষ্যবর্গ মার্কিন নৃতত্ত্বের যে বিশেষ দল গড়ে তুলেছেন তাদের মতে কোনো গোষ্ঠীর মানুষকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে ক্ষেত্র-সমীক্ষা খুব জরুরী। ক্ষেত্র- সমীক্ষার পর তত্ত্বালোচনার চেয়ে তথ্যাদির বিন্যাস আর তথ্যাদির বিন্যাসের পর বর্গীকরণ আর প্রতিতুলনা। মানুষের অর্থ খুঁজে বেড়ানো লোকসংস্কৃতির তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রটিও তেমনি। বস্তুত মার্কিন নৃতাত্ত্বিকদের সঙ্গে লোকসংস্কৃতি বিদ্যার ভুবন মোটেই দূরবর্তী নয়। মার্কিন নৃতাত্ত্বিকদের ক্ষেত্র-সমীক্ষা সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার তিন-বিন্দুর ক্ষেত্র চিহ্নিত করা। তিন-বিন্দুর ক্ষেত্র বলতে বোঝায় সেই সব ক্ষেত্র যেখানে তিনটি সাংস্কৃতিক ভূগোলের প্রান্ত মিশে আছে। সাংস্কৃতিক-ভূগোল এক একটি স্বতন্ত্র মানবিক কৃষ্টির ভূমি। প্রকৃতির সহজ গতিতে এরকম সাংস্কৃতিক-ভূগোল শত শত বছরে গড়ে ওঠে— চলমান থাকে, গ্রহণ ও বর্জন চলতে থাকে— শেষ পর্যন্ত বিমিশ্রণ শুরু হয়। বিমিশ্রণ— সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পূর্ব শর্ত। এই শর্তটি সবচেয়ে বেশি করে লক্ষ করা যায় তিন-বিন্দুর ক্ষেত্রে।

ড. দিলীপকুমার দে-র গবেষণা-পত্রের সংশোধিত পরিমার্জিত রূপ যখন মুদ্রিত গ্রন্থের চেহারা পাচ্ছে তখন এই কথাগুলি বিশেষ ভাবে মনে পড়ল। কোচবিহার জেলা দীর্ঘ দিন ধরে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। এখানে স্বতন্ত্রভাবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আগমন নির্গমন ঘটেছে— উত্তর ভারতের আর্যভাষাভাষীদের সঙ্গে বিমিশ্রণ ঘটেছে এইভাবে। অন্যদিকে আদি-অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর সুপ্রাচীন প্রব্রজনের ধারাটি এই ভূমিখন্ডকে ধরে পূর্বাস্য গতি পেয়েছিল বলেই মনে হয়। মেঘালয় হয়ে ব্রহ্মদেশ পেরিয়ে সেই জনগোষ্ঠীর ক্রমিক যাত্রার সীমানা নির্ধারিত হয়েছে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত। দাক্ষিণ বাহিনী নদী অববাহিকা ধরে 'দুয়ার' -বরাবর এখানে এসেছে মঙ্গোল গোষ্ঠীর জনপ্রবাহ।

ঐতিহাসিক পর্বে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে থাকবে---- হয়ত-বা সেন রাজবংশের শাসন বিস্তার লাভের সময় থেকে। এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কোচবিহার জেলার স্থান নামে। পরবর্তী প্রবাহ অহোম-সংস্কৃতির হওয়া সম্ভব। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ - দুর্গাবর - ষষ্ঠীবর- নারায়ণদেব বঙ্গ-অসম উভয় সংস্কৃতির সাধারণ পূর্ব-সূরী। বিশেষত শঙ্করদেবের মহাপুরুষিয়া মত অসম থেকে উৎখাত হবার পর কোচবিহারে আশ্রয় পেয়েছিল— সে কথা মনে রাখতে হচ্ছে।

বিপরীতক্রমে বাংলার পন্ডিতরা কামাখ্যায় পূজা পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন— অসমের তন্ত্র আর বাংলার তত্ত্ব— একাকার হয়েছে।

সর্বশেষ অভিঘাত দুটি— প্রথম, চা-বাগিচা পত্তন ও শ্রমবাহিনীর আগমন। দ্বিতীয়, দেশ বিভাগ ও উদ্বাস্তু প্রবাহ। লেভি স্ত্রোসের আলোচনা মনে পড়ছে— পৃথিবীর কোথাও আকাড়া সংস্কৃতির ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। সর্বত্র ফাটা ঘন্টার ধ্বনি। এই পরিস্থিতিতে বর্গীকরণ, বিন্যাস ও তুলনাই অত্যন্ত কঠিন কাজ— সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রবর্তন অসম্ভব প্রায়। ডঃ দে প্রথম কাজটুকু করেছেন। তাঁর বইয়ের প্রচার কামনা করি। যদি কোনো নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে বদ্ধ, প্রকৃত, মৌলিক বা শ্রেষ্ঠ বলে কেউ প্রতিপন্ন করতে চান, তার সে চেষ্টা সারস্বত-ক্ষেত্র থেকে রাজনীতির কাছাকাছি চলে যাবে। ডঃ দে সে কাজে নিশ্চয় বিরত আছেন। উত্তরের উন্মুক্ত প্রকৃতি আর প্রকৃতিলগ্ন মানুষদের কথা সারস্বত আলোচনার সীমায় আরো বেশি করে আসুক।

ডঃ [signature]

অধ্যাপক ঃ বাংলা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

লেখকের নিবেদন

কোচবিহারের ঐতিহ্যশালী লোকসংস্কৃতি কিভাবে এখনও জনজীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করছে বক্ষ্যমান আলোচনা তার পরিচয় দেবে। কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির আঙ্গিক উপাদান ও স্বরূপের শুলুক সন্ধান করতে গিয়ে প্রধানত কোচবিহারের রাজবংশী সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করেছি। এছাড়াও জেলায় বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লৌকিক সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার কথা প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়েছে। কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকের নির্বাচিত উপকরণের সংগ্রহ ও এতদঞ্চলে লোকসংস্কৃতির বহমান ধারার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ, তৎসহ এই জেলার লোকসংস্কৃতির যথাযথ মূল্যায়ন এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়। আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির গবেষণার ভিতর দিয়েই পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে বঙ্গসংস্কৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয়— এ আশা রাখি।

বক্ষ্যমান আলোচনার "**প্রথম পরিচ্ছেদ**"-এর ভূমিকায় কোচবিহারের একটি সংক্ষিপ্ত সাধারণ রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। যাতে আছে ভৌগোলিক অবস্থান, জনবিন্যাস, কোচবিহারের সংক্ষিপ্ত রাজ-ইতিহাস।

"**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**"-এ আলোচিত হয়েছে লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা, কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও পরিচয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রাজন্য শাসিত কোচবিহাবের সাহিত্যচর্চা, লোকসংস্কৃতির যথাযথ সংজ্ঞা নিরূপণ, বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

"**তৃতীয় পরিচ্ছেদ**"-এ বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে কোচবিহারের লোকসাহিত্য ও মৌখিক সাহিত্য। যার মূল অনুষঙ্গে আছে লোকগীতি, লোককথা, লোকনাটক, ছড়া, ছিলকা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকায়ত মন্ত্র ইত্যাদি মৌখিক সাহিত্য। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় লোকজীবনের বিভিন্ন স্তরে যেমন— ভাষায়, উচ্চারণে বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করেছি তাকে অবিকৃত রেখে যথাস্থানে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

"**চতুর্থ পরিচ্ছেদ**"-এ সুবিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে কোচবিহারের বৈচিত্র্যময় লোকদেবতার উৎস, স্বরূপ, মূর্তির আদল, বিবর্তন, হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত দেব-দেবী, জেলার লোকজীবনের লোকধর্ম-নির্ভর লোকচক্ষুর আড়ালে পূজিত একাধিক দেব-দেবীর সঙ্গে থান, পাট ও দেব-দেউলের কথা। থান-পাটের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসেছে লোকবিশ্বাস ও ব্রত-ভিত্তিক লোকনৃত্যানুষ্ঠানের প্রসঙ্গও। জেলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আঞ্চলিক এই দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে বর্ণাঢ্য লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার সন্ধান করা হয়েছে এই অধ্যায়ে । সঙ্গত ভাবেই এই অধ্যায়টি আমাদের মনোযোগ বেশী দাবি করে। প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যায়টি স্বতন্ত্র একটি আলোচনার বিষয়। অধ্যায়ের কলেবর বাড়িয়েও পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া গেছে বলে দাবি করবো না।

"**পঞ্চম পরিচ্ছেদ**"-এ আলোচিত হয়েছে জেলার আনুষ্ঠানিক লোকপ্রিয় খেলা, মেলা ও লোকউৎসবের অন্তর্পরিচয়। কোচবিহারের জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই আঙ্গিকগুলি কী ভাবে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে কোচবিহারের জনজীবনকে ধরে রেখেছে এক চিরায়ত বিশ্বাসে।

"**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ**"-এ রয়েছে কোচবিহারের লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার, লোকপুরাণ, যেগুলির স্বরূপ সন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি কোচবিহারের লোকজীবনের সুগভীর পরিচয় কিভাবে বিচিত্র আঙ্গিকে শতদলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে।

"**সপ্তম পরিচ্ছেদ**"-এ আলোচিত হয়েছে জেলার লোকসংস্কৃতিতে লোকশিল্পের গুরুত্ব, আর্থ সামাজিক সমাজজীবনে তার প্রভাব। স্থানীয় উপকরণে যন্ত্র-বর্জিত সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃজনশীল চিন্তায় কি বিচিত্র শিল্পজগৎ সৃষ্টি করে চলেছে জেলার লোকশিল্পীগণ, তার সংক্ষিপ্ত অথচ অনুপুঙ্খ আলোচনা।

"**অষ্টম পরিচ্ছেদ**"-এ আলোচিত হয়েছে জেলার লোকসংস্কৃতিতে লোকভাষা বিভাষার প্রসঙ্গ। লোকভাষা সর্বক্ষেত্রেই লোকসংস্কৃতির বাহন। অন্যভাবে বলা যায় এই লোকভাষাই লোকসংস্কৃতির বহু বিচিত্র আঙ্গিককে লোকগ্রাহ্য ও গ্রহণীয় করে তুলেছে। অকৃত্রিম বাহুল্য বর্জিত সহজ সরল এই ভাষা মৌখিক পরম্পরায় আজও বয়ে চলেছে বহতা নদীর মতই এখানে।

"নবম পরিচ্ছেদ"-এর মূল আলোচ্য বিষয় লৌকিক খেলাধূলা। জেলার লোকসংস্কৃতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে এই খেলাধূলাগুলি। ছড়া-নির্ভর এই খেলাধূলাগুলি যা আজও জেলার সর্বত্র জনজীবনের প্রত্যেকটি স্তরে সঞ্জীবনী সুধার মত কাজ করে চলেছে। কিছু বিচিত্র লোকখেলাধূলা আজ বিলুপ্ত হতে বসেছে। এরই আন্তরিক পরিচয় বহন করছে এই অধ্যায়টি।

"দশম পরিচ্ছেদ"-এ আলোচিত হয়েছে কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির পরম্পরাগত ঐতিহ্যটি কেমন করে বাংলার লোকসংস্কৃতিকে আজও সমৃদ্ধ করে চলেছে তার প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গটি। জেলায় লোকসংস্কৃতি অতীতের মায়ামৃগ নয়, এটি এক বাস্তব জীবন-চর্যা।

কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির কথা যেন অফুরন্ত ভাণ্ডার। দশটি পরিচ্ছেদে পরিক্রমা করেও মনে হয় যেন অনেক কিছুই বলা হল না। তাই **"পরিশিষ্ট"** অংশে অত্যন্ত সংক্ষেপে বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। যেমন-- খাদ্যাভ্যাস, মৌখিক সাহিত্যের নমুনা, লোকবাদ্যযন্ত্র, জনপ্রিয় মেলার সারণী, জেলার লোকসংস্কৃতি-চর্চার কথা, লোকশিক্ষা প্রসঙ্গ, আলোকচিত্রমালা, জেলার মানচিত্রে নদ-নদী ভিত্তিক লোকউৎসব, লোকমেলা, দেব-দেউল, দরগা, লৌকিক দেবদেবীর অবস্থান।

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির আলোচনায় কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার নামমাত্র উল্লেখেই সন্তুষ্ট হয়েছেন অনেকে। কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির বহুমুখী ধারার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার বিনম্র প্রচেষ্টা এই প্রথম।

এ ব্যাপারে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক লোকসংস্কৃতি অনুরাগী ও অনুসন্ধানী শ্রদ্ধেয় ড. দিগ্বিজয় দে সরকার মহাশয় তাঁর নির্দেশ, তত্ত্বাবধান ও বিষয়নিষ্ঠ পরামর্শ দিয়ে যথার্থই আমার পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। তৎসত্ত্বেও আমার অনবধানতা- জনিত কিছু ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

বয়সের ভারকে উপেক্ষা করে পিতৃতুল্য— অশীতিপর আইনজীবী, লোক- সংস্কৃতিপ্রেমী শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, তীক্ষ্ণবিশ্লেষণ ও সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমার পাণ্ডুলিপির বিষয়বিন্যাস যেভাবে দেখে দিয়েছেন তাতে আমি অভিভূত।

আমার গবেষণা কর্মের শুরুতে অধ্যাপক আলাউদ্দীন আহমেদ যেভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন তা কোনদিন ভুলতে পারব না। জীবিতকালে গ্রন্থটি দেখাতে না পারার দুঃখ রয়েই গেল— এ আমার চিরদিনের আক্ষেপ।

আমার পরম হিতৈষী ও নিত্য শুভার্থী, লোকসংস্কৃতি অনুরাগী প্রবীণ, নবীন বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরামর্শ, উৎসাহ ও সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে জেলার লোকসংস্কৃতির পথ-পরিক্রমায় সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন— আমার মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ পবিত্রকুমার গুপ্ত, ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়, ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী এবং বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশীষ চ্যাটার্জী, ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী, ডঃ সুবোধ সেন, অধ্যাপক স্মৃতিময় দে, মহুয়া মৌলিক, অজয় সাহা, ডঃ রামপ্রসাদ মুখার্জী, দেবাশীষ দাস, সঞ্জয় মুখার্জী, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, পুষ্পনারায়ণ ভকত, দীপক ধর, রতন গাঙ্গুলি, বিশ্বনাথ দাস, স্বপন রায়— এঁদের সবার কাছে আমার ঋণ চিরদিনের।

বিষয়নিষ্ঠ পরামর্শ ও আদ্যন্ত পাণ্ডুলিপির প্রুফ দেখে লেখাকে প্রাঞ্জল করে দিয়েছেন আমার শিক্ষক শ্রী জনার্দন ভট্টাচার্য এবং সাহিত্যসঙ্গী ভ্রাতৃপ্রতিম প্রধান শিক্ষক শ্রী অমরেন্দ্র বসাক এবং পাণ্ডুলিপিকে প্রেসের উপযুক্ত করে অনুলেখনে সহযোগিতা করেছে মিনতি বর্মা, দীপক বর্মা, প্রণব দাস, অমির বসাক, অজিত দেবনাথ এবং অপূর্ব সাহা। এঁদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

জেলার কৃষ্টি-সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানে, ক্ষেত্র-সমীক্ষার সময় তথ্য ও চিত্র গ্রহণে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে রোদ বৃষ্টি মাথায় করে স্বেচ্ছায় সঙ্গদানে যে ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু, সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন যথাক্রমে সর্বশ্রী ব্রজদুলাল পাল, পুলেন্দ্রনাথ অধিকারী, কবি কমলেশ সরকার, স্বপন রাভা, মন্টু দাস, বিশ্বজিৎ তালুকদার, কুন্তলা অধিকারী, তারিণীকান্ত সরকার, অঞ্জলি রাভা, মৃগাঙ্ক প্রামাণিক, নৃপেন পণ্ডিত, দীনেশ সান্যাল, অমিত চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ দাস, জহর ধর, কুমারকিশোর চক্রবর্তী, ঝর্ণা বর্মা, গণেশ বর্মা, চরিত্র দেবনাথ, জ্যোতিষ দাস, কমলকান্তি সরকার, পল্টু চক্রবর্তী (মাথাভাঙ্গা), দুলাল, তিনু (মেখলিগঞ্জ), অতীশ ঘোষ ঠাকুর, দুলাক বোস (দিনহাটা), ফজলুল হক, মিঠু দত্ত (হলদিবাড়ি), তপন দে, দিপঙ্কর দে (সদর)— এঁদের কাছে আমি চিরঋণী।

প্রসঙ্গত ঋণ স্বীকার করছি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ ও লোকশিল্পীদের, যাঁদের কাছে অযাচিত আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছি, তথ্যানুসন্ধানে ও সংগ্রহে পেয়েছি আন্তরিক সহযোগিতা। সম্পূর্ণ অপরিচিত-অজানা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও কেউ বিমুখ করেন নি অনুসন্ধান কর্মে।

ব্যবসা জগতের মানুষ হয়েও শতব্যস্ততার মধ্যেও আমার এই সারস্বত সাধনার পেছনে নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন পরমাত্মীয় নীলু সরকার (মেসো শ্বশুর) ও মাধুরী দে (শ্বশ্রূমাতা)। আমার মাতা শ্রীমতী চিনু রানী, সহধর্মিনী শ্রীমতী তপতী ও পুত্র শ্রীমান সৌম্যদীপ, অনুজ বাবল ও সুভাষ পারিবারিক দায়িত্ব ও ঝামেলা থেকে আমাকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে যেভাবে উৎসাহ যুগিয়েছে তা মনে রাখার মতো।

পাণ্ডুলিপি পুরোটাই কম্পিউটারের মাধ্যমে সুদৃশ্য মুদ্রণে রূপ দিয়েছেন দক্ষ মুদ্রক মিলেনিয়াম প্রিন্টার্স-এর পীযূষকান্তি রায়।

আমার এই গবেষণা কর্মে প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য পেয়েছি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের (গবেষণা বিভাগ), উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের, তুফানগঞ্জ মহকুমা রাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ গ্রন্থাগারের, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের, কোচবিহার দেবত্র ট্রাষ্ট বোর্ড গৌরীপুর রাজবাড়ী সংগ্রহশালার। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস (অধ্যাপক ঃ বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ও ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার মহাশয় (প্রাক্তন অধ্যক্ষ ঃ ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়)-দের নিকট, যাঁরা শতব্যস্ততার মধ্যেও এই গ্রন্থের মূল্যবান প্রাক্‌কথন ও মুখবন্ধ লিখে গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় ঋণ স্বীকার করি সেই সব বিদগ্ধ লেখক ও পণ্ডিতজনদের যাঁদের মূল্যবান গ্রন্থ থেকে নানা উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি।

সর্বোপরি, বলা যায় উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগবশত "অণিমা প্রকাশনী"-র শ্রদ্ধেয় শ্রী দ্বিজদাস কর মহাশয় যেভাবে স্বল্প সময়ে এই গ্রন্থ প্রকাশনায় এগিয়ে এসেছেন তার জন্য তাঁকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

জাতীয় জীবনের ইতিহাস, বিশেষতঃ সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস তথ্যপঞ্জী মাত্র নয়। এর জন্য প্রয়োজন সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধি এবং নিশ্চিতভাবেই লোকসংস্কৃতির ইতিহাস অনুসন্ধান। কোচবিহার লোকসংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে এখনও জেগে আছে। এখানকার সমাজ মূলত কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ। এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থা লোকসংস্কৃতির জন্মদাতা ও রক্ষাকর্তা। কোচবিহারের অনগ্রসর জীবন-যাত্রায় এই কারণেই লোকসংস্কৃতির বিশেষ ভূমিকাটি অস্বীকার করা যায় না। এখানকার জনজীবনে লোকভাষা, লোকবিশ্বাস, লোকমানসিকতা বিচিত্রভাবে আজও ক্রিয়াশীল। আশা করবো এই অনুসন্ধান আমাদের ভিত্তিমূলকেই নতুন করে পাবার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, গবেষক ও সাধারণ পাঠকবর্গের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হলে অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করব।

তুফানগঞ্জ,

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা ঃ কোচবিহারের সাধারণ রূপরেখা

কোচবিহার বলতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের একটি জেলাকে বোঝায়। এই জেলার পাঁচটি মহকুমা— কোচবিহার সদর, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জ। ভারতভুক্তির পূর্বেও কোচবিহার এই পাঁচটি মহকুমায় বিভক্ত ছিল। এই জেলাটি ত্রিকোণাকৃতি এবং এর ভৌগোলিক অবস্থান হল ২৫°৫৭′৪০″ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬°৩২′২০″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৪৭′৪০″ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৮৯°৫৪′৩৫″ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যবর্তী।

বর্তমান কোচবিহার জেলার উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা, পূর্বে আসাম রাজ্য, দক্ষিণে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে জলপাইগুড়ি জেলা ও বাংলাদেশ। এই জেলার আয়তন ৩৩৮৬ বর্গ কিলোমিটার। এই জেলায় রয়েছে পাঁচটি মহকুমা, নয়টি থানা, ১২৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১২টি পঞ্চায়েত সমিতি। এই জেলার মোট জনসংখ্যা— ২৪,৭৮,২৮০ জন (২০০১ আদমসুমারী অনুযায়ী)। মহকুমাগুলোর আয়তন হল— সদর - ৭৩৭.৬ বঃ কিঃ মিঃ, তুফানগঞ্জ - ৫৮৫.৭ বঃ কিঃ মিঃ, দিনহাটা - ৭০৪.২ বঃ কিঃ মিঃ, মেখলিগঞ্জ - ৪৯৭.৬ বঃ কিঃ মিঃ ও মাথাভাঙ্গা - ৬২৬.৮ বঃ কিঃ মিঃ।

পৌরাণিক মত অনুসারে প্রাচীন কামরূপের সীমা পূর্বে দিক্করবাসিনী থেকে পশ্চিমে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় "সপ্তম শতকে য়ুয়ান-চোয়াং (হিউয়েন সাং) পুন্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপে যাবার পথে এই করতোয়া নদী অতিক্রম করেছিলেন।"[১] দিক্করবাসিনী নদী অরুণাচলে, করতোয়া উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায়। যোগিনী তন্ত্রে উল্লেখ আছে—

"নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রি ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমং।।
করতোয়াং সমাশ্রিতা যাবদ্দিক্কর বাসিনী।
উত্তরাস্যাং কঞ্জগিরি! করতোয়াত্তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্বস্যাং গিরিকন্যকে।।"[২]

সেই হিসেবে বলা যায় প্রাচীন কোচবিহার রাজ্য তথা বর্তমান কোচবিহার জেলা এই ভূখন্ডের অন্তর্ভুক্ত। "প্রাচীন কামরূপ দেশের চারটি অংশ পূর্ব থেকে সৌমারপীঠ, কামপীঠ, রত্নপীঠ ও স্বর্ণ পীঠ। কোচবিহার জেলা ছিল সে সময় রত্নপীঠের অন্তর্গত।"[৩]

যে বিশাল জনপদ থেকে বর্তমান কোচবিহার জেলার জন্ম হয়েছে, সেই বিশাল জনপদের এবং এতদঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের ইতিহাস এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী এবং জেলার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে কোচরাজবংশের বিবর্তনের ইতিহাসও জানা প্রয়োজন। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার নামক এই রাজ্যের স্থপতি ছিলেন মহারাজা বিশ্বসিংহ। তার পরবর্তী কালে সিংহাসনে বসেন ষোড়শ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্য মহারাজা নরনারায়ণ। তাঁর প্রধান সেনাপতি অনুজ শুক্লধ্বজ (চিলারায়)-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে বীর বিক্রমে একের পর এক রাজ্য জয় করে রাজ্যের সীমাকে প্রসারিত করতে থাকেন। এ সময়ই কোচবিহার রাজসভাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও সারস্বত সমাজ। যাঁদের মধ্যমণি ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের ভক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ মহাপুরুষ শঙ্করদেব। উত্তর-পূর্ব ভারতে সেদিন বয়েছিল এক ভক্তিবাদের প্লাবন। পাশাপাশি রাজধর্মের স্বাভাবিক পরিণাম হিসেবে ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও শক্তির শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছেই সিংহাসনের অংশীদারীকে কেন্দ্র করে শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। রাজনীতির কুটিল আবর্তে অবক্ষয় শুরু হয় ইতিহাসর অমোঘ নিয়মে। সে সময় সংগঠিত হয় মুঘল আক্রমণ এবং সিংহাসনের রাজনীতিতে ভুটানের সক্রিয় অংশ গ্রহণ কোচবিহারের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তোলে সাময়িকভাবে।

কোচবিহারের দ্বিতীয় মহারাজা নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন কোচরাজ্য কামতাপুরে মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন শঙ্করদেব। পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামী ছিলেন দামোদরদেব ও মাধবদেব। "এই সমস্ত ধর্ম প্রচারকগণের চেষ্টায় কামতাপুর তথা কোচবিহার রাজ্যের তথা উত্তরবঙ্গের অধিবাসীগণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী হন। প্রতি হিন্দুগৃহে তুলসী স্থাপিত হয়। এই রাজ্যের অধিবাসীগণ হরিপূজা করেন।"[৪] অদ্বৈতপন্থী শঙ্করদেব প্রবর্তিত রাধাবিহীন কৃষ্ণ আজও পূজিত হন কোচবিহারের মদনমোহনবাড়ীতে এবং জেলার সবকটি মহকুমার স্টেট ঠাকুর বাড়ীতে। এটাও সত্য যে লোকসংস্কৃতিতে বাধা বর্জিত নন।

১৫১০ খ্রীঃ থেকে ১৭৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত কোচবিহার ছিল রাজন্য শাসিত এক স্বাধীন রাজ্য। ১৭৭৩ খ্রীঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং তৎকালীন মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে এক সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে কোচবিহার পরিণত হয় এক সামন্ততান্ত্রিক করদ মিত্র রাজ্যে। কালের বিবর্তনে নানা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৯৪৯ খ্রীঃ ১২ই সেপ্টেম্বর মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারকে তাঁর রাজ-ঐতিহ্যের সত্তা থেকে সরিয়ে এনে গণতান্ত্রিক ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করেন। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী (গভর্ণমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট, ১৯৩৫-এর ২৯(ক) নং ধারা অনুযায়ী) কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ভারতের ৪৪০ বছরের স্থায়ী একটি হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে। শুধু ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনই নয়, তৎকালীন রাজ্যটির নামও পরিবর্তিত হয়েছে একাধিকবার। "ষোড়শ শতকে বিশ্বসিংহ প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটির

নাম ছিল 'কামতা'। মহারাজা নরনারায়ণের সময় 'বিহার', 'বেহার', 'নিজবেহার' নামে অভিহিত হতে থাকে।"[৫]

খান চৌধুরী আমানতুল্লা রচিত 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ আছে, র‍্যাল্‌ফফিচ্, ষ্টিফেন ক্যাসিলা প্রমুখ বিদেশী পর্যটকগণ তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এদেশের নাম 'কোচ' বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তাঁর মতে— "(১) কোচদের বিহার ক্ষেত্র বা বাসস্থান থেকে কোচবিহার নামের উৎপত্তি; (২) কোচ বধূপুর (শিব জায়া পার্বতী নাকি কোচ-জাতিয়া ছিলেন। মতান্তরে স্বয়ং শিব কোচ-জাতীয় ছিলেন বলে তাঁর জায়া কোচ বধূ); (৩) কোচদেশ ও তার রাজধানী বিহার থেকেও কোচবিহার নামের উৎপত্তি; (৪) মোগল আমলে সুবা বা বিহার থেকে কোচরাজ্য বা দেশ বিহারের পার্থক্য বোঝানোর জন্য কোচবিহার নাম।"[৬]

পরবর্তীতে তৎকালীন কোচরাজ্যের ২০তম মহারাজা তথা কোচবিহারের রূপকার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে ১৩/৪/১৮৯৬ খ্রীঃ এই নাম বিভ্রাট দূর করার জন্য কোচবিহার স্টেট কাউন্সিলের নির্দেশে বর্তমান কোচবিহার নামের প্রচলন হয়।

১৯৯১-এর আদমসুমারী অনুযায়ী কোচবিহারের জন-বিন্যাস

থানা	মোট জনসংখ্যা	অ-তফসিলী জাতি	তফসিলী জাতি	তফসিলী উপজাতি
হলদিবাড়ী	৮৮৭০৩ (১০০)	৩৫৫৭০ (৪০.১০)	৫২৭০১ (৫৯.৪১)	৪৩২ (০.৪৯)
মেখলিগঞ্জ	১১৯২২৪ (১০০)	৩১৯১৩ (২৬.৭৭)	৮৬০৭৬ (৭২.২০)	১২৩৫ (১.০৪)
ঘোকসাডাঙ্গা	১৩৭৫৫৯ (১০০)	৪৪২৫১ (৩২.১৭)	৯০৯৫৫ (৬৬.১২)	২৩৫৩ (১.৭১)
মাথাভাঙ্গা	২১১০৩৫ (১০০)	৭১১৪৩ (৩৩.৭১)	১৩৯৭৬১ (৬৩.২৩)	১৩১ (০.০৬)
শীতলকুচি	১৫১৯৩৩ (১০০)	৬৪০৬৮ (৪২.১৭)	৮৭৮৫১ (৫৭.৮২)	১৪ (০.০০৯২)
কোচবিহার সদর	৫৭৫৯৫৯ (১০০)	৩২৯৬৪৯ (৫২.২৩)	২৪২৪০৯ (৪২.০৯)	৩৯০১ (০.৬৮)
তুফানগঞ্জ	৩৫৫২৬২ (১০০)	১৭৭৯২৯ (৫০.০৮)	১৭৩৭১২ (৪৮.৯০)	৩৬২১ (১.০২)

থানা	মোট জনসংখ্যা	অ-তফসিলী জাতি	তফসিলী জাতি	তফসিলী উপজাতি
দিনহাটা	৪৪৫২৭১ (১০০)	২৫২৬৪০ (৫৬.৭৪)	১৯১০৫১ (৪২.৯১)	১৫৮০ (০.৩৫)
সিতাই	৮৬১৯৯ (১০০)	২৬৯৮৮ (৩১.৩১)	৫৯২০৩ (৬৮.৬৮)	৮ (০.০০৯২)
কোচবিহার জেলা	২১৭১১৪৫ (১০০)	১০৩৪১৫১ (৪৭.৬৩)	১১২৩৭১৯ (৫১.৭৬)	১৩২৭৫ (০.৬১)

(বন্ধনীতে প্রত্যেকটি থানার মোট জনসংখ্যার জাতি/উপজাতির সংখ্যা শতকরা হারে দেখান হয়েছে)

(সংগ্রহ - District Census Hand Book-1991, Part - XII B, Series - 26, P - 200-201)

(২০০১ সালের আদমসুমারী অনুসারে জেলার বর্তমান লোকসংখ্যা - ২৪,৭৯,১৫৫)

নৃতাত্ত্বিক বিচারে এতদঞ্চলে তফসিলী জাতি বা উপজাতির পরিচয় যাই হোক না কেন, দীর্ঘ দিনের সাযুজ্য ও সহাবস্থানের ফলে এ সকল জনগোষ্ঠীর (Race) কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক, সামাজিক লোকাচার এবং ভাষা ব্যবহারে বাঙালী সংস্কৃতি ও ভাষার অনুসারী এবং হিন্দুধর্মে প্রভাবিত বলা যায়।

স্থানীয় প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রাজবংশী ক্ষত্রিয় জনসমাজের মৌল রসধারায় পুষ্ট। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত সংস্কৃতির ধারাটির সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মানুষের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির। ফলস্বরূপ দেখা যায় জেলার বহু বিচিত্র লৌকিক দেবদেবী, লোকায়ত নৃত্য-গীত, পূজা-পার্বণ, সংস্কার, ব্রত, মেলা ইত্যাদি। লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া গানে প্রতিফলিত হয় এতদঞ্চলের সহজ সরল জীবনের প্রতিচ্ছবি। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের ফলে প্রতিরক্ষা, শাসনতান্ত্রিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয় এতদঞ্চলে। ফলে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংহত কোচবিহারের জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংহতি যা এতদিন এতদঞ্চলের জনজীবনে প্রবহমান ছিল, তার মধ্যে ছোঁয়া লাগে এক নূতন হাওয়া, যার প্রভাব সুদূর গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে যায়। কোচবিহারের লোকজীবনের ঐতিহ্যবাহী বহু প্রাচীন কৃষ্টি ও লোকায়ত সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন আজ তাই অবহেলায় ম্রিয়মান। নূতন প্রজন্মের কাছে আজ আর প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ছিল্‌কা, লোকনাটক, লোকগীতি, লোকায়ত উৎসব অনুষ্ঠান সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য আক্ষেপ করে

বলেছেন— "গ্রাম্য লৌকিক খেলাধূলা ছেলেমেয়েরা আর করে না, লোকসঙ্গীত কদাচিৎ শুনতে পাওয়া যায়, লোককথা আর কেউ বলে না।"[৭]

আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যুবক-যুবতীগণ জানে না লৌকিক খেলাধূলা কি? ঐতিহ্যের প্রতি এমন অবক্ষয়িত মনোভাব যেমন চোখে পড়ে তেমনি কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির বহু নিদর্শন আজ আর দর্শক মনে এবং সামাজিক পরিবেশে তেমন করে দাগ কাটতে পারে না। কালের বিবর্তনে সংস্কৃতির এরূপ সংকটের ছায়া থাকলেও আজও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত কিছু মানুষ কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির বর্ণময় বিভিন্ন ধারাকে সজীব, সচল ও প্রবহমান রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও আবহমান কাল ধরে বসবাসকারী জনজাতিগণের উন্নত সংস্কৃতির মূলেও রয়েছে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যভাবনা। এই নিয়েই বর্তমান কোচবিহার।

তথ্য সূত্র ঃ

১। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) — নীহাররঞ্জন রায়, পৃ- ৪৭ (১৩৭৩)

২। যোগিনী তন্ত্রম্ — স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী, একাদশঃ পটল, পৃ- ১১৪ (১৩৮৫)

৩। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা,পৃ- ৭ (১৯৩৬)

৪। কোচবিহারের ইতিহাস — হেমন্তকুমার রায়বর্মণ, পৃ- ২৭ (১৯৭৭)

৫। সাহিত্যসাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার — ডঃ শচীন্দ্রনাথ রায়, পৃ- ৮,৯ (১৪০৬)

৬। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ ৪ (১৯৩৬)

৭। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ - ১৪ (১৯৮২)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃ লোকসংস্কৃতি

জীবজগতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যার নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে। এই সংস্কৃতির দৌলতেই মানুষ ভূ-মন্ডলের অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে এই সংস্কৃতিই মানুষকে বিবর্তনের পথ দেখিয়ে সভ্যতার উত্তুঙ্গ শিখরে উত্তরণ ঘটায়। আবার এই সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি ও লোকসংস্কৃতির প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ এই আদিকথা ও লোকসংস্কৃতির চর্চাকেই বলেছিলেন"জ্ঞানের আদিনিকেতন চর্চা"। সময়ের বিবর্তনে বিচিত্র সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে বিশেষ অঞ্চলের বা স্থানের সভ্যতা ও কৃষ্টির ঐতিহ্য। উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এই জেলায় সাংস্কৃতিকঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। এর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর, স্বতন্ত্রধর্মী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। অবিভক্ত বাংলার যে ভূ-খণ্ড গঙ্গানদীর উত্তর প্রান্তে এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত সেই ভূ-খণ্ডই যেমন উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত, তেমনি এই উত্তরবঙ্গের আসাম সীমান্তবর্তী এক প্রত্যন্ত জেলা এই কোচবিহার। কৃষি-নির্ভর সংস্কৃতির অন্যত ম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল উত্তরবঙ্গের এই জেলা। কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজ শুধু তাই কোচবিহারের ভৌগোলিক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়, উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। বলাবাহুল্য আজকের কোচবিহারের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বা ঐতিহ্য চিরদিন বর্তমান রূপে ছিল না। অনন্তকাল ধরে নতুন নতুন জাতি (Race), জনজাতি ও গোষ্ঠীর ঢেউ আছড়ে পড়েছে এতদঞ্চলে। তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সংস্কৃতি ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে একাধিক সময়ে এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বর্তমান কোচবিহার তার নির্দিষ্ট কোনও একটিকে স্মরণ করে নি।

প্রাচীন কামতাপুর তথা বর্তমান কোচবিহারের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিচার করলে আমরা দেখতে পাই কোচবিহার ছিল একদিন সাহিত্য সাধনার পীঠস্থান। বিচিত্র সংস্কৃতির মিশ্রণে কোচবিহার হয়ে উঠেছিল ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের এক মিলনতীর্থ। ১৯৫০ সালে কোচবিহার তার রাজন্য পোষাক পরিবর্তন করে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় রূপান্তরিত হয়।

কোচবিহার রাজ্যের সঙ্গে রয়েছে নিম্ন আসাম ও বর্তমান বাংলাদেশের রঙপুর, দিনাজপুর ও নেপালের মরং অঞ্চলের স্মৃতিচিহ্ন। স্বভাবতই এই বৃহৎ অঞ্চলের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ

ছিল এই জেলার সংস্কৃতির ভাণ্ডার। এই অঞ্চলের বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদি নীড় স্থাপিত হয়েছিল। বিদগ্ধ ঐতিহাসিকদের মতে তিন হাজার বছর পূর্বেও এই অঞ্চলে ছিল সমৃদ্ধ জনবসতি। আর তখন বাংলার দক্ষিণ অংশটি ছিল সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত। বাংলার লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ প্রাচীন মৌখিক সাহিত্য ময়নামতীর গান, গোরক্ষনাথের গান এই অঞ্চলেরই দান। চর্যাপদের ভিত্তিভূমিও ছিল এই ভূ-খণ্ড। এছাড়াও বাংলা গদ্যের নিদর্শনও মিলেছে এখানে "১৫৫৫ সালে অহমরাজ চুকুমফাকে লেখা মহারাজ নরনারায়ণের চিঠিতে।"[১]

স্বাভাবিকভাবেই কোচবিহার ছিল তার অতীত গৌরব নিয়ে এমন একটি জনপদ যে অঞ্চলের মৌখিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল যেমন প্রাচীন তেমনি স্বতন্ত্র।

রাজদরবারে রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতায় ও সৌজন্যে এতদঞ্চলের কবিগণ কাব্য রচনা করলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের স্বতন্ত্রধর্মী নিরপেক্ষ ব্যক্তিমনের ছাপ ছিল স্পষ্ট। "প্রাচীন কোচবিহারে সাহিত্য চর্চার প্রতি অনুরাগ যে কত প্রবল ছিল তা কোচবিহারের ইতিহাস পড়লে বোঝা যায়। কোচবিহারের রাজারা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য ভূমি ও অর্থ সাহায্য করেছেন। ঘনরাম, কবিকঙ্কণ, রামেশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কোচবিহারের কবিদের যে সমস্ত হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া যায় তার মধ্যে কিরাত পর্ব পুস্তকটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।"[২]

সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে মহারাজা প্রাণনারায়ণের রাজসভার অন্যতম বিদগ্ধ কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ ব্যাসদেব কৃত মহাভারতের অনুবাদ কোচবিহারের প্রাচীন সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । এছাড়াও তিনি অসংখ্য কাব্য রচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে কোচরাজবংশীয় দ্বিতীয় রাজা মহারাজা নরনারায়ণের রাজসভায় একশরণ নাম ধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ শঙ্করদেব কোচবিহার রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। বাংলাভাষায় লিখিত আঞ্চলিক ইতিহাস 'রাজোপাখ্যান' ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়নাথ মুন্সী রচনা করেন।

প্রাচীন কোচবিহারের সাহিত্য সাধনার ধারাটি ছিল মূলত অনুবাদ সাহিত্যের ধারা। তৎকালীন কোচ রাজ্যে শিবের মাহাত্ম্য ছিল সর্বাধিক প্রচলিত। কোচবিহার তাই শৈবতীর্থ নামেও পরিচিত। মহারাজা বিশ্বসিংহ প্রথম হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করেন এই রাজ্যে। এতদঞ্চলে রাভা, কোচ, মেচ, গারো জনগোষ্ঠীর নিজস্ব প্রধান দেবদেবীগণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে শিব ও গৌরীতে উন্নীত হয়েছেন।

মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকে এখানে রচিত হয়েছিল 'গোসানীমঙ্গল'। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে গোসানীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কোচবিহার রাজসভায় কবি রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী রচনা করেন 'গোসানীমঙ্গল কাব্য'— যা এতদঞ্চলের লোকায়ত কাহিনীনির্ভর সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন।

মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে রাজসভার মধ্যমণি ছিলেন শঙ্করদেব। ডঃ মহেশ্বর নেওগের মতে, "তৎকালীন কোচরাজ্যে শঙ্করদেবের সাহিত্য সাধনার সময়কাল ছিল ১৫৪৩-১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ।"[৬] তাঁর সাহিত্যকর্মের সুপ্রাচীন নিদর্শনগুলি পুঁথি আকারে আজও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, নবম, দশম এবং একাদশ স্কন্দ শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেবের অনূদিত। রাজন্য শাসিত কোচবিহারেব সাহিত্য সম্পদ এই পুঁথিগুলির মাধ্যমে কোচবিহারের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল।

এই সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির মধ্যেও সাধারণ মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের জনজীবন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে লৌকিক নানা ধরনের জীবনচর্চার উপাদান। শিল্পে সমৃদ্ধ জেলাগুলিতে লোকসংস্কৃতি এখন অতীতের মায়া। লোকজীবন পরিবর্তনশীল, কিন্তু বাংলার উত্তরাঞ্চলের এই জেলায় লোকসংস্কৃতি এখনও বহতা নদী। জীবন যাত্রার পরতে পরতে অমৃতধারার মতই এখনও বর্ষিত হচ্ছে লোকসংস্কৃতির সঞ্জীবনী পুণ্যতোয়া স্পর্শ। লোকসংস্কৃতি এই অঞ্চলে আজও জনজীবনে, জনমনোরঞ্জনের প্রধান অঙ্গ অথবা বলা যায় অন্যতম নির্ধারক শক্তি।

কোন একটি নির্দিষ্ট জনপদ বা অঞ্চলের সুসংহত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে লোকমানসের সৃষ্টি হয় তাকে আমরা সামগ্রিকভাবে বলতে পারি লোকস্তর। এই লোকস্তরেই উদ্ভব হয় যে সংস্কৃতির তাই হল লোকসংস্কৃতি। অর্থাৎ লোকস্তরই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব স্থল। তাই বলা যায় নির্দিষ্ট কোন লোকায়ত জনগোষ্ঠির লোকাচার, জীবনচর্চা, শিল্প, সাহিত্য ও ললিতকলা ইত্যাদির সামগ্রিক অভিব্যক্তি লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির প্রকাশ বা অভিব্যক্তিকে একাধিক ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন— সংশ্লিষ্ট স্থানের লোকবিশ্বাস, লোকধর্ম, লোকাচার, লোকশিল্প, লোকউৎসব, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়, সমগ্র মানব সমাজের অন্তর্গত বিশেষ কোন লোকসমাজের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় লোকসংস্কৃতির মধ্যে।

লোকসংস্কৃতির মধ্যে আমরা দেখতে পাই লোকজীবনের লোকসংস্কৃতিগত দিকের পূর্ণাঙ্গ পবিচয়। সংস্কৃতি বা কালচারের সঙ্গে 'ফোক' বা 'লোক' যুক্ত হয়ে অর্থাৎ লোকজীবনের সংস্কৃতিচর্চা কল্লেই লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি।

সামগ্রিকভাবে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হলেও কোচবিহারেব লোকসংস্কৃতি অন্যান্য জেলা অপেক্ষা স্বতন্ত্রধর্মী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এক মিশ্র জনগোষ্ঠী তাদের চলমান জীবনে গ্রহণ-বর্জন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কোচবিহারের জনজীবন অক্ষুন্ন রেখেছে তাদের ঐতিহ্যপূর্ণ লোকসংস্কৃতিকে। এক কথায় কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি হচ্ছে এতদঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আত্মজীবনী।

কোন একটি অঞ্চল বা দেশের একটি জাতির আত্মজীবনী হল তার লোকসংস্কৃতি। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জাতির প্রথা, দীর্ঘ দিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আচার, বিশ্বাস, পূজা-পার্বণ, মেলা, উৎসব, অনুষ্ঠান প্রভৃতির ধারাবাহিকতার মধ্যেই একটি জাতির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য জেলা হল কোচবিহার। রাজ্যের অন্যান্য অনেক জেলার তুলনায় কোচবিহারের লোকায়ত সংস্কৃতি এখনও যেমন হৃদয়স্পর্শী তেমনি প্রাণবন্ত।

বিচিত্র ভান্ডার নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি। কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান, ব্রতের গান, মনঃশিক্ষার গান, হেটো গান, বিয়ের গান, জারি গান, সবই এখনও সমান ভাবে আকর্ষণীয়। বাংলার অন্যত্র লোকনাটক প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। কোথাও কোথাও লোকনাটক লোক অভিধাকে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু কোচবিহারে প্রাচীন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনও অভিনীত হচ্ছে দোত্রা, কুষান, বিষহরা প্রভৃতি লোকনাটক। বিচিত্র লোকধর্ম নিয়ে গড়ে উঠেছে কোচবিহারের জনজীবন। লৌকিক দেব-দেবীর আসন পাতা আছে এখনও। বিচিত্র লোকউৎসব, মেলা, নদীভিত্তিক উৎসব ও মেলা কোচবিহারের জনজীবনকে ধরে রেখেছে চিরায়ত বিশ্বাসে। লোকভাষায় রচিত লোকমন্ত্র গ্রামাঞ্চলে এখনও সরল বিশ্বাসে গৃহীত। লোকসংস্কৃতি ধরে রেখেছে কোচবিহারের জনজীবনকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। প্রবাদ, প্রবচন, ছিলকা, লোককথা, লোকপুরাণ কি নেই কোচবিহারের লোকসংস্কৃতিতে। এখানে শিব, শীতলা ও চন্ডী ঠাকুরের সঙ্গে পূজিত হন একই মর্যাদায় হুদুম, যাইটল, মাসান প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবী। এখানকার কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় আবার শিব হয়েছেন কৃষির দেবতা। লোকক্রীড়া এখনও বন্ধ হয়ে যায় নি এই জেলায়। এই তালিকায় আছে হা-ডু-ডু থেকে দারিয়াবান্ধা, ডাংগুলি, গোল্লাছুট, আংটি খেলা, সই পাতানো খেলা, জল-কুমীর খেলা আরও কত কী।

লোকশিল্পের অঙ্গনটিও কোনক্রমে ম্লান নয়। শোলার, মাটির, পাটের, কাঠের, বাঁশের আরও নানা উপাদানের বিচিত্র শিল্পজগৎ সৃষ্টি করে চলেছেন এই জেলার লোকশিল্পীরা। প্রকৃতপক্ষে কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির ভান্ডার বিশাল ও ব্যাপক।

উত্তরবঙ্গের এই জেলার নারী সমাজের ঐতিহ্যে লালিত যাইটল, কাতি, হুদুম, সুবচনী, কাত্যায়নী ব্রত কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির ভান্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ, বর্ণময় ও উজ্জ্বল। উক্ত ব্রতগুলি ধর্মীয় পরিমন্ডলে অনুষ্ঠিত হলেও স্ত্রী-সমাজে লোকশিক্ষা প্রচারে আজও এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। সমগ্র কোচবিহারের হাটে, মাঠে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নির্জন প্রান্তরে, নদী-নালার ধারে খেটে খাওয়া অসংখ্য শ্রমজীবী নিরক্ষর ও নবসাক্ষর মানুষের গ্রাম্য কথাবার্তায় এমন অনেক প্রবাদ-প্রবচন, লোককথা আত্মগোপন করে আছে যা কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে করে তুলেছে সমৃদ্ধশালী। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি আজও

জনজীবনে সুদূর প্রসারী। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের প্রধান আঙ্গিক লোকনাটক — কুষান ও দোত্‌রা পালা, মনসা-বিষহরি পালা যা কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এতদঞ্চলে লোকভাষা, লোকবিশ্বাস, লোকমানসিকতা আজও বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল। কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট হল, একই প্রাণধারায় পুষ্ট হয়েও বিচিত্র বর্ণাঢ্য অভিব্যক্তি। লোককবির মারফতী গানের ভাষায় যাকে বলা যায়—

'নানা বরণ গাভীরে তার একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।'

যুগের পরিবর্তনে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচির পরিবর্তন স্বাভাবিক। তাই মহাকালের বিবর্তনে পরিবর্তিত হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা। প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রসভ্যতার কৃত্রিম মূল্যবোধ ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করছে কোচবিহারের লোকজীবনের নতুন প্রজন্মকে। যে সহজ সরল জীবনযাত্রায় একদিন স্থানীয় সমাজ ছিল অভ্যস্ত, তারা এখন আধুনিক সংস্কৃতির জোয়ারে ভেসে যেতে চলেছে। কিন্তু দীর্ঘ দিনের যত্নে লালিত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সহজে মুছে যাবার নয়। দীর্ঘ আলোচনায় এই লোকসংস্কৃতির চরণ-চিহ্ন অনুসরণ করেছি পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদে।

তথ্য সূত্র

১। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, প্রথম খণ্ড, পৃ-১০৪। কোচবিহার স্টেট, (১৯৩৬)

২। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি — সুশীলকুমার ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি / তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ — প.ব.স., পৃ- ৮৫ (১৯৭০)

৩। Sankardev & His Times — Dr. Maheswar Neog, P - 161 (1965)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লোকসাহিত্য ঃ লোকগীতি, লোককথা, লোকনাটক, ছড়া-ছিলকা, প্রবাদ-প্রবচন

ভূমিকা ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে লিখেছেন— "গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে তাহা বিশেষ রূপে, সংকীর্ণ রূপে দেশীয়, স্থানীয়।" কোচবিহারের লোকসাহিত্য সম্পর্কেও একথা সত্য।

কোচবিহারের লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ যেমন বহু শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। তথ্যানুসন্ধানের পর একথা সহজেই বলতে পারি যে প্রাচীন কোচবিহারের জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই ছিল সহজ, সরল, অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রামবাসী। কৃষি নির্ভর এই সমাজের লোকস্তরেই লোকগীতি, লোককথা, লোকনাটক, ছড়া, ছিলকা, ধাঁধাঁ, প্রবাদ-প্রবচন, লোকসঙ্গীত, ব্রতকথা ইত্যাদির জন্ম। এই সৃষ্টিস্রষ্টাহীন মৌখিক সাহিত্য মাত্র। উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী কোচবিহারের লোকজীবনের প্রধান সম্পদই হল তার লোকসাহিত্য। বাংলার লোকসাহিত্যের ভাববস্তু ও বিষয়বৈচিত্র্য অনুযায়ী কয়েকটি শাখায় ভাগ করা যায়— (ক) লোকগীতি, (খ) লোককথা, (গ) লোকনাটক, (ঘ) ছড়া-ছিলকা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি।

(ক) লোকগীতিঃ

লোকগীতি বা লোকসঙ্গীত প্রকৃত অর্থে লোকজীবন থেকে উদ্ভূত সঙ্গীত। লোকায়ত জীবনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা জাগতিক বিভিন্ন প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যেই এরূপ সঙ্গীতের সৃষ্টি। ইংরেজীতে যাকে বলে Folk Song, যার শব্দ, সুর ও ভাষা ঐতিহ্যের অনুসারী এবং গ্রামীণ সংস্কৃতিনির্ভর। এক কথায় বলা যায় প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে স্নেহ ভালবাসায় তারই সৃষ্ট মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে আপন আপন কীর্তির উজ্জ্বল মহিমার বর্ণচ্ছটায় যে লোকসংস্কৃতির অফুরন্ত স্বর্ণভাণ্ডার গড়ে তুলেছে তারই অন্যতম প্রধান ধারা লোকসঙ্গীত। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আঞ্চলিক জীবন রসে পুষ্ট বলেই এই গানকে অন্য অর্থে "আঞ্চলিক গীতি"ও বলা যায়।

লোকসঙ্গীতের সৃষ্টিকাল ও তার স্রষ্টার নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। প্রকৃতির আলো, বাতাস, পাহাড়, নদী, পর্বতের মতই তা জীবন্ত। এই গানের কোন লিখিত রূপ নেই, মৌখিক পরম্পরায় এ গান আজও সর্বত্র প্রবহমান। নদীকেন্দ্রিক, বনভূমি আকীর্ণ জনমানসে যে গীতধারা লালিত হয়ে আসছে তাই কোচবিহারের লোকগীতি। প্রচলিত লোকসঙ্গীত কোচবিহারের লোকায়ত সংস্কৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি করেছে নিজ গুণে, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কোচবিহারের প্রচলিত লোকসঙ্গীতকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করেছি— (ক) কর্মসঙ্গীত, (খ) আনুষ্ঠানিক লোকগীতি।

কর্মসঙ্গীত ঃ

লোকগীতি লোকজীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই উৎপন্ন হয়। এতদঞ্চলের শ্রমনির্ভর মানুষের নিত্য সঙ্গী গান। এরা হাতে কাজ, মুখে গান নিয়েই তৈরী করেন কর্মসঙ্গীত। কর্মসঙ্গীতে পুরুষ-মহিলা উভয়ের ভূমিকাই সমান। ধানকাটা, রোয়াগারা, ঢেঁকিতে ধান ভানা বা চিড়া কোটার সময় মেয়েরা এরূপ গান করেন। কর্মসঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল, সাবলীল এবং আঞ্চলিক।

ভাওয়াইয়া ঃ

কোচবিহারে প্রচলিত কর্মসঙ্গীত বিভাগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতধারা হল ভাওয়াইয়া। কোচবিহারের লোকগীতির মূল সুরই হল ভাওয়াইয়া। ভাওয়াইয়ার জনপ্রিয়তার বিস্তার ও চর্চা সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, নিম্ন আসামের গোয়ালপাড়া, বাংলাদেশের রঙপুরে হলেও বিশেষভাবে কোচবিহারে এই সঙ্গীতধারার প্রভাব বেশী। তাই যথার্থই বলা যায়— "ভাওয়াইয়ার কোচবিহার বা কোচবিহারের ভাওয়াইযা।" এর অপর একটি কারণ হল এই ভাওয়াইয়া গানের যশস্বী শিল্পীরা বেশীর ভাগই কোচবিহারের মানুষ।

এই লোকসঙ্গীতের নাম 'ভাওয়াইয়া' কেন হল এ সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও তাঁর অনুগামী অনেকের মতে ভাবমূলক গান বলেই এর নাম ভাওয়াইয়া। সংক্ষেপে বলা যায়, যে গানের সুর ও বিষয়বস্তু অন্তরকে দোলা দেয়, ভাবিয়ে তোলে তাই ভাওয়াইয়া। সুরেন বসুনিয়া থেকে আরম্ভ করে আরও অনেক বিদগ্ধ সঙ্গীতসাধকগণ এই মতকে সমর্থন করেছেন। আবার শিবেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডলের মতে ভাওয়াইয়া হল 'উদাস করা গান'। তাই কেউ বলেন 'বাওয়াইয়া' বা 'বিবাগী' শব্দ থেকে এই গানের নামকরণ হয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন 'বাউদিয়া' সম্প্রদায়ের রচিত গান বলে এর নাম 'ভাওয়াইয়া'। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শুরুতে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে বন্যহাতি ও মোষ চরাবার কাজে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ নিযুক্ত হতেন। বনে জঙ্গলে এই বিপজ্জনক কাজ করতে গিয়ে তারা দীর্ঘদিন থাকতেন প্রিয়

সঙ্গীহীন। তাই মাহুত ও মৈষালের কণ্ঠে ধ্বনিত হত ভাওয়াইয়া গীত। আবার কেউ কেউ মনে করেন এই অঞ্চল অসংখ্য নদী-নালায় পরিপূর্ণ ছিল। "হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদী বিধৌত অঞ্চলে অবিরত নদীগুলো ভাঙন সৃষ্টি করত। এই ভাঙনের তীরে বাস করা জনজীবন ছিল অত্যন্ত বেদনা-বিধুর। তাই এই ভাঙন শব্দ থেকে 'ভাঙ্নীয়া' বা 'ভাওয়াইয়া' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।"[১]

ব্যক্তিমানুষের চেয়েও এতদঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিমন্ডল ও পরিবেশে কবে থেকে এ সঙ্গীতের শুরু এ সম্পর্কে সঠিক সময় নির্ধারণ করা যায় না। কাঁঠাল কাঠের দোত্‌রাই ভাওয়াইয়া গানের একমাত্র বাহন। এই গানের কলিতেই শোনা যায়— 'মোক করলু জরমের (জনমের) বাউদিয়া।' অর্থাৎ এই দোত্‌রা নামক যন্ত্রটি গায়ককে করে তুলেছে উদাস ও বিবাগী। জলের সঙ্গে মাছের, ফুলের সঙ্গে সৌরভের যেমন সম্পর্ক দোত্‌রার সঙ্গে ভাওয়াইয়া গান একই ভাবে সম্পর্কিত।

"ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি আক্রমণের আগে ঐ দোত্‌রা যন্ত্রটির কথা কেউ বলে নি। মুসলমান সংশ্রবের সঙ্গে এদেশে এসেছে সানাই। এই সময় এসেছে দোতারা যন্ত্রটি দোত্‌রা নাম নিয়ে। প্রচলিত প্রবাদও এই সাক্ষ্য দেয় 'দোত্‌রা হারাম খোর'। দোত্‌রার এই ইতিহাস ভাওয়াইয়ার জন্মলগ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত। দোত্‌রার নামকরণ সম্পর্কে অনেক কষ্টকল্পনা রয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, মইষাল, গাড়ীয়াল, বণিক, নাবিকদের এই ভাওয়াইয়া গানে মুসলিম সংশ্রব একটা বড় সত্য।"[২]

কোচবিহারের সামন্ত রাজাদের বিভূতি-বৈভবের ইতিহাস দেড় শত বছরের বেশী নয় বলে সম্ভবতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ইংরেজ পণ্ডিতদের অনুসন্ধানের সময় পর্যন্ত এখানকার লোকগীতিকে ভাওয়াইয়া নামে অভিহিত করা হয়। গ্রিয়ারসন সাহেবের মতে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকগীতি রাজবংশী ভাষার গান। যেমন —

(১) "প্রাণ সাধুরে
যদি যান সাধু পরবাস
না করেন সাধু পরার আশ্
আপন হাতে সাধু —
আধিয়া খান ভাতোরে।" (কোচবিহার জেলা)

(২) "পর্থম যৌবনের কালে না হৈল মোর বিয়া
আর কতকাল রহিম ঘরে একাকিনী হয়া
রে বিধি নিদয়া।"[৩] (জলপাইগুড়ি জেলা)

গ্রিয়ারসন সাহেব এ গানকে যদিও ভাওয়াইয়া নাম দেন নি তবু বলতে পারি এগুলো ভাওয়াইয়ার আদি রূপ।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, অনাদিকাল থেকে এতদঞ্চলে মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত রাখালিয়া, মৈষাল গীতই পরবর্তীকালে রাখালিয়াগান, দোত্‌রাগান, মৈষালি বা মৈষালবন্ধুরগান, বাউদিয়া বা ভাঙ্‌নিয়া ইত্যাদি লোকগীতি, ভাওয়াইয়া নামে অভিহিত হয়। মৈষালী বা রাখালিয়া লোকসঙ্গীতই ভাওয়াইয়া গানের আদি রূপ।

নদী প্রধান কোচবিহারের জনজীবন ও বসতি ছিল অনিশ্চিত। গহন অরণ্যের নির্জন ভয়াল পরিবেশের মধ্যে প্রবাহিত একাধিক নদ-নদী। এমন পরিবেশে মানুষের সঙ্গী ছিল এই গান। তাই নদীকে নিয়ে গান বাঁধা হত এখানে। যেমন—

"নদী না যাইও রে বৈদো
নদীর ঘোলারে ঘোলারে পানি।"

ভাওয়াইয়া গানের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল প্রেম। লোকশিক্ষা, দেহতত্ত্ব অনেক ক্ষেত্রেই গানের বিষয় হলেও এই গান মূলত প্রেমের গান। আবার একে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের গান বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই গানের প্রেমিক প্রবর কোথাও রাখালিয়া বালক, কোথাও মৈষালবন্ধু, কোথাও বাউদিয়া, কোথাও বৈদো বা কালিয়া। বাঁশি নয়, দোত্‌রাই এর মূল বাহন। এ গানের পরকীয়া প্রেমের অভিব্যক্তি ও তীব্রতা রায়ডাক ও তোর্ষার মতই খরস্রোতা। পরকীয়া প্রেমের প্রাধান্য এতদঞ্চলের সমাজবিন্যাসকেই প্রতিফলিত করে। তা বলে স্বকীয়া প্রেমের গভীরতাও কম নয়। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় সঙ্গীতের নিদর্শন আমরা পাই আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে, কথায় ও সুরে—

"ওকি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু
কয়া যাও কয়া যাও রে।"

বিরহ এই ধারার লোকসঙ্গীতের অন্যতম বিষয়। মূলত প্রেম, প্রীতি, দৈনন্দিন সংসারজীবননির্ভর লোকসঙ্গীতের এই ধারায় তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনা গৌণ। বিষয়বস্তু লৌকিক প্রেম হয়েও প্রকাশভঙ্গীতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই গান।

গানের মাধ্যমে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা ও মিলন-বিরহ প্রকাশ পায়। আমরা যথার্থই বলতে পারি কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান প্রবাসের আত্মীয় স্বজনের বিরহ বেদনার প্রকাশ ঘটায়। আপনজনকে দূরে রেখে জীবন-জীবিকার স্বার্থে অনেকে যখন গরু- মহিষের রক্ষক

হয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভাওয়ায় কাটায় তখন তাদের নিত্যদিনের কথাই ভাওয়াইয়া গানে মূর্ত হয়ে ওঠে আপনজনের কণ্ঠে—

"ওরে তখনে না কইচঙ মইষাল রে
মইষাল না যান গোয়ালপাড়া
ওরে কাড়িয়া লবে হাতের বাঁশি
ছিড়িয়া গলার মালা রে।"

(প্রচলিত কথায় ও সুরে নায়েব আলী গীত)

ভাওয়াইয়া নামক এই প্রেমসঙ্গীতের নায়ক মহিষরক্ষক মৈষালবন্ধু হওয়ায় একে মৈষালবন্ধুর গানও বলা হয়।

কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গানে আঞ্চলিক উচ্চারণরীতি বিশেভাবে লক্ষণীয়। এই গান গলার স্বরভাঙা উচ্চারণ, নদীনির্ভরতা, বনভূমি অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গের নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ ফল বলে আমরা মনে করি। "প্রান্ত উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি এমনই যে নদীগুলি অপ্রশস্ত ও অগভীর হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে হয় খুব স্রোতা। সে কারণেই নদীগুলি ঘন ঘন হঠাৎ বাঁক নেয়। সেই Abruptness-ই ধরা পড়ে গলা ভাঙায়।"[৪]

আঞ্চলিক লোকগীতির সুরধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এর অন্তর্নিহিত সুরমাধুর্য উপলব্ধি করতে পারেন আঞ্চলিক মানুষরাই। যেমন কোন বিশেষ অঞ্চলের গায়কের কণ্ঠেই বিশেষ আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের অর্থ ধরা দেয় সম্পূর্ণভাবে।

ভাওয়াইয়া গানকে আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে যে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, সেটি হল— চট্‌কা ও দরিয়া। ভাওয়াইয়া গানের চটুলরূপই হল এই চট্‌কা। নৃত্যের আবেগে, সুরে ও তালে চট্‌কা গান হয়ে ওঠে লাস্যময়ী। তা সত্ত্বেও এ গানে জীবনের গভীর সংবেদন মূর্ত হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনে চোখে দেখা লঘু চপল বিষয়ই এই গানে শ্রুতিমধুর হয়ে ধরা দেয়। দ্রুত তালে আবদ্ধ মনোরঞ্জনকারী এই চট্‌কা গান মূলত লঘু বিষয়, তিন তিন ছয় মাত্রার তালে গাওয়া হয়। যেমন—

"প্রেম জানে না রসিক কালাচান
ঝুরিয়া থাকে মন . . . . ।"

কোচবিহার পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি জেলায় ভাওয়াইয়ার এই চট্‌কা আঙ্গিকটি "ফাক্‌সালি" এবং "খ্যাচেরা" নামে পরিচিত। হাসি, রঙ্গ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি জীবনের বিচিত্র দিকগুলো দ্রুত ছন্দে হালকা সুরে এবং লঘু তালে উজ্জ্বল করে তোলা হয় চট্‌কার নামান্তরে এই 'ফাক্‌সালি' গানে। যেমন—

"ও তুই কিসোত গোসা হলুরে
নাল বাজারের চ্যাংড়া বন্ধুরে।"

অথবা

"দাড়ি পাল্লা হাতোত করি পাইকার বেড়ায় টারি টারি
কোন বাড়ীতে কোষ্টা ব্যাচাইবে।"

দরিয়া চার চার আট মাত্রার চালে গাওয়া হয়। দরিয়ার গতি দীর্ঘ এবং গভীর। মনকে উদাস করে তোলে। এক কথায় বিলম্বিত লয়ের সঙ্গীত। যেমন—

"ও কন্যা রে, কন্যা তোর কন্যার পীরিতের আশে
বাপো ভাই কন্যা ছাড়িলাম দ্যাশে রে।"

ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীতের দুটি মূল বিভাগ চট্‌কা ও দরিয়া হলেও এই গানের বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা, সুর ও ছন্দের বৈচিত্র্য অনুযায়ী এর মূল সুর প্রধানত ছয়টি ভাগে বিভক্ত। যেমন—

(১) চিতান ভাওয়াইয়া ঃ

বিচ্ছেদ বেদনায় নারীর মন ভেঙ্গে পড়লে এই গানের আশ্রয় নেয়। এর বৈশিষ্ট্য হল উচ্চগ্রাম থেকে ক্রমে নিম্ন গ্রামে অবতরণ। পরকীয়া প্রেমের মাধুর্য এই গানের প্রাণসম্পদ। যেমন—

"ওকি একবার আসিয়া সোনার চাঁদ মোর, যাও দেখিয়া রে।
অদিয়া অদিয়া যান রে বন্ধু ডারায় (১) না হন পার
ওরে থাউক বোল তোর দিবার থুবার দেখায় পাওয়া ভার রে।"

(২) ক্ষীরল ভাওয়াইয়া ঃ

এই শ্রেণীর গানে দোত্‌রা বাজাবার একটি বিশেষ পদ্ধতি বা ধরন আছে। এ ধরনকে ক্ষীরল ডাং (Stroke) বলে। বিরহের প্রতীক এই গান সাধারণত কিছুটা নিম্ন গ্রামে আরম্ভ হয়ে উচ্চ গ্রামে যায়। যশস্বী লোকসঙ্গীত শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে এই গানে শোনা যায়—

পু - "কোন্‌টে থাকে কন্যা তোমার স্বামী
কোন্‌টে দেখা তার পাব আমি
আজি কও হে কন্যা সে কথা তুমি আমারে।

না - উজান গেইচে বন্ধু বাণিজ্যের আশে (৩)
এলাও টারত (৪) বন্ধুরে গামছা হাসে
আজি সকল কথা বন্ধু কইও তাহার আগে হে।"

(৩) দরিয়া বা দীঘল নাসা ভাওয়াইয়া ঃ

এই গান দীর্ঘ প্রসারিত দম সাপেক্ষ। সুরে দীর্ঘশ্বাসের প্রয়োগ দেখা যায়। ভাওয়াইয়ার এই বিভাগের এতদঞ্চলের জনপ্রিয় গান হল—

"ওকি গাড়িয়াল (১) ভাই
কত রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে।
যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে।"

(৪) গড়ান ভাওয়াইয়া ঃ

বিরহ বেদনা কাতর নারীর ধূলায় গড়াগড়ি যাওয়ার অবস্থা। অর্থাৎ গান শুনে উপলব্ধি হওয়া স্বাভাবিক যে ব্যথাতুরা নারী ধূলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, এক কথায় এমন সুরের গান—

"কত পাষাণ বান্ধাইছ পতি মনেতে
দুঃখের দিনে রইলেন পতিধন বৈদ্যাসে।"

(৫) করুণ রসের ভাওয়াইয়া ঃ

এ গানে করুণ রসের প্রাধান্য থাকে। ভাওয়াইয়া গানের যে পর্যায়ে সামাজিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় তাদের অন্যতম চিটুল / চিটুক বিদুয়া। স্বামীর মৃত্যুর পর বিবাহিতা নারীর অকাল বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণা ও চরম শোকের ছবি ফুটে ওঠে, তাই এখানে চিটুল বিদুয়া নামেও পরিচিত এই গান। এ গানের প্রচলিত একটি রূপ—

"নদীর পাড়ের কুরুয়ারে মোর জামের গাছের শুরা
কোড়ারে মুই কান্দোং চিটুল বিদুয়া হয়্যা।"

(৬) মৈষালী বা সোয়ারী চালের ভাওয়াইয়া ঃ

বাড়ি ঘর ছেড়ে দূর দেশে মহিষ চারণের জন্য থাকাকালীন যখন বাড়ির কথা মনে পড়ে, তখন চলমান মহিষের সওয়ার হয়ে মৈষালবন্ধু যে গান করেন, তা-ই মইষালবন্ধুর গান। এই গানের চাল অন্যান্য গানের থেকে ভিন্ন। এই গান গাইবার সময় মনে হয় যেন গায়ক কোন কিছুর সওয়ার হয়ে চলেছে এবং চলার ছন্দ গানের ছন্দে প্রকাশ পায়। এই চালকে সোয়ারী চাল বা মৈষালী চাল বলে। অনেক সময় মৈষালের বিরহেও এই গান করেন তার পত্নী। যেমন—

"মৈষ চড়ান মোর মৈষালবন্ধু রে
বন্ধু কোনবা চড়ের মাঝে
এলা কেনে ঘন্টির বাজন
না শোনোঙ মুই কানে মৈষাল রে।"

ভাওয়ার গান ভাওয়াইয়ায় পুরুষ প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও নারীর বিরহ বেদনা এ গানে প্রকাশ পায় নারীর জবানীতে পুরুষ কণ্ঠে। আবার পরনারীতে আসক্ত স্বামীর ব্যবহারে ব্যথিতা নারী যা গেয়ে ওঠেন তা ভাওয়াইয়া গানে হৃদয়স্পর্শী কবিতায় রূপ লাভ করে—

"মন সজনী কার কাছে কব দুঃখের কথা
কিসের মোর রান্দোন, কিসের মোর বারন
কিসের মোর হলদিয়া বাটা।"

ভাওয়াইয়া গানের আর একটি দিক হল— দেহতত্ত্বের গান। মানুষ তার নিজের রসসিক্ত ভক্তিপূর্ণ মনকে অদৃশ্য দেবতার কাছে নিবেদন করে এক ধরনের আধ্যাত্মিক গান ভাওয়াইয়ার সুরে গেয়ে থাকেন। এতদঞ্চলে মনঃশিক্ষা এবং তুক্ষা নামে যা পরিচিত। যেমন— মেখলিগঞ্জ মহকুমার লোকশিল্পী সোমারু বর্মনের কণ্ঠে শুনি—

"ভাবের বৈরাগী তুই ভাবতে মজালু
তোর প্রেমে মজিয়া শোক সাগরে ভাসালু
ও বৈরাগী নামটি ভালো, কেনে বা তুই বৈরাগী হলু
হরিনাম ছাড়িয়া এলা তুই প্রেমেতে মজালু।"

ভাওয়াইয়া গানে সমকালীন আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন ঘটে। যেমন— বন্যা, ভাঙন, দুর্মূল্যের বাজারে কন্ট্রোলের কাপড় নিয়ে চোরাকারবারীর মত ঘটনাও উল্লিখিত হয়। একটি গানে দেখা যায়—

"ও ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে
চতুর্দিকে জ্বলে সরুজবাতি
তোমার ক্যানে বল আন্ধার রাতিরে।"

এতদঞ্চলে প্রচলিত সকল আঙ্গিকের লোকগীতির সর্বজনগ্রাহ্যতা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার মন জয় করেছে। ভাওয়াইয়া গানের জনপ্রিয়তা আজ বাংলার লোকসঙ্গীতের অন্যতম অংশীদার। এ গান যথার্থই কোচবিহারের লোকগীতির ভিত্তি। শহরে, সুশিক্ষিত, শিষ্টজনের সুনজরে পড়ে এ গান আজ কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির বহমান ধারায় পর্যবসিত।

এই গানের প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে যাঁরা নিরলস অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বসুনিয়া, আব্বাসউদ্দীন আহমেদ, শৈলেন রায়, শিবেন্দ্রনারায়ণ মন্ডল, জীবন মৈত্র, নায়েব আলী টেপু, প্যারীমোহন দাস প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় কোচবিহারের ভাবের গান ভাওয়াইয়ার সঙ্গে যোগ বেশী। লোকসঙ্গীতের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়েও এ গান আজ নিজস্ব গুণে, সুর ও ছন্দের মাধুর্যে কোচবিহারের আঞ্চলিক সীমাকে অতিক্রম করেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় এর সুবের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আজ আধুনিকতার ছোঁয়ায় হোঁচট খাচ্ছে। সময়ের পরিবর্ত্তনে ভাওয়াইয়ার সুরও পরিবর্তিত হচ্ছে। সরকারী সৌজন্যে ভাওয়াইয়া গানের পুনরুজ্জীবনে ও সংরক্ষণে এক নতুন দিক সৃষ্টি হয়েছে। তোর্ষা-রায়ডাক, গদাধরের জল বেয়ে সাউদ সওদাগরের আনাগোনা আজ আর নেই। রাখালিয়া বালক বা মৈষাল বন্ধুরা দিনান্তের গোধূলিতে আর পেন্টি (ছোট লাঠি) হাতে গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফেরে না। তবু লোকসঙ্গীতের বহমান এই ধারা ও তার ঐতিহ্য আজও তোর্ষা, কালজানি, রায়ডাক, গদাধরের স্রোতের মতই প্রবহমান। ভাওয়াইয়া ছাড়াও জেলায় প্রচলিত রয়েছে আরও অনেক কর্মসঙ্গীত। যার অন্যতম সারিগান—

সারিগান ঃ

নদীমাতৃক কোচবিহারে নদীকে ভিত্তি করে যাদের জীবিকার আশ্রয়, এক কথায় মাঝি-মাল্লাদের মধ্যে সারিগানের প্রচলন বেশি। যদিও এই গানের মূল উপলক্ষ থাকে নৌকাবাইচ। জেলার সর্বত্রই নৌকাবাইচের প্রচলন আছে একথা বলা যায় না। অনেকে মনে করেন নৌকাবাইচের উৎস কল্পনায় গাজীপীরের কেরামতি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের মত কোচবিহারেও আনুষ্ঠানিক লোকক্রীড়া হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক নৌকাবাইচের আগে এবং পরে প্রতিযোগীরা নাচের মাধ্যমেই যেমন এই সারিগান করেন তেমনি নৌকা চলাকালীনও এই গান করেন। নৌকার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে বসে দাঁড়বাহকগণ যখন দাঁড় টানেন, তখন নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে সারিগানের মূল বা দোয়ারী প্রথম গান ধরেন।

এতদঞ্চলে বিশেষ করে কালজানি নদীতেই নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান ছাড়াও স্বতন্ত্র দিনে এই সারিগান ভিত্তিক নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে যখন খাল-বিল এমনকি নদীতে যখন তুলনামূলকভাবে জল কম থাকে তখনই জাতিধর্ম নির্বিশেষে নৌকাবাইচকে উপলক্ষ করে এই গানের আয়োজন হয়। সারিগানের বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেম থাকে, তেমনি থাকে লৌকিক প্রেম। তাই সারিগানে দেখা যায় প্রেমিকা তার প্রেমিককে উদ্দেশ্য করে বলছে —

> "দক্ষিণা হাওয়ায় প্রাণ বাঁচে না
> সোনার বন্ধু নাই ঘরে
> ঢালুয়া খোপা উড়াল বাতাসে।"[৫]

বলরামপুর গ্রামের লোকশিল্পীগণ চিলাখানা বন্দর সংলগ্ন কালজানি ব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্বে কালজানি নদীতে নৌকাবাইচের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এরূপ একটি সারিগান গেয়ে শোনান—

> "অল্প বয়সে খইস্যা পড়ল রাজার গলার মতি হার
> বসন্ত কালরে আমার ২

যখন ও জন্মিল কন্যা বর্ণ রাজার ঘরে রে
বসন্ত কালরে আমার
নয় না বছরের কন্যা দশ নাহি পুরে রে
বসন্ত কালরে আমার
নালিশ করিল কন্যা বাপেরও হুজুরে রে
বসন্ত কালরে আমার।"[৬]

সারিগানের সঙ্গে প্রতিযোগীগণ সারিনাচও প্রদর্শন করেন। "সারিগানের বিষয় একাধিক। রাধা-কৃষ্ণ, হরগৌরী, নিমাই সম্পর্কিত গান, লৌকিক নরনারীর প্রেমাত্মক গান, পরস্পর আক্রমণাত্মক গান গাওয়া হয় বেশী।"[৭]

বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে মনসা ভাসানের দিন এই গানের প্রচলন থাকলেও কোচবিহারে হিন্দু সমাজে আশ্বিনের শুক্লা দশমী-তিথির পর নৌকাবাইচকে উপলক্ষ্য করে এই গানের প্রচলন বেশী।

ছাঁদ পেটানো গান ঃ

কোচবিহার জেলায় ছাঁদ পেটানোর সময় রাজমিস্ত্রি শ্রমিকগণ কর্মসঙ্গীত হিসেবে একরকম গান করে থাকেন। যার বেশীরভাগ সুরই ভাওয়াইয়া এবং ভাটিয়ালী। লোকসঙ্গীতের আঙ্গিক বিচারে এগুলি কখনও মনঃশিক্ষা, আধ্যাত্মিক, দেহতত্ত্ব ও প্রেমমূলক। একটি ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া গান এতদঞ্চলে রোয়া গাঁড়া, ছাঁদ পেটানো, পাট কাটার সময় শ্রমজীবী সম্প্রদায় তাদের শ্রমকে লাঘব করার জন্য গেয়ে থাকেন—

"ওকি পতিধন প্রাণ বাঁচেনা যৈবন জ্বালায় মরি
আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কি করে তার তারা

যে নারীর সোয়ামী নাইরে দিনে আন্ধিয়ারা।"

লোকসঙ্গীতের শ্রেণী বিচারে ছাদ পেটানোর গান অন্যতম কর্মসঙ্গীত। সেই হেতু ধান কাটার গান, পাট কাটার গান, ধান ভানার গান, বোনার গান, তাঁত চালানোর গান ইত্যাদির মত ছাঁদ পেটানোর গানকেও সারিগান বলা যায়। লোকায়ত কর্মজীবনে গ্রামীণ শ্রমিকগণ সারিবদ্ধভাবে গানগুলি করে বলে একে সারিগান বলা হয়।

প্রসঙ্গত বলা যায় সারিগানেব পাশাপাশি ভাটিয়ালী গানের প্রচলনও আছে কোচবিহারে। তিস্তা, তোর্ষা, গদাধর, কালজানি নদীপথে ভাটি দেশের (বাংলাদেশ) বাণিজ্য উপলক্ষে নৌকার মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে ভাটিয়ালী গানের আগমন ঘটে এতদঞ্চলে।

মাছ ধরার গান ঃ

উত্তরবঙ্গের আদিম জনজাতির অন্যতম রাভা জনজাতি। যাদের জীবনাচরণ, ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি উত্তরবঙ্গ তথা নিম্ন আসামের লোকসংস্কৃতির এক বিরল দৃষ্টান্ত। এই জনজাতির জীবনচর্চায় নৃত্যগীতের স্থান অতি নিবিড়। রাভা ভাষায় নৃত্যকে বলা হয় "বসিনী" (Basini) এবং গীতকে বলা হয় "চায়" (Chai)। এই জনজাতির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনবৃত্তের প্রতিটি পরতে পরতে নৃত্য ও গীতের প্রচলন আছে। সাধারণত নদী বা জলাশয়ে মাছ ধরার সময় নারী-পুরুষ উভয়েই কোমরে খলুই বেঁধে, হাতে জাকই নিয়ে নৃত্যের তালে তালে নিম্নোদ্ধৃত গীতটি করেন। যাকে উক্ত জনসমাজের নিজস্ব ভাষায় বলা হয় 'নাকচেংবেনি'। যেমন—

'ফালা কাটাঙ্গি পালাউ আনাও
ফালা কাটাঙ্গি পালাউ
শিঙ্গি মারিঙ্গি দুকু আনাও
শিঙ্গি মারিঙ্গি দুকু
উ-দুকু মইন উ পালাউ মইন
চিনা জোরা হাসামায় নাকচেংরেতিয়া
আনাও না রেতিয়া
নাং পালাউ নো আনাও।"[৮]

রাভা জনজাতির 'হুর' পূজার যে গান করা হয় তাকে বলা হয় 'হুর তাণ্ডি'। আবার বৈশাখ মাসে এদের প্রধান দেবী 'আমায়জু' পূজা উপলক্ষে যে নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান হয় তাকে বলা হয় 'কা-তাণ্ডি'। কোচবিহারের রাজবংশী সমাজেও মাছ ধরার নিমিত্ত অনেক গান প্রচলিত আছে। যেমন—

"মাছ মারে মাছুয়া ভাইরে ছেকিয়া ফেলায় পানি
আমার মাছুয়া মাছ মারিছে চন্দনা পরুয়া
মাছ মারে মাছুয়া ভাইরে
ইলশা শামলাং কইহে।"

হাতি পোষ মানানোর গান ঃ

আসামের গোয়ালপাড়া বিশেষ করে গৌরীপুর অঞ্চলে গান দিয়ে মানুষের আওয়াজের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় হাতিকে এবং প্রশিক্ষণ শুরুর সময় আল্লা রসুলের যে গান গাওয়া হয় তা হল—

"আল্লা আল্লা বলরে ভাই হায় আল্লা রসুল
কোন মহলের হাতিরে ভাই হায় আল্লা রসুল।"

আবার হাতির মাহুত ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী ভিত্তিক এক ধরনের গান প্রচলিত আছে যাকে বলা হয় 'মাহুতবন্ধুর গান'। যেমন—

"গদাধরের পাড়ে পাড়ে রে
মোর মাহুত চড়ায় হাতি
কি মায়া নাগাইলেন মাহুতরে
তোর গলায় রসের কাঠি।"

অরণ্য অধ্যুষিত কোচবিহারের অনেক অঞ্চলে এই গান একদা বহুল প্রচলিত থাকলেও আজ তা বিলুপ্তির পথে। দূরদর্শন ও ভিডিওর মত আধুনিক বিনোদনের প্রচার মাধ্যমের দাপাদাপিতে জেলার গ্রামীণ সংস্কৃতির বহমান এই ধারার যাত্রাগান, কবিগান, পালাগান এবং ভাওয়াইয়ার মত লোকগীতিআজ বিলুপ্তির পথে। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু প্রবীণ লোকশিল্পী লোকসংস্কৃতির এই ধারাকে কখনও ব্যক্তিগতভাবে, কখনও সমষ্টিগতভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন।

আনুষ্ঠানিক লোকগীতি ঃ

কোচবিহারের লোকগীতির একটি বড় অংশ এর আনুষ্ঠানিক লোকগীতি। এ প্রসঙ্গে বলা যায় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের বিষহরি পূজা ও পালা, ষাইটল পূজার গান, কাতি পূজার গান, পদ্মা পুরাণকে নিয়ে এখানে পালা গান নামেও প্রচলিত। আসামে এই গানকে বলা হয় 'বাঁশীপুরাণ' গান।

আবার কোচবিহারের লোকনৃত্য ও লোকগীতি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। কোচবিহারের জনজীবনে অলিখিত সাহিত্যের রসমাধুর্যের প্রকাশ পায় এই লোকসঙ্গীতে। গ্রামীণ লোকজীবন এই সকল লোকসঙ্গীতের মূর্ছনায় কর্মজীবনে এক নূতন প্রেরণা লাভ করে।

কোচবিহারের লোকসঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল- এর উত্তরসাধকগণ অনেক ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিক। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখা গেছে আজও অনেক লোকশিল্পী আছেন যাঁরা পুরুষানুক্রমে এই গান গেয়ে চলেছেন। এর বাস্তবতা দেখা যায় আনুষ্ঠানিক গানের মারেয়া-মারেয়ানীদের মাধ্যমে। হলদিবাড়ীর তিস্তাবুড়ি ব্রতের মারেয়ানী পবনেশ্বরী রায়, নাটাবাড়ীর বিষহরি ও ষাইটল পূজার মারেয়ানী খুকি নমদাস, দিনহাটার পুটিমারি গ্রামের ফুলতি বর্মন, মাঘপালা গ্রামের নেন্দা বর্মন আজও বংশানুক্রমিকভাবে এই গান গেয়ে চলেছেন।

কোচবিহারের কুষাণ-দোত্রা পালা নামক লোকনাটকেও এতদঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় গানের প্রচলন আছে, যাকে বলা হয় 'পালাগান'।

বিয়ের গান ঃ

প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়েরই লোকসঙ্গীতের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ বিয়ের গান বা গীত। সমাজ বিবর্তনের ধারায় শিক্ষিত জনমন থেকে লোকসঙ্গীতের মূল্যবান এই ধারা আজ

লুপ্তপ্রায়। লোকজীবনের প্রাচীন কতকগুলি রূপ এই গীতের মধ্যে দেখা যায়। পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই এই গান বা গীতের কদর। বিয়ে নামক ব্যবহারিক প্রয়োজন ফুরোলেই গীতগুলি প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

জেলার পাঁচটি মহকুমার ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক ক্ষেত্র-সমীক্ষায় কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম নিরপেক্ষ বিয়ের গানগুলির মধ্যে আমরা কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি— (ক) বিয়ের বিভিন্ন লোকাচার ভিত্তিক অনুষ্ঠানকে নিয়ে গান করা হয়; (খ) বিয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর ও কনেকে কেন্দ্র করে হাসি-ঠাট্টা ও রঙ্গ-ব্যঙ্গ মূলক গান করা হয়; (গ) বর ও কনের বাড়িতে তাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করেও গান করা হয়; (ঘ) নবদম্পতিকে উদ্দেশ্য করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের শুভকামনা করেও অনেক গানের প্রচলন আছে।

স্থানীয় রাজবংশী সমাজে বিয়ের দিন বর কনের বাড়িতে আসার মুহূর্তে যখন কন্যা ও কন্যার বাড়ির মহিলাগণ কান্নাকাটি করেন তখন কনের বাড়ির বৈরাতিগণ বরকে বরণ করার নিমিত্তে যে গান করেন তার একটি নিদর্শন পাই মেখলিগঞ্জ মহকুমার নিজতরফ গ্রামের মালতি বর্মনের কণ্ঠে—

> "ও ভুট ভুটির মাও (উলু / জোকার)
> কইন্যা কাইন্দ না, কাইন্দ না, কাইন্দ না ঘরে (২)
> বিয়ার গাড়ী ওই বুঝি আইসে।"[৯]

স্থানীয় রাজবংশী সমাজের লোকাচারের মত জেলার মুসলিম সমাজে লোকাচার ও পার্বণের অন্যতম উপাদানই হল এই গান। শরিয়তে, বিয়েতে গানের অনুমতি না থাকলেও কোচবিহার জেলার বহু অঞ্চলে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়েতে গানের প্রচলন আছে। জেলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম এই সম্পদ আজ বিলুপ্তির পথে। তুফানগঞ্জ মহকুমার দেওচড়াই অঞ্চলের কেতুমন বিবি ও নচিমন বিবি, চর বালাভূতের জরিনা বিবি, সাহিনা বিবি, জাহানারা বেগম, হামিদা বিবি, ঝনকা বিবি, বাঁশরাজা গ্রামের হালি বিবি, রহিমা বিবি, নেসবান বিবির কণ্ঠে আজও বেঁচে আছে কঠিন সংযম ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই গান। এই রকম একটি গান নিম্নরূপ—

> "খোলা হাটের মাঝে রে জয়মালা টানাইছে রে
> নাল ময়না তোরে কারণে
> সুন্দর ময়না তোরে কারণে
> তোর বাবা জবাব দিচে ভরা সভার মাঝেরে।"[১০]

জাগ গান ঃ

কোচবিহারের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মদনকামদেব বা বাঁশ পূজা উপলক্ষে জাগ গানের প্রচলন আছে। সারা রাত জেগে এই গান গাওয়া হয় বলে এই গান 'জাগ গান' নামে পরিচিত।

মতান্তরে এই গানের দ্বারা কামকে জাগ্রত করা হয় বলে এই গানের নাম 'জাগ গান' হয়েছে। মূল গায়ক প্রথমে গান ধরলে দোহারগণ পরবর্তীতে ধুয়া দেন। আখ্যানমূলক এই গানে মদনকামদেবের জন্মকথা, বাঁশের জন্মকথা, নাড়ু সিজ্জন প্রভৃতি নামে গান গাওয়া হয়। এছাড়াও এই গানে সত্যপীর, চৈতন্যলীলা, সমসাময়িক আঞ্চলিক প্রেমলীলাও এই গানের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা জাগ গানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে প্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। অবিভক্ত বাংলার রঙপুর জেলার প্রতিবাদী কবি রতিরাম দাস ছিলেন এই গানের রচয়িতা এবং গায়ক। কোচবিহারের মদনকাম, বাঁশ পূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই জাগ গান। কবি রতিরাম দাস রচিত একটি জাগ গানে ইংরেজ শাসিত উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিচয় পাই। বিশেষ করে তৎকালীন ইজারাদার দেবী সিংহ ফতেপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে অত্যাচার চালায় তারই নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায় এই গানটিতে—

"কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবী সিং
সে সময় মুল্লুকেতে হৈল বার টিং
কত যে খাজনা পাইবে তার নেকা নাই
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই।"[১১]

কানাই ধামালী বা লীলা জাগ নামেও এক ধরনের পাড়াভিত্তিক জাগ গানের প্রচলন আছে এখানে। ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীতের অন্যতম সম্পদ এই 'কানাই ধামালী'। এ গান মূলত আখ্যায়িকামূলক লোকগীতি।

সত্যপীরের গান ঃ

মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের বিশেষ করে সত্যপীর, গাজীপীর ও তোর্ষাপীর প্রমুখের মাহাত্ম্য প্রচার করে এক ধরনের গান প্রচলিত আছে যা সত্যপীরের গান নামে পরিচিত। এ গান হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত আছে। ক্ষেত্রানুসন্ধানে জেলার হলদিবাড়ী ব্লকের পৌর এলাকার ফজলুল হক মহাশয় গুরুশিষ্যের কথোপকথনের ভঙ্গিতে সত্যপীরের এক গান গেয়ে শোনান—

শিষ্য— 'কোন ফকিরের বেটা তুমি,
কোন ফকিরের নাতি?
আসমান হইল কয় তবক,
জমিন কয় রত্তি?

ফকির— মন ফকিরের বেটা আমি
তন ফকিরের নাতি
আসমান হইল সাত তবক (স্তর)
জমিন ছয় রত্তি।"

অন্যান্য ঃ

গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গান ঃ

কোচবিহার তথা অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের প্রাচীন মৌখিক সাহিত্যের চমকপ্রদ নিদর্শন 'গোপীচন্দ্রের গান'। কোথাও কোথাও একে ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের গানও বলা হয়। নানা কারণেই গোপীচন্দ্রের গান প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে এখানে। স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন ময়নামতীর গান সংগ্রহ করে "মানিকচন্দ্র রাজার গান" নামে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রথম প্রকাশ করেন ১৮৭৮ সালে।

গোপীচন্দ্র ও তার মা ময়নামতীকে কেন্দ্র করে এক মহাকাব্যধর্মী আখ্যান গড়ে উঠেছে গোপীচন্দ্রের গানে। নাথ সাহিত্যের একটি ধারা গোরক্ষবিজয়-মীনচেতন ও অপর ধারাটি মানিকচন্দ্র-ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের গান। এই শেষোক্ত ধারাটি অবলম্বন করে কোচবিহার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে এই গানের প্রাবল্য দীর্ঘদিন থেকেই অনুভূত হয়েছে। গোপীচন্দ্রের কাহিনী অত্যন্ত মানবিক গুণে সমৃদ্ধ। এই কাহিনী জনমানসে স্থায়ী আসন লাভ করার পেছনে রয়েছে নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের লোকপ্রিয় স্মৃতি।

শ্রদ্ধেয় ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'গোপীচন্দ্রের গান' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "গোপীচন্দ্রের গান এপিক ধর্মী রচনা—ইহার বিস্তার, ভাবগভীরতা এবং সমুচ্চ আদর্শ ইহাকে মহাকাব্যের গুণে মণ্ডিত করিয়াছে। যদি মৌখিক মহাকাব্য (Oral epic) বলিয়া কিছু থাকে তবে গোপীচন্দ্রের গান তাহাই।" গোপীচন্দ্রের গানের কাহিনীটি শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

"মানিকচন্দ্র রাজা ছিল ধর্মী বড় রাজা।
ময়নাক বিভা করিল তার নওবুড়ি ভার্যা।
ময়নাক বিভা করি রাজার না পুরিল মনের আশ।
তারপর দেবপুরের পাঁচ কন্যা বিভা করি পুরি গেল মনের আবিলাস।"
(গোপীচন্দ্রের গান, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ-১, ক.বি. ১৯৬০)

'গোপীচন্দ্র-ময়নামতী'র গানগুলি গল্পরস ও সাংসারিক অনুভূতির প্রকাশে আজও এতদঞ্চলের বৃহত্তম লোকজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ব্রতের গান ঃ

কোচবিহারে লোকাচার ভিত্তিক ব্রত অনুষ্ঠানেও কথার পাশাপাশি গানেরও প্রচলন আছে। এ সকল গানে পারিবারিক কামনা-বাসনার পাশাপাশি লৌকিক দেবদেবীর মহিমা যেমন প্রচার করা হয় তেমনি কৃচ্ছ্র সাধনের মাধ্যমে জীবনকে বিকশিত করার কথাও বলা হয়। এক কথায় সার্বিক মঙ্গল কামনাই ব্রতের গানের মূল উদ্দেশ্য। কোচবিহারে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য

গীতিনির্ভর ব্রতগুলি হল— সুবচনী ব্রত, কাতিপূজার ব্রত, কাত্যায়নী ব্রত প্রভৃতি। প্রত্যেকটি ব্রতের মধ্যেই গানের প্রচলন আছে। গান এই ব্রতগুলির প্রাণ।

আনুষ্ঠানিক লোকগীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ষাইটল, বিষহরি ও কাতি পূজার গান।

গীদালী বা মুলানী তাঁর নিজস্ব সুরে এই গান গেয়ে চলেন। ষাইটল ব্রতের গান গাওয়া হয় বসে, অপরপক্ষে কাতি পূজা এবং বিষহরি গান গাওয়া হয় দাঁড়িয়ে। নৃত্য এ গানের প্রধান অনুসঙ্গ হওয়ায় ঢাকের বাজনার তালে তালেই এ গান গাওয়া হয় এবং সবক্ষেত্রেই গান ও নৃত্যের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পায় গ্রামীণ অপটু দক্ষতা। ষাইটল, বিষহরি ও কাতি পূজার ক্ষেত্রেও গানের ধারা মৌখিক পরম্পরায় চলে, এর কোন লিখিত রূপ নেই। এতদঞ্চলে প্রচলিত এরূপ গানের নমুনা নিম্নরূপ—

কাতিপূজার গান —

'আনিল মারেয়া ষোলটিয়া কলার থাতি,
কাতি দেওয়ানে বইসে রে।
আনিল মারেয়া কুমারের ঘট
কাতি দেওয়ানে বইসে রে।"

(নীলেশ্বরী নমদাস, গ্রাম—নাটাবাড়ী)

ষাইটল ব্রতের গান —

"তোরে বরে মা পুত্র পাইলাম কোলে
তোক বানেয়া আনলাম মালাকারের ঘরে
পূজা খাবার বইসেক মা তুই আমার ঘরে।"

(খুকি নমদাস, গ্রাম—নাটাবাড়ী)

বিষহরি ব্রতের গান —

গ্রামবাসী ঃ "যায় যায় বেহুলা নায়ে ফেলায় পাও
আমার ঘাটে চাপা নৌকা সেন্দুর পৈরা যাও।"

বেহুলা ঃ "না পিন্দি না পিন্দি তোমার সেন্দুর
আমি কাচা চুলের আরি
সেন্দুর জলতে ভাসেয়া দেও পিন্দুক বিষহরি।"

(নেন্দা বর্মন, গ্রাম—মাঘপালা)

ষাইটল ও বিষহরি গান মূলত ষষ্ঠী ও মনসার প্রসঙ্গে হলেও এতে কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গ আসে। যাকে কোচবিহারে বলা হয় খোসা গান। এই খোসা গানই ষাইটল ও বিষহরি গানকে জমিয়ে তোলে।

চার যুগের গান ঃ

জেলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত চার যুগের গান। চার যুগের গান নারীর সন্তান ধারণের সময় ভ্রূণ সৃষ্টি থেকে শুরু করে গর্ভপাত পর্যন্ত দশমাস দশদিন পূর্ণ হলে জঠর থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের হিন্দু ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত গানটি গাওয়া হয় দোয়ারী ও মূলের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। যেমন—

দোয়ারী —

"এক না মাসের বেলা জানি কি না জানি,
দুইয়ো না মাসের বেলা কিসের কানাকানি।
তিন না মাসের বেলা কিসে কিসে জোড়া,
পাঁচ না মাসের বেলা কিবা পুষ্প ফোটে,
ছয় না মাসের বেলা কিবা উল্টি বসে।
সাত না মাসের বেলা কিবা খাইতে চায়,
অষ্ট না মাসের বেলা পবন জিয়ায়।
নয় না মাসের বেলা কিবা গুণ স্থিতি,
দশ না মাসের বেলা কিসের মুরতি।"

প্রতি উত্তরে মূল বলেন —

"এক না মাসের বেলা জানি কি না জানি,
দুইয়ো না মাসের বেলা কিসের কানাকানি।
তিন না মাসের বেলা রক্তে ছান্দে গোলা,
চার না মাসের বেলা হার মাংস জোড়া।
পাঁচ না মাসের বেলা পঞ্চ পুষ্প ফোটে,
ছয় না মাসের বেলা যুগ উল্টি বসে।
সাত না মাসের বেলা সাধ খাইতে চায়,
আট না মাসের বেলা মন পবন জিয়ায়।
নয় না মাসের বেলা নবগুণ স্থিতি,
দশ না মাসের বেলা জনমের মুরতি।"

(কথক ঃ গোপাল নমদাস ও জলেশ্বর নমদাস, চারালজানি, মাছুয়ার টারি,
নাটাবাড়ী ২ নং অঞ্চল, তাং - ৭/১১/৯৯ইং)

জারিগান ঃ

বর্তমান পূর্ববাংলার মত উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারে মুসলিম সমাজে সারিগানের চেয়ে জারিগানের প্রচলন বেশী। সারিগানের কোন ধর্মীয় উপলক্ষ না থাকলেও জারিগানের মূল উপলক্ষ মহরম। তাজিয়া নিয়ে মহরমের দিন মুসলিম যুবকগণ লাঠি খেলার মাধ্যমে উদ্দাম বাদ্যের সঙ্গে এক ধরনের জারিগান করেন। হলদিবাড়ী ব্লকের টাউন ক্লাবের মাঠে প্রতি বছর মহরমের দিন প্রায় ২৫টি এরূপ লাঠি খেলার দল উদ্দাম নৃত্যের মাধ্যমে জারিগান করেন।

কোচবিহার জেলার গুদাম মহারাণীগঞ্জ অঞ্চলে আমরা এক ক্ষেত্র-সমীক্ষায় একটি জারিগান সংগ্রহ করি। স্থানীয় লোকশিল্পী গাটু মিঞা এই জারিগানটি গেয়ে শোনান। গাটু মিঞার মতে এই গান চার যুগের (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) গান নামেও প্রচলিত। লাঠি খেলার অন্তে কুড়ি-পঁচিশ (২০/২৫) জনের একটি দল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এরূপ গান করেন। উর্দু আ-লে-বে-তে-ছে - এই বর্ণের অনুসরণে গানের প্রশ্ন হল —

"আ - লেপ হরফে আসমান পয়দা
বে - হরফে জমি
তে - হরফে হিন্দু পয়দা
ছে - হরফে আমিন পয়দা
আসমান না ছিল কোথায় ছিল তারা।"

অপর এক গানে উক্ত গাটু মিঞা বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন বারে ঋতুবতী নারীদের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে গান করেন। যেমন —

"প্রথম নারী ঋতুবতী যে দিবসে হয়
রবিবারে প্রথম ঋতু যে নারী পাবে
নারী থাকতে স্বামী তার মারা যাবে।"

স্থানীয় মুসলিম সমাজের বিশ্বাস যদি কোন নারী রবিবারে প্রথম ঋতুবতী হয় তবে সে অল্প বয়সে বিধবা হবে।

কোচবিহারের লোকসঙ্গীত উদ্ভব লগ্ন থেকেই কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছে। সেই সুবাদে আজও সমসাময়িক হয়ে উঠেছে পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে বহমান রেখেই এই গান।

(খ) লোককথা ঃ

বংশানুক্রমিক কিংবা মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত ও গদ্য ভাষায় বর্ণিত লোকশ্রুতিমূলক গল্পকেই লোককথা বলা যায়। এ ধরনের লোককথা সাধারণত সহজ সরলভাবে এগিয়ে যায়।

লোককথায় সাধারণত Motive লক্ষ্য করা যায়। এই Motive-এর উপর ভিত্তি করেই লোককথার ক্ষুদ্র আয়তন ঐতিহ্যকে ধরে বেঁচে থাকে।

কোচবিহারে লোককথার অলৌকিক শক্তির প্রকাশ যেমন দেখা যায়, তেমনি লোকজীবন ও লোকসমাজও প্রস্ফুটিত হয়। লোককথার বিষয়বস্তু সবসময় বা সকল ক্ষেত্রে মানুষই হবে এমন কোন কথা নেই। অনেক সময় দেবদেবী ও পশু-পাখীও এই লোককথার বিষয়বস্তু থেকে বাদ যায় না। তবে কোচবিহারের লোককথার সিংহভাগ জুড়ে আছে লোকজীবনের লোকাচার ও লোকধর্মনির্ভর ব্রত কথাগুলি। লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ ওয়াকিল আহমেদ-এর মতে "যে জাতি বিচিত্র বিষয়ক, বহু সংখ্যক লোককথার জন্ম দেয়, সে জাতি সাংস্কৃতিক চেতনায় ও জীবন রসে সমৃদ্ধতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।"

কোচবিহারের লোকসাহিত্য বা মৌখিক সাহিত্যকে যদি আমরা লোকমনের তথা লৌকিক সমাজমনের বিশেষ অভিব্যক্তির প্রকাশ মনে করি তবে সেটি অবশ্যই লোককথা। লৌকিক কাহিনীনির্ভর প্রচলিত লোককথাগুলি কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। অঞ্চলভেদে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আর্থসামাজিক পরিবেশে লোককথার পটভূমিকায় যাই থাকুক না কেন এর মূল সমস্যা কিন্তু সবগুলিই মানবিক। কোচবিহারের লোককথা লোকভাষা নির্ভর।

বুড়া-বুড়ি আর শিয়াল ঃ

একদিন দুই বুড়া-বুড়ি শ্যাক আলু গাড়ে। ওদিয়া জঙ্গল থাকি শিয়ালের ঘর উলুক-ভুলুক করিয়া দেখে আর মনে মনে ধেন্দেলায়— 'ক্যামোন করিয়া বুড়ার শ্যাক আলু খাওয়া যায়। এক দুই করিয়া শিয়ালের ঘর বুড়া-বুড়ির বগল আসিয়া কয়— 'হ্যাঁ বাহে! বুড়ার ব্যাটা! ওটে তোমরা কি করেন?' বুড়া-বুড়ি কয়— 'শ্যাক আলু গাড়ি।' শিয়ালের ঘর ফির কয়— 'শ্যাক আলু গাড়েন, তা ক্যাঙ করিয়া গাড়েন?' বুড়া কয়— 'ক্যা, শ্যাক আলু মাটির তলোত থুইয়া পোঁতে থুইলে না হইল।' শিয়ালের ঘর কয়— 'তে হৈলে তো বুড়ারব্যাটা শ্যাক আলু তোমার মোটা হইবে না।' বুড়া-বুড়ি কয়— 'ক্যা?' শিয়ালের ঘর কয়— 'শ্যাক আলু যদি উসিয়া গাড়েন তে হৈলে দেখিবেন শ্যাক আলু ক্যামুন মোটাসোটা হয়।' বুড়া-বুড়ি শিয়ালের কতাক সচায় ভাবিয়া সউগ শ্যাক আলু গুলান উষান করি গাড়ি থুইয়া গেইল। ইদিয়া দিন বীতি যায় রাতি হৈল্। বুড়া-বুড়ি বাড়ি আসিয়া মনে মনে কয়— 'তে হৈলে এইনান করি গাড়িলে ঝ্যাদি মোটাসোটা হয় তে ভালে তো। হামরা তো এদ্দিন জানি না, রাতি পোয়াইলে যায়া দেখিমু একবার।'

ইদিয়া শিয়ালের ঘর সগায় আসিয়া শ্যাক আলু খুড়িয়া হাতাপাতি খায়া শ্যাক আলুর চোচা ক্যালেয়া মাটি দিয়া ঢাকি থুইয়া গেইচে।

বুড়া সকালে আসি দেখে শিয়ালের ঘর কুল্যে খায়া গেইচে। খালি চোচাগুলায় সার। বুড়া কয়— 'শিয়ালের ঘরোক এই বার মজা দেখাইম।' বাড়ি ঘুড়ি আসিয়া বুড়িক কইল— 'মুই বিচিনাত শুতি রঙ তুই মোক ক্যাতা কাপড় দিয়া ঢাকি থুইয়া কান্দেক গালা ছাড়ি দিয়া।' বুড়া উদি এখান ছন্ছনা ধারুয়া বেকি সাথোত নিল।

বুড়ি আনানি-বিনানি করি কান্দে। তাকে শুনিয়া শিয়ালের ঘর কয়— 'বুড়ি বুড়ি, তোমার কি হৈচে?' বুড়ি কয়— 'মোর কপাল ভাঙিচে। বুড়াটা মরি গেইলেক, মুই এলা কি করোং?' শিয়ালের ঘর কয়— 'না কান্দেন, আমরা ইয়ার হিত চিন্তা করিমু।' একনা-একনা করি শিয়াল বুড়ির ঘর সোন্দায় আর বুড়ার চাইরো পাকে বৈসে। বুড়ি কান্দে আর কয়— 'একনা না সোন্দাইল রে বুড়া।' বুড়া কয়— 'হু।' আর একনা শিয়াল সোন্দায় বুড়ি কয়— 'দুকুনা সোন্দাইল রে বুড়া।' বুড়া কয়— 'হু।' এ্যাঙ করি কুল্ল্যায় শিয়াল ঝ্যালা ঘর সোন্দাইল শ্যালা। বুড়ি কয়— 'কুল্ল্যায় সোন্দাইল রে বুড়া।' বুড়া 'হু' কয়া ক্যাতার তল থাকি বিড়িয়া বেকি হাতোত ধরি খাড়া হইল। ইদি বুড়ি দুয়োর ঝাপেয়া বায়রা দুয়োর চিপি ধরি আচে। বুড়া কারও ঠ্যাং কাটিলেক, কারও ন্যেটু কাটিলেক, কারও টিকা কাটিলেক। ব্যাড়া চাটি ভাঙিয়া শিয়ালের ঘর দিল দৌড়। দৌড়াইতে দৌড়াইতে খ্যাড় বাড়িত বইসে খ্যাড়ের আগাল গুতা নাগে, কয়— 'এটেও বুড়া অসিচে।' আরও দৌড়ায় ধান কাটা নাড়া বাড়িত বৈসে। ওটেও কাটা নাড়া গুতা নাগে। আরও দৌড়ায়। এ্যাং করি শ্যাষোত বুড়ার বাড়ির ময়াল ছাড়ি ভালে দূর যায়া তবে শেনে উকাশ ফ্যালায়। (লোভে পাপ আর পাপে হৈল বিনাশ।)

(কথক - প্রমোদ চন্দ্র সরকার, চাড়াল জানি, নাটাবাড়ী। তারিখ - ১২/৪/২০০০ইং)

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার রাভা জনজাতি সমাজে প্রচলিত
পৃথিবী সৃষ্টি বিষয়ে লোককথা ঃ

সৃষ্টির আদিতে সব ছিল জলময়। রাভাদের অনাদি দেবতা মামা বোল্যা অপার সেই জলরাশির মধ্যে 'লউ কমপায়' বা লাউয়ের টোকরার মধ্যে তাঁর দুই জৈক বা স্ত্রী দুর্গাজুং ও গঙ্গাজুংয়ের সঙ্গে ছিলেন ভাসমান।

একদিন তাঁর বড় ইচ্ছা হল পৃথিবী সৃষ্টি করতে। তাই তার বীজ কোথায় পাওয়া যায় তা খোঁজ করতে জলের জীব মাগুর মাতা (মাগুর মাছ), নারান মাতা (চেং মাছ) এবং হ্যালং মাতা (কাঁকড়া বা হ্যান)-কে ডেকে বললেন— 'যাও, তোমরা এক এক করে খুঁজে আন পৃথিবী সৃষ্টির বীজ। আমি সুন্দর 'হাসং' বা পৃথিবী সৃষ্টি করব।' তিনি জানতেন এই তিনজনই হল পৃথিবী সৃষ্টির বীজ খুঁজে আনার উপযুক্ত, কারণ এদের প্রাণ ভীষণ শক্ত।

তাঁর আদেশে প্রথমে গেল মাগুর মাতা। মামা বোল্যা লাউয়ের টোকরায় দিনের পর দিন ভেসে আছেন। দিন যায়, মাস যায়, মাগুর মাতা আর ফেরে না। তিনি বিস্মিত হয়ে একদিন

দেখলেন মৃত অবস্থায় জলের উপর ভেসে উঠল মাগুর মাতা। এর পর তিনি ভার দিলেন নারান মাতাকে— 'খুঁজে আন কোথায় রয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির বীজ।' নরান মাতাও সেই অপার জলরাশির মধ্যে তলিয়ে গেল। দিন যায়, মাস যায়, সে ফেরে না। অধীর আগ্রহ নিয়ে দিন গোনেন তার ফিরে আসার, কিন্তু না, একদিন সেও মৃত অবস্থায় ভেসে উঠল জলের তলা থেকে। মামা বোল্যা এবার ডাকলেন হ্যালং মাতাকে অর্থাৎ কাঁকড়াকে। বললেন— 'তুমিই আমার শেষ সহায়, যাও তো কোথায় আছে পৃথিবী সৃষ্টির বীজ খুঁজে নিয়ে এস।'

কাঁকড়া তাঁকে প্রণাম করে ডুব দিল জলের গভীরে। মামা বোল্যার আশা, নিশ্চয়ই হ্যান তাঁর আশা পূরণ করতে সমর্থ হবে। তিনি অধীর আগ্রহে লাউয়ের টোকরার মধ্যে ভাসছেন আর ভাবছেন— হ্যান ফিরে এল বলে। কিন্তু তাঁর অপেক্ষা আর শেষ হয় না। তিনি গভীর ভাবে চিন্তিত হলেন। একদিন দেখলেন তাঁর কাঁকড়াও প্রায় মৃত অবস্থায় জলের উপর ভেসে উঠল। অবশেষে তিনি ধ্যানে বসলেন এবং দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন কাঁকড়ার দুই দাঁড়ের মধ্যে রয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির বীজ।

তিনি খুঁজে তা নিয়ে এলেন। দুই হাতে ছেনে ছেনে তা দিয়ে গোল করে হাসং বা পৃথিবী গড়ে দিলেন। এর পর তিনি তৌচাক, বাচাক, মারাপনর‍্যা গড়লেন অর্থাৎ পশু, পাখী, বৃক্ষ-লতাদি গড়লেন।

মানুষ কেন চিরজীবী নয় ঃ

মামা বোল্যা অবশেষে গড়লেন মারাপ বা মানুষ তো গড়লেন তারপর ভাবলেন, তাকে তিনি করে তুলবেন একেবারে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, করবেন তাকে অমর এবং সেই জন্যই খুঁজতে বের হলেন কোথায় পাওয়া যায় 'শৈর চৈল পাক' অর্থাৎ লোহা দিয়ে তৈরী প্রাণ। তা আনতে এবং তাঁর নতুন গড়া প্রাণহীন মানুষগুলোকে পৃথিবীর উত্তর কোণে লুকিয়ে রাখলেন। যাবার পূর্বে স্ত্রী দুর্গাজুং এবং গঙ্গাজুংকে বার বার নিষেধ করে গেলেন 'দ্যাখো— তোমরা পৃথিবীর তিন দিকে যাবে কিন্তু উত্তর দিকে কখনই যেয়ো না।'

তিন দিন তিন রাত যায়, সাত দিন সাত রাত যায়, মাস যায় মামা বোল্যা ফেরেন না। ওদিকে দুর্গাজুং ও গঙ্গাজুং ঠিক করল— 'ঠাকুর পৃথিবীর তিন দিকে যেতে বলল অথচ উত্তর দিকে যেতে নিষেধ করল কেন?' খুব কৌতূহল হল— 'চল তো দেখি ওদিকে কী আছে?' তারা ওদিকে যেতেই অবাক বিস্ময়ে দেখল ওখানে রয়েছে 'মিন হিংসারাম মারাপ' অর্থাৎ সুন্দর সব নরমূর্তি। যেন তারা হাসছে— একটু ছোঁয়া বা একটু জল ছিটোলেই প্রাণ পেয়ে কথা কয়ে উঠবে। কোথায় জল? তাকিয়েই দেখে কচুর পাতার ওপর জল, সেই জল নিয়ে তাদের গায়ে ছিটিয়ে দিতেই তারা প্রাণ পেয়ে শোরগোল করতে লাগল।

ওদিকে মামা বোল্যা 'শৈর চৈল্ পাক' বা লোহার প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে দেখেন তাঁর গড়া মানুষরা প্রাণ পেয়ে গেছে। হায়! অমর করার জন্য যে প্রাণ নিয়ে এলেন তা আর তাদের দেহে সঞ্চার করা হয়ে উঠলো না। 'মারাপ চৈল্ পাক, লংচাকনি চিকা'। কচুর পাতার ক্ষণস্থায়ী জলে মানুষের প্রাণ সঞ্চারিত হল বলেই মানুষ ক্ষণজীবী, এ হল রাভা লোকবিশ্বাস। আর হ্যান বা কাঁকড়া দাঁড়ায় করে যে মাটি এনেছিল তা দিয়ে পৃথিবী গড়া হয়েছিল বলেই পৃথিবীর নাম হা বা হাসং হল।

(সংগ্রহ — সুনীল পাল, লোকচর্যা, শারদ সঙ্কলন, ১৩৯২, পৃ - ২৩-২৪।)

ব্রতকথা ঃ

ষষ্ঠী ঃ

ষষ্ঠী ব্রতের মূল অনুষ্ঠান হবার পর বাড়ীর প্রবীণা ব্যক্তি ব্রতকথা বলেন। এমনি একটি ব্রতকথা হল—

এক গ্রামে এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ দম্পতি ছিলেন। সচ্ছল ব্রাহ্মণ পরিবারে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত বাড়ীর সকল কাজ করত ঝিয়েরা। তাই তারা খুব ভোর বেলায় এসে কাজ শুরু করত। কালক্রমে ব্রাহ্মণ রাজা হয়ে যায়। কিন্তু তখনও তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। এক ঝিয়ের ছিল সাত ছেলে। পাড়া-প্রতিবেশীরা একদিন ঝিকে বলেন— 'তোমার কি ব্যাপার? তুমি কেন আটকুড়ার বাড়ী ভোর বেলা যাও? তুমি কি জান না ভোরবেলা আটকুড়ার মুখ দর্শন করলে পাপ হয়?' একথা শুনে ঝি মনে মনে ফন্দি আঁটে, এখন থেকে সে রাজার বাড়ী দেরী করে যাবে, যাতে ভোরবেলা নিঃসন্তান রাজার মুখ দেখতে না হয়। ঝি যা ভাবল তাই করল। অর্থাৎ ভোরের বদলে দেরী করে রাজার বাড়ী যেতে শুরু করল। বিস্মিত রাজা একদিন ঝিকে বললেন— 'কিগো, তুমি এত দেরী করে আস কেন?' উত্তর দিতে ঝি লজ্জিত বোধ করলেও শেষ পর্যন্ত প্রকৃত কারণটি বলে ফেলল। ঝি রাজাকে বলল— 'আমাকে পাড়া-প্রতিবেশী এবং পথচারী সবাই বলে— তুমি সাত পুত্রের জননী আর রাজা আটকুড়া।' ঝিয়ের মুখে একথা শোনা মাত্র রাজা মনের দুঃখে পুত্র সন্তানের বর লাভের আশায় বাড়ী ছেড়ে চললেন। রাস্তায় বহু লোকের সঙ্গে রাজার দেখা হল, তারা রাজাকে জিজ্ঞেস করেন— 'কি রাজা মশাই কোথায় চললেন?' রাজা উত্তর দেন— 'পুত্র সন্তানের বর লাভ করতে।'

এমনি করে চলার পথে সাত জন পথচারী সাত স্থানে তাদের সাত রকম সমস্যার কথা রাজাকে বলেন এবং সমাধানের উপায় জেনে আসতে অনুরোধ করেন। যেমন প্রথম ব্যক্তিকে রাজা তার সমস্যার কথা জানতে চাইলে পথিক জানালেন যে— 'তার কলাগাছে কলা ধরে পেকে যাচ্ছে কিন্তু কোন পাখী বসে না এবং খায় না। রাজা মশাই যেন এর কারণটা জেনে আসেন।' দ্বিতীয় ব্যক্তি তার সমস্যার কথা বললেন— 'আমার গরু বাচ্চা দিল কিন্তু গরু ও

বাচ্চা হাম্বা হাম্বা করে না কেন?' তৃতীয় ব্যক্তি জানালেন— 'রাজা মশাই, আমার নতুন ঘর তৈরীর পর কেন সব সময় মচ্ মচ্ করে?' চতুর্থ পথিকের সমস্যা হল— 'তার পুকুরের জল কাকে-বকেও খায় না এবং মানুষও ছোঁয় না।' পঞ্চম পথিকের সমস্যা হল— 'তার মাথায় শোলার বোঝা কিন্তু বোঝা কেন নামানো যায় না?' ষষ্ঠ পথিকের সমস্যা— 'তার পাছায় পিড়ি আটকে আছে কিন্তু পিড়ি কেন খোলে না?' সপ্তম পথিকের সমস্যা— 'তার মুখে চুন লেগে আছে কিন্তু চুন খসে পড়ে না কেন ?' এই সাতজন পথিক নিজের নিজের সমস্যার কথা জানান এবং সমাধানের উপায় জেনে আসতে বলেন।

পথের এই সাত পথিকের সাত রকম জিজ্ঞাসা ও নিজের পুত্র সন্তানের বর কামনার জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রাজা একদিন মা ষষ্ঠীর বাড়ীতে হাজির হন। ষষ্ঠী দেবী তখন নদীতে স্নানে গেছেন। তিনি ফিরে এসে বাড়ীতে অপেক্ষমান রাজাকে দেখেই বিরক্ত বোধ করেন এবং 'দুর্মুসা' বলে গালাগাল দেন। মা ষষ্ঠী বলেন— 'তোমরা ষষ্ঠী পূজার দিন ছেলেমেয়েদের দূর দূর কর কেন ? ষষ্ঠী পূজার দিন তোমরা ছেলেমেয়েদের আদর কর না এবং পূজার পর তাদের প্রসাদও দাও না। এ জন্যই তোমাদের এত সমস্যা। তোমার সন্তান হতে পারে তবে একটি শর্তে, পূজার পর ছেলেমেয়েদের প্রসাদ দিতে হবে, তাদের আদর করতে হবে।' মা ষষ্ঠী আরও বলেন— 'কলা গাছে কলা হলে তোমরা কলা বিক্রি করে দাও, নিজেরা খাও, কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশী বা ছোট ছেলেমেয়েদের দাও না। ছেলেমেয়েদের দিয়েও মাঝে মাঝে বাল্য-সেবা করতে হবে। তোমাদের গাইয়ে বাচ্চা দিলে প্রথমেই দুধ বিক্রি কর বা খাও, কিন্তু তা না করে প্রথমে ব্রাহ্মণ-সেবা দিতে হবে, তারপর নিজেদের খেতে হবে। তোমরা পুকুরে জল ভর্তি থাকা সত্ত্বেও মানুষকে নামতে দাও না বা স্নান করতে দাও না, সবাইকে পুকুরের জল ব্যবহার করতে দিতে হবে। ঘট দিয়ে পূজা না করে, বাচ্চাদের প্রসাদ না দিয়ে গৃহপ্রবেশ করলে ঘর মচ মচ করবে। কাজেই গৃহপ্রবেশের পূর্বেই নারায়ণ পূজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে।' মা ষষ্ঠী শেষে বললেন— 'কলার মাইচ পাতায় জল, দুধ ও আমফল নিয়ে তোমার বউকে খাওয়াও।'

রাজা বাড়ী গিয়ে তাই করলেন এবং যথারীতি রাণী সন্তান সম্ভবা হলেন। রাণী গর্ভবতী থাকাকালীন রাজা ভাবলেন যে রাজসভা থেকে রাণীর অবস্থান অনেক দূরে, তাই তাঁকে সব সময় চিন্তায় থাকতে হবে ।রাজা বুদ্ধি করে রাজসভায় একটি ঘন্টা বেঁধে দিলেন এবং ঘন্টার সঙ্গে একটি দড়ি বেঁধে সেটি রাণীর ঘর পর্যন্ত জুড়ে দিলেন। ঝিদিগের বলে দিলেন রাণীর হঠাৎ কোন প্রয়োজন পড়লে সেই দড়ি ধরে টানলেই তিনি চলে আসবেন। রাজা সব সময় উৎকর্ণ থাকেন কখন ঘন্টা বাজবে। বাড়ীর ঝিয়েরা স্বাভাবিক ঔৎসুক্য বশত একদিন ঘন্টার দড়ি ধরে টান দেয়। রাজা ঘন্টার শব্দ শোনামাত্র ছুটে আসেন এবং রাণীকে জিজ্ঞেস করেন— 'কি দরকার? ঘন্টা বাজালে কেন?' রাণী তখন বললেন— 'আমি তো ঘন্টা বাজাইনি।' রাজা তখন ক্ষুব্ধ হয়ে রাজসভায় ফিরে যান। এদিকে রাণীর যেদিন প্রকৃতই প্রসব যন্ত্রণা শুরু হল সেদিন ঝিয়েরা ঘন্টা

বাজানো সত্ত্বেও রাজা আসেন নি। ঝিয়েরা নিজেরা তৎপর হয়ে রাণীমার শুশ্রূষা করার পর রাণীমা একটি কুমড়ো প্রসব করেন। এ অবস্থায় তারা কি করবে বুঝতে না পেরে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে কুমড়োটিকে ফেলে দেয়। তৎক্ষণাৎ কুমড়োটি ফেটে তার ভেতর থেকে সাত ছেলে ও এক মেয়ে বেরিয়ে আসে। মা ষষ্ঠী রাজাকে এক চড় মারেন। অনেক কাকুতি মিনতির পর মা ষষ্ঠী সাত ঝিকে একটি করে ছেলে দিয়ে দেন আর মেয়েটিকে আর একজনকে দিয়ে দেন। কালক্রমে ছেলেরা বড় হয়ে ওঠে, তাদের বিয়ে হয় এবং তারা সংসারী হয়। একদিন রাজা ও রাণী উভয়েই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। মা ষষ্ঠীর একদিন ইচ্ছে হল বুড়ী সেজে কিছু তুলো এনে সাত ছেলের সাত বউকে বাছতে দেন। তারা বেছেও দিল, কিন্তু সাত বউয়ের ছেলেরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ঢলে পড়ল। সাত বউ দৌড়ে গিয়ে মা ষষ্ঠীর কাছে নালিশ করেন। মা ষষ্ঠী বলেন— 'পূজার দিন অবহেলা করলে এমনই হয়, পূজার জল নিয়ে ছেলেদের মুখে ছিটিয়ে দাও। তারা বেঁচে উঠবে।'

অনেকদিন পর মা ষষ্ঠীর ইচ্ছে হল যে ওরা কেমন আছে দেখে আসবেন। রাণী চলে যাবার পূর্বে তাঁর হাতের বালা ডালিম গাছে এবং করঞ্চা গাছে রেখে দেন। বড় ছেলের বউ ডালিম গাছে হাত দেওয়া মাত্র ছেলেরা আবার ঢলে পড়ে। তারপর মা ষষ্ঠীর কৃপায় পুনরায় বেঁচে ওঠে। একদিন সাত ছেলে ও তাদের বউদের মা-বাবার কথা খুব মনে হতে থাকে। তারা নদীর ঘাটে নৌকা থামিয়ে যাত্রীদের বলেন— 'তোমরা আমাদের বাবা-মাকে দেখেছ?' সবাই 'জানি না' বলে এড়িয়ে যান, কিন্তু শেষের নৌকায় সওদাগর বেশে রাজা-রাণী তাদের সামনে এসে দেখা দেন। রাজা-রাণী তাদের বলেন— 'তোমরা ষষ্ঠী পূজা দিয়ে সন্তানদের ষাঠ দিও। কিন্তু কখনই ভাগনার ছেলেকে না দিয়ে শুধু মাত্র নিজের ছেলেকে দিও না।' এমনি করে মা ষষ্ঠীর কৃপায় রাজা-রাণী ও তাঁদের পুত্র-পুত্রবধূদের মিলন ঘটে এবং তাঁরা সুখের জীবন যাপন করতে থাকেন।

নাটাইচণ্ডী ব্রতকথা ঃ

ষষ্ঠী ব্রতের মত নাটাইচণ্ডী ব্রতের পূজার শেষেও ব্রতকথা বলেন কোন প্রবীণা। নাটাইচণ্ডী ব্রতকথার প্রচলিত কাহিনীটি এরূপ—

এক গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী তাদের দুটি মেয়েদের সঙ্গে বাস করতেন। তাদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। মেয়ে দুটি প্রতিদিন ভিক্ষা করতেন এবং ভিক্ষার দ্বারাই সংসার চালাতেন। তারা একদিন ভিক্ষা করতে গিয়ে দেখেন এক বাড়ীতে নাটাইচণ্ডী দেবীর পূজা হচ্ছে। দুই বোন পূজা দেখেন আর ভাবেন— 'একদিন যখন সুদিন আসবে তখন আমরাও বাড়ীতে

নাটাইচন্ডী পূজা করব।' স্বপ্নে দেবীর নির্দেশে ব্রাহ্মণী নাটাইচন্ডীর পূজা করেন। পরদিন ঘুম থেকে উঠে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দেখেন তাদের বাড়ী রাজপ্রাসাদে পরিণত হয়েছে আর তারা নিজেরা রাজা-রাণী হয়েছেন। বাড়ী ঝি-চাকরে ভর্তি, গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ। এ সবই নাটাইচন্ডী দেবীর কৃপায় হয়েছে। তাই ব্রাহ্মণ পরিবার নিয়মিত নাটাইচন্ডী দেবীর পূজা করেন।

একদিন ভিন্ রাজ্যের এক রাজা শিকারে এসে রাত্রি হয়ে যাওয়ায় ঐ বাড়ীতে থাকেন। তারা রাত্রে রাজাকে অমৃত রান্না করে খাওয়ান। রাজা খুশি হয়ে বড় বোনকে বিয়ে করেন এবং ছোট বোনকে নিয়ে গিয়ে অন্য দেশের রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন। এদিকে বড় বোনের এক ছেলে ও এক মেয়ে হয়। ঘটনাচক্রে তাদের পরিবারে নাটাইচন্ডী দেবীর পূজা বন্ধ হয়ে গেলে সংসারে অশান্তি শুরু হয়। অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে কায়ক্লেশে তাদের দিন চলতে থাকে। একদিন বড় বোন ভাবলেন যে ছোট বোনের বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসবেন। এই উদ্দেশ্যে একদিন ছেলে ও মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ছোট বোনের বিশাল বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হন। ছেলে-মেয়েদের হাতে তার নিজের নামাঙ্কিত একটি আংটি দিয়ে তাদের বাড়ীর ভিতরে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন। ছেলে-মেয়েরা আংটি নিয়ে গিয়ে ছোট বোনকে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের চিনতে পারেন এবং তাদের মাকেও (বড় বোন) বাড়ীর ভিতরে নিয়ে আসতে বলেন। অতপর বড় বোন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বোনের বাড়ীতে কিছুদিন বেশ ভালভাবেই কাটান। দিদির দুর্দশার কথা শুনে ছোট বোন একদিন তার দিদিকে বলেন যে, নাটাইচন্ডী দেবীর পূজা অবহেলা করার জন্যই তাদের এই দুরাবস্থা। তিনি তার দিদিকে পুনরায় নাটাইচন্ডী দেবীর পূজার পরামর্শ দেন। ছোট বোনের কথায় বড় বোন বাড়ী ফিরে এসে পুনরায় নাটাইচন্ডী দেবীর পূজা করেন এবং হৃত গৌরব ফিরে পান। অতঃপর মা নাটাইচন্ডীর কৃপায় স্বামী ও পুত্র কন্যা সহ নিজ রাজ্যে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে থাকেন।

এই ব্রতের শেষে ব্রতীগণ বলেন— 'লুনা আলুনা আলোতে নিয়ে অন্ধকারে খাবে। নুন পড়লে ভাল।'

নিরাকলি ব্রতকথা ঃ

এক ব্রাহ্মণ তার একমাত্র কন্যাকে রেখে মারা যান। কিছুদিন পর ব্রাহ্মণীও স্বামীর মৃত্যু শোকে মারা যান। অসহায় ব্রাহ্মণ কন্যার একমাত্র অবলম্বন তার অশীতিপর বৃদ্ধা ঠাকুরমা। ঠাকুরমার কাছেই সে মানুষ হতে থাকে। তাদের আহারের সংস্থান হয় ভিক্ষার মাধ্যমে। ব্রাহ্মণ কন্যা সারা দিন ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে। এই ভাবে ভিক্ষা করতে করতে একদিন এক বাড়ীতে গিয়ে দেখে সেখানে পূজা হচ্ছে। উৎসুক হয়ে সে কী ঠাকুরের পূজা হচ্ছে তা জানতে চায় এবং

এই পূজা করলে কি লাভ হবে তাও জানতে চায়। এই পূজার কারণ শুনে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা দেবীকে প্রণাম করে এবং স্বামী-পুত্র-কন্যা সহ সুখী সংসার জীবন কামনা করে। ঘটনাচক্রে সে ঐদিন অনেক বেশী ভিক্ষা পায়। নাতনী ও ঠাকুমার খাওয়ার পরও সেদিন অনেক কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যায়। ব্রাহ্মণ কন্যা তাই নিরাকলি দেবীর পূজা করার জন্য ঠাকুমার কাছে আব্দার করে এবং ঐ উদ্বৃত্ত জিনিস দিয়ে নিরাকলি দেবীর পূজা করেন। দৈবানুগ্রহে ঐ পূজার দিন দূর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবার তাদের পুত্রের বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে আসেন। অনেক মেয়ে দেখেও তাদের পছন্দ হয় না কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখামাত্র তাদের পছন্দ হয় এবং তারা ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে তাদের পুত্রের বিয়ে দেন। এই বিয়েতে ব্রাহ্মণ কন্যার শর্ত ছিল যে শ্বশুর বাড়ীতে ঘরে ওঠার পূর্বে সে নিরাকলি দেবীর পূজা করে ঘরে উঠবে। শ্বশুর মশাই তাতে রাজী হয়ে যান। এর পর পূজা করে শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার পর থেকেই তাদের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সবই নিরাকলি দেবীর আশীর্বাদ। কালক্রমে ব্রাহ্মণ কন্যা রাজরাণীতে পরিণত হন।

রাণী হওয়ার পর ব্রাহ্মণ কন্যার একটি পুত্র সন্তান হয়। ভোগ-লালসায় ব্যস্ত হয়ে সে নিরাকলি দেবীর আরাধনা ভুলে যায়। ধীরে ধীরে বাড়ীতে গবাদি পশু, ক্ষেতের ফসল সবই নষ্ট হতে থাকে। এদিকে রাণী ব্রাহ্মণ কন্যা পুনরায় সন্তান সম্ভবা হয়। ব্রাহ্মণ রাজা বলেন— 'এই দুরবস্থায় আর এখানে থাকব না।' তাই সে রাজ্যপাট ফেলে সুখের সন্ধানে সন্তান সম্ভবা স্ত্রী ও এক ছেলেকে নিয়ে গ্রামান্তরে যাত্রা করেন। যাত্রা পথে জঙ্গলেই ব্রাহ্মণীর এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ঐ মুহূর্তে জলের ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ রাজা শিশু পুত্রদ্বয় সহ রাণীকে ঐ জঙ্গলে রেখে জল ও আগুনের সন্ধানে বের হন।

সেই সময় পার্শ্ববর্তী দেশের রাজা তার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় রাজচক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত লোকের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যার কপালে রাজটীকা দেখবেন তাকেই রাজমুকুট পরিয়ে তার দেশের রাজা করবেন। দৈবক্রমে এ সময় জল নিয়ে ফেরার পথে নিঃসন্তান রাজা তাঁর সামনে পড়ে যায়। তার কপালে রাজটীকা দেখে তাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে পাশের দেশের রাজা তাকে নিয়ে চলে যান। এদিকে ব্রাহ্মণ রাজার জল নিয়ে ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে ব্রাহ্মণী বড়ছেলের কাছে ছোটছেলেকে রেখে নিজেই জলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এই সময় তার নিরাকলি দেবীর কথা স্মরণ হয় এবং সে একমনে নিরাকলি দেবীকে ডাকতে থাকে। কোথাও জল খুঁজে না পেয়ে ব্রাহ্মণী রাণী এক নদীর ঘাটে গিয়ে হাজির হয়। ঘাটে গিয়ে সে দেখে সওদাগরগণ বড় বড় নৌকা দিয়ে ঘাট আগলে বসে আছে। জল নেবার জন্য সে সওদাগরদের নৌকা একটু সরাতে বলে। মাঝি-মাল্লা ও সওদাগরগণ রাণীর কথায় কর্ণপাত করে না। রাণী তখন আবার বলে— 'আমি নিজের হাতে নৌকা সরিয়ে জল নেব।' রাণীর কথা শুনে এবার সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। কিন্তু নিরাকলি দেবীর ক্ষমতা সম্বন্ধে তারা ছিল অজ্ঞাত। রাণী নিরাকলি দেবীর নাম স্মরণ করে নৌকায় ধাক্কা দেওয়া

মাত্র নৌকা সরে যায়। রাণীর এই ক্ষমতা দেখে সবাই অবাক হয়ে যায় এবং ভাবে এই কাজ তো কোন সাধারণ নারীর পক্ষে সম্ভব নয়, এ নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন নারী। সওদাগররা তখন রাণীকে জোর করে নৌকায় তুলে নিয়ে যায়।

এদিকে বনের মধ্যে রাণীর ছেলেরা কান্নাকাটি করছে। সওদাগররা রাণীকে নৌকায় চাপানোর পর নিরাকলি দেবীর কাছে রাণী কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকে— 'দেবী, আমাকে কুৎসিত কর, কুষ্ঠ রোগ দাও, রূপ যৌবন নষ্ট করে দাও, আমার ছেলেদের রক্ষা কর।' নিরাকলি দেবী সদয় হয়ে তার দুই পুত্রের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি নবজাতক শিশু দুটিকে বাঁচানোর জন্য এক নতুন ফন্দি আঁটেন। তিনি কমল ঘোষ নামক এক নিঃসন্তান গোয়ালাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য মনস্থির করেন। কমল ঘোষের অনেকগুলি গরুর মধ্যে একটি ছিল কামধেনু। তার গরুগুলির তত্ত্বাবধান করে একজন রাখাল। রাখাল যখন গরু চড়াতে জঙ্গলে যায় তখন ঐ কামধেনু গোপনে গিয়ে নবজাতক শিশু দুটিকে দুধ খাইয়ে আসে। এদিকে গোয়ালার বাড়ীতে দুধের পরিমাণ কমে যায়। এভাবে কিছুদিন চলার পর কমল ঘোষ একদিন গরুর দুধের পরিমাণ হঠাৎ করে কমে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রাখাল তখন কামধেনুর শিশু দুটিকে দুধ খাওয়ানোব কাহিনী খুলে বলে। নিঃসন্তান কমল ঘোষ তখন রাখালকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে শিশু দুটির কাছে ছুটে যায় এবং ঐ দৃশ্য দেখে শিশু দুটিকে নিয়ে এসে তার স্ত্রীকে লালন-পালন করার দায়িত্ব দেন। গোয়ালিনী শিশু দুটি পেয়ে আত্মহারা। তিনি ভাবলেন দেবী এত দিনে তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। কমল ঘোষ তার স্ত্রীকে দশ মাস দশ দিন গর্ভবতী সেজে থাকার পরামর্শ দেন। দশ মাস দশ দিন গর্ভবতী সেজে থেকে গোয়ালিনী প্রচার করেন যে তার যমজ সন্তান হয়েছে। দিন যায় ছেলেরা বড় হয়, লেখাপড়া শেখে। কমল ঘোষ ছেলেদের দুধের ব্যবসা করতে বলেন কিন্তু ছেলেরা রাজী হয় না। তাদের মনে সন্দেহ হয় যে তারা গোয়ালার ছেলে নয়। কারণ বড় ছেলেটির আগের কথা কিছু কিছু মনে ছিল। কমল ঘোষ ছেলেদের খেয়া পারাপারের চাকরী জোগার করে দেন। নৌকা পারাপার করার জন্য ছেলেরা নদীর পাড়ের চালা ঘরেই থাকত। বড় ভাই ছোট ভাইকে তার মা-বাবার কথা কিছু কিছু বলত। এ দিকে অনেক ঘাটে ঘুরতে ঘুরতে সওদাগরের নৌকা একদিন রাণীকে নিয়ে গোয়ালার ঘাটে পৌছায়। বড় ভাই তখন ছোট ভাইয়ের কাছে গল্প বলছিল। এই গল্প রাণীও শুনে ফেলেন। গল্প শুনতে শুনতে রাণী বুঝতে পারেন যে এরা তারই হারানো পুত্র। তখন রাণী ছেলেদের কাছে তার পরিচয় দিয়ে বলেন যে— 'আমিই তোদের মা'।

কমল ঘোষের স্ত্রী গোয়ালিনী একথা শুনতে পেয়ে তার মাতৃত্বের দাবি জানায়। এভাবে দুই ছেলের মাতৃত্বের দাবি নিয়ে রাণী ও গোয়ালিনীর মধ্যে বিতর্ক শুরু হলে প্রকৃত মা কে তা নির্ণয় করার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশের রাজার কাছে বিচার চান। এই রাজা সেই ব্রাহ্মণ রাজা অর্থাৎ ছেলে দুটির পিতা, যিনি জল আনতে গিয়ে হারিয়ে গেছেন। রাজা বিধান দেন— কে

সত্যিাকরের মা তার প্রমাণ দিতে হবে। রাজা তাই নদীর এক পাড়ে ছেলেদের দাঁড় করান। অপর পাড়ে দুই মাকে দাঁড় করান। তিনি বলেন— 'যার স্তন থেকে দুধ ছেলেদের মুখে যাবে সেই হল ছেলেদের প্রকৃত মা।' পরীক্ষায় দেখা গেল রাণীর স্তন থেকে দুধ গিয়ে ছেলেদের মুখে পড়ল, অপর দিকে গোয়ালিনীর স্তন থেকে এক ফোঁটা দুধও বের হল না। অতঃপর মা ও ছেলের মিলন দেখে রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন— 'আমারও দুই ছেলে এবং স্ত্রী জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে।' রাজার কথা শুনে রাণী তখন তার সব কাহিনী খুলে বলল। রাজা-রাণী ও তাদের ছেলেদের মিলন ঘটল। তারা গোয়ালা কমল ঘোষ ও তার স্ত্রীকে প্রচুর ধনসম্পদ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা ও রাণী তাদের সন্তানদের নিয়ে সাড়ম্বরে নিরাকলি দেবীর পূজা করে পুনরায় সুখে সংসার করতে লাগলেন।

(কথক ঃ মায়ারাণী বসাক, স্বামী— কুটিশ্বর বসাক, তুফানগঞ্জ শহর, পূর্বতন ময়মনসিংহ, গ্রাম— ভালকুইট্যা গোবিন্দাসী, তাং - ১৬/৪/২০০০ ইং।)

কাত্যায়নী ব্রতকথা ঃ

কাত্যায়নী ব্রতকথার মূল বিষয়বস্তু হল হর-গৌরীর বিবাহ সম্পর্কিত কাহিনী। বিভিন্ন সুরে গানের ভিতর দিয়ে এই ব্রতকথা শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ব্রতীগণ গানের মাধ্যমেই ব্রতকথা প্রকাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে যুবতী মেয়েদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, রঙ্গরস, কারুণ্য ও বাৎসল্য প্রকাশ পায়।

প্রাচীন বিবাহ প্রথায় দেখা যায় কন্যার বয়স নয় বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার বিয়ে দেওয়া হত। সে নিয়মে সাত বছর পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুপাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই ব্রতকথার একটি গানে শোনা যায় —

"গৌরীর বিয়াও দিমু পূব দেশে
পূব দেশে আছে নেংটিয়া শিব তাক দিমু গৌরীকে
না দিম না দিম নেংটিয়া শিবের ঘরে।"

এদিকে শিবেরও বয়স হয়ে যাচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনহীন অনাত্মীয় শিব কতদিন আর বিয়ে না করে থাকবেন। ভূত-প্রেত, নন্দী-ভৃঙ্গী ইত্যাদি চ্যালা-চামুন্ডারাই শিবের একমাত্র ভরসা। বিয়ের চিন্তায় শিব নিজেই চিন্তিত। চ্যালা-চামুন্ডাদের চিন্তা তাঁর থেকেও বেশী। তাদের চিন্তা— শিবের যদি বিয়ে না হয় তাহলে জগতে সুখ-শান্তিও আসবে না। তাই নারদকে এই বিয়ের ঘটক নিযুক্ত করা হয়। নারদের মাধ্যমে উভয় পক্ষই জানতে পারে তাঁদের বিয়ে হবে অর্থাৎ গিরিরাজ কন্যা উমার সঙ্গে কৈলাশপর্বতের দেবাদিদেব মহাদেবের বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। দুজনের বাড়ীতেই বিয়ের আয়োজন চলতে থাকে। এদিকে নারদ বিয়েব আগেই শ্মশানচারী আত্মভোলা শিবের দুরবস্থা সম্পর্কে মেনকাকে আগাম জানিয়ে তাঁর মনকে দুর্বল করে দেয়। বিয়ের আসরে ভূত,

প্রেত, নন্দী-ভৃঙ্গী ইত্যাদি বরযাত্রী সহ শিবকে আসতে দেখে মেনকার মন আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বাস্তব অবস্থা দেখে মেনকা চোখের জলে ভাসতে থাকেন আর তাঁর মনে হয় এর চেয়ে আদরের মেয়েকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভালো ছিল। এয়োতি বা বৈরাতিগণ যখন শিবকে বরণ করতে আসেন তখন তারা অবাক হয়ে দেখেন পাত্র শিব বাঘছাল পরিহিত এবং তাঁর কণ্ঠে সাপ। বরকে চন্দনের ফোঁটা দিতে গেলেই কণ্ঠলগ্ন সর্পদ্বয় এয়োতিদের ছোবল মারে এবং তারা অজ্ঞান হয়ে যায়। তাই ব্রতকথার একটি গানে মেনকার খেদোক্তি শোনা যায় —

"মেনকা কাঁদিয়া কয় শুন প্রভু মহাশয়
এহেন বরে না দিমু গৌরীর বিয়াও রে।"

একথা শুনে শিব প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হন। তাঁর ক্রুদ্ধ শ্যেন দৃষ্টিতে বিয়ের আসর লন্ডভন্ড হয়ে যায়। মেনকা অঝোরে কাঁদতে থাকেন। এরূপ দুঃসহ অবস্থা দেখে উমা শিবকে তাঁর রূপ পবিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করেন। উমার অনুরোধে শিব রূপ পরিবর্তন করেন। অবশেষে বিয়ের কাজ শুরু হয়। চন্দ্র, সূর্য সাক্ষী রেখে ব্রহ্মার সাহায্যে পিতৃ-মাতৃহীন শিবকে কন্যা সম্প্রদান করেন গিরিরাজ। সম্প্রদানের পর হর-গৌরীর মিলন ঘটল। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ভরে উঠল আনন্দের বাতাবরণে। হিন্দু-বাঙালী লোকাচার অনুযায়ী বিয়ের পর শিব ও উমা পাশা খেলতে বসলেন। যথারীতি উমাকে হারিয়ে শিব তাঁকে জয় করলেন। এমনি করে বিয়ের রাত্রি পার হবার পর ভোরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৌরী যাত্রা করে শ্বশুর বাড়ির দিকে। মা মেনকা গৌরীর কথা মনে করে স্মৃতি চারণা করে কাঁদতে থাকেন। একদিকে বাৎসল্য রস আর একদিকে কন্যার বিরহ ব্যথা। ঘুম কাতুরে সাত বছরের ছোট মেয়ে কি করে শ্বশুর বাড়ি আগলাবেন এই চিন্তায় মা মেনকার মন অস্থির। তাই তিনি বলেন— 'সাত বছরের গৌবী মোর কেমনে করিবে পরার ঘর।'

এই ভাবে কাত্যায়নী ব্রতকথা শেষ হয় এবং ব্রতীগণ পূজার যাবতীয় বস্তু জলে ভাসিয়ে দিয়ে প্রার্থনা করেন— 'মা দুর্গা যেন তাদের ধনধান্যে ভরিয়ে তুলে স্বামী-পুত্রের ছোট সংসারকে সুখী ও সমৃদ্ধ করেন।'

(কথক— আগুনেশ্বরী দাস (৮০), স্বামী মৃত মায়াচাঁন দাস,
গ্রাম— নাটাবাড়ী, তুফানগঞ্জ, ৫/১১/৯৯ ইং)

(গ) লোকনাটক ঃ

লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হল লোকনাটক। অনেকেই এই নাটকের সংজ্ঞা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করলেও লোকনাটকের সঠিক স্বরূপের অভিব্যক্তি ঘটে নি এই সব সংজ্ঞায়। এর উৎপত্তির ক্রমবিকাশ আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, লোকনাটক প্রকৃতপক্ষে

অ-বস্তু নির্ভর ভঙ্গীগত বাগাশ্রিত লোকসাহিত্যের একটি শাখা। যার বিষয়বস্তু মৌখিক ও শ্রুতিনির্ভর সংলাপধর্মী। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের লোকনাটকের মত কোচবিহারের লোকনাটকের মূলেও আছে বিভিন্ন ব্রত ও লৌকিক অনুষ্ঠান, সঙ্ নাচ ও লৌকিক নৃত্যানুষ্ঠান। একাধিক গ্রামে উপস্থিত থেকে আমরা প্রত্যক্ষ করি মুলানীর নেতৃত্বে সুবচনীর হাঁস চুরির অপরাধে বালককে শাস্তি প্রদান, পরে ভুল স্বীকার, পাড়া-প্রতিবেশীদের সহানুভূতি লাভ সবই মূল মন্ডপের চারদিকে ঘিরে অভিনয় প্রদর্শন করা হয়। যার মাধ্যমে পুরো একটি কাহিনী অভিনয়ের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। আবার ষাইটল পূজা ও কাতি পূজার আঙ্গিকে গিদালীর নেতৃত্বে দেবীর আবাহন, ঘট সিজ্জন প্রভৃতির যে গীত সহযোগে নৃত্যানুষ্ঠান হয় সেটি নাটকের আদিম রূপ। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় কোচবিহারে লোকনাটকের উদ্ভব হয়েছিল এ ধরনের ব্রত অনুষ্ঠান থেকেই। ডঃ দুলাল চৌধুরী লোকনাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন— "বাংলার আনুষ্ঠানিক ব্রতগুলি মূলত নাটকের প্রত্নরূপ।"[১২]

এতদঞ্চলে ক্ষেত্র-সমীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন লোকনাটকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে লোকনাটকের যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা লক্ষ্য করেছি তা হল— এগুলির কোন স্রষ্টা থাকলেও তিনি উপলক্ষ মাত্র। তিনি লোকসমাজের একজন। আজও কোচবিহারে লোকনাটক মঞ্চস্থ হয় জেলার বিভিন্ন লোকউৎসব ও মেলার জনসমাগম- পূর্ণ আসরে। সেখানে দর্শক-শ্রোতার মধ্যে একটা সান্নিধ্য বর্তমান থাকে।

লোকনাটকের সংজ্ঞা নির্ধারণ সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যায়-- "লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে বর্ণিত এবং অভিনীত নাটক। কোন পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিকতার ভিতর প্রবেশ করা সঙ্গত নয়। তার কাহিনীতে পূর্ববর্তী কোন ধাবা কিংবা ঐতিহ্য থাকে না।"[১৩]

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে— Myth বা Ritual মিলিত হয়ে কোন সংহত লোকগোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারই নাট্যরূপ লোকনাটক।

কোচবিহারের লোকনাটককে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (ক) আনুষ্ঠানিক, (খ) আখ্যানমূলক এবং (গ) বিবিধ বিষয়ক।

কিন্তু কাহিনীর বিচারে কোচবিহারের লোকনাটককে সঠিক বিভাজন করলে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— (ক) দোতরা পালা ও (খ) কুষাণ পালা। এক সময় বিষহরি পালার কিছু স্বতন্ত্র নাট্যরূপ ছিল বলে মনে হয়।

দোতরা পালা সাধারণত সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গ ও লৌকিক কাহিনীনির্ভর। অপরপক্ষে কুষাণ পালায় থাকে পৌরাণিক ঐতিহাসিক কাহিনী। কোচবিহারে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য দোতরা

পালাগুলি হল— বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী, করিম বাদশা, গুঞ্জুরাবিবি, মৈযালবন্ধু, দুবলাবলী, ময়নামতী, কালুগাজী, রূপবান কন্যা। অপরপক্ষে এতদঞ্চলে কুষাণ পালাগুলি হল— লবকুশ, দাতা হরিশচন্দ্র, রাবণ বধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ধনপতি সওদাগর, বেহুলার ভাসান, সতী বেহুলা ইত্যাদি। কুষাণ ও দোত্‌রা পালার মত লোকনাটকের যেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেই তেমনি নেই কোন লিখিত রূপ। মূল বা পরিচালক সাধ্যমত কাহিনীর বিস্তার ঘটান। আসরের ওজন বা সমাগম বুঝে পালার স্থায়িত্ব বাড়ান বা কমান। বিষহরি পালাকে কুষাণের অন্তর্গত ধরা হলেও বিষহরি পালার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন এর সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মুখা বাঁশী অপরিহার্য। কুষাণ লোকনাটক যা প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ কাহিনীর নৃত্য-গীতিময় ধারা। এই কুষাণ পালা একদিন রামযাত্রা নামেও পরিচিত ছিল। কুষাণ পালায় মূলের হাতে থাকে 'বেনা' নামক একটি বাদ্যযন্ত্র। এই সুবাদে এতদঞ্চলে কুষাণ পালা নাটককে বলা হয় 'বেনা কুষাণ'। কুষাণ পালায় চার থেকে পাঁচজন ছেলে মেয়ে সেজে নাচে আর গান গায়। যদিও বর্তমানে মেয়েরাই এই ভূমিকায় অভিনয় করে। উত্তরবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ পালার মূল ললিতনারায়ণ কুষাণীর মতে কুষাণ পালায় এভাবে নাচ ও পালা চলতে থাকে। মূল একাধারে পরিচালকও বটে। তিনি গানের মাধ্যমে পালা গেয়ে যান। সমগ্র দর্শক মনে একঘেয়েমি দানা বাধতে দেন না দোয়ারী। দোয়ারী দর্শকদের হাসান এবং কাঁদান। রামায়ণের লবকুশের গাওয়া গানের অনুকরণে সৃষ্ট বলে এই পালাগান এতদঞ্চলে কুষাণ গান হিসেবে বেশী পরিচিত। পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর গীত রচনা করে তার সঙ্গে ভাওয়াইয়ার সুরে সুরারোপ করে জনমনোরঞ্জন করাই ছিল এই পালার দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য। লোকসংস্কৃতির এই ধারায় পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীগণও পরবর্তীতে আসীন হয়েছেন।

উন্মুক্ত খোলা মাঠ, উৎসব প্রাঙ্গণ বা বড় উঠোনে বৃত্তাকার স্থানে শামিয়ানা বা কোন আচ্ছাদন দিয়ে এই পালার অভিনয় মঞ্চ তৈরী করা হয়। দর্শক বেষ্টিত উক্ত স্থানটি অভিনয় স্থল। বাদ্যযন্ত্রীরা দর্শকের সামনে বৃত্তাকারেই বসেন। মূল বা গীদাল পাশাপাশিই থাকেন। দর্শক অভিনেতার স্থানও এই নাটকে পাশাপাশিই থাকে। আলোর ভূমিকা খুবই নগণ্য, তবে প্রাচীন ডেলাইট বা হ্যাজাকের প্রচলন এখন আর নেই।

কুষাণ পালায় মূলের হাতে যেমন বেনা নামক বাদ্যযন্ত্র অবশ্যই থাকবে, তেমনি দোত্‌রা পালায় মূলের হাতে থাকবে দোত্‌রা। দোত্‌রা পালার একটি বৈশিষ্ট্য হল দোত্‌রা পালার কাহিনী ও সংলাপের ভাষা বলে দেয় এই নাট্যরূপ কুষাণের চেয়েও বেশী গণভিত্তিক ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী। মধ্য যুগে এসে এই সব লৌকিক পালায় মুসলিম প্রভাব পড়েছে। যার ফলস্বরূপ কাহিনীতে দেখা যায় বৈচিত্র্য। "দোত্‌রা বাদ্যযন্ত্রটি মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গেই যুক্ত। ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক আদি লোকনাটকের ধারা যে ভাবে দোত্‌রা পালায় রক্ষিত হয়েছে উত্তরাঞ্চলের কোন লোকনাটকে তা দেখা যায় না।"[১৪]

তবে কৃষাণ ও দোতরা পালার অপর বৈশিষ্ট্য হল অনেক সময় গানই সংলাপ, নাচই মনোভাবের বাহক। শুধুমাত্র গানকে নির্ভর করেও অনেক পালা আছে। সংলাপ সবক্ষেত্রেই গদ্য ও পদ্যে রচিত। সবক্ষেত্রেই পালা শুরুর আগে আসর বন্দনার রেওয়াজ আছে। সেক্ষেত্রে সরস্বতী বন্দনাই বেশী দেখা যায়। আসর বন্দনা শেষ হলেই 'মূল' পালা ঘোষণা করেন। যেমন—

"বন্দনা কথা ভাইরে ক্ষেন্ত দিয়া যাই
বেহুলা ভাসানী গান সভাতে জানাই।"

কোচবিহারের প্রচলিত লোকনাটকে পালা চলাকালীন দর্শকমনের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য (Dramatic relief) 'ফাস' গান বা 'খোসা' গানের প্রচলন আছে। যদিও এ গান মূল পালার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়, একে অনেক জায়গায় ভর্তুকি গানও বলে। এরূপ একটি ভর্তুকি গান হল—

"আমার পালঙ্কের ময়না কোন বনে যায়রে
কোন বনে যায়রে ময়না ফিরিয়া না চায়রে।"

কোচবিহারের লোকনাটকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর লোকসাংবাদিকতা। তাই এর কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে চলে আসে সামাজিক সমস্যা। এ ব্যাপারে দোয়ারীর ভূমিকা বেশী। যেমন এতদঞ্চলে প্রচলিত মৈষালবন্ধু পালায় তেভাগা আন্দোলনের প্রসঙ্গ দেখা যায়। মন্ডল গ্রামপঞ্চায়েত নিঝালুর সঙ্গে তার কথাবার্তা হচ্ছে— "মন্ডল ঃ দাদা রাগ না হয় চন্ডাল, ভোগ না হয় পিচাল। কজরুর ডাহার ভিতর কি হবার ধচ্ছে ট্যার পাচেন? রাগ বলে ৬০/৪০। উচ্ছেদ করা চলে না। ভাগচাষ বোর্ডের আইন। উকি ফির বেনামী আর রিটার্ন দেওয়া জমির ভাগ বন্দ।"[১৫]

মৈষালবন্ধুর কাহিনী মূলত প্রেমোপাখ্যান হলেও এর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজ ব্যবস্থার নিষ্ঠুর অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কোচবিহারের গ্রাম্য পরিবেশ, অর্থবানের বহুবিবাহের নেশা, অতি সাধারণ মানুষের জীবনধারা, মৈষালের জীবন কথা, বিবাহ ব্যবস্থা, অর্থের প্রতিপত্তি ইত্যাদি নাটকের আঙ্গিকে রূপায়িত হয়েছে।

লোকনাটকের সাজসজ্জা খুবই সাধারণ। মূল বা গীদাল সাধাবণত পড়েন ধুতি, পাঞ্জাবি ও সাদা উত্তরীয়; তবে বর্তমানে প্রচলিত লোকনাটকগুলিতে চরিত্রাভিনেতার আগমনে সাজসজ্জার চাকচিক্য দেখা যায়। দোয়ারী যেহেতু কমিক চরিত্র তাই তার অঙ্গসজ্জায় থাকে তীর্যক আভাস, যেমন— তিনি নাভির নীচে কাপড় পরেন, মাথায় টিকি, চিত্রিত অঙ্গ, কপালে ও বুকে তিলক ফোঁটা, হাতে একটি ত্রিভঙ্গ লাঠি, কাঁধে গামছা। তবে কুষাণ পালায় মূলের গায়ে সবসময় থাকে নামাবলী।

উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত কুষাণ পালার মূল ললিত (বর্মন) কুযাণীর মতে— 'পূর্বে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপদসঙ্কুল থাকায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল থাকায় পালা চলত সারারাত ধরে। দর্শক শ্রোতাগণ বাড়ী ফিরতেন ভোরের আলোয়। কিন্তু বর্তমানে কর্মব্যস্ত মানুষের সারারাত জেগে নাটক শোনার সময় নেই, তাই সময়ের পরিবর্তনে লোকনাটকের দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে এসেছে।'

কুষাণ গানের মূল, গীদাল, দোয়ারী ও বায়েন ইত্যাদি শিল্পীগণের শিক্ষা সাধারণত গুরু পরম্পরায় হয়ে থাকে।

জেলায় প্রচলিত উল্লেখযোগ্য কুষাণ ও দোত্‌রা পালায় উল্লেখযোগ্য কাহিনীগুলির বিশ্লেষণে দেখতে পাই দানবীর হরিশ্চন্দ্র পালায় মহাভারতের কাহিনীর নির্ভরতা। হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্ব দানের আগ্রহ, অর্থোপার্জনের চেষ্টা, বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া এবং সমস্ত বাধা দূর করে পালার মূল বিষয়বস্তু স্থান করে নেয়। যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা হয় এই নাটকে তা হল সত্য বা আদর্শ রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুত্রের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রাজকীয় জীবন থেকে শ্মশানের শবদাহনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। সর্বশেষে বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার কাহিনীর যে মূল্যবোধ তা আজও লোকমনে গভীরভাবে দাগ কাটে।

আবার লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালায় রামায়ণের কাহিনীর উপর নির্ভর করে রচিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুযায়ী নিকুম্ভিলার যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ নিহত হন। পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাবণের সীতা হরণ যেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। কিন্তু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মন্দোদরী এই কাজে বাধা দেন। লক্ষ্মণের আরোগ্য লাভে হনুমানের আপ্রাণ চেষ্টা স্থানীয় মূল বা গীদালের অভিনয় দক্ষতায় মানবতাবাদের এক চরম সত্যের প্রকাশ ঘটে। নীতিশিক্ষার পাশাপাশি লোকশিক্ষাও কোচবিহারের এই নাটকগুলিতে আমরা দেখতে পাই।

অপরপক্ষে দোত্‌রা পালার 'দুবলাবালী' লোকনাটকের কাহিনীতে আমরা দেখি এক অল্পবয়স্কা নারী। প্রথম যখন সে জানতে পারল শ্যাম কালা তার প্রেয়সীকে না পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করেছে তখন সে এ কাজকে বোকামী বলেছে এবং সে বিশ্বাস করে, প্রেম করতে কৌশলের প্রয়োজন হয়। দুবলা তার স্বামী কর্তৃক বিপদগ্রস্ত হয়, পরে বন্ধুর সাহায্যে সে বিপদ থেকে উদ্ধার পায়। এই নাটকে মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির লোকায়ত প্রকাশ দেখা যায়।

সতী বেহুলা পালাটি মনসামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত হলেও এর প্রতিপাদ্য বিষয় হল মানুষের জীবন সংগ্রামে প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া এবং তাকে অতিক্রম করা। বিভিন্ন ঘটনার ঘনঘটায় পালা এখানে ক্রিয়াশীল। এই নাটকে বেহুলা লোহার কলাই জলের মতো সিদ্ধ করে দিয়ে তার সতীত্ব প্রমাণ করে। তাই দেখে চাঁদ সওদাগরের অনুচর লেংয়া তাকে বলে— "এই কইনাই ভাল। হামার উত্তি কন্ট্রোলের চাইল বোল্ডারের মত। উয়ায় রান্দিলে চিন্তা নাই।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কন্ট্রোলের অব্যবস্থার কথা এখানে বলা হয়েছে।

কোচবিহার ও পার্শ্ববর্তী নিম্ন আসামের ধুবরী ও গোয়ালপাড়া জেলার অন্যতম জনপ্রিয় পালা হল দোতরা পালার অন্তর্গত "মরুচমতী কন্যা" লোকনাটক। এর মূল কাহিনী হল— মরুচমতীকে পাবার জন্য রাজপুত্রের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হল তাকে পাবার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারপর দেখা দিল বাধা, ফলে মরুচমতীর সঙ্গে ঘটল বিচ্ছেদ। ডোমনীকে বিয়ে করার বিষয়টি কাহিনী বলেই সম্ভব হয়েছে। লালমাছ থেকে মরুচমতীর পরিবর্তন, তারপর তার ফুল হয়ে যাওয়া, মালিনীর বাড়ীতে প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করার মধ্যে যাদুমন্ত্র অলৌকিকতার প্রকাশ ঘটেছে। কাহিনীতে বহু ঘটনায় বিবর্তন হয়েছে সত্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিহীন ঘটনা ঘটেছে। কাহিনী দীর্ঘ হলেও তেমন উৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি।

উত্তরবঙ্গে কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলার অপর একটি লোকনাটকের আঙ্গিক হল 'রঙ পাচাল'। যদিও এর প্রচলন কোচবিহারের চেয়ে জলপাইগুড়িতেই বেশী। দোতরা ও কুষাণ পালার চেয়ে এর আঙ্গিক স্বতন্ত্রধর্মী হলেও দোতরা পালার মতই দৈনন্দিন জীবনের রঙ্গ-রসিকতা ও হাস্যরস এরূপ পালার মূল লক্ষ্য। অভিনয়ে স্ত্রী-পুরুষ উভয় চরিত্রই থাকে। লোকনাট্যের এই আঙ্গিকের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল গ্রাম্য প্রহসন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে রঙ পাচালের নায়ককে বলা হয় 'বাতেয়া'। অর্থাৎ যিনি পালার মূল কাহিনী বর্ণনা করেন। এই 'বাতেয়া' রঙ পাচাল নামক লোকনাটকের হাস্যরসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অভিনয় চলাকালীন মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাস্যরসাত্মক সংলাপ রচনায় দক্ষ হন এরূপ চরিত্র। রঙ পাচাল অভিনয় যেমন মুক্তাঙ্গণে হয় তেমনি কোন ধরাবাধা নিয়মের বশবর্তী নয় এ নাটক। এতে থাকে না কোন পৌরাণিক চরিত্রের ধারা। চরিত্রের সব নামকরণ হয় লোকজীবনের অর্থাৎ লোকায়ত জীবনের চলমান চরিত্র থেকে। অর্থাৎ গ্রামের প্রধান জোতদার বা জমিদার, মুসলিম কাজী বা বিয়ের ঘটক এদের কাজকর্মকে ব্যঙ্গ করেই সংলাপের মাধ্যমে দর্শককে আনন্দ দান করা এর উদ্দেশ্য। আবার অনেক ক্ষেত্রে করুণ রসাত্মক মর্মস্পর্শী সামাজিক ঘটনাও এর বিষয়বস্তু হয়। যেমন— সৎমা, কোন পুরুষের একাধিক স্ত্রী, এদের জীবন যন্ত্রণার বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয় রঙ পাচালে। কোচবিহারে লোকনাটকের এই আঙ্গিক আজ বিলুপ্তির পথে।

কোচবিহারের কুষাণ পালার জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান মূলদের মধ্যে অন্যতম হলেন ললিত বর্মন (ললিত কুষাণী, গোসানীমারী), ধরণী রায়, নৃপেন গীদাল, বীণা রায়, ভৈচাল দোয়ারী (ভান্ডিজেলাস), জলেশ্বর নমদাস (নাটাবাড়ী), নকীন কুষাণী (হরিপুর), বাঁশি গীদাল (নাগরুর হাট)।

অপর পক্ষে দোতরা পালার মূল ও গীদালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পঞ্চাগীদাল (শিমূলবাড়ী), শিবেন মুচিয়ার ও ভোমামুচি (শিমূলবাড়ী), সুশীল রায়, কারাম মিএগ্রা, মেঘনাদ রায়, জলেশ্বর নমদাস প্রমুখ।

জেলার বিভিন্ন গ্রামের মেলা ও লোকউৎসবে উপস্থিত থেকে কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই নিদর্শনের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা দেখতে পাই এর লোকসাংবাদিকতা। কোচবিহারের লোকনাটক এক অর্থে লোকশিক্ষক অর্থাৎ এই নাট্যমাধ্যম গণশিক্ষা বিস্তারে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। দোত্‌রা পালার প্রেম যেমন বিশ্বজয়ী তেমনি সামাজিক সমস্যা, সাক্ষরতা, পণপ্রথা, কুসংস্কার ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে এই লোকমাধ্যমে। কুষাণ পালাও রামায়ণনির্ভর হয়ে দক্ষ মূল ও গীদালের অভিনয় গুণে নারীর প্রেম ও সতীত্ব বড় হয়ে দেখা দেয়। সেই অর্থে কোচবিহারের লোকনাটক যথার্থই লোকশিক্ষার বাহন।

দিনহাটা মহকুমার শিমূলবাড়ী গ্রামের প্রখ্যাত দোত্‌রা পালার মূল পঞ্চাগীদাল পরিচালিত বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী পালায় আমরা দেখতে পাই রাক্ষস মেসাম্বর বিশ্বকেতুকে প্রশ্ন করে —

"পৃথিবীর অধিক গুরু হয় কোন জন?
গগণ হইতে উচ্চ কোন মহাজন?
তৃণের অধিক ক্ষুদ্র কোন মহাশয়?
পবনের অগ্রেতে কে চলে যায়?"

বিশ্বকেতু যথার্থই উত্তর দেয় —

"পৃথিবীর অধিক গুরু হয় জননী।
গগণ হইতে উচ্চ পিতা বলে মানি।
তৃণের অধিক ক্ষুদ্র ভিক্ষুক যে জন।
পবনের অগ্রেতে চলে আপনার মন।"

এতদঞ্চলে লোকনাটকে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে প্রবাদ-প্রবচন। এগুলিও লোক শিক্ষার অঙ্গ।

চৌর্যবৃত্তিকে নিয়ে মিথ-ট্যাবু-লোককথার পাশাপাশি লোকবিশ্বাসকে ভিত্তি করে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামে 'চোর-চুরনী' নামক পালার ব্যাপক প্রচলন থাকলেও কোচবিহার জেলার একমাত্র মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ীর অনেক গ্রামে সঙ্গীতনির্ভর 'চোর-চুরনীর' পালার প্রচলন আছে। হালকা করুণ রসের মাধ্যমে লোকসমাজের প্রতিচ্ছবি এরূপ পালায় প্রতিফলিত। এই পালায় চোর ও চুরনী মূল কুশীলব হলেও অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকাও থাকে। চোর ও তার স্ত্রী চুরনীর কথোপকথনের মাধ্যমে সে কেন চুরি করতে বাধ্য হচ্ছে, চুরি করা সামগ্রী দিয়ে চুরনীর বাসনা কিভাবে চরিতার্থ হয়, আবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার পর তার করুণ পরিণাম প্রভৃতি কখনও গানে, কখনও কথায় ব্যক্ত হয়। মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ী অঞ্চলের এই পালার প্রচলিত একটি গানে দেখা যায় —

"চুন্নী ভাবিস না চিন্তিস্ না মোর বাদে,
ভাবিলে এ দেহা শুকাবে
কান্দিলে কি আর খণ্ডিবে
যা হবার তা হয়া গিসে
চুন্নী, মোর কপালে যা লেখা আছে।"

লোকনাটকের আঙ্গিক বিচারে এই পালা পূর্ণাঙ্গ লোকনাটক না হলেও বর্তমানে মঞ্চেও এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

চোর ও চোরের স্ত্রী উভয় ভূমিকায় অভিনয় করেন পুরুষ। কালী পূজার সময় হলদিবাড়ী ও মেখলিগঞ্জের গ্রামে যুবকগণ দলবদ্ধভাবে গানের পাশাপাশি একজন চোর সাজেন অপর একজন পুরুষ স্ত্রীর ভূমিকায় চুরনী সাজেন। চোরের বেশভুষা স্বাভাবিকভাবে সঙের বেশে হয়। অন্য চরিত্রাভিনেতাগণ রঙ-বে-রঙের পোশাক পরেন, অনেক ক্ষেত্রে মুখোশও ব্যবহার করেন। গানই এই পালার সংলাপ। কখনো প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে অভিনয় সম্পাদিত হয়। গৃহস্থ যুবকগণ সানন্দ চিত্তে পালার অভিনয় ও গান শুনে তৃপ্ত হন। এই পালায় কোন ধর্মীয় বা পৌরাণিক ভাবনা নেই। গানই এই পালার কথা। চোর ও তার স্ত্রী চুরনীর নিস্তরঙ্গ জীবনে ব্যঙ্গ-রসাত্মক, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অভিব্যক্তিপূর্ণ লোকশিক্ষামূলক অনেক কথা থাকে এই পালায়। দিনের বেলায় ভাল মানুষ, চোর রাত্রিবেলায় কাকুরী হাতে চৌর্য কার্য সম্পাদন করেন। মেখলিগঞ্জ মহকুমার নিজতরফ গ্রামের মালতী বর্মনের কণ্ঠে একটি গানে এই করুণ দৃশ্য ব্যক্ত হয়েছে—

'ওরে মোর চুরনীটার চাতুরী
রাইতোত্ ঘুরায় কাকুরী।'

আবার হলদিবাড়ী ব্লকের হেমকুমারী গ্রামেও আমরা চোর-চুরনী পালা অনুষ্ঠিত হতে দেখি।

কোচবিহারের লোকনাটকের ভাষা হল কামরূপী উপভাষা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুষাণ ও দোতরা পালায় বর্তমানে প্রচলিত মান্য কথ্য ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। এটি শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে রুচিবোধের পরিবর্তনজনিত ঘটনা। বিশেষ করে এই পালা বা নাটকের সঙ্গে যুক্ত লোকশিল্পীগণ অনেকেই আজ আর নিরক্ষর নন। তাই মূল বা গিদালের শিক্ষিত রুচির প্রতিফলন ঘটে এই লোকনাটকে।

জেলার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই লোকনাটক এখনও যাদুঘরের প্রত্ন বস্তুতে রূপান্তরিত হয় নি। তাই রাসমেলা, স্নানমেলা, বাঁশপূজারমেলা প্রাঙ্গণে যেমন তেমনি শীতের মরশুমে বাঁশি গীদাল, সুশীল রায়, ললিত কুষাণীর মত দক্ষমূলগণ সিতাই থেকে মাথাভাঙ্গা,

মেখলিগঞ্জ থেকে দিনহাটা— গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে লোকসংস্কৃতির এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে জীবন্ত ও প্রবহমান রেখেছেন। কোচবিহারের লোকজীবনকে বুঝতে হলে চলমান জীবন্ত এই গণমাধ্যম— লোকনাটকের বিচার বিশ্লেষণ— সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন।

(ঘ) ছড়া, ছিলকা, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধাঁ, লোকায়ত মন্ত্র ইত্যাদি ঃ

ছড়া ঃ

উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধতম অংশই হল কোচবিহারের মৌখিকসাহিত্য বা লোকসাহিত্য। যার মধ্যে ছড়া, ছিলকা, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধাঁ ও লোকায়ত মন্ত্র এক বৈচিত্র্যপূর্ণ নিদর্শন। আজও কোচবিহারের নিরক্ষর, নবসাক্ষর কৃষক কবিগণের মৌখিক পরম্পরাগত হেঁয়ালীগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাই বিগত দিনের মানুষের হৃদয়বৃত্তি, সামাজিক রীতিনীতি, লোকাচারের বিবর্তন ইত্যাদি। আমাদের প্রকল্পাধীন সংগৃহীত ছড়া, ছিলকা ও হেঁয়ালীগুলি কোচবিহারের কৃষক কবির নিজস্ব ভাষা ভঙ্গিতে প্রচলিত ও ব্যবহৃত। কোচবিহারের লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছড়াগুলির এক বিশেষ ভূমিকা আছে। সভ্যতার কোন্ সময়ে এই ছড়াগুলি সৃষ্টি হয়েছিল তা কেউ বলতে পারেন না। অনেক ছড়ার মধ্যে ডাক ও খনার বচনের প্রভাব দেখা যায়। "কোচবিহারের প্রচলিত হেঁয়ালী, ছিলকাগুলির রচনা পরিপাট্য এবং অর্থ সংগোপনের কৌশল প্রশংসনীয়। পৌরাণিক আখ্যান কিংবা লোকচরিত্র অবলম্বনে ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনার প্রথা পুরাতন, লিখিত এবং মৌখিক এই দ্বিবিধ উপায়ই প্রচলিত হত।"[১৮] আবার এখানকার প্রচলিত হেঁয়ালী বা ধাঁধাঁগুলি। কোচবিহারের লোকয়ত ছড়ার একটি উজ্জ্বল প্রাঙ্গণ হল এর লোকক্রীড়া অর্থাৎ স্থানীয় লোকজীবনের অনেক খেলাধূলায় ছড়ার ব্যবহার দেখা যায়। তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী অঞ্চলের ভেলাপেটা গ্রামের ফুলেশ্বরী দাস আংটি খেলার একটি ছড়া আমাদের শোনান —

"আংটি না বাংটি
সরা মাছক ঘুংটি
সরসরায় না মড়মড়ায়
ডোমনা বেটা কোন্টে নুকাইল
করে কাউয়া কারটে।"

জেলার প্রচলিত শিশু ভুলানো ছড়াগুলি (ছাওয়া ভুলাকি) শুধু কোচবিহারেই সীমাবদ্ধ নয়। এমন অনেক শিশু ভুলানো ছড়াও প্রচলিত আছে যেগুলি পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি, আসামের গোয়ালপাড়া ও বাংলাদেশের রঙপুর অঞ্চলেও সমধিক প্রচলিত।

এমন একটি শিশু ভুলানো ছড়া যার ব্যবহার দেখা যায় শিশুকে ঘুম পাড়ানোর সময়—

"আয় নিন্ (চাঁন) আয়
আমার সোনা বাচ্চা বাপই
নিন্ যাবার চায়।"

"এক শিয়ালে রান্দে বাড়ে
তিন শিয়ালে খায়,
কান কাটা এক বুড়া শিয়াল
ভুড়কি মারি চায়।"

(কথক— গেন্দুশ্বরী বর্মন, গ্রাম— মাঘপালা, জেলা সদর)

তুফানগঞ্জ মহকুমার জায়গীর চিলাখানা ১নং অঞ্চলের অন্তর্গত ঝাকুয়াটারি গ্রামে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ধান কাটা মাড়ার পর স্থানীয় গৃহস্থ বাড়ীর যুবকগণ সোনা রায় ও রূপা রায়ের মাগন তোলা উপলক্ষে গৃহস্থ বাড়ীর উঠোনে গিয়ে ছড়া কাটেন। যেমন—

" হাপ্পা হাপ্পা নাফা শাক
তাক ফেলালং পাত
হাত্তি আসিল ঘোড়া আসিল
ফুল মানিকের ভাই
ফুল মাণিকের ভাইরে
একনা উড়ালি কবুতর
উড়ি উড়ি বেড়ায় ম্যান্ডেলের ভিতর
সাত খান নাওরে সাত খানা নাওরে দরিয়া সাত
চটকার ধুতি পিন্দি বাড়ি বুলি যাই
বাড়িত নাই নাই ভাত
থুবে .... এ .... থুবে।" (দোহার)

এতদঞ্চলের মৌখিক সাহিত্য লোকমনের কষ্টকল্পিত ফসল নয়। লোকজীবনই এই ফসলের উৎসভূমি। অলিখিত এই মৌখিক সাহিত্য তাই কোচবিহারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লিখিত সাহিত্যের ভিত্তিভূমি। দৈনন্দিন, পারিবারিক গ্রামীণ জীবনে নির্মল আনন্দ যোগায় লোকসাহিত্যের এই চলমান নিদর্শনগুলি। তাই আজও কালজানি, তোর্ষা, রায়ডাক সংলগ্ন গ্রামের নির্জন প্রান্তরে রাখালিয়া বাঁশির সুর, মইষালের দোত্‌রার ডাং যেমন শোনা যায় তেমনি সোনা রায়ের ব্রতীগণ বাড়ীর উঠানে এসে হাঁক ছাড়ে লোকায়ত ছড়ার ভঙ্গীতে—

"সোনারায়ের দক্ষিনা দিতে যায় করিবে হেলা
তার সোয়ামীর নাগাল পাইম গরুচড়ের বেলা
সোনারায়ের দক্ষিনা দিতে যায় করিবে ইশপিশ
ছয় মাস তার গাত জ্বর পেটে পড়িবে বিষ।"

কোচবিহারের লোকায়ত জীবনে নিরক্ষর, নবসাক্ষর, বিবাহিত রমণীগণ লোকলজ্জায় স্বামীর নাম উচ্চারণ না করে হাতে পয়সা না থাকলেও ঘাট পারাপারের সময় সে ছড়ার মাধ্যমে ঘাটিয়ালকে অনুরোধ করেন—

"তিন তেরো দিয়া বারো
নয় দিয়া পূরণ কর
মোর সোয়ামীর এই নাম
পার করি দেও বাড়ি যাং।"

(সুবলচন্দ্র বর্মন, গ্রাম— অন্দরান ফুলবাড়ী, তুফানগঞ্জ, ৫/১২/৯৮ইং)

কোচবিহারে লোককবি বা হেটোকবিদের রচনা বিষয়বস্তুর গুণে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চোখে দেখা, চেনা জানা নানা পরিবেশে কোন সত্য ঘটনা, প্রেম-প্রণয়, অভাব-অভিযোগ এক কথায় চলমান জীবনের বাস্তব চিত্রই ফুটে ওঠে লোককবিদের এই হেটো কবিতায়। যেমন বর্তমান সাক্ষরতার প্রচারে গ্রামগঞ্জের হাটে মাঠে লোককবির কথায় শোনা যায়—

"আছে অন্ধকার নিজের ঘরে কেহ নাহি জানে
নিরক্ষর শত্রু মোদের বুঝলাম এতদিনে
শত্রু হটাইব আলো জ্বালন কালের প্রদীপ লইয়া
নিরক্ষরকে সরা সব আলোর মুসল দিয়া।"

ছিলকা ঃ

কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ লোকসমাজের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত হয় শ্লোক বা ছিলকা। শ্লোক শব্দের অপভ্রংশ এখানে ছিলকা বা ছিলিকা নামে প্রচলিত। তবে শ্লোক ও ছিলকার প্রয়োগরীতি ভিন্ন। "শ্লোকের প্রয়োগরীতিতে যে গুরুগম্ভীর এক ভাব লক্ষ্য করা যায়, ছিলকার প্রয়োগে তা দেখা যায় না। সাধারণত ছিলকার প্রয়োগ লঘু, চপল, এ যেন হালকা ডিঙি নৌকা পালে বাতাস লেগে তর তর করে বয়ে চলছে।"[১৭]

কোচবিহারের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের এমন কতকগুলি ছিলকা বা হেঁয়ালী প্রচলিত আছে যেগুলি প্রতি মুহূর্তে বাক্য বিনিময়ের বা কথোপকথনের মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এগুলি এতদঞ্চলের লোকজীবনের নিত্যসঙ্গী। উপকারী মানুষ কতটা উপেক্ষিত তার দৃষ্টান্তের একটি ছিলকা হল— "উপকারী গাছের নাই ছাল / উপকারী মানষির নাই ভাল।" অপর একটি

প্রচলিত ছিলকা হল— "আগ ধেয়া যায় বান্দে আলি / তায় খায় শইল বোয়ালী।" অর্থাৎ যে তাড়াতাড়ি আল বাঁধবে সে ভাল ভাল মাছ পাবে। হলদিবাড়ীর হেমকুমারী গ্রামে সংগৃহীত একটি ছিলকা হল— "একে পাতে খাই / তোর ক্যানে গাও দুম দুম মোর কানে নাই।" অর্থাৎ এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করে কেউ রুগ্ন থাকে আবার কেউ নাদুস-নুদুস চেহারার হয়। জেলায় প্রচলিত এমন কতকগুলি প্রবাদ আছে যেগুলি সার্বজনীন, যার মধ্য থেকে উঠে আসে চিরন্তন মানব অভিজ্ঞতার কথা। এমন একটি প্রবাদ হল —

"আটিয়া কলাক কলা না কং বিচি সাং সাং করে
পর পুরুষক পুরুষ না কং নিদান কালে ছাড়ে।"

হেঁয়ালী কোচবিহারে ছিলকা নামেও পরিচিত। অক্ষরজ্ঞানহীন কৃষক কবির সহজ সরল ভাব সমৃদ্ধ এই ছিলকাগুলি বা হেঁয়ালীগুলির মধ্যে আধুনিক সাহিত্যকৌশল না থাকলেও এর মধ্যে অতীত যুগের মানব হৃদয়ের রুচি, সামাজিক রীতি-নীতি প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত হয়। এরূপ ছিলকা ও হেঁয়ালীগুলি শুধুমাত্র কোচবিহারেই নয় পার্শ্ববর্তী আসামের গোয়ালপাড়া জেলা, জলপাইগুড়ি ও অবিভক্ত বাংলার অনেক জেলাতেও সমধিক প্রচলিত। এতদঞ্চলের অনেক গ্রামেই বিয়ের সময় কন্যাকে পাত্রস্থ করার পূর্বে উপদেশমূলক একটি ছিলকার প্রচলন আছে— "নদী দেখি করি স্নান / পুরুষ দেখি করি দান।" অর্থাৎ স্নান করার পূর্বে আমাদের নদীর জলের গভীরতা ও স্বচ্ছতা যেমন দেখা প্রয়োজন, তেমনি কন্যার বিয়ের সময় বরের স্বাস্থ্য, চরিত্র ও আর্থিক সঙ্গতির কথা জানা দরকার।

প্রবাদ ঃ

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত এতদঞ্চলেও প্রবাদ কোন্ মুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছিল তা কেউ বলতে পারেন না। কালের বিবর্তনে প্রবাদ পরিবর্তিত হলেও তার অর্থ থাকে অপরিবর্তিত। অর্থ ঠিক রেখে উত্তরবঙ্গের অনেক গ্রামে অঞ্চলভেদে প্রবাদ ভিন্ন নামে প্রচলিত আছে। প্রবাদের সমাধানটাই শেষ কথা নয়। হলদিবাড়ী ব্লকের হেমকুমারী গ্রামের নন্দকুমার বর্মনের কাছ থেকে এরূপ একটি প্রবাদ সংগ্রহ করি— "কুতিয়া মৈল দৈবকী / নাম ফাটায় যশোদারাণী।" (অর্থাৎ দৈবকী প্রসববেদনা ভোগ করলেও কৃষ্ণজননী আখ্যা পান যশোদারাণী। অর্থাৎ একজন কষ্ট করে অন্যজন ফল ভোগী।) জেলার সকল প্রবাদই এতদঞ্চলের স্থানীয় ভাষার এক চমৎকার নিদর্শন। প্রবাদগুলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এর উপমা এবং রূপকসমূহের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য।

জেলার প্রায় সকল গ্রামেই প্রচলিত অপর একটি জনপ্রিয় প্রবাদ হল—

"ঝাপি মাথাত দিয়া নাও বয়
তাকে কং মুই নাইয়া

বিয়ার পরে নাইয়োর না যায়
তাকে কং মুই মাইয়া।"

(কথক ঃ পুলেন্দ্রনাথ অধিকারী, গ্রাম- সোলাভাঙ্গা, মারুগঞ্জ অঞ্চল)

প্রবাদটির মর্মার্থ হল— মাথায় ঝাপি দিয়ে বর্ষণমুখর দিনেও যে মাঝি নৌকা বায় সে-ই প্রকৃত মাঝি। অপর পক্ষে যে মেয়ে বিয়ের পর বাপের বাড়ীর মোহ্ কাটিয়ে স্বামীর সংসারকে আপন করে নেয়, বাপের বাড়ী কম যায়, সে-ই প্রকৃত মেয়ে।

কোচবিহারে বাঁশ কাটার বাধা-নিষেধ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ হল—

"মঙ্গলে না মারি গাটি
শনিবারে না কাটি মাটি।"

শনি ও মঙ্গলবার যথাক্রমে বাঁশ যেমন কাটা যায় না তেমনি ঘরের কাজও করা যায় না।

ক্ষেত্র-সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই এতদঞ্চলের প্রচলিত প্রবাদগুলি হল এক ধরনের উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি। যার মধ্যে কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব নেই। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এগুলি সমানভাবে প্রচলিত। যুগসীমা বা কালসীমা অতিক্রম করে এই সব প্রবাদ চিরন্তন মানব রায়কে প্রকাশ করে।

ধাঁধাঁ / হেঁয়ালী ঃ

এতদঞ্চলে ধাঁধাঁকে হেঁয়ালী বলা হয়। কোচবিহারের লোকসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন এই ধাঁধাঁ। ধাঁধাঁর আবেদন মানুষের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিকেই প্রকাশ করে বেশী। ধাঁধাঁ সাহিত্যিক ও লৌকিক এই দুই রকম হলেও এতদঞ্চলে লৌকিক ধাঁধাঁর প্রচলন বেশী। জেলার অন্যান্য অঞ্চলের মৌখিক সাহিত্যের মত ধাঁধাঁও এতদঞ্চলের গ্রাম্য মানুষের সৃষ্টি। জলপাইগুড়ি জেলায় ধাঁধাঁকে বলা হয় "ফাক্রি"। ধাঁধাঁর বিষয়বস্তু যেমন মানুষ, তেমনি পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ এবং সামাজিক ও ব্যক্তি মানুষের চরিত্রও বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধাঁধাঁর ব্যবহার দেখা যায়। এতদঞ্চলের লৌকিক ধাঁধাঁগুলি উদ্দেশ্যমূলক হলেও লোকাচার ও ধর্মনিরপেক্ষ। কোচবিহারে প্রচলিত সকল ধাঁধাঁই প্রশ্নমূলক। কখনও অল্প কথায়, কখনও ছড়ার মাধ্যমে, আবাব কখনও গল্পের মাধ্যমে। প্রত্যেক ধাঁধাঁর উদ্দেশ্যই হল কৌশলমূলক শব্দ চয়নের মাধ্যমে অন্যের প্রতি শব্দের প্রশ্নবান ছুঁড়ে দেওয়া। জেলার প্রায় সকল গ্রামেই প্রচলিত এরূপ একটি ধাঁধাঁ হল—

"রাজার বেটি ধুন্দল পেটি
বিন কোদালে খোড়ে মাটি।"

(উত্তর ঃ শূকর)

এই ধরনের অপর একটি ধাঁধাঁ হল—

"ওপারের কাশিয়াগুটি ঝিকির মিকির করে
কার বাপের সাধ্যি আছে কাটিয়া আনতে পারে ?"

(উত্তর ঃ আকাশের তাঁরা)

সুপারী ও তালগাছ সম্পর্কিত একটি ধাঁধাঁ হল—

"এক পায়ের হাতি
গলায় ঘুগুরা, মাথায় ছাতি।"

(উত্তর ঃ সুপারী ও তালগাছ)

কোচবিহারে প্রচলিত লৌকিক, মৌখিক সাহিত্যের এই আঙ্গিকগুলি এতদঞ্চলের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির উপাদানসমৃদ্ধ রত্ন ভান্ডার। কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি বিকাশের জয়যাত্রা শুরু সুদূর প্রাচীন কাল থেকে হলেও কাল পরিক্রমায় গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে আজও পুষ্টিলাভ করে চলেছে এগুলি।

লোকায়ত মন্ত্র ঃ

কোচবিহারের মৌখিক সাহিত্যের স্বল্প পরিচিত এক প্রাচীন নিদর্শন হল, কোচবিহারের আঞ্চলিক লোকভাষায় রচিত লোকায়ত মন্ত্রগুলি যা আজও প্রায় সকল গ্রামে সহজ সরল ভাবে গ্রামবাসী কর্তৃক সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এতদঞ্চলের লোকজীবনে মন্ত্রের উদ্ভব ও ব্যবহার সুপ্রাচীন কালের। সর্বপ্রাণবাদী কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের শুভ বিশ্বাস, সুগভীর শ্রদ্ধা এবং যাদুবিশ্বাস এতদঞ্চলের মন্ত্রের উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। দেও, দেবতা ও তন্ত্র মন্ত্রে বিশ্বাসী এতদঞ্চলের স্থানীয় সম্প্রদায় আজও অশুভ দেও অপদেবতার পূজার জন্য ওঝা-ফকিরের মাধ্যমে রোগ ব্যাধি সারাবার চেষ্টা করেন।

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী গ্রামের গিরিশ কবিরাজের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১১০ বছরের প্রাচীন এক মন্ত্রপুঁথি থেকে তেলপড়া মন্ত্রটি সংগ্রহ করি। এটি বিশেষ করে স্ত্রী লোকের মইল্যা দোষ, (গর্ভনষ্ট, মৃত পুত্রের জন্ম দেওয়া) ইত্যাদি ক্ষেত্রে কবজ দেওয়ার পূর্বে শরীরকে তেলপড়া দিয়ে কবিরাজ মন্ত্রপুত করেন। মন্ত্রটি হল— "তেলির তেল পসারি চৌষট্টি জুগিনি / বয়ভাব গঙ্গা দুর্গাবন্দ মাতে মুই / ফল্যা তেল পরং আদ্যের দেবী কালিকা / চন্ডীর হাতে এই তেল পড়িয়া চক্ষে ছাতি পেটোত দিয়া ভুত পিচাস / জকা জকিনী দুষ্টা দানব চমক চমকা শ্মশান মশাল বাও বাতাস / গোড়াজুল্লি নিসা চোবা ছাড়িয়া পালায় / মোর পল্যার তেল পরাত সিদ্ধি / গুরু ওস্তাদের পাও এই তেল পরি দিয়া / ফল্যাক রক্ষা করিলেক কামরূপের কামেক্ষা চন্ডিমাও।"

কোচবিহারের প্রচলিত লোকমন্ত্রগুলিতে আমরা দেখি প্রতিকার, প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যানের শব্দচয়ন। অনেক মন্ত্রের ব্যবহারিক গুরুত্ব না থাকলেও ছড়ার মত গুরুত্ব নিয়ে মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত আছে।

প্রচলিত অনেক মন্ত্র শুভ অশুভ অনেক কাজেই ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালের ওঝা ও ফকিরগণ এক একজন এক এক লোকদেবতার সাধক ছিলেন। তেমনি কোচবিহারের লৌকিক চিকিৎসায় ভোঙরিয়াগণ কালী, মনসা ও মাসানের শরণাপন্ন হন। রোগ বিশেষে জলপড়া, তাবিজ-কবজও দেন। তুফানগঞ্জ মহকুমার বালাভূত গ্রামের প্রবীণ সাপের ওঝা রসতুল্লা মিঞা সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসায় মনসার মন্ত্র গীতের ভঙ্গিতে গেয়ে থাকেন। যেমন —

"প্রথম আল্লার নাম দেই মেলান দরুদ নবী জী
বিসমিল্লা বলিয়া মুখের জবানও খুলি
ওস্তাদ পীর বদি করিলাম মস্তিষ্ক উপরে
তুমি মাতা লখা দেবী বস আমার কণ্ঠতে
তুমি যদি না আস মা এই অধমের আসরে
কলঙ্ক হবে মাতো জগত মাঝারে।"

এতদঞ্চলে প্রচলিত মাথার বিষ ঝাড়ার মন্ত্রে দেখা যায়—

"উং গুরু মনে মনে গুরু মুখে মুখে বৈদ্য বাহন গুরু মোর
আস্তি গুরু মোর পস্তি, চন্দ্র সূর্য ব্রহ্মণা বৈষ্ঠ মহশ্বের।"

দেশ বিভাগ জনিত কারণে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু সমাজের আগমনে, শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারে, যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মনস্কতায়, আর্থ সামাজিক পরিবর্তনে কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ লোকায়ত মন্ত্র আজ বিলুপ্তপ্রায়। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই মন্ত্রের দ্রব্যগুণ ও গোপনীয়তা নষ্ট হওয়ার ভয়ে ওঝা বা গুণীদের রক্ষণশীলতাও মন্ত্রের বিলুপ্তির অন্যতম কারণ— ফলস্বরূপ বংশ পরম্পরায় যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবও এজন্য দায়ী।

বহতা নদীর মতই কোচবিহারের গ্রামেগঞ্জে প্রবহমান লোকসংস্কৃতির অমৃতধারা, যার ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ আঙ্গিক লোকসাহিত্য-- মৌখিক সাহিত্য। কোচবিহারের ধর্মীয়, লোকায়ত সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন— লোকগীতি, লোককথা, লোকনাটক, লোকবিশ্বাস, যার অনন্য সাধারণ বৈচিত্র্য সমন্বিত আঙ্গিক বাংলা লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে উজ্জ্বল সম্পদ। কোচবিহারের লোকসাহিত্য লোকায়ত সমাজজীবনকে আজও ঐক্যবদ্ধ ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে। তিস্তা, তোর্ষা, কালজানি, রায়ডাক, গদাধর অধ্যুষিত গ্রামগুলি আজও দারিদ্রতাকে সাক্ষী রেখে সনাতন প্রাচীন মূল্যবোধকে সম্বল করে প্রাচীন ঐতিহ্য লালিত লোককথাকে যেমন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিসর্জন দেন নি তেমনি আজও বছরের বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন তিথিতে লোকউৎসবের

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আসর বসান লোকনাটক ও লোকসঙ্গীতের। কোচবিহারের প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় রচিত, সমাজজীবন নির্ভর লোকসঙ্গীতের বিষয় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দুইই অনন্য সাধারণ। বিশেষ করে আঙ্গিক ও পরিবেশন রীতিতে। যেমন— ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের ভাব ও ভাষাভঙ্গী উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে স্বতন্ত্রধর্মী। সকল ক্ষেত্রেই এই আঞ্চলিকতার বর্ণময় প্রকাশভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়।

সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখা যায় জেলার সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বিয়ের গানগুলি জেলার আদিবাসী হিন্দু ও মুসলিম নারী সমাজের জীবনসঙ্গীতও বলা যায়। ঠিক তেমনি এতদঞ্চলে প্রচলিত যাইটল, কাতি, হুদুম ও বিষহরি পূজা ব্রতের গানগুলিও লোকপরম্পরায় এতদঞ্চলের মানুষকে আজও উজ্জীবিত করে।

কোচবিহারে প্রচলিত পালাগানগুলির মধ্যে কুষাণ, রাবণ, বিষহরা, সোনারায় গানগুলি হয়ত উদ্ভব লগ্নে ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। পরবর্তীকালে বাস্তব রসসিক্ত হয়ে লোকচিত্ত বিনোদনের সামগ্রী হয়েছে। দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী মৌখিক সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে ছড়া, ছিলকা, প্রবাদ-প্রবচনগুলির মধ্যে স্থানীয় লোকজীবনের নানা প্রশ্নের, সমস্যার, বেদনার সমাধানের উপায় খুঁজে পায় সাধারণ মানুষ। সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি কোচবিহারের লোকসাহিত্যের আঙ্গিকগুলি লোকশিক্ষার যথার্থ বাহন। স্থানীয় লোককথা, ব্রতকথা, উপকথায় সহজ সরল উপমার মাধ্যমে লোকজীবনই ব্যক্ত হয়। সকল ক্ষেত্রেই এই সব কাহিনী সাবলীল ও ছন্দোময়। প্রকৃতপক্ষে কোচবিহারের মৌখিক সাহিত্য মূলত লোকজীবনেরই প্রকাশ। জীবন ও জীবিকার স্বার্থে আর্থসামাজিক কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলের সমাজজীবনের পরম্পরা ও অভিজ্ঞতার বাস্তব ভূমিতে সৃষ্টি হয়েছে লোকবিশ্বাস ও মৌখিক সাহিত্য। কোচবিহার জেলা আজও যথার্থই লোকসাহিত্যের অফুরন্ত ভান্ডার, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সমাজ বিকাশের ধারায় এরূপ লোকসাহিত্যকে মূল্য না দিলে সামাজিক প্রগতি সাধিত হবে না।

__তথ্য সূত্র__

১। কোচবিহার রাজ্যের লোকসংস্কৃতির আর্থসামাজিক স্বরূপ— সুবোধ সেন (Souvenir, Cooch Behar College. 1996) পৃ - গ/৮।

২। ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীত— ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার (মনীষী পঞ্চানন বর্মার ১৩৩ তম জন্মজয়ন্তী উৎসব ও দশম রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা তাং - ১৪/১৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৯) কোচবিহার রাসমেলা ময়দান।

৩। Linguistic Survey of India by G A Grierson. Indo-Aryan Family - Eastern Group, Part-1. First ed. 1903. Reprint - 1968. Page 193. 185

৪। ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীত — ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার (মনীষী পঞ্চানন বর্মার ১৩৩ তম জন্মজয়ন্তী উৎসব ও দশম রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, তাং - ১৪/১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৯), কোচবিহার রাসমেলা ময়দান।

৫। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — মোবারক হোসেন ব্যাপারী, বক্সীর কুঠি, তুফানগঞ্জ, কালজানি নৌকাবাইচ অনুষ্ঠান, তাং - ১১/১০/২০০০।

৬। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — সিরাজুল ব্যাপারী, নৌকাবাইচ অনুষ্ঠান, ভেলাকোপা গ্রাম, চিলাখানা ২ নং গ্রামপঞ্চায়েত।

৭। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ - ১০৯ (১৯৭৪)।

৮। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — ধনঞ্জয় রাভা ও তার সম্প্রদায়, গ্রাম - ভারেয়া, তুফানগঞ্জ, তাং - ৮/১১/৯৮ ইং।

৯। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — মালতি বর্মন, গ্রাম - নিজতরফ, মেখলিগঞ্জ, তাং ৭/১০/১৯৯৯।

১০। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — কেতুমন বিবি, গ্রাম - দেওচড়াই, তুফানগঞ্জ, তাং - ১২/৩/৯৯ ইং।

১১। কৃষক সংগ্রামের প্রতিবাদী কবি রতিরাম দাস — পরিতোষ দত্ত, পৃ - ৩১, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা (১৯৯৮)।

১২। পশ্চিম দিনাজপুরের লোকনাট্য — একটি সমীক্ষা, ডঃ দুলাল চৌধুরী (মধুপর্ণী, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা - পৃ- ৪৪৪ (১৩৯৯)।

১৩। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা লোকসংস্কৃতি গ্রন্থাবলী, পৃ - ১২৯ (১৯৮২)।

১৪। কোচবিহারের লোকনাটক — ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার, পৃ - ৯ (১৪০৩)।

১৫। কোচবিহারের লোকনাটক — ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার, পৃ - ১৩ (১৪০৩)।

১৬। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ ৫২ (১৯৩৬)।

১৭। উত্তর বাংলার রাজবংশী ভাষায় ছিলকা — মধুরেশ চক্রবর্তী, ত্রিবৃত্ত, ১৫ই কার্তিক (১৩৮০), ৫ম বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, পৃ - ১৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লৌকিক দেবদেবী, হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত দেবদেবী, দেবদেউল, থান, পাট, পূজা-পার্বণ নানা অনুষ্ঠান, ব্রত ও ব্রতভিত্তিক আনুষ্ঠানিক লোকনৃত্য

লৌকিক দেবদেবী ঃ

কোচবিহারের মাটি ও প্রকৃতি যেমন প্রাকৃতিক কারণেই উর্বর ও সমৃদ্ধ তেমনি তার লৌকিক দেবদেবীগণও লোকজীবনের গভীরে অধিষ্ঠিত। শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক খোলস ছেড়ে ঘরের মানুষের মতই এখানে আপন হয়ে উঠেছেন এই দেবদেবীগণ। কোচবিহারের লোকায়ত মনও লৌকিক দেবদেবীদের দেখেছে দৈনন্দিন জীবনের চলার পথে, সংসারের সহজ সরল ক্ষেত্রে, উৎসবে, আনন্দে, সুখে-দুঃখে, রোগে-ভোগে। আদিম যুগের শিকারজীবী মানুষের মত তন্ত্র-মন্ত্রের ফাঁদ যেমন তারা পাতেন নি তেমনি আধুনিক শহুরে মানুষের মত শাস্ত্রের ঘেরাটোপে আবদ্ধ করেন নি তাদের লোকদেবতাকে। দেবতাকে তারা দেখেছেন গৃহের অভ্যন্তরে, নদীর প্রশস্ত প্রান্তরে, সবুজ ধানের ক্ষেতে, গরুর গোয়াল ঘরে, নিভৃত কোন জনপদে, তেমাথার মুক্তাঙ্গনে খেলে বেড়ানো শিশুটির মাঝে। এতদঞ্চলে অনেক লোকদেবতার উদ্ভবের মূলে আছে আদিম টোটেম, ট্যাবু ও যাদু বিদ্যার প্রভাব। সাধারণ ভাবে বিচার করলে দেখা যায় এরূপ দেবতা অশাস্ত্রীয়, অপৌরাণিক, সম্পূর্ণ রূপে লোকজীবনেরই অঙ্গ। আবার ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে একাধিক দেবতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাচীন নামেরও পরিবর্তন ঘটেছে। কোচবিহারের লোকদেবতাগণ একাধারে আঞ্চলিক দেবতা, গ্রাম দেবতা, ব্রত দেবতা।

জেলায় এমন অনেক গ্রাম আছে, যে গ্রাম বিশেষ কোন লোকদেবতার দ্বারা চালিত। যেমন দিনহাটার গোসানীমারী অঞ্চলের আলোকঝারি গ্রাম ও সিতাই থানার গাবুয়া গ্রামের গড়কাটা মাসান; এই গ্রাম দুটিতে গ্রামবাসীদের সুখ-দুঃখ, রোগ-ভোগ, বিপদ-আপদ ও কৃষিকর্মের নিয়ন্ত্রক হল মাসান নামক লোকদেবতার অদৃশ্য শক্তি। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রামীণ এই লৌকিক দেবদেবীগণ ব্রাত্য ও পতিত দেবতা। লোকদেবতার পূজার প্রচলন অন্ত্যজ ও উপজাতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বিশেষ করে কৃষিনির্ভর লোকায়ত সমাজে। কালের বিবর্তনে অনেক লৌকিক দেবদেবী শাস্ত্রীয় সম্মানে উন্নীত হচ্ছেন। অনেক গ্রামে কালী ও অন্নপূর্ণার পাশাপাশি মাসান যথা-যথিও পূজিত হন। শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের বাইরে লোকায়ত বিশ্বাস ও আন্তরিকতার গভীরেই সৃষ্টি হয়েছে এ সকল লৌকিক দেবদেবী।

কোচবিহারের মাসান, যখা-যখি, বুড়াঠাকুর, কুমিরদেব, ডাংধরা, চড়কা, টাকুয়া, মদনকাম, হুদুমদেও, ভান্ডানী, থানসিড়ি, গাবুরদেব, বুড়াঢ্যাল্লা, গেরাম ঠাকুর প্রভৃতির উল্লেখ কোন পুরাণ বা শাস্ত্র গ্রন্থে নেই। লোকদেবতার মূর্তির গড়ন বা আদল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জেলার সর্বত্র সর্বাধিক পূজিত ও সর্বজনবন্দিত জাগ্রত মাসান দেবতার গড়নে হলদিবাড়ী, মেখলিগঞ্জ, নিশিগঞ্জ, দিনহাটা, গোঁসানীমারী প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্নতা দেখা যায়। শুধু মূর্তির গড়ন বা রঙেই পার্থক্য নয়, বাহনের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য স্পষ্ট। মাঘপালা গ্রামের আক্রারহাট নামক স্থানে মাসানের বাহন কোথাও শূকর, কোথাও বা হাতি; আবার দিনহাটা মহকুমার আলোকঝারি গ্রামের এই দেবতার বাহন শোল মাছ হলেও নগরভাঙনি গ্রামের বিলের ধারে চৈত্র সংক্রান্তির দিন সখির মেলা উপলক্ষ্যে অন্নপূর্ণা ও শীতলার পাশাপাশি যে মুন্ডহীন মাসান পূজিত হন তার বাহন কিন্তু কচ্ছপ। অনেকক্ষেত্রেই এই মাসান দেবতার হাতে থাকে পেন্টি, লাঠি ও গদা। উপবিষ্ট বা দন্ডায়মান দুই রূপেই মাসানকে দেখা যায়। উপবিষ্ট যে সকল মাসানকে দেখা যায় তাদের গড়ন, আঙ্গিক এবং আদল বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মাসান কোচবিহার জেলায় পৌরাণিক শিবের লৌকিক রূপ। শিব বা মহাদেব এখানে মাসানের নামান্তরে পূজিত হন। তুফানগঞ্জ মহকুমার জায়গীর চিলাখানা গ্রামে গো-সম্পদ রক্ষক হিসেবে ডাংধরা দেবতা পূজিত হন। স্থানীয় ভোংরিয়া নরেন বর্মনের মতে গ্রামবাসীগণ এই ডাংধরা দেবতাকে শিবজ্ঞানে পূজা করেন। মাসানের একাধিক বাহনের বৈচিত্র্য বিচার করলে আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি এতদঞ্চলে আদিম পশু পূজাই বিবর্তনের মাধ্যমে লোকদেবতার সঙ্গী হয়ে পূজা পায়। "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বর্তমান কোচবিহার রাজ্যের উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলে দলে দলে বন্যহস্তী বিচরণ করিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও গোঁসানীমারীর অদূর উত্তরে পাহাড়গঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বন্যহস্তী আগমন করিত।"[১] এতদঞ্চলে বাঘ বা হাতির উপরোক্ত উপদ্রবের কথা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, গ্রামবাসীগণ জীবন হানি, কৃষির ফলন নষ্ট ও গবাদি পশু রক্ষা কল্পে বাঘ ও হাতির বাহনরূপী দেবতার সন্তুষ্টি বিধানে এসকল পূজার প্রচলন করেন। গাভীর বাচ্চা প্রসবের চৌদ্দদিনের মাথায় গবাদি পশুর মঙ্গল কামনায় রাজবংশী সমাজের গোরক্ষনাথের পূজাও লৌকিক শিবেরই পূজা।

মাটির মূর্তিতে মাসানকে দেখা গেলেও জেলার স্থানীয় রাজবংশী ও আদিবাসীদের মধ্যে পূজিত মাসানের এক প্রাচীন রূপ দেখা যায়, তা হল শোলার তৈরী মাসান। মেখলিগঞ্জ ও তুফানগঞ্জ মহকুমায় এরূপ মাসান পূজার প্রচলন বেশী। এক্ষেত্রে বাহন অবশ্যই অশ্ব। গ্রামীণ লোকশিল্পীগণ অপূর্ব কৌশলে তৈরী করেন এই শোলার মাসান। পূর্বে মাসানের মত বহু লোকদেবতাই পূজিত হতেন বিমূর্ত ভাবে যার নিদর্শন এখনও দেখা যায় প্রস্তরখন্ড, লালনিশান বা ধ্বজা পূজায়।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মত কোচবিহার জেলার সকল গ্রামবাসীর উপাস্য দেবতা হল শিব। কোচবিহারের এই লৌকিক শিব বিভিন্ন নামে পূজা পেয়ে আসছেন। যেমন— বুড়া ঠাকুর, মহাকাল, ডাংধরা, গাবুরদেব, মদনকাম ইত্যাদি।

কোচবিহার জেলার রাজবংশী ও অন্যান্যদের বিশ্বাস মহাকাল, সোনারায়, ডাংধরা, ভান্ডানী, শালেশ্বরী, গোরক্ষনাথ সবাই ব্যাঘ্র দেবতা। এই দেবদেবীগণের পূজার পশ্চাতে ব্যাঘ্রভীতি থাকলেও অন্য অর্থে একে আদিম টোটেম ও সর্বপ্রাণবাদী জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসও বলা যায়।

জেলার সকল গ্রামেই পূজিত গ্রাম দেবতার পূজারীগণও ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্রের আওতায় পড়েন না। স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী সমাজের কেউ কেউ বংশানুক্রমিক ভাবে পৌরোহিত্য করেন। কোচবিহারের সর্বত্রই এই লোকদেবতার পূজা ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য নিজস্ব সামাজিক পূজক সম্প্রদায় দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি শ্রেণীর নাম পাতাধারী অর্থাৎ এরা কানে তুলসীপাতা ধারণ করেন। অন্য শ্রেণীর নাম চক্রধারী। এরা তাম্র নির্মিত চক্র ধারণ করার জন্যই এই নামে ভূষিত হন। "রাজবংশী সমাজে চক্রধারীদের পূজা করার অধিকার বংশানুক্রমিক, তাঁরা শিষ্য গ্রহণে সক্ষম। চক্রধারীদের বংশানুক্রমিক উপাধি অধিকারী কিন্তু পত্রধারীরা সাধারণত রায়, বর্মন ইত্যাদি পারিবারিক পদবী গ্রহণ করে থাকেন। কোচবিহারের লোকায়ত জীবনে এই অধিকারী ছাড়াও যে পূজক সম্প্রদায় আছেন তাঁরা হলেন দেউসী বা দেববংশী, ওঝা বা রোজা, ভোগুরিয়া ও কীর্তনীয়া সম্প্রদায়। শেষোক্ত সম্প্রদায় শুধুমাত্র মৃত্যু কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেন। মৃতদেহ সৎকারের যাবতীয় দায়িত্ব, যেমন— জীবনচালান, গৃহশুদ্ধি ইত্যাদি কাজ কীর্তনীয়াগণ সম্পন্ন করেন। উপরোক্ত অধিকারী সম্প্রদায় অনেক সময় নিজেই ভর গ্রহণ করেন। একে এতদঞ্চলে ভরওঠা বলে। বর্তমানে অধিকারী সম্প্রদায়ের পাশাপাশি শর্মা উপাধিধারী অসমিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্যও লক্ষ্য করা যায়। কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী সমাজের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র এই ব্রাহ্মণ সমাজ।

অনেকক্ষেত্রেই এই সকল লৌকিক দেবদেবীর নামের অর্থও দুর্বোধ্য। অনেকক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ও প্রাধান্য থাকলেও মন্ত্রের ভাষা স্থানীয় উপভাষা। গ্রামের উন্মুক্ত স্থানে সমষ্টিগতভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে গ্রামবাসীগণ লোকদেবতার পূজা করেন।

শিব ঃ

সমগ্র কোচবিহারে শিব বা মহাদেবের পীঠস্থান সর্বাধিক। সেই অর্থে কোচবিহারকে শৈবতীর্থও বলা হয়। কোচরাজবংশের উপাস্যদেবতাও শিব। ভারতবর্ষের সর্বজনমান্য দেবতা এই শিব কোচবিহারে কৃষি-দেবতা হিসেবেও সম্মানিত। মঙ্গলকাব্যগুলিতেও পৌরাণিক শিবকে কৃষক চরিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে। শিবের প্রতীকগুলি বিশ্লেষণ করলে এই দেবতাকে কৃষি-

দেবতা হিসেবে মান্য করতে হয়। শিবের বাহন বৃষভ। যার শব্দ ও ধাতুগত অর্থ হল বর্ষণ। বর্ষণ ও বৃষের সঙ্গে কৃষি কর্মের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। বৃষ আবার প্রজননেরও প্রতীক। এই প্রজনন সন্তান উৎপাদন ও শস্য উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শিবের অন্যতম ভূষণ সর্প। এই সর্পও প্রজননের কাজেই কৃষির প্রতীক। শিবের প্রধানতম প্রতীক লিঙ্গ। শিবের যে মূর্তি-পূজার প্রচলন আমরা দেখি এটি অনেক পরের ঘটনা। পূর্বে লিঙ্গ পূজাই ধর্মীয় কৃত্য হিসেবে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই লিঙ্গ থেকেই লাঙ্গল শব্দ এসেছে। এই অষ্ট্রিক শব্দ দুটি মূলত লাঙ্গলকেই বোঝায়। তাই একথা সহজেই অনুমিত হয় শিবের পৌরাণিক ভাবমূর্তির চেয়ে কৃষিদেবতা রূপেই সহজভাবে গ্রহণযোগ্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য শিবকে কোচদেরই দেবতা বলে উল্লেখ করেছেন।

জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ্বর, জটেশ্বর এবং কোচবিহার জেলার বানেশ্বর, সিদ্ধনাথ শিব, দামেশ্বর, ষণ্ডেশ্বর শিব-শিবকান্তের প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে আজও।

এই মহাকাল শিব কোচবিহারের মানুষের সর্বাধিক মান্য প্রধান উপাস্য দেবতা। প্রসঙ্গত বলা যায় কোচবিহারের রাজ পরিবারও শৈবধর্মে দীক্ষিত। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রজাগণের উপর রাজধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কোচবিহারে প্রচলিত প্রাচীন কিংবদন্তী 'যোগী বেশধারী মহাদেবের ঔরসে বিশ্বসিংহ ও শিষ্যসিংহ নামে হীরার গর্ভে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন।' কোচবিহারে হিন্দুধর্মের প্রসার ও বিস্তার শুরু হয় বিশ্বসিংহ শৈবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই। স্থানীয় মানুষ তাদের সকল শুভ কাজের সূচনা করেন শিবপূজার মাধ্যমে। শিব সম্পর্কিত সর্বাধিক জনপ্রিয় লোকশ্রুতি হল, শিবকর্তৃক মদন ভস্ম ও মদনের পুনর্জন্মের কাহিনী। ধর্মপ্রাণ মহারাজা প্রাণনারায়ণের আমলে প্রতিষ্ঠিত, পুনর্নির্মিত ও সংস্কার করা হয় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক শিবমন্দির।

জেলার প্রাচীন লোকায়ত সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন হল মদনকাম পূজা। "এই পূজার সঙ্গে শিব ভোলানাথের সম্পর্কহেতু ভক্তরা নিজেদেরকে শিবের ভক্ত ভূত-প্রেত ইত্যাদির সমতুল্য করে ধূলা-বালি-কালি মেখে জরাজীর্ণ বস্ত্রাদি, ছেঁড়া বস্তা, ছেঁড়া মাছ ধরার জাল ইত্যাদি পরে কামদেবের মাগন সংগ্রহ করেন।"[২]

কোচবিহারের সীমান্তবর্তী রাজ্য আসামের গোয়ালপাড়া জেলা ও কোচবিহারের কিংবদন্তী অনুযায়ী রাজবংশী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসে শিব পূজা হল প্রকৃতি পূজা। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজিত শিবের উল্লেখযোগ্য রূপ হল 'শিবজখা' ও 'বুড়া চৌপারী'। শিবের অপর নাম 'বুড়া চৌপারী' ও 'মহাদেব'। এই পূজা সাধারণত দেউসী অধিকারী ও গাওবুড়া কর্তৃক সম্পন্ন হয়। শিবেব "লোকায়ত এই পূজায় শিবকে সাক্ষী রেখে এতদঞ্চলে খাসির মাংস খাওয়ানোর প্রচলন আছে। একটি পাঁঠার অন্ডকোষ কেটে জ্ঞাতি ও মহাদেবের নামে উৎসর্গ করে বলি দিয়ে

খাসির মাংস ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন এবং গ্রামবাসীগণ সবাই খান। একে রাজবংশী সমাজে 'বুড়ার চৌপারী' বলা হয়।"[৩]

"কোচবিহারের স্থানীয় জনগোষ্ঠী মনে করেন জমির উর্বরা শক্তি প্রদাতা স্বয়ং মহাদেব। কোচ রাজবংশ শিব রাজবংশ নামে পরিচিত ছিল। কোচমুদ্রায় নৃপতিগণ 'শিবচরণ কমল মধুকর' বলে পরিচয় দিতেন। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই উর্বরা দ্যোতক লিঙ্গ পূজা বা শৈব Cult — জনজীবনে প্রতিষ্ঠা পায়।"[৪]

ক্ষেত্রানুসন্ধান ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জেলায় পূজিত আরও একাধিক শিবের পরিচয় আমরা পাই। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জেলা সদরের বানেশ্বর গ্রামের বানেশ্বর শিব, সাগরদীঘির পশ্চিমপারে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভশিব, সিদ্ধনাথ শিব, তুফানগঞ্জ মহকুমার দামেশ্বর শিব, যন্ডেশ্বর শিব, হরিহর মহাদেব প্রভৃতি।

বলরাম ঃ

কোচবিহারের জনজীবনে কৃষিদেবতা লৌকিক শিবের মতই অপর একজন দেবতা পূজিত হন, তিনি বলরাম। স্থানীয় রাজবংশী ও রাভা সম্প্রদায় শিবের পরেই এই কৃষিদেবতাকে মান্য করেন।

দিনহাটা মহকুমা শহরের মধ্যস্থলে এরূপ এক মদনমোহন বলরাম ঠাকুরের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের গর্ভগৃহে অবস্থিত ৮ ইঞ্চি উঁচু কৃষ্ণ ও বলরাম মূর্তি। নিত্যপূজা ব্যতীত রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, দোলযাত্রায় বিশেষ পূজা হয়। তুফানগঞ্জ নাটাবাড়ী ১ নং অঞ্চলের ভুচুংমারী গ্রামে পূজিত বলরাম এবং ঘোগারকুঠি গ্রামে পূজিত দরিয়া বলরাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই দেবতাগুলি সম্পর্কে চার (৪) নং পরিচ্ছেদের দেব-দেউল অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

সোনারায় ঃ

মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে অথবা ভূতপূর্ব কামরূপ অঞ্চলে সোনারায় এবং রূপারায় নামক দুই জন ধর্ম সংস্কারক আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রকৃতি বিরল, নানারকম অলৌকিক ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে আছে এতদঞ্চলের মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি। "সোনারায়, রূপারায় এবং গোরক্ষনাথের দেশ প্রচলিত গানগুলিতে মুসলিম প্রসঙ্গ থাকায় ঐ গানগুলি এদেশে মুসলিম আগমনের পরবর্তীতে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। সোনারায়ের সঙ্গে মুসলিম সৈন্যের যুদ্ধ হওয়ার বৃত্তান্ত আমরা সোনারায়ের গানে শুনতে পাই।"[৫]

গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ব্যাঘ্রদেবতা সোনারায়ের গড় বা পাট এখনও দেখা যায়। সোনারায় ধর্মরূপী বুদ্ধের উপাসক ছিলেন এবং রূপারায়ের গান এখনও আসামের

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে শোনা যায়। "সমগ্র উত্তরবঙ্গ, আসামের গোয়ালপাড়া, পূর্ববঙ্গের রংপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, পাবনা, বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় সোনারায়ের পূজার প্রচলন আছে।"[৬]

রাখাল বালক বা গো-পালক বালকগণই এই পূজায় বেশী আকৃষ্ট হয়। জেলার রাজবংশী যুবকগণ প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির দিন সোনারায়ের পূজা করেন। পূজারী বা ভক্তগণ নিষ্ঠার সঙ্গে এই দেবতার পূজা করলেও এই ভক্তগণের বড় আনুষ্ঠানিক পর্ব হল পৌষ মাসের ১লা তারিখ থেকে সংক্রান্তির আগের দিন পর্যন্ত সোনারায়ের দক্ষিণা ও মাগন তোলার পালা। গ্রামের ছেলেরা খোল করতাল সহযোগে ছড়া ও গানের মাধ্যমে মাগন তোলে। তাদের হাতে থাকে মাগন সংগ্রহের ঝোলা এবং পাটকাঠি বা খাগের মাথায় তুলির মত লাল, নীল, সবুজ তিন রঙের পাটের গুছি; যেগুলি হল তিন দেবতা— সোনারায়, রূপারায় ও কালারায়ের প্রতীক। কাঠির গলায় গাদা ফুলের মালা ঝুলিয়ে যুবকগণ সোনারায়ের ছড়া বা গান বিশেষ ধরনের সুরে গেয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান। এ সময় তদের সঙ্গে থাকা দুধ মিশ্রিত জল ও ফুলের বিনিময়ে ভক্তরা দক্ষিণা হিসেবে সংগ্রহ করেন ধান, চাল, পয়সা। সারা পৌষ মাসের সংগৃহীত দক্ষিণা দিয়ে পৌষ সংক্রান্তির দিন নদীর ধারে বা ফাঁকা মাঠে সোনারায়, রূপারায় ও কালারায়ের উক্ত প্রতীক মাটিতে গেড়ে দেওয়া হয়। এঁরাই সোনারায়ের প্রতীক হিসেবে পূজা নেন। এটাই জেলার ভ্রাম্যমান সোনারায়ের মূর্তি। উক্ত দিনে গ্রামের বালক কিশোরগণ সংগৃহীত অর্থ, চাল ও সবজী দিয়ে 'রাখালভোজ' 'জোলামুনি' নামে বন-ভোজনের ব্যবস্থা করেন। হালের গরু, মোষ, ছাগল, পাঁঠা, হাঁস, মুরগীকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাঘের দেবতাকেই সন্তুষ্ট করা শ্রেয় মনে করেন জেলার গ্রাম্য বালকগণ। এই পূজার মাগন তোলার সময় ভক্ত বালকগণ গৃহস্থ বাড়ীতে যে ছড়াগুলি নির্দিষ্ট সুরে গেয়ে শোনায় তা হল—

"দাদা বলরামরে হাসিয়া কতা কয়,
দুঃশাসনী বাঘ নিয়া নামিল সোনারায়।"[৭]

শিকারপুর গ্রামের শশীমোহন বর্মন এমন একটি ছড়া গেয়ে শোনান এক সাক্ষাৎকারে—

"সোনারায়ের দক্ষিণা লাগে পূর্ণ কুলা ধান
তাহার উপুরা নাগে জোড় গুয়া পান।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই মাগন চাওয়াকে কেউ যাতে ভিক্ষার সঙ্গে তুলনা না করেন সেজন্যও ছড়া বানিয়ে নেন ভক্তরা—

"ধানের কাঙালী না হই, গুয়া তো না চাই
দেশের ব্যবহার কতা কয়্যা দিয়া যাই।"

দক্ষিণা প্রদানের পর সোনারায়ের মাগন প্রার্থীরা গৃহস্থদের জন্য দুগ্ধ মিশ্রিত জল ও আশীর্বাদ দান করেন। এ সময়ের গানটি হল নিম্নরূপ—

"সত্য ঠাকুর সোনারায় গারস্তক দে তুই বর
ধনে বংশে বাড়ুক গিরি চন্দ্র দিবাংকর
গহ্লে বাড়ুক গাইগরু জাঙ্গালে বাড়ুক নাউ
গিরির গিরি ঘরের শত্রু দুসমন বনের বাঘে খাউক।"[৮]

এর মাধ্যমেই সোনারায়ের পূজার মূল তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যায়। আবার সোনারায়ের মাগন প্রদানে কেউ অনীহা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে ভক্তগণ ভয়-মিশ্রিত ছড়া গান করে শোনান। যেমন—

"সোনারায়ের দক্ষিণা দিতে যায় করিবে হেলা
তার ভাতারক নাগাল পামু গরুচরের বেলা
সোনারায়ের দক্ষিণা দিতে যায় করিবে হেলা
হাত পাও খসিয়া পড়ে চক্ষুর বিরায় ঢেলা।"[৯]

দিনহাটা মহকুমার বড়শাকদল গ্রামে পৌষ সংক্রান্তি ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়েও সোনারায়ের পূজা হয়। তুফানগঞ্জ মহকুমার হরিরহাট, নাটাবাড়ী, অন্দরাণ ফুলবাড়ি ও মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিকারপুর গ্রামে সোনারায়ের পাঁচ ভাই যেমন— সোনারায়, রূপারায়, মানিকরায়, হীরারায়, বুড়ারায়ের প্রতীক কল্পনায় পূজা হয়। এক্ষেত্রেও দেখা যায় খাগের মাথায় পাঁচরঙের লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, সাদা পাটের গোছা বেঁধে বাড়ী বাড়ী গান করে ভক্তগণ মাগন সংগ্রহ করেন।

কোচবিহারের লৌকিক দেবকূলে শিবেরই সমগোত্রীয় এই লৌকিক দেবতার পূজা রাজবংশী হিন্দু সম্প্রদায় করলেও গরু যেহেতু হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই গৃহপালিত প্রাণী-সম্পদ, তাই বাঘের আক্রমণ থেকে গোধনকে রক্ষা কল্পে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই সোনারায়ের স্মরণাপন্ন হন।

মহাকাল ঃ

উত্তরবঙ্গের সর্বজনমান্য ব্যাঘ্রদেবতা হল মহাকাল। কোচবিহারে ব্যাঘ্রদেবতা হিসেবে সোনারায় ও মহাকাল ছাড়াও অপর এক ব্যাঘ্রদেবতার আরাধনা করেন স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়। তিনি হলেন ডাংধরা দেবতা। এই দেবতা প্রকৃতই গোরক্ষক দেবতা হিসেবে পূজিত ও সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে যেমন দক্ষিণারায়, তেমনি উত্তরবঙ্গের সোনারায়। কোচবিহারে শিবের অন্যতম অনুষঙ্গী সোনারায়ের মত মহাকালও জেলার অন্যতম জনজাতি রাভা সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত হন এখানে। ঐতিহ্যবাহী এই লোকদেবতার মূর্তি কল্পনায় দেখা যায় ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে

আসীন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় জটাভার, কোমরে গঞ্জিকা সেবনের কল্কি, পরনে ব্যাঘ্রচর্ম, সর্প ভূষণ, এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে বরাভয়। সম্পূর্ণই বীরের প্রতিরূপ।

ক্ষেত্রানুসন্ধানে আমরা জেলার প্রায় সকল গ্রামেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঘ সম্পর্কিত লোকায়ত বিশ্বাস ও প্রচলিত সংস্কার প্রত্যক্ষ করি। যেমন জেলার আদিবাসী ও কৃষিজীবী রাভা সম্প্রদায়ের অন্যতম উপাস্য ব্যাঘ্রদেবতা মহাকাল। জেলার দেওয়ানহাট ভেটাগুড়ির মধ্যবর্তী স্থানে পাকা রাস্তার বামপাশে মহাকাল দীর্ঘ দিন ধরে পূজিত। দিনহাটা মহকুমার বড় শাকদল গ্রামে বছরের যে কোন সময় পূজিত হন ব্যাঘ্রবাহন সোনারায়। এই সোনারায় এবং মহাকাল ছাড়াও এই জেলায় আরও একাধিক দেবতা বাঘের দেবতা হিসেবে পূজিত হন। শিব সদৃশ সোনারায়ের মৃন্ময় মূর্তিতে পূজা জেলার বিভিন্ন গ্রামে পৌষ সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। সোনারায়ের প্রতীকধর্মী পূজার প্রচলন জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। জেলার গ্রামাঞ্চলে ব্যাঘ্রদেবতার পূজার উদ্দেশ্যগুলি হল— গৃহপালিত পশু অর্থাৎ গরু, ছাগল ইত্যাদি ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করা, গ্রামের সার্বিক মঙ্গল কামনা, কৃষিভিত্তিক সভ্যতার আদিম নিদর্শন হিসেবে শস্যের উৎপাদন ও ফলন বৃদ্ধি, গৃহপালিত পশুর রোগ মুক্তি ইত্যাদি।

সন্ন্যাসী ঠাকুর ঃ

কোচবিহারের লোকজীবন ও লোকায়ত সংস্কৃতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ দেবতা শিবের অপর এক লৌকিক রূপ দেখা যায়— তিনি হলেন সন্ন্যাসী ঠাকুর বা সন্ন্যাসী শিব। জেলার লৌকিক বিশ্বাসে এই সন্ন্যাসী ঠাকুর শিবের সমগোত্রীয় বলে পূজিত। উত্তরবঙ্গের অনেক জেলাতেই সন্ন্যাসী ঠাকুর পূজার প্রচলন কম। কোচবিহার জেলার দিনহাটা ও মেখলিগঞ্জ মহকুমার একাধিক গ্রামে সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রভাব দেখা যায় বেশী। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ধর্মের উদ্ভবের পূর্বেই এই দেবতা কোচবিহারের প্রায় সমস্ত গ্রামের সর্বত্রই একাধিক নামে পূজিত ও বন্দিত ছিলেন। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ী গ্রামের বুড়া ঠাকুর, দিনহাটার শিমূলবাড়ী গ্রামে সন্ন্যাসী ঠাকুর, মেখলিগঞ্জ মহকুমার জামালদহ গ্রামের সন্ন্যাসী ঠাকুর বা সন্ন্যাসী মাসান, মাথাভাঙ্গার শিকারপুর গ্রামের সন্ন্যাসী মাসান বা গেরাম ঠাকুর সবই শিবের রূপান্তরে সন্ন্যাসী ঠাকুর হিসেবে পূজিত হন। আবার কোথাও মূর্তিহীন প্রস্তরখন্ড, বট-পাকুর, বিল্ব বৃক্ষ সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাশাপাশি শিব জ্ঞানে পূজিত হন। জলপাইগুড়ি জেলাশহর থেকে ১৫/১৬ মাইল দূরবর্তী সন্ন্যাসীকাটা হাট নামক স্থানেও বৌদ্ধ প্যাগোডার আদলে তৈরী এক পাকা মন্দিরে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বাঘের ছাল পরিহিত জটাধারী এক সন্ন্যাসী ঠাকুরের মূর্তি আজও বিদ্যমান। প্রতি বুধ ও শনিবার ব্যাঘ্রবাহন এই সন্ন্যাসী ঠাকুর আজও জাগ্রত দেবতা জ্ঞানে পূজা পান। কোচবিহার জেলার উক্ত গ্রামগুলিতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের বাৎসরিক

পূজা অনুষ্ঠিত হয় ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই সন্ন্যাসী ঠাকুরের বাহন বাঘ এবং সন্ন্যাসী ঠাকুরের হাতে থাকে কল্কি। এঁর পূজারীরা হলেন রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের অধিকারী বা দেউসীগণ।

ত্রিনাথ / তেন্নাথ ঃ

আসাম ও অবিভক্ত বাংলার সর্বজনপ্রিয়, সর্বজনমান্য লোকদেবতা ত্রিনাথ স্থানভেদে তেন্নাথ নামেও পূজিত হন। ত্রিনাথের লৌকিক কাহিনী সূত্রে এই লোকদেবতা কোচবিহারের লোকায়ত জীবনের গভীর বিশ্বাসে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের প্রতিভূ। "লোকদেবতা ত্রিনাথ প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ-ত্রিরত্ন — বুদ্ধ-সংঘ-ধর্ম এই তিন রত্নের রূপের আড়ালে আদিনাথ শিব, মীননাথ ও গোরক্ষনাথ — এই ত্রিনাথের এক রূপ ত্রিনাথ কল্পনা করেন।"[১০]

জেলায় প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুযায়ী গরু সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে ত্রিনাথের মেলা বা কীর্তন যেমন দেওয়া হয় তেমনি এই লোকদেবতার নামে পূজা দেন সবাই। বর্তমানে এই প্রাপ্তির সীমা ছাড়িয়ে গরুর অসুখ, গো-বৎসের মঙ্গল কামনা, গো-দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি, মেয়ের বিয়ে, নিঃসন্তানের সন্তান কামনা, চাকুরি প্রাপ্তি, পরীক্ষায় পাশ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। জেলার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই লোকদেবতার প্রভাব থাকলেও নাথ ও যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যেই পূজা প্রদান, ভক্তি বিশ্বাসের আধিক্য দেখা যায়। কোচবিহার জেলা সদরের অন্তর্গত পুন্ডিবাড়ী ব্লকের কচুবন গ্রামের নাথ-যোগী সম্প্রদায়ের ত্রিনাথ ঠাকুরের পূজায় ভক্তবৃন্দের গাঁজা সেবন অবশ্যই করণীয় ধর্মাচার। এটি ত্রিনাথ পূজার অন্যতম অঙ্গ। এই পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— ত্রিনাথের ভক্তগণ নিম্নলিখিত ছড়াটি আবৃত্তি করে ত্রিনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত গাঁজা সেবন করে থাকেন—

"স্বর্গে ছিল ত্রিলক্যনাথ
মর্তে অধিকার
ভক্তে পাইয়ে তারে
করিল প্রচার।
ত্রিনাথের নাম যেবা এক চিত্তে লয়
সর্বশক্তি হয় তার রণে বনে জয়।"[১১]

মাথাভাঙ্গা মহকুমার জামালদহগামী রাস্তার মধ্যবর্তী অংশে চেঙ্গারখাতা খাগরীবাড়ী গ্রামের সুটুঙ্গা নদীর ব্রিজের বাঁদিকে দক্ষিণমুখী টিনের চালাঘরের মন্দিরে ষড়ভুজা, ত্রিমস্তক, দ্বিপদ সমন্বিত বৃষবাহন শিবই ত্রিনাথ রূপে পূজিত হন। ষড়ভুজ শিবের দুটি হাত ও একটি মাথা পার্বতীর অনুকরণে শরীরের অর্ধাঙ্গের রঙ হলুদ। উক্ত গ্রামের উক্ত স্থানে প্রতি বছর ত্রয়োদশীর বারুণীর স্নানের সময় বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজা উপলক্ষে উক্ত তিথিতে দর্শনার্থী

স্থানকে কেন্দ্র করে একটি মেলাও অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান পূজারী পবিত্র চক্রবর্তীর মতে পূজার মূল উপকরণ গরুর বাচ্চা প্রসবের ১৫ দিনের মাথায় দোয়ান দুধের ক্ষীরের নাড়ু, পানসুপারী, নতুন একগাছা পাটের দড়ি, ঘট ও ফলমূল। অবিভক্ত বাংলায় তথা বর্তমান বাংলাদেশে ত্রিনাথের মেলার উদ্দেশ্যে গাওয়া একটি গান এতদঞ্চলেও সমধিক প্রচলিত। যেমন—

"কলিতে তিন নাথের মেলা
খোঁড়ায় নাচে, কানায় দেখে,
বোবায় বলে বোম ভোলা।"[১২]

বুড়া ঠাকুর ঃ

সমগ্র কোচবিহার জেলায় বিশেষ করে দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ী (থানা), তুফানগঞ্জ মহকুমার একাধিক গ্রামে স্থানীয় রাজবংশী, রাভা ও অন্যান্য কৃষিজীবী উপজাতি ও আদিবাসী সমাজে যে গণদেবতা সর্বত্র বন্দিত ও পূজিত তিনি অবশ্যই বুড়া ঠাকুর। কোচবিহারে শিবেরই এই লৌকিক রূপ বা অনুসঙ্গী বুড়া ঠাকুর অঞ্চলভেদে মহাদেব, মহাকাল, শিব, সন্ন্যাসী ঠাকুর বিভিন্ন নামে পূজিত হন। নদীর ধার বা রাস্তার ধারে বট-পাকুড় গাছতলায় এই লোকদেবতার থান বা পাট দেখা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিমূর্ত প্রস্তর খন্ড বা মাটির ঢিবি বুড়া ঠাকুরের প্রতীকে পূজিত হয়। বুড়া ঠাকুর কোন কোন অঞ্চলে বাঘের দেবতা হিসেবেও অরণ্যের অধিকারে সমৃদ্ধ। আর অরণ্য মানেই তার প্রধান অধিবাসী বাঘ। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত কোচবিহারের লোকসংস্কৃতিতে বাঘও একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিগণ বিশেষ করে স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঘ না বলে 'বুড়ার বেটা' কথাটির প্রচলন বেশী। শৈবতীর্থ কোচবিহারের স্থানীয় জনমনে জনপ্রিয়তার দিক থেকে আর কোন লৌকিক দেবতা এর কাছাকাছি নেই। অন্যান্য লৌকিক দেবতার মত এই বুড়া ঠাকুরের সন্তুষ্টি বিধানেও গ্রামবাসীগণ যথারীতি বিভিন্ন বস্তু মানত বা উৎসর্গ করেন। জলপাইগুড়ি জেলার সন্ন্যাসীকাটার হাট সংলগ্ন মন্দিরের সন্ন্যাসী ঠাকুরের বিগ্রহকেও অনেকে বুড়া ঠাকুর বলেন। বাঘছাল পরিহিত ও প্রকান্ড গুম্ফ আচ্ছাদিত এই দেবতা এখানে বাঘের দেবতা বুড়া ঠাকুর। বর্ধমান ও ২৪ পরগণা জেলায় বুড়ো রাজ ও বাবা ঠাকুর নামে এরূপ এক লোকদেবতা পূজিত হন। বাংলাদেশে ব্রাত্য হিন্দুগণ কোন এক সময় ব্রাহ্মণ্য বা শাস্ত্রীয় দেবতার পূজার অধিকারে বঞ্চিত হলেও তাদের শিবের প্রতি ভক্তি অটুট ছিল এবং পরবর্তীতে তারা লোকায়ত ধারণা ও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে শাস্ত্রীয় শিবের একটি নতুন নামকরণ করেন, ইনিই লোকসমাজে স্থানভেদে বাবা ঠাকুর, বুড়া ঠাকুর বা বৃদ্ধ, নিরীহ, শান্ত শিব রূপেই পূজিত হয়ে আসছেন বাংলার সর্বত্র। তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ি গ্রামেও বুড়া ঠাকুর পূজিত হন। রোগ-ভোগ ও গবাদি পশুর মঙ্গল কামনা ব্যতীত বন্যায় নদীর ভাঙন রোধে বুড়া ঠাকুরের পূজা দেন অনেকে।

"কোচবিহার এবং রঙপুর অঞ্চলের হিন্দু সমাজে ময়নাবুড়ি অথবা বুড়ি পূজা হয়ে থাকে। শিশু সন্তানের উপর 'বুড়ির ঝোঁক' (বুড়ির কু-দৃষ্টি)-এর কথা সর্বত্র শোনা যায়।"[১২] জেলার অনেক গ্রামেই বুড়ির থান বা পাট আছে। তুফানগঞ্জ মহকুমার বক্সির- হাট ব্লকের ঠেটারপাট গ্রামে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় শনিবার বুড়ির পাটে বুড়িমার পাশাপাশি একাধিক লোকদেবতার পূজা হয়। এতদঞ্চলে প্রচলিত ময়না বুড়ির পূজার মন্ত্রে দেখা যায়— 'থান মধ্যে বন্দো মা গৌড় ষোল আনা।'

মাথাভাঙ্গা মহকুমার পূবদিকে বুড়ার পাট নামে একটি স্থানে মূর্তিহীন বুড়া ঠাকুর পূজিত হন। গ্রামবাসীগণ প্রতিদিন ধূপ-দীপ দিয়ে ভক্তি নিবেদন করে। "তুফানগঞ্জ মহকুমার রসিকবিল, বড় শালবাড়ী, ভাড়েয়া, হরিরহাট, বাঁশরাজা, ছাট্‌রামপুর, বোচামারী গ্রামের বনবাসী ও কৃষিজীবী রাভাগণ গৃহপালিত পশু ও পারিবারিক মঙ্গল কামনায় বুড়া ঠাকুরের পূজা করেন।"[১১] অনেক গ্রামে বুড়া ঠাকুরের পাটে মূর্তি মানত অনুযায়ী একটি বাঁশের টুকরো বা ঠগা প্রোথিত করেন বাড়ির তুলসী মঞ্চের পাশে। অনেকে উক্ত ঠগার দুপাশে একটি করে সাদা পাটের চামর ও লাঙ্গল রাখেন। শিব মূলত কৃষিদেবতা, তাই তাঁর অনুসঙ্গী বুড়া ঠাকুরের পাটের পাশে লাঙ্গল বা পাটের চামর রাখাকে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার নিদর্শন বলা যায়।

গেরাম ঠাকুর ঃ

কোচবিহারে বিশেষ করে গ্রামের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলকারী দেবতা হলেন গেরাম ঠাকুর। স্থান ভেদে গারাম ঠাকুর নামেও পরিচিত। এই লোকদেবতার নামের মধ্যেই গ্রামের সম্পর্কের কথা নিহিত আছে।

একই গ্রামে এক বা একাধিক গেরাম ঠাকুর থাকতে পারে। কোচবিহারে গ্রামাঞ্চলে পূজিত সকল লোকদেবতাই এক অর্থে গেরাম ঠাকুর। এতদঞ্চলে পূজিত কোথাও শিব বা শিবের অনুসঙ্গী যার বাহন বৃষ, বাঘ নয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় এই লোকদেবতার বাহন হাতি। আবার এখানে হাতিবাহন সন্ন্যাসী ঠাকুরও দৃষ্ট হয়। পার্থক্য হল গেরাম ঠাকুরের বাহন হাতির সঙ্গে মাহুত থাকেন কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুরের কোন মাহুত থাকেন না। অনেকক্ষেত্রে গ্রামের কোন নির্জন স্থানে, কোন বৃক্ষতলে, কোন প্রস্তরখন্ডও অনেক গ্রামে গেরাম ঠাকুর নামে পূজিত হন। সে সকল স্থানে নির্দিষ্ট দিন ছাড়াও বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক গ্রামে বিভিন্ন পাড়ায় একাধিক নামে গেরাম ঠাকুরের পূজা হয়। জেলার প্রায় সকল মহকুমায় সব বসতবাড়ীর বাইরে উত্তর-পূর্ব কোণে কিংবা কোন বট-পাকুড় বা শেওড়া গাছের নীচে খড়ের চালাঘর বা ছোট ছোট টিনের সারিবদ্ধ দোচালা ঘর দেখা যায়। এগুলি গেরাম ঠাকুরের পাট বা থান। গ্রামের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রামের সার্বিক মঙ্গলকামনায় এই পূজায় অংশ গ্রহণ করেন। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এরূপ পূজায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আদিম মানব সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ

জীবনের প্রভাব লক্ষ্য করি। জেলায় পূজিত এই গেরাম ঠাকুর অনেক ক্ষেত্রেই মূর্তিহীন। তাই গ্রামের ঐ সকল উন্মুক্ত স্থানে লোকদেবতার থান বা চালাঘরের কোথাও মাটির ঢিবি বা প্রস্তর খন্ড গ্রাম দেবতার প্রতীক হিসেবে পূজিত হন। গারাম বা গেরাম ঠাকুর— এই লোকদেবতাকে যে নামেই ডাকি না কেন বা সারা বছর প্রকৃতির কোলে অরক্ষিত অবস্থায় ঝোপঝাড় জঙ্গলে ছেয়ে থাকলেও বাৎসরিক পূজার সময় নতুন রূপ ধারণ করেন এই দেবতা। কোচবিহারে গ্রাম দেবতা গেরাম বা গারাম ঠাকুর, গ্রামবাবা, গ্রাম ঠাকুর, গ্রাম দেবতা, গ্রাম রক্ষী প্রভৃতি নামেও পূজিত হন। মেখলিগঞ্জ মহকুমার মৃগীপুর গ্রামে গ্রাম ঠাকুরকে পূজা দিয়েই কৃষি কর্মের সূচনা করা হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পূজার সময় থাকে বৈশাখ মাস। কৃষিকর্ম ছাড়াও গৃহস্থবাড়ীর অনেক শুভকাজ ও বিবাহের মত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পূর্বে অনেকে গেরাম ঠাকুরের নামে পূজা দেন। মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলায় কালুরায় ও দক্ষিণরায় গ্রাম সমাজের লৌকিক দেবতা, তাঁরা এতদঞ্চলের গেরাম ঠাকুরের মতই পূজিত হন। ক্ষেত্র পালন বা কৃষি দেবতা হিসেবে কোচবিহারের গেরাম ঠাকুর ও সন্ন্যাসী ঠাকুরের মতই ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার একাধিক গ্রামে কৃষিকাজ শুরু করার সময় কৃষকগণ দক্ষিণরায় ও কালুরায়কে পূজা দেন। লোকদেবতা কালুরায় কোন কোন জেলায় ধর্মঠাকুর রূপেও পূজিত হন। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ী ব্লকে এই গেরাম ঠাকুরের পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশী।

এক ক্ষেত্র-সমীক্ষায় মেখলিগঞ্জ মহকুমার মৃগীপুর গ্রামে আমরা দেখতে পাই মেখলিগঞ্জ ধাপরাহাটগামী রাস্তার বাম পার্শ্বে দক্ষিণমুখী চারচালা পাকা মন্দিরে গেরাম ঠাকুর পূজিত হন। গেরাম ঠাকুর এখানে কালোরঙের হস্তি পৃষ্ঠে আসীন এক জটাধারী শিব। ঠাকুরের ডান হাতে বরাভয় ও বাম হাতে পেন্টি, সঙ্গী মাহুত। দুধ, কলা ও ফল-মূলের নৈবেদ্য সাজিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে গ্রামবাসীগণ প্রতি বছর বৈশাখ মাসে কৃষিকর্মের সূচনায় বাৎসরিক পূজা দিলেও সারা বছর মানতকারীগণ পূজা দেন। অনেকে বলি না দিয়ে পাঁঠা ও পায়রা উৎসর্গ করেন। পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় অধিকারী ব্রাহ্মণ। উক্ত মহকুমার ডাকুবহাট গ্রামে একই রাস্তার বাম পার্শ্বে খড়ের ঘরে পাশাপাশি পূজিত হন হস্তী পৃষ্ঠে আসীন, বাম হাতে কল্কি, মাহুত সহ শিব। এই গ্রামে গেরাম ঠাকুর শিব ও মাসান জ্ঞানে পূজিত হন। গেরাম ঠাকুরের স্থান নির্বাচন হয় সাধারণত গৃহস্থবাড়ী থেকে দূরে বাঁশবাগানের ছায়া ঘেরা কোন স্থানে, কখনও রাস্তার ধারে জঙ্গলাকীর্ণ কোন নির্জন স্থানে, আবার কোন উন্মুক্ত প্রান্তরের উত্তর-পূর্ব কোণে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ছোট ছোট দো-চালা ঘরের এই দেবতার থান বা পাট বাৎসরিক পূজার সময় পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। গেরাম ঠাকুরের পূজার সময় সাধারণত সকাল। মাটির মূর্তির বদলে কোন কোন গ্রামে আবার কলা গাছের খোল দিয়ে গেরাম ঠাকুরের মূর্তি তৈরী হয়। উন্মুক্ত স্থানে বিমূর্ত গেরাম ঠাকুরের থান মাটির বেদী হয় সাধারণত দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথা ক্রমে ৯ ফুট ও ৬ ফুট। তবে গেরাম ঠাকুরের পূজারী প্রায় সব ক্ষেত্রেই গ্রামের অধিকারী ব্রাহ্মণ।

কোচবিহারের অনেক গ্রামে দেখা যায় পারিবারিক মঙ্গল কামনায় অনেক সময় বাড়ির মেয়েরা দল বেধে গান করে গেরাম ঠাকুরের থানে পূজা দিতে যান। এমন একটি প্রচলিত গান হল—

"গারাম ঠাকুরের ঘরোত কিসের বাজনা বাজে
বাপে ভাই রাজী গারাম ঠাকুরের পূজে।"[১৫]

জ্বরাসুর ঃ

প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ ও সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থেও এই অনার্য জ্বরাসুর দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। আজও কোচবিহারের পল্লী অঞ্চলে অসুর বা দৈত্যদানব প্রভৃতি আর্যেতর জ্বর নিরাময়ের দেবতা। জ্বরাসুরের নাম থেকেই বোঝা যায় তিনি অসুরকুলের দেবতা। তবে মনে হয় এই দেবতার উৎপত্তিস্থল বর্তমান বাংলাদেশ। জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার থেটারপাট গ্রাম ব্যতীত অন্য অনেক গ্রামে শিব বা বুড়া ঠাকুরের অনুসঙ্গী এই লোকদেবতার পূজার প্রচলন খুব বেশী নেই।

তুফানগঞ্জ মহকুমার বক্সিরহাট ব্লকের থেটারপাট গ্রামে জ্বরাসুর বা জ্বর নিরাময়কারী এই দেবতা পূজিত হন পঞ্চাশ বছর ধরে। বর্তমান বাংলাদেশের ঝালো, মালো, কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি ঁসয়ম্বর কবিরাজ দেশান্তরের সঙ্গে সঙ্গে এই দেবতাকেও স্থানান্তর করেন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে। আজও উক্ত অঞ্চলে সমান বিশ্বাসে এই লোকদেবতা পূজিত হন প্রতি বছর বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শনিবার। এই লোকদেবতার পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি না দিয়ে উৎসর্গ করা হয়। জেলার এটি অন্যতম স্থানান্তরিত (মাইগ্রেটেড) লোকদেবতা। বর্তমানে যে স্থানে পূজিত হন সেই স্থানের নাম বুড়ির পাট। "এই পাটে জ্বরাসুরের সঙ্গে আর তিনজন লোকদেবতা একই দিনে পূজিত হন। যেমন— বুড়িমা. নিস্কিন্দা মাসান ও কালী। তান্ত্রিক মতে বর্তমানে পূজা করেন প্রবর্তক ঁসয়ম্বর কবিরাজের পুত্র দীনেশ দাস। ফুল, ফল, নৈবেদ্য ও ভোগ পূজার মূল উপকরণ।"[১৬]

বৌদ্ধ সমাজেও এরূপ আরোগ্যদেবতা হিসেবে পূজিত বহু দেবতার নাম শোনা যায়। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' নামক গ্রন্থে বলেছেন, জ্বরাসুরের সঙ্গে 'মহাজনিদের' এক সময় সম্পর্ক ছিল। এই দেবতার রূপ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁরা নিজ সমাজের ঐ দেবতাকুলের আকৃতি গঠন করেন এবং আরোগ্য-দেবতার বৈশিষ্ট্য দান করেন।

গোরক্ষনাথ ঃ

কোচবিহারে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে পূজিত অন্যতম লোকদেবতা গোরক্ষনাথ। এর জন্ম, সময়, স্থান এবং জাতি নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। "গ্রিয়ারসন সাহেবের মতে গোরক্ষনাথ ছিলেন নেপালী বৌদ্ধ যোগী। উত্তরবঙ্গের প্রচলিত একাধিক লোকগীতিতে

গোরক্ষনাথের জন্মস্থান জল্পেশ এবং মেচপাড়ার (গোয়ালপাড়া জেলায়) নিকটবর্তী বলে কথিত আছে। আবার প্রাচীন নেপালী মুদ্রায়ও শ্রী শ্রী গোরক্ষনাথের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।"[১৭] কোচবিহারে এই দেবতার পূজার আঙ্গিকে দেখা যায় মূল পূজার এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে গ্রামের বয়স্ক ও যুবকেরা দল বেধে গোরক্ষনাথের গান গেয়ে বাড়ী বাড়ী চাল, টাকা, সব্জী ইত্যাদি মাগন সংগ্রহ করেন। গান গাওয়ার সময় দলের প্রত্যেকেই একটি বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে থাকেন। কোন গৃহস্থবাড়ীতে প্রবেশের পর বাড়ীর উঠোনের মাটিতে ধান ভানার মত করে লাঠি ঠেকিয়ে সবাই এক সঙ্গে গান গাইতে শুরু করেন। প্রথমে দলের প্রধান বা মূল গায়ক গানের একটি চরণ গাইতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে দোহারের ন্যায় অপর সকলে পরের চরণটি গায়। এই ভাবে সম্পূর্ণ গানটি গাওয়া হয়। মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিকারপুর গ্রামের শশিমোহন বর্মা এইরূপ একটি গান গেয়ে শোনান। তা হল—

মূল গায়ক	দোহার
"এই গাই কি কাপিলি বেটি	হয় রে হয়।
দুধ হয় কি আটারো ঘটি	হয় রে হয়।
সেই দুধ কি হইল	হয় রে হয়।
সেই দুধ বিলাই খাইল	হয় রে হয়।
সেই নদী কি হইল	হয় রে হয়।
সেই নদীৎ নেপেরা জ্বালাইল	হয় রে হয়।"

বাংলাদেশে গরুর অধিক দুধ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এরূপ গানের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"এই গাইয়ের দুই বাছুর —— হেচ্ছ।
চিতক পাইল্যা দাদুর বাছুর —— হেচ্ছ।
গাইয়ের নাম চ্যাপ্পামুড়ি — হেচ্ছ।
দুধ অয় আটারো কুড়ি — হেচ্ছ।"[১৮]

কোচবিহারে গোরক্ষনাথকে আবার ত্রিনাথ কল্পনা করা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর— এই তিনে মিলে ত্রিনাথ। উত্তরবঙ্গের নাথ-যোগী সম্প্রদায় ত্রিনাথকে শিব বলে মান্য করেন। আবার অনেকে মনে করেন গোরক্ষনাথ শিবের পুত্র। কোচবিহারের লোকায়ত বিশ্বাস অনুযায়ী হারানো গরু ফিরে পাওয়ার আশায় এবং গরু সংক্রান্ত যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে গোরক্ষনাথের পূজা অনুষ্ঠিত হলে তাকে তিন নাথের মেলাও বলেন। সে সময় কীর্তনের মাধ্যমে এই দেবতার পূজা দেন। এই ক্ষেত্রে শুধু হারানো গরু প্রাপ্তিই নয়, মেয়ের বিয়ে, সন্তান কামনা, পরীক্ষায় পাশ, চাকুরী প্রভৃতি আশা আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত হয়। গরুর বাচ্চা প্রসবের একুশদিন পর এই পূজা দিতে

হয়। এ সময় গরুর অশৌচ থাকে। এই সময় গরুর দুধ ক্ষীর করে এক ধরনের নাড়ু বানানো হয়। অনেকে একটু ভাং মিশিয়ে দেন। একে বলা হয় গুক্ষের নাড়ু। সঙ্গে থাকে পান, সুপারি ও বাছুরের জন্য একগাছা নতুন দড়ি। আর থাকে ঘট, আসন ও অন্যান্য পূজার উপকরণ। এই পূজায় কোন শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করেন না। যে কোন ব্যক্তি এই পূজা পরিচালনা করতে পারেন। "গোরক্ষনাথ প্রীতে হরি হরি বোল" এই ধ্বনি দিয়ে পূজার শুরু এবং পাঁচালী পাঠের শেষে একই ধ্বনি দিয়ে পূজার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

গোরক্ষনাথের পূজা প্রকরণে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অপর একটি রীতি প্রচলিত আছে। এই রীতি প্রকরণে দেখা যায় গরুর অসুখ-বিসুখ হলে কিংবা গরু হারালে গৃহস্থগণ গোয়াল ঘরের ভিতরে কলা, খই, কিছু ফলমূল দিয়ে গোরক্ষনাথের পূজা করেন। পাড়ার বৃদ্ধ ও যুবকগণ সমবেত হয়ে গোরক্ষনাথের পূজা করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি ছড়া তারা কীর্তনের মত করে গান করেন। তুফানগঞ্জ মহকুমার বালাঘাট গ্রামে প্রচলিত এরূপ একটি ছড়া হল—

"কান্দেরে গোয়াল নন্দী হাতে নিয়ে ঘটি
গাভীর বদলে ক্যানে না মরে মোর বেটি
কান্দেরে গোয়াল নন্দী হাতে নিয়ে দাও
গাভীর বদলে ক্যানে না মরে মোর মাও।"[১২]

ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের মতে গোরক্ষনাথের পূজা শিব পূজারই নামান্তর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন গো রক্ষক হিসেবে গোরক্ষনাথের প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি নাথ সম্প্রদায়ের আদি গুরু গোরক্ষনাথ নন। কোচবিহারের লোকবিশ্বাস গরুর দেবতা গোরক্ষনাথ পূজা পেলেই সন্তুষ্ট হন এবং গৃহস্থের গো সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

বুড়া ঢ্যাল্লা ঠাকুর ঃ

লোকদেবতার বৈচিত্র্যে কোচবিহারের লোকজীবন যে প্রাণবন্ত তার প্রমাণ আমরা পাই জেলার হলদিবাড়ী ব্লকেব কাশিয়াবাড়ী গ্রামে। এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য ব্যাধিহরণকারী দেবতা হলেন বুড়া ঢ্যাল্লা ঠাকুর। কৃষিপ্রধান কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের উপাস্য অন্যতম একটি লৌকিক দেবতা এই ঠাকুর। আদিম মানুষের বিমূর্ত লোকদেবতার পূজার যে রূপের কথা আমরা জানি হলদিবাড়ী ব্লকের এই গ্রামের ঢ্যাল্লা ঠাকুর তার নিদর্শন। উন্মুক্ত মাঠ কিংবা কৃষিক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিম কোণে আট-নয় ফুট লম্বা প্রোথিত একটি বংশদন্ডের মাথায় পাটের গুছি ছনের ঝাড়ু ও একটি ভাঙা ডেলি ঝুলিয়ে তিনটি সিঁদুরের কৌটা দিয়ে এই ঢ্যাল্লা ঠাকুরের মূর্তি তৈরী করা হয়। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার আজন্ম বিশ্বাস গরুর বাচ্চা হলে প্রথম দোহানো দুধ দ্বারা ঘটে পাতা দই, চিঁড়া, আঁটিয়া কলা ও আতপ চালের নৈবেদ্য দিয়ে পূজা দান কর্তব্য। এই পূজায় নেই যেমন কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র, তেমনি নেই নির্দিষ্ট পুরোহিত। মানতকারী নিজেই উক্ত নৈবেদ্য

দিয়ে প্রণাম করে পূজা সারেন। ১৫/৬/৯৯ ইং তারিখে এক ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখা যায় লোকদেবতার এই থানের পাশাপাশি পূজিত হন গেরাম ঠাকুর, কালী হরিবলা, তিস্তাবুড়ি ঠাকুর। সর্দিকাশি নিরাময়কারী এই লোকদেবতার পূজার কোন দিনক্ষণ নেই। কাশিয়াবাড়ি গ্রামের কৃষক বাহাত্তর বছরের প্রবীণ খগেন রায়ের মতে জাগ্রত এই ঢ্যাম্না ঠাকুর গ্রামের জাগ্রত প্রহরী। গ্রামবাসীর বিপদে-আপদে, রোগে-ব্যাধিতে মানত করলেই তিনি সাড়া দেন।

মাসান ঃ

কোচবিহারের ভয়ঙ্কর লোকদেবতা মাসান সম্পর্কিত এতদঞ্চলের লোকবিশ্বাস হল ধর্মঠাকুরের কন্যা কালী। এই কালীর ১৮ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান হল মাসান। আবার কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের অপর লোকবিশ্বাস হল মাসান হচ্ছে ছয় কুড়ি যাট রকমের এবং মাসানের জন্ম হয় ভাদ্র মাসের শনিবার।

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী ও কদমতলা অঞ্চলে মাসানের জন্ম সম্পর্কে লোকবিশ্বাস হল— তেঘাটায় কালীর আনন্দে নৃত্যরত অবস্থায় প্রতি ঘর্ম বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয় এক একটি মাসানের, যেমন— "নাচিতে নাচিতে কালী আইয়র / চুইয়া পড়ে ঘাম / তাতে সৃষ্টি হইল / এ জলা মাসান।"[২০]

ভয়ঙ্কররূপী লৌকিকদেবতা মাসানকে কোচবিহারের গ্রামীণ আদিবাসী ও রাজবংশী সমাজের মানুষ কালী ও ধর্মের সন্তান রূপে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে মাসান ঠাকুরের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী ও লোকবিশ্বাস হল— "একসময় মা কালী একাকী নদীতে স্নান করতে যান। হঠাৎ সেখানে ধর্মদেবতার আবির্ভাব ঘটে। এর পর উভয়ের মিলনের ফলে জন্ম হয় মাসানের। সে সময় তার নাম হয় 'পিছলা মাসান'। তাকে বলা হয় বিরাট যোদ্ধা।"[২১] এই জেলার সমস্ত গ্রামেই ওঝা, রোজা, কবিরাজ, বৈদ্য, ভোগুরিয়াগণই মাসানের উপস্থিতি, অবস্থান, মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। এই ওঝাদেরই হঠাৎ দর্শনে কোন ব্যক্তি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জ্বরে আক্রান্ত হলে মাসানকে শান্ত করতে পূজা দেন। লোকদেবতা মাসানকে এতদঞ্চলে কালীর সন্তান এবং অশ্বারোহী মহাশক্তির আধার হিসেবেও দেখা হয়। জনবসতিপূর্ণ এলাকা বাদে জেলার সমস্ত গ্রামেই এই দেবতার অধিষ্ঠান বেশীর ভাগ জায়গায় থাকে বট বা শ্যাওড়া গাছের নীচে কিংবা কোন রাস্তার তেমাথার ধারে; কোন নির্জন নদীর ধারে কোথাও বা কালীর পাটের পাশে। ডঃ চারু সান্যাল তাঁর "Rajbansis of North Bengal" গ্রন্থে ষোল (১৬) রকম মাসানের কথা বলেছেন। যেমন— "বাড়িকা মাসান, পিছলা, ঘাটের মাসান, ছুচিয়া মাসান, চলান, বহিতা, কাল, কুহুনিয়া, নাঙ্ঘা, বিশুয়া, ওবুয়া, শুকনা, ভুলা, ড্যামসা, উগুরিয়া, নারহা।"[২২] যদিও উপরোক্ত ষোল রকম মাসানের বেশীর ভাগই জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামে দেখা যায়। মাসানের রকমফের, নামের বৈচিত্র্য, মূর্তির বৈচিত্র্য ইত্যাদি

কোচবিহার জেলায় জলপাইগুড়ি জেলার চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র। আমরা ক্ষেত্র-সমীক্ষায় জেলার পাঁচটি মহকুমা ও একটি ব্লকেব একাধিক গ্রামে চব্বিশ (২৪) রকম মাসানের রূপ দেখতে পাই— (১) গদাধর মাসান, (২) কুচিয়ামারী মাসান, (৩) কানার দীঘি মাসান, (৪) শূর মাসান, (৫) সুন্দরমালা মাসান, (৬) চাপিলা মাসান, (৭) খ্যাতাওড়া মাসান, (৮) পোড়া মাসান, (৯) ভ্যাড়া মাসান, (১০) টসা মাসান, (১১) ঘুগবা মাসান, (১২) গড়কাটা মাসান, (১৩) জলুয়া মাসান, (১৪) ঘোড়া মাসান, (১৫) হাতি মাসান, (১৬) সিংহ মাসান, (১৭) পানিমাছ (কচ্ছপ) মাসান, (১৮) নিঙ্কিন্দা মাসান, (১৯) মুড়িয়া মাসান, (২০) কালী মাসান, (২১) শ্মশান মাসান, (২২) মহাদেব মাসান, (২৩) যখা মাসান, (২৪) পোয়া মাসান।

প্রথমেই বলা হয়েছে মাসান ঠাকুরের পাট বা থানের অবস্থান লোকালয়ের বাইরে হয়। কোথাও বা ছন দিয়ে দোচালা ঘর, কোথাও বট বা শ্যাওড়া গাছের নীচে ফাঁকা জায়গায় এর অবস্থান; তবে মুক্তাঙ্গণ জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পূজিত হন শোলার তৈরী অশ্বারোহী মাসান। দিনহাটা মহকুমার বর্ধিষ্ণু সব গ্রামাঞ্চলে বেশীরভাগ মাসান পাট হল টিনের চারচালা বা দোচালা বা দোচালা পাকা দেওয়াল বিশিষ্ট। জেলার বিভিন্ন মহকুমায় মাসানের পূজা পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন— তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ী, নাটাবাড়ী, হরিরহাট গ্রামে মাসান ঠাকুরের পূজায় ওঝা, বৈদ্য বা পূজারী এবং আক্রান্ত রোগী ব্যতীত পূজার সময় কেউ সামনে থাকে না। আবার দিনহাটা মহকুমার বালাসী, আলোকঝাড়ি, ত্রিমোহিনী এবং হলদিবাড়ী-মেখলিগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে এর বিপরীত দৃশ্য দেখা যায়। অর্থাৎ মাসান এখানে সার্বজনীন ভাবে পূজিত।

মাসান ঠাকুরের মূর্তি বা আদল বিচার করলে দেখা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মৃন্ময় মূর্তি দণ্ডায়মান অথবা পদ্মাসনে উপবিষ্ট। হাতে কোথাও পেন্টি কোথাও গদা। গ্রামরক্ষী লোকদেবতার বড় অস্ত্র এই দুটি। তুফানগঞ্জ ও মেখলিগঞ্জ মহকুমার প্রত্যন্ত বহু গ্রামে স্থানীয় লোকশিল্পীদের তৈরী শোলার অশ্বারোহী মাসান পূজিত হন। এই লোকদেবতার মূর্তির গড়ন এবং বাহনের বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে বলা যায়— বীভৎস মূর্তিমান এই দেবতা কোথাও মুন্ডহীন বক্ষে চোখ, কোথাও রুদ্ররূপী হাতি বাহন ও সিংহ বাহন, কোথাও গদাধারী ভীমরূপী। কোথাও বা পদ্মাসনে আসীন শিব বা মহাকালের মত গায়ের রঙ, কোথাও বা কৃষ্ণবর্ণ ও নীল, কোথাও তাঁর বাহন কচ্ছপ, কোথাও শোলমাছ, ভেড়া, কোথাও ঝাকড়া চুলে মাথায় পেট্রি (ফেট্রি) বাঁধা— এটাই কোচবিহারের মাসান নামক লোকদেবতার মূর্তি কল্পনার বাস্তব রূপ। কালের বিবর্তনে দেবদেবীর প্রভাব আদিম মানুষের মনকে প্রভাবিত করে নিজস্ব মূর্তিতে ধরা দেয়। জেলার মাসান নামক এই লৌকিক দেবতার মূর্তি কল্পনাতেও এই বিবর্তন এসেছে।

মাসান ঠাকুরের কোপ, আক্রমণ বা ভর হয় সাধারণত সংক্রান্তি, অমাবস্যা, শনি ও মঙ্গলবার। রোগাক্রান্ত বা বিকারগ্রস্ত মানুষের আরোগ্য কামনায় এই পূজা করা হয়। এই অপদেবতা দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ হিসেবে দেখা যায় হাতে তুড়ি মারা, বাঁশের শব্দ, ঢিল মারা, আগুন জ্বালানো এবং রাত্রে মাছ ধরতে চাওয়া, পোড়ামাটি খেতে চাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ। গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে জেলার রাজবংশী সম্প্রদায় ওঝাব মাধ্যমে এই ভয়ঙ্কর দেবতার পূজায় মানত করেন। পূজার উপকরণে থাকে উনানের পোড়ামাটি, শোলমাছ ও মাটির প্রদীপ এবং এগুলি রাখা হয় কলার পাতায়। সঙ্গে এক জোড়া কবুতরও থাকে তবে এই পূজার প্রধান উপকরণ আঁটিয়া কলা, ঘটিতে পান্তা দই, ভুরভুরা চিরার দশ বা পাঁচ খোল নৈবেদ্য, লাল রঙের দুটি নিশান, চালভাজা, কোন কোন গ্রামে সুরা ও ডিম। পূর্বে এই পূজায় শূয়োরের মাংসও দেওয়া হত। মানতকারীগণ শূয়োর বলি দিয়ে উৎসর্গ করতেন। পূজার প্রশস্ত সময় ভরদুপুর ও নিশা (গভীর) রাত্রি। মাসানের উগ্রতা ও আক্রান্ত রোগীর অবস্থা বুঝে অনেকে এই পূজার প্রসাদ খান না। নির্দিষ্ট পুরোহিত না থাকলেও ওঝা ও স্থানীয় অধিকারী সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করেন। অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রামে শর্মা উপাধিকারী শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণগণও পৌরোহিত্য করেন। বলি হিসেবে মানতকারীগণ সামর্থ অনুযায়ী শূকর, পাঁঠা, পায়রা উৎসর্গ করেন। পূজার জায়গাটিতে মাটি দিয়ে লেপে পাঁচটি সিঁদুরের ফোটা দেওয়া হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আরোগ্য লাভে যখন এই পূজা হয় তখন ঠাকুরের সামনে রোগীকে কাঠের পিঁড়িতে বাঁদিকে বসানো হয়। ধাতুর পাত্রে জল দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সেই জল রোগীর গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। দিনহাটা মহকুমার ত্রিমোহিনী গ্রামের মাসানের মহিলা পূজারী ও ওঝা ফুলেশ্বরী রায় সাক্ষাৎকারে এই পূজার এক মন্ত্র শোনান --

"এসো কালী বস চালে কথা কও কর্ণমূলে
কর্ণের কথা কর্ণে কও যত মিথা মনে খাবি
করম করম ধরম ধরম সাতালি পর্বত চালং
নরং লোকের নাক চালং, মরা বর্তা মাসান।"[২৫]

এই লোকদেবতার পূজার পূর্বে রোগীর রোগ নির্ণয়ের জন্য রোজা হাতে পাটকাঠি মেপে পরীক্ষা করেন। এভাবে ঝাড়ফুঁক বা স্বাভাবিক ভাবে মাসান ঠাকুরের পূজার মাধ্যমে রোগী আরোগ্য লাভ না করলে পরবর্তী পর্যায়ে পূজার বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে ঝাড়ফুঁকের যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'ভোমর ডাঙানো'। এই ক্ষেত্রে যিনি মূল ওঝা অর্থাৎ যিনি ঝাড়ফুঁক করবেন তাকে বলা হয় ভোঙরিয়া। প্রধান ভূমিকা তিনিই গ্রহণ করেন। সঙ্গে থাকে ঢাকি এবং দেউরী। সেখানেও দশ খোল নৈবেদ্য সাজানো হয়। এভাবে দ্বিতীয় পর্যায়েও যদি রোগী আরোগ্য লাভ না করে সে ক্ষেত্রে মাটির ঘট, একটি কবুতর, রঙিন কাপড় ও প্রদীপ জ্বালিয়ে একটি ভেলা ভাসানো হয়।

মাসান এতদঞ্চলে কখনই গৃহদেবতা হিসেবে সম্মান পান নি। জেলার লোকসংস্কৃতিতে আবহমান কাল ধরে স্থানীয় লোকসমাজের উজ্জ্বল ও মহান লৌকিক সৃষ্টি হিসেবে সবার ভীতি ও উদ্বেগের পাশাপাশি শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করে আসছেন এই লোকদেবতা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, "মাসান দেবতার দ্বি-বিধ রূপ স্ত্রী ও পুরুষ। জেলার লোকায়ত ধর্মে যখন স্ত্রীরূপে তাকে কালী জ্ঞানে পূজা করা হয় তখন তিনি সিংহ বাহিনী ও চতুর্ভুজা, পদতলে শিবের শয়ান মূর্তি। পুরুষ দেবতা রূপে তাকে শিব, শিবানুচর, কখনও বা অপদেবতা জ্ঞানে উপাসনা করা হয়। অমঙ্গল, মহামারী এবং পথদুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই দেবতার আরাধনা হয়ে থাকে।"[২৪]

মাঘপালা গ্রামে মাসান শূকর পৃষ্ঠে আসীন। তাঁকে চতুর্ভুজ শিবও বলা হয়। তুফানগঞ্জ মহকুমার কোচবিহার, আসাম জাতীয় সড়কের পাশে তল্লিগুড়ি, মারুগঞ্জ এবং ফলিমারী, শালবাড়ী ও হরিরহাট গ্রামে পথের পাশে মাসান পাটে মানত পূজা উপলক্ষে পাঁঠা ও পায়রা বলি দেন অনেকে। তবে প্রায় সর্বত্রই বৈশাখ মাসের প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবার এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সিতাই ব্লকের চামটা গ্রামে প্রায় ৮টি মাসান পাট রয়েছে। মাথাভাঙ্গা মহকুমার পাটছড়া, গোপালপুর গ্রামে সন্ন্যাসী ঠাকুর, বানমারা ঠাকুর, ঢাংঢিং ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে মাসানও পূজিত হন।

বিজ্ঞানের দৌলতে আজ আমরা অনেক লৌকিক বিশ্বাস, সংস্কার ও ধর্মীয় ভাবনাকে কুসংস্কার বলে মনে করি কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রসার লাভ করে নি। সবাই এধরনের পূজা-পার্বণ, ঝাড়ফুঁক ও ওঝা-কবিরাজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন। ইন্দোমঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত আদিবাসী ও রাজবংশী সমাজে প্রাচীন এই কোপন স্বভাব লোকদেবতার পূজার প্রচার, লোকাচার ও আনুষ্ঠানিকতা আজ ক্রম-হ্রাসমান।

কোচবিহার জেলার পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় যে উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী জাগ্রত মাসান লোকদেবতার সন্ধান পাই সেগুলি হল নিম্নরূপ—

গড়কাটা মাসান ঃ

জেলার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ও প্রভাবশালী মাসান হল গড়কাটা মাসান। দিনহাটা মহকুমার গোঁসানীমারী ১ নং অঞ্চলের অন্তর্গত আলোকঝারি গ্রামে পাকা রাস্তার ধারে এই মাসান পাট অবস্থিত। দিনহাটা গোঁসানীমারী জাতীয় সড়কের উক্ত গ্রামের বাম পার্শ্বে টিনের চালযুক্ত পাকা পশ্চিমমুখী মন্দিরে এই মাসান অধিষ্ঠিত। জেলার প্রাচীন জাগ্রত ও সর্বজন পূজিত এই গড়কাটা মাসান উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য লোকদেবতা। প্রাচীন কামতাপুরের কামতেশ্বর রাজার দুর্গের প্রাচীনতর বা গড় কাটা বা ভাঙ্গার সময় এই লোকদেবতার প্রতিষ্ঠা হয় বলে স্থানীয় লোকরা মনে করেন এই দেবতা 'গড়কাটা মাসান' নামে বেশী পরিচিত। শুধু কোচবিহার নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতর এই মাসান গড়কাটা নামের চেয়েও 'আলোকঝারি মাসান' নামেই খ্যাত।

প্রতি বছর ১৫ই বৈশাখ থেকে ৩১শে বৈশাখ পর্যন্ত মাসানের মূল মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় ১৫ দিন ব্যাপী পূজা ও মেলা। এ সময় মূল মন্দিরের সম্মুখে শত শত ভক্ত বাঁশের কঞ্চিতে লাল নিশান বেঁধে, ছোট ছোট মৃন্ময় মাসান ও শূকরের মূর্তি মানত করেন। মন্দির চত্বরে উন্মুক্ত ভাবে স্থানীয় অধিকারী ব্রাহ্মণ কর্তৃক আটিয়া কলা, ঘটিয়া দই (মাটির ঘটে পাতা কাঁচা দুধের দই), চিড়া দিয়ে তিন বা পাঁচ বা দশ খোল নৈবেদ্য দিয়ে পূজা দেন। মন্দিরের বাইরের চাতালে মানত পূজায় অধিকারী ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করলেও গড়কাটা মাসানের মূল পূজায় পৌরোহিত্য করেন শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শুধুমাত্র স্থানীয় সম্প্রদায়ই নয় দূর অঞ্চলের শহর ও গ্রামবাসীগণও বৈশাখ মাসের উক্ত দিনে এখানে ছুটে আসেন মানত করে পূজা দিতে। বৈশাখ মাস পূজার প্রশস্ত সময় হলেও উক্ত মাসের শনি ও মঙ্গল বারেই মানত পূজা হয় বেশী। মেলার সময় ১৫ দিন ব্যাপী মন্দিরের সম্মুখে চলে পাঁঠা ও পায়রা বলি। অনেক মানতকারী আবার শূকর বলি দেন। এই মাসানের প্রাচীনত্ব ও নামের মাহাত্ম্যের সুবাদে গ্রামটি 'মাসান পাট' নামেই সর্বাধিক পরিচিত।

প্রথম দিকে এই লোকদেবতার পূজার সমস্ত উপকরণই ছিল কাঁচা (কাঁচা দই, কাঁচা আটিয়া কলা, কাঁচা সাটি মাছ, চিড়া)। তাই এই লোকদেবতাকে সবাই 'কাঁচা খাওয়া' দেবতা বলতেন। এই দেবতার পূজার সময় রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব তৈরী গোবরের ধূপকাঠি পুরোহিত প্রথমে জ্বালিয়ে দেন ঠাকুরের সামনে। এই ধূপকাঠি যতক্ষণ প্রজ্জ্বলিত থাকবে ততক্ষণ পূজা চলবে, এটাই প্রচলিত নিয়ম।

তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ী ১নং অঞ্চলের অন্তর্গত বাঁশরাজা গ্রামের রাভা ও রাজবংশী সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত হন 'পোড়া মাসান'। এই মাসানের মূল পূজা অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমী তিথিতে। নৈবেদ্য হিসেবে থাকে কাঁচা দৈ, চিড়া, আটিয়া কলা এবং পোড়া সাটি মাছ। এই লোকদেবতা পোড়া মাছ খান বলে এরূপ নামকরণ।

এই জেলার অপর উল্লেখযোগ্য মাসান হল 'ভেড়া মাসান'। মাসানের বাহন এখানে ভেড়া হওয়ায় এই নামকরণ। দিনহাটা মহকুমা সদর থেকে সাহেবগঞ্জ সড়ক হয়ে বামন হাটের দিকে দুই কিলোমিটার দূরত্বে উত্তর লাউচাপরা গ্রামের ভ্যাংরা পুলের পাশে পশ্চিমমুখী একটি টিনের চালা ঘরে এই ভেড়া মাসানের অধিষ্ঠান। প্রতি বছর মাঘ মাসে এই দেবতার বাৎসরিক পূজা হয়।

মাথাভাঙ্গা মহকুমার ডাঙ্গবোকা গ্রামের দিগডারু নদীর বাম পার্শ্বে ময়না দলী রোডের কালভার্টের পাশে 'টসা মাসানের' অবস্থান। মাসানের বাহন এখানে শূকর ও শাল মাছ। বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় রাসপূর্ণিমায়।

সিতাই ব্লকের চামটা গ্রামের ধূমদহপাড়ে অশোকাষ্টমী স্নান উপলক্ষে পূজিত হন 'জলুয়া মাসান'। তাঁর বাহন এখানে শাল মাছ। জলে বসবাসকারী অপদেবতা জলকাওরী স্ত্রী জাতীয় অপদেবতা হলেও কোচবিহারে পুরুষ অপদেবতা জলুয়া মাসানের সঙ্গে এর সাদৃশ্য অনেক। যার উপর এই অপদেবতা ভর করবেন তাকে শেষ রাত্রে কিংবা মাঝ রাত্রে ঘুমের ঘোরে মাছ ধরার ছিপ, জাল, জাকই, বর্শি নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ায় প্ররোচিত করবেন।

কোচবিহার শহরের উত্তবপ্রান্তে খাগরাবাড়ী থেকে নিউকোচবিহার মুখী রাস্তার দক্ষিণ পাশে ডোম সম্প্রদায়ের বাস। এই ডোমপাড়ায় অবস্থিত শূকর বাহন 'শূর মাসান'।

দিনহাটা মহকুমার ত্রিমোহিনী গ্রামে খ্যাতা 'ওড়া মাসানের' অধিষ্ঠান। এই মাসানের বিশেযত্ব হল এর পূজার জন্য গ্রামবাসীগণ সূচ ও সূতা মানত করেন। এই মাসান পূজার অপর বৈশিষ্ট্য এর পৌরোহিত্য করেন ফুলেশ্বরী রায় নামে এক মহিলা ওঝা।

মুন্ডহীন বক্ষে চোখ, দন্ডায়মান, হাতে গদা ও মৃত শিশু— বীভৎসরূপী ভয়ঙ্কর 'নিষ্কিন্দা বা মুড়িয়া মাসান' নামেও পূজিত হন অনেক গ্রামে। তুফানগঞ্জ মহকুমার থেটার-পাট গ্রামে, গোঁসানীমারী বাজারের পশ্চিম পাশে, নাটাবাড়ীর মাছুয়াটারী গ্রামে, বামন হাটে এই নিষ্কিন্দা মাসানের অধিষ্ঠান।

যখাযখি ঃ

কোচবিহারের গ্রাম জীবনে এক উল্লেখযোগ্য লৌকিক দেবদেবী হলেন 'যখাযখি'। শিশু আক্রমণকারী ও শিশু রোগের আরাধ্য এই দেবদেবীর পূজা প্রায় প্রত্যেক গ্রামবাসী রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। এই প্রসঙ্গে বলা যায় উত্তরবঙ্গের অন্য কোন জেলায় শিশু রোগের প্রতিরোধে এই পূজার প্রচলন দেখা যায় না। যখাযখি নামেব ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে মনে হয় এটির উৎপত্তি যক্ষ শব্দ থেকে। মাসানের নামে যে কুবেরের ধ্যান করা হয় সেই কুবেরেরই অপর নাম যক্ষ। এই লোকদেবতার শোলার তৈরী মূর্তিতে কালো রঙ দিয়ে তৈরী যখা-যখি স্বামী ও স্ত্রী রূপে পূজিত হন। কিন্তু, মৃন্ময় মূর্তিতে পূজিত হলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই হাঁস বলি দিয়ে মানত করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ভাবে শুধু যখাও পূজিত হন। যখাকে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা মহকুমার অনেক গ্রামে মাসানের বিকল্পরূপ কল্পনায় পূজা করা হয়। অনেক গ্রামে যখা ও যখির মূর্তির পাশে শিবের মূর্তিও পূজিত হন। মানত করে অনেকে পাঁঠা ও পায়রাও বলি দেন। অনেক গ্রামে পাঁঠা ও পায়রার মাংস ও ভাত রান্না করে প্রসাদ রূপে গ্রামবাসীদের খাওয়ানো হয়। মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিকারপুর গ্রামে, দিনহাটা মহকুমার কিশমতদশ গ্রামে গাভী বাচ্চা প্রসব করলে গ্রামবাসীগণ প্রথম বারের দুধ দোহন করে দই তৈরী করে এই দেবতাকে উৎসর্গ করেন। শুধু শিশু রোগ নয় বয়স্ক মানুষ ও গৃহপালিত পশুর রোগ নিরাময়ের জন্যও অনেক

গ্রামবাসী আটিয়া কলা ও দই দিয়ে এই দেবতার পূজা মানত করেন। জেলা সদরের মাঘপালা গ্রামে যখাযখির পূজায় দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের আশায় বলি দেওয়া হয়।

কোচবিহার জেলার শিশুরক্ষক এই দেবতার সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার পঞ্চানন্দ ও ওলাবিবি নামক লোকদেবতার সাদৃশ্য দেখা যায়। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলীর শিনি পূজার সঙ্গেও কোচবিহারের যখির কিছু মিল আছে। জেলার রাজবংশী রমণীগণ যাদের গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায় বা সন্তান প্রসব হওয়ার পর অল্প দিনেই মারা যায় তারাও এই লোকদেবতার শরণাপন্ন হন। ভুত-প্রেত ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ওঝা বা রোজা নিয়ন্ত্রিত এই যখাযখি ও মাসান পূজার মাধ্যমে গ্রামবাসীগণ খুঁজে পান সান্ত্বনা।

স্থানীয় রাজবংশী সমাজে 'শিবযখা' নামে যখার একটি স্বতন্ত্র রূপ পূজিত হয়। জেলার স্থানীয় সম্প্রদায় নবজাতক জন্মাবার পর বাড়ীর পূর্ব প্রান্তে ছনের দোচালা ঘর তৈরী করে অনেক সময় ওঝার মাধ্যমেও যখাযখির পূজা দেন। মানতপুষ্ট শিশু আক্রমণকারী এই যখাযখির পূজার পর ওঝা বা পূজারী মানতকারী পরিবারের নবজাতকের হাতে বেঁধে দেন যখাযখির নামে সুতা ও মাদুলী। এছাড়াও "ব্যাধিগ্রস্ত শিশুকে যখাযখি দেবতার মন্ডপের সামনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দেন এবং শিশুর নামে মানত করে 'হিতুমাটি' (যখার মন্ত্রপুত মাটি) শিশুকে খাওয়ানো হয় এবং গায়ে মাখানো হয়।"[২৫] ক্ষেত্র-সমীক্ষায় আমরা জেলার পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে তিন রকমের যখা ঠাকুরের সন্ধান পাই। যেমন শিবযখা, কালযখা ও বৈষ্ণব যখা।

ঢেল ঠাকুর / জুড়াবান্দা ঠাকুর ঃ

কোচবিহার জেলার লোকদেবতার বৈচিত্র্যে এক বিমূর্ত দেবতার সন্ধান পাওয়া যায় যার নাম 'ঢেল ঠাকুর' বা 'জুড়াবান্দা ঠাকুর'। দিনহাটা মহকুমার গোঁসানীমারী রোডে শকুন্তলা স্টপেজে এ রকম এক ঢেল ঠাকুরের পূজা হয়। এই দেবতার কোন মূর্তি নেই। লোকবিশ্বাস, কোথাও গাছের তলার একটি মাটির ঢিবি বা প্রস্তর খন্ড এই দেবতার প্রতীক। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস আমবাড়ি চৌপথীর বড়াই (কুল) গাছের নীচে এই দেবতার অধিষ্ঠান। পথচলতি পথিকগণ যাতায়াতের সময় যে কোন বস্তু দিয়ে ঢিল দিলে এই দেবতা তুষ্ট হন। ঢিল এখানে এই দেবতার প্রতীক।

এই দেবতার অপর বিশেষত্ব হল প্রথাগত পূজার উপকরণ, পুরোহিত বা মন্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই। কোচবিহার সংলগ্ন আসাম সীমান্তবর্তী ধুবরী জেলার কালডোবা ও ছত্রসালের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক জাগ্রত ঢেল ঠাকুরের অধিষ্ঠান আছে। পথপার্শ্বস্থ তেঁতুল, শেওড়া, পাকুড় প্রভৃতি গাছেই এই দেবতার অধিষ্ঠান। মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিকারপুর গ্রামে হাট-বাজারগামী পথিক ও গ্রামবাসীগণ চলার পথে শুকনো ঘাস, কাঠ, পাথর ইত্যাদি দুটি বস্তু একসঙ্গে জোড়া বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেন অথবা ঢিল মারেন। এটাই এই লোকদেবতার অর্ঘ্য নিবেদনের একমাত্র উপায়।

মাথাভাঙ্গা মহকুমার নবীনের দোলা গ্রামে আর একটি 'জুড়াবান্দা ঠাকুরে'র থান আছে। এখানেও পথচারী মানতকারী ব্যক্তিগণ পথে কুড়িয়ে পাওয়া যে কোন দুটি বস্তুকে জোড়া বেঁধে ঢিল মেরেই ঠাকুরকে ভক্তি নিবেদন করেন। দিনহাটা মহকুমার সিতাই থেকে গিরিধারী গ্রামে যাওয়ার পথে পাগলারহাট গ্রামে জিগা গাছের নীচে মাটির একটি ঢিবি এখানে ঢেল ঠাকুরের প্রতীক। এখানেও পথচারী ব্যক্তিগণ এক জোড়া ঢিল দিয়ে ঠাকুরের কাছে ভক্তি নিবেদন করেন।

চরকাটাকুয়া (শিশু আক্রমণকারী লৌকিক প্রেতাত্মা) ঃ

লৌকিক প্রেতাত্মা বা শিশুখাদক 'টাকরা-টাকরি' নামে এক লোকদেবতার সন্ধান পাওয়া যায়। শিশু হত্যাকারী এই অপদেবতা অশরীরী প্রেতাত্মা বলে এক লোকবিশ্বাস কোচবিহারে প্রচলিত। একে ব্রহ্মদৈত্যরূপী পরোপকারী ভূত রূপেও মান্য করেন অনেকে। প্রেতযোনি প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদৈত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার 'লোকসাহিত্য গ্রন্থে (চতুর্থ খন্ড) ব্রহ্মদৈত্য' নামে একটি লোককাহিনীর উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানব ভারতীয় পুরাণ কাহিনীতে নেই। আরব-পারস্য কাহিনীতে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারকারী দৈত্য-দানবের কথা আছে। অতএব মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভূত-প্রেতাদি আরব্য সংস্কৃতির প্রভাব জাত বলে মনে হয়।

কুমীরদেব / গাবুরদেব ঃ

কোচবিহার জেলা সদরের খোলটা গ্রামে বিশেষ দুটি উল্লেখযোগ্য লোকদেবতা পূজিত হন, যা জেলার অন্য কোন গ্রামে দেখা যায় না। তারা হলেন কুমীরদেব ও গাবুরদেব। এই দুই দেবতার নাম ও বাহনে বৈপরীত্য দেখা যায়। জেলার খোলটা গ্রামের দ্বিভুজ কুমীরদেবের বাহন কুমীর না হয়ে হয় বাঘ। এই পুরুষ দেবতার গায়ের রঙ বেগুনী। পূজার প্রশস্থ সময় বৈশাখ মাস। গ্রামের অনেক রাজবংশী গৃহস্থবাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এই দেবতার থান বা পাট আছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মাটির বেদীর উপর লাল নিশানকেই কুমীরদেবতা জ্ঞানে পূজা করেন সবাই। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় ও সাক্ষাৎকারে খোলটা গ্রামের নরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর বাড়ীর পূর্ব প্রান্তের সুর কুমীরদেবতার থান দেখান। তাঁর মতে মাটির ঢিবি এবং বাঁশের কঞ্চিতে লাগানো দুটি লাল নিশানই কুমীরদেবতা।

এই খোলটা গ্রামেই অপর বিরল দৃষ্ট লোকদেবতা পূজিত হন চতুর্ভূজ মহিষবাহন গাবুরদেব। গাবুরদেবের ডান দিকের উপরের হাতে অসি, নীচের হাতে তীর, বাঁদিকের উপরের হাতে ঢাল, নীচের হাতে ধনুক। গ্রামবাসীগণ এই দেবতার থানে ডিম, পাঁঠা, পায়রা, মহিষ মানত করেন। ডাংধরা বা গোরক্ষনাথের মত কোচবিহারের মহিষরক্ষক দেবতা এই গাবুরদেবকে অনেকে মৈষাল দেবতাও বলেন। নির্মলচন্দ্র চৌধুরী "চারুচন্দ্র সান্যাল স্মারক" গ্রন্থের ২২০

পৃষ্ঠায় তাঁর "উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী" গ্রন্থে কুমীর দেবতা সম্পর্কে উক্ত গ্রামে প্রচলিত একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন—

"কালজানি আন্ধার কিল কিল রাতি
নাময়ে সুর কুমীর দেও নিশিভাগ রাতি
চাইর কোনে প্রিথিমী ধেইছে জানিয়া
সত্তম চরই ফল্যার বুকে ভর দিয়া।"[২২]

বাঘসুর ঃ

জেলার অপর এক উল্লেখযোগ্য লৌকিক পুরুষদেবতা হলেন বাঘসুর। নামের মধ্যেই বোঝা যায় এই দেবতার বাহন হবে বাঘ। ব্যাঘ্র ভীতি থেকেই এই দেবতার উদ্ভব। বুড়ার ব্যাটা বা বাঘকে সন্তুষ্ট রেখে গবাদি পশুর প্রাণ রক্ষার্থেই এই দেবতা পূজিত হন। কিন্তু তুফানগঞ্জ মহকুমার ধলপল ২নং অঞ্চলের অন্তর্গত ছাট গেন্দুগুড়ি গ্রামের বাঘসুর দেবতার বাহন বাঘের পরিবর্তে সিংহ। উক্ত গ্রামের প্রবীণ ভোঙরিয়া কালীচরণ দাস কালারায়ের পাটে বাঘসুর দেবতার একাধারে পূজারী ও ভোঙরিয়া। স্থানীয় লোকবিশ্বাস বাঘসুর মাসানের বিকল্প লোকদেবতা। এই পুরুষ দেবতার গায়ের রঙ নীল, মাথায় চূড়া, একহাতে গদা, অন্যহাতে অভয়, বাহন সিংহ। কার্তিক মাসের রাসপূর্ণিমার বাৎসরিক পূজায় পৌরোহিত্য করেন শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ অম্বুঠাকুর। নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদন করা হয় দই, চিড়া, মনুয়াকলা ও ফলমূল। স্থানীয় গ্রামবাসীর কাছে বাঘসুর শুধু বাঘেরই দেবতা নন, তিনি যেমন ব্যাঘ্রভীতি দূর করেন তেমনি জ্বর, প্যারালাইসিস, ব্যথা প্রভৃতি রোগেরও মুক্তিদাতা। রাজবংশী, রাভা, পূর্ববঙ্গীয় এবং মুসলিম সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঘসুর দেবতার থানে পাঁঠা, পায়রা মানত করেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক রোগমুক্তির কামনায় সব মানতই নির্দেশিত হয় ভোঙরিয়ার নির্দেশে। এরূপ বাঘসুর পূজিত হয় তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলাখানা-নাটাবাড়ী রাস্তার ডানপাশে নাটাবাড়ী বাজারের আধমাইল আগে কালীধামে। এখানে দক্ষিণমুখী ছনের চালাঘরে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আসীন বাঘসুর পূজিত হন প্রতি বছর রাসপূর্ণিমায়।

কালারায় ঃ

ছাট্‌গেন্দুগুড়ি গ্রামের অপর জাগ্রত পুরুষ লোকদেবতা কালারায়। যদিও কোচবিহারে পূজিত এই লোকদেবতা কালারায়ের সঙ্গে সোনারায়ের কোন সম্পর্ক নেই। পশ্চিমমুখী পাকা দালানে অধিষ্ঠিত এই দেবতার এক হাতে পেন্টি অন্য হাতে অভয় মুদ্রা, গায়ের রঙ কাল্‌চে নীল। মাথায় গামছার পাগরী। কালারায় প্রকৃতপক্ষে এখানে গ্রামদেবতা। গ্রামরক্ষীর ভূমিকায় সকল অশুভ শক্তিকে দূর করে গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন এই পুরুষ দেবতা। এখানেও পুরোহিত ও ভোঙরিয়া কালীচরণ। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ভোঙর ডাঙানো নামক লোকচিকিৎসার মাধ্যমে দূর দূরান্ত থেকে আসা অসহায় গ্রামবাসীর দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ে রোগী ঝাড়ান। ভোঙরিয়া কালীচরণ ভরগ্রস্থ হয়ে এক হাতে পেন্টি দিয়ে নিজের পিঠে আঘাত করেন ও বিড় বিড় করে

ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে রোগী ঝাড়ান। স্থানীয় কবিয়াল হোসেন আলী মিঞা জানান, মানত হিসেবে এখানে ভক্তগণ পাঁঠা, পায়রা, ফলমূল নিবেদন করেন। তার মতে ভোঙরিয়া রোগী ঝাড়ার সময় কোন জাত দেখেন না।

ডাংধরা দেবতা ঃ

কোচবিহার জেলার উত্তর অংশে বিশেষ করে তুফানগঞ্জ, নাটাবাড়ী, বানেশ্বর অঞ্চলের ডাংধরা দেবতা ডাংধরা ঝান্টা, ডাঙ্গা, ডাংঘটি প্রভৃতি নামেও পূজিত। এ সকল অঞ্চলে ডাংধরার সহচর হিসেবে কালামাসান, কালমাতৃ নামেও পরিচিত। ডাংধরা দেবতার বাহন হিসেবে সর্বত্রই বাঘকে কল্পনা করা হয়। মহিষের বাচ্চা হলে তার দুধ খাওয়ার পূর্বে এতদঞ্চলে ব্যাঘ্রদেবতার নামে নিবেদন করে নানা উপাচারে পূজার প্রচলন আছে। এই ব্যাঘ্র দেবতার নাম ডাংধরা। এই দেবতার হাতে একটি দন্ড থাকে বলে দেবতার নাম হয়েছে ডাংধরা। এই দেবতার উদ্ভবের মূলে রয়েছে ব্যাঘ্রভীতি। বর্তমানে মহিষবাথান না থাকলেও ব্যাঘ্রদেবতা ডাংধরা যথারীতি বিভিন্ন গ্রামে পূজিত হন।

কোচবিহারের বিভিন্ন গ্রামে ডাংধরা দেবতা কোন মৃন্ময় মূর্তিতে পূজিত হন না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ীর তুলসী মঞ্চের পাশে শাস্ত্রীয় পুরোহিতের বদলে গৃহকর্তা কর্তৃক এই দেবতা পূজিত হন।

ডাংধরা দেবতা এক বিচিত্র লোকবিশ্বাসে দিনহাটা মহকুমার কিশমতদশ গ্রামে পূজিত হন বটপাকুর ও জিগাগাছের নীচে বাঁধানো চাতালে। একটি প্রস্তর খন্ডই ডাংধরা দেবতার বিমূর্ত প্রতীক। এখানে ডাংধরার পাশাপাশি পূজিত হন কালী, মহাকাল, পাগলাপীর। হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষই গবাদি পশুর মঙ্গল কামনায় সমবেতভাবে এই পূজা দেন। তুফানগঞ্জ মহকুমার শিকারপুর গ্রামে, মেখলিগঞ্জ মহকুমা ও হলদিবাড়ী থানার রাজবংশী সম্প্রদায় গরুর বাচ্চা হওয়ার দশ-বারো দিন পর দুধ সংগ্রহ করে সেই কাঁচাদুধে তৈরী দই, চিড়া, আঁটিয়াকলা, কোন কোন গ্রামে উক্ত দুধের ক্ষীরের নাড়ু তৈরী করে নৈবেদ্য দিয়ে বাড়ীর উঠোনে তুলসীমঞ্চের পাশে ডাংধরার কোপদৃষ্টি থেকে গৃহস্থের গরুর যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই উদ্দেশ্যে ডাংধরা দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা হয়। এখানে ডাংধরা দেবতার রূপ কল্পনা করা হয় ঝাঁকড়াচুলে সর্বাঙ্গ কঁ্যাথা দিয়ে মোড়া, অনেকটা কঁ্যাথা ওরা মাসানের মত। ডাংধরা দেবতা শ্মশানচারী শিব। জেলার পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুগণও গরুর বাচ্চা প্রসবের দশ থেকে বারো দিনের মধ্যে নতুন দুধের ক্ষীর (গোক্ষুরের নাড়ু) এই দেবতার নামে উৎসর্গ করেন। সেই ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁরা ডাংধরা না বলে গোরক্ষনাথের নামেই তাঁদের নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন।

মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত সর্বপ্রাণবাদী রাজবংশী সম্প্রদায়ের ডাংধরা নামক মুক্তাঙ্গণ লোকদেবতার পূজা আদিম পশুপূজা ও জড়বস্তুর উপাসনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

তুফানগঞ্জ মহকুমার জায়গীর চিলাখানা অঞ্চলে বলরাম ধামের ভোগুরিয়া নরেন বর্মন দীর্ঘ দিন ধরে ডাংধরা দেবতার পূজা করেন। নিম্নলিখিত গুরুমন্ত্র দিয়ে তিনি ডাংধরা দেবতার পূজা করেন—

"ওঁ গণেশায় নমঃ (২)
ধর্ম হল মহাদেব বলিয়া
পূজা কইরলোং শিবগুরু বলিয়া
ফুল রথে আসিল নামিয়া।"[২৭]

ভোগুরিয়া নরেন বর্মনের মতেও এতদঞ্চলে ডাংধরা দেবতা শিবের অনুসঙ্গী বা প্রতীক। অনেকে এই দেবতাকে বুড়া ঠাকুরও বলেন।

কালী ঠাকুরাণী ঃ

জেলার শুধু রাজবংশী সম্প্রদায়ই নয়, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেও কালী ঠাকুরাণীর প্রভাব ব্যাপক ও গভীর। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত কোচবিহারেও কালী ঠাকুরাণী পূজিত হন বহু নামে। কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে শ্যামাকালী, কাঁচাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী প্রভৃতি নামে কালীর ধ্যান, উপাসনা ও আরাধনার প্রচলন আছে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে কালী শুধু শক্তি সম্পন্না ভীষণা দেবী নন, তিনি মাসানের স্ত্রীরূপেও পূজিতা। সন্ন্যাসী ও গেরাম ঠাকুরের মত কালীও এখানে এক অর্থে সর্বমঙ্গলকারিণী গেরাম ঠাকুর রূপে সম্মানিত। বেশীর ভাগ গ্রামে গেরাম ঠাকুরের পাশাপাশি কালীও পূজিত হন।

"জেলার দিনহাটা মহকুমার খলিসা গোঁসানীমারী গ্রামের শূকরবাহনা মাসানকালী পূজিতা হন।"[২৮] নিত্য পূজিতা এই কালীর রূপ ও বৈচিত্র্য জেলার অন্য কোথাও দেখা যায় না। কালীই একমাত্র এতদঞ্চলে সম্মানিতা স্ত্রীদেবতা, যার প্রভাব, মর্যাদা এবং দৈবী শক্তির প্রতি ভক্তি ভাব যা অন্য কোন দেবতার মধ্যে দেখা যায় না।

মূর্তিহীন কালী ঃ

মূর্তিহীন কালী পূজার নিদর্শন আছে এই জেলার হলদিবাড়ী ব্লকের কাশিয়াবাড়ী গ্রামে। উক্ত ব্লকের কাশিয়াবাড়ী বাজার সংলগ্ন পশ্চিমপার্শ্বে শতাধিক বছরের প্রাচীন এক মন্দিরে পূজিত হন এই দেবী। এই কালী মন্দিরের উৎপত্তি সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের মধ্যে একাধিক বিশ্বাস প্রচলিত আছে। সারা বছর মূর্তিহীন ভাবে পূজিত হলেও দক্ষিণমুখী ভগ্নপ্রায় ইষ্টক নির্মিত প্রাচীন এই মন্দিরে শুধু দীপান্বিতায় এই কালী সাড়ম্বরে মৃন্ময় মূর্তিতে পূজিতা হন। বর্তমান পুরোহিত স্থানীয় রাজবংশী সমাজের তারিণীকান্ত রায় স্থানীয় কৃষ্টি অনুযায়ী পূজা করেন। এই পূজার বংশানুক্রমিক ঢাকি অমূল্য হাজরা। মানত হিসেবে পাঁঠা ও পায়রা বলি হয়। রাজরক্ষী সূর্যপ্রসাদ

নিঃসন্তান থেকে সন্তান লাভের পর বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন। বাৎসরিক পূজা মূর্তি দিয়ে হলেও পূজার রাতে সূর্য ওঠার আগেই দেবীর ভাসান হয়। এই প্রথা এখনও সচল। এছাড়াও সারা বছর শনি ও মঙ্গলবার মূর্তিহীন বেদীতে দক্ষিণাকালী কল্পনায় পূজা করেন গ্রামবাসীগণ। বর্তমান পুরোহিত তারিণীকান্ত রায় ভর উঠিয়ে ভোঙর ডাঙান এবং রোগ নিরাময়ের জন্য ঝাড়ফুঁক করেন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের কালী পূজার মন্ত্রে যে মূর্তি কল্পনার আভাস নেই, হলদিবাড়ী ব্লকের কাশিয়াবাড়ী গ্রামের কালী ঠাকুরাণী তার দৃষ্টান্ত।

মাধাই খালের কালী ঃ

দিনহাটা মহকুমার বামনহাট অঞ্চলের পাথরশোন গ্রামে সকল সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত জেলার উল্লেখযোগ্য কালী ঠাকুরাণী এই মাধাই খালের কালী। প্রতি বছর চৈত্র মাসের অষ্টমী তিথির পরের শনি বা মঙ্গলবার পূজা শুরু হয় এবং পরের শনি বা মঙ্গলবার মহিষবলির মাধ্যমে এই পূজার সমাপ্তি ঘটে। এটি প্রকৃতপক্ষে জেলার অন্যতম মাইগ্রেটেড বা স্থানান্তরিত কালী ঠাকুরাণী। "বর্তমান বাংলাদেশের রঙপুর জেলার কুঁড়িগ্রাম মহকুমার মাধাই খাল গ্রামের খর্গনাথ বর্মন(পূজারী) এই ভদ্রকালী এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর চৈত্র মাসের বাসন্তী পূজার পর শনি অথবা মঙ্গলবার পূজা শুরু হয় এবং চলে ১২দিন ব্যাপী। বাংলা ১৩৫৯ সন থেকে এই পূজা শুরু হয়।"[২৯]

এই পূজার বৈশিষ্ট্য অষ্টম দিনে পাঁঠা, পায়রা ও মহিষ, মানকচু, চালকুমড়ো বলি। বলিকৃত শোণিত মাটির মালসায় কালীকে নিবেদন করা হয়। দক্ষিণমুখী টিনের পাকা মন্দিরে এই কালী ঠাকুরাণী অধিষ্ঠাতা। উচ্চতা ১২ হাত এই ভদ্রকালীর পূজা উপলক্ষে ২০০ একর জমির উপর জেলার বৃহত্তম ও সর্বাধিক জনসমাগমের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় লোকবিশ্বাস মতে বিভিন্ন রোগভোগের ভয়ে যেমন মানত হয়, তেমনি জেলার মানুষের বদ্ধমূল ধারণা এই কালীর পাটের তুলসী পাতা ও মাটি খেলে যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি সারে। দিনহাটা মহকুমার বামনহাট অঞ্চলের পাথরশোন গ্রামের এই ভদ্রকালী ঠাকুরাণীকেই কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায় কর্তৃক 'সাতবইনী'র অন্যতম রূপে কল্পনা করা হয়। বর্তমান পূজারী আদ্যনাথ ভাগবতী, ভোঙরিয়া দেবেন্দ্রনাথ বর্মন এবং বলিকার ভদ্রনাথ বর্মন। বামনহাটের এই ভদ্রকালী সম্পর্কে একটি লোকশ্রুতি রয়েছে। এই লোকবিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়ে এখনও এই মেলায় ভদ্রকালীকে প্রণাম করে হাজার হাজার বিবাহিতা রমণীগণ শাঁখা পরেন।

এছাড়াও দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে প্রতি বছর ভাদ্র মাসের অমাবস্যায় পূজিত হন ছিন্নমস্তাকালী। এই মহকুমার অপর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কালী পূজার পীঠস্থান বাউসমারী গ্রাম। উক্ত গ্রামের গ্রামবাসীগণ কালীকে 'বাউসমারী কালী' বলে ভক্তি করেন। এই গ্রামের পুরনো কালীবাড়ীর সিদ্ধেশ্বরী মিলনমন্দির প্রাঙ্গণে পূজিত হন এই কালী ঠাকুরাণী।

মনস্কামনা কালী ঃ

প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় তুফানগঞ্জ মহকুমার পলিকা গ্রামের পোয়াতী বিলের পাশে দক্ষিণমুখী পাকা মন্দিরে পূজিতা হন মনস্কামনা কালী। বাংলা ১৩৬০ সনের মাঘী পূর্ণিমা থেকেই সাড়ম্বরে এই পূজা উপলক্ষে একদিনের একটি মেলাও বসে। অবিভক্ত বাংলার টাঙ্গাইল অঞ্চলের লৌকিক বিশ্বাস এবং এতদঞ্চলের রাজবংশী সম্প্রদায়ের লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে একাকার হয়ে যান এই কালী ঠাকুরাণী। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গীয় টাঙ্গাইলের নাথ যোগী সম্প্রদায় এবং স্থানীয় রাজবংশী সমাজের মিলিত প্রয়াসেই এই পোয়াতি বিলের মনস্কামনা কালী ঠাকুরাণীর পূজার সূচনা হয়। পলিকা গ্রামের প্রবীণ শ্রী অক্ষয়কুমার নাথ মেলা প্রাঙ্গণে সাক্ষাৎকারে এক কাহিনী শোনান ঃ

"স্থানীয় লোকশ্রুতি পলিকা গ্রামের মাঝখানে বিলের ধারে ছিল রাজবংশী অধর দাসের বাড়ি। তাঁর অশীতিপর বৃদ্ধা মা পলিকার বিলের বটগাছের নীচে বুড়া ঠাকুরের পূজা দিতেন। এই বুড়িমার কাছ থেকেই মাসান ও বুড়া ঠাকুর সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী শুনেছিলেন স্থানীয় নাথ সম্প্রদায়ের প্রবীণ ব্যক্তিগণ। বুড়িমার স্বপ্নাদেশের কথা মাথায় রেখে আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে শোলা ও ছনের তৈরী মাটির মন্দিরে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে দেবীর আরাধনা শুরু হয় এবং এই গ্রামে মনস্কামনা কালী পূজা শুরু হয়।"

কোন এক অদৃশ্য শক্তির বলে উক্ত পলিকা বিল নূতন করে গভীরতা প্রাপ্ত হয়ে জলে ভরে ওঠে এবং মায়ের কাছ থেকে নির্দেশ আসে এখানে পূজা দিতে হলে এই বিলেই স্নান করতে হবে। তখন এর নাম হয় 'কালীগঙ্গা'। পলিকার মায়ের কৃপায় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। এই বিশ্বাসের ফলেই প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে এই থানে পূজা দিতে। নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘোচে, দৃষ্টিহীন পায় আলোর সন্ধান, বহু দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ নিরাময় লাভ করেন, পথভ্রষ্ট পথিক পায় সঠিক পথের সন্ধান। তাই তুফানগঞ্জ মহকুমার জাগ্রত মনস্কামনা কালী এই পলিকা গ্রামের কালী।

মাসান কালী ঃ

জেলা সদরের অন্তর্গত দেওয়ানহাট ব্লকের ধুমপুর বালাসী গ্রামে একটি বটগাছের নীচে এই কালীর অধিষ্ঠান। মূর্তিহীনভাবে কালীস্বরূপা মাসান দেবতার প্রতীক হিসেবে পূজিত হয় একটি ঘট। প্রতি মঙ্গবার এখানে পূজা হয়। পূজার মূল উপকরণ পাঁচখোল দই, চিড়া ও আটিয়াকলা। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের মানুষ একত্রিত হয়ে পূজা দেন। এই মনস্কামনা কালীর থানে ভোগুরিয়ার নির্দেশে পাঁঠা, পায়রা, হাঁসের ডিম ও ফলমূল মানত হিসেবে উৎসর্গ করা হয়।

সিংহবাহনা কালী ঃ

জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার ধলপল ২ নং অঞ্চলের অন্তর্গত ছাট্ গেন্দুগুড়ি গ্রামের কালারায়ের ধামে পূজিত হন সিংহবাহনা রণকালী। বাৎসরিক পূজা প্রতি বছর রাস পূর্ণিমায় শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হলেও নিত্যপূজায় ভোগুরিয়া কালীচরণ বর্মন পৌরোহিত্য করেন।

এই মহকুমারই বারোকোদালী ২নং অঞ্চলের ভারেয়া গ্রামে পূজিত হন সিংহবাহনা ষড়ভূজা কালী। দেবীর গাত্রবর্ণ নীল, সঙ্গে ডাকিনী যোগিনী। বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর পৌষ মাসের শনি অথবা মঙ্গলবারের যে কোন এক দিন। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল অঞ্চলের দেওপুরা গ্রামের মদনপুর থেকে আগত স্থানীয় পূর্ববঙ্গীয়গণ প্রতিষ্ঠা করেন এই কালী পূজার। পাঁঠা ও পায়রা বলির জন্য এখানে মানত করা হয়।

মনসা/বিষহরি/পদ্মা/ষাইটল বিষহরি ঃ

কোচবিহারের লোকায়ত বিশ্বাস ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি এবং নাগপঞ্চমী তিথিতে সাপের বিষ বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় রাজবংশী ও রাভা সম্প্রদায় কোন মৃন্ময় মূর্তির পূজা করেন না। শোলার তৈরী মনসার মূর্তি অঙ্কিত মঞ্জুষাই সর্পদেবী বিষহরির মূর্তি। কিন্তু কালের বিবর্তনে পূর্ববঙ্গীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির মিশ্রণে চতুর্ভুজা, সর্পধৃতা, পদ্মাসনা, হংসারূঢ়া, মৃন্ময়ী মূর্তিতে অনেকে পূজা করেন। কোচবিহারে রাজবংশী সমাজের বিবাহ পরবর্তী বা পূর্ববর্তী সময়ে মনসা বা বিষহরি পূজা অবশ্য কর্তব্য। তখন মনসা দেবীর পূজার নাম হয় 'মারাই' পূজা। কোচবিহারের অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর মত মনসা বা বিষহরির কোন স্থায়ী পাট, থান বা মন্দির নেই, যেখানে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এই পূজা করেন। শাস্ত্রীয় সর্পদেবী বা মনসার প্রভাবপুষ্ট হয়ে গ্রামীণ লোকায়ত জীবনে শোলার মঞ্জুষা মূর্তি পূজা কমে যাচ্ছে। অনেকক্ষেত্রেই মনসা পূজার আবশ্যিক উপকরণ হিসেবে দেখা যায় সিজ বৃক্ষের ডাল। লৌকিক বিশ্বাস এই বৃক্ষের ডাল বিষ হরণ করে। এটি আদিম টোটেম বিশ্বাসেরই ফল।

কোচবিহারে সর্পাঘাতের আধিক্য না থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় রাজবংশী সমাজে সর্পদেবী বিষহরি পূজার ব্যাপক প্রচলন সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে W.W. Hunter সাহেব বলেছেন— "The snake goddess, Bis Hara (Poison destroyer) is also very largely worshipped by the people. This is the more strange, as there are very few poisonous snakes in kuch Behar"[৬০]

আসামের মনসা পূজায় দেওধানি পূজা হয়। কামরূপ কামাখ্যার পুরুষ দেওধাদের মত এই দেওধানি মেয়েরাও দশাগ্রস্ত অবস্থায় নাকি 'ভর' পড়েন এবং ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারেন।

"বাংলা তথা কোচবিহারের সর্পদেবী হংসবাহনা হলেও আসামের কোন কোন অঞ্চলে হস্তিবাহনা মনসাও পূজিত হন। কোচবিহারের মত আসামেও একে মারাই নামে পূজা করা হয়। শিলং-এর খালিয়া সম্প্রদায় এক সময় 'উথলেন' নামক লোকদেবতাকে পূজা করে নরবলি দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে মনসা বা শীতলা দেবীকে পূজা করা হয়। যেখানে তিনি সর্পাঘাতের চেয়েও মহামারী বা বসন্ত রোগের প্রতিরোধকারিণী।"[৩১]

মনসা সাপের দেবী। সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র হিন্দুরাই নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ও পূজা করে থাকেন। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বালাভূত গ্রামের মনসা বা বিষহরি পূজার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়। বালাভূত মোড়ে স্থানীয় দিলীপ রায়ের বাড়িতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হলেও হিন্দু-মুসলিম সকলের সহযোগিতায় ও আন্তরিকতায়, ওঝা রসতুল্লা মিঞার পৃষ্ঠপোষকতায় এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার দিন রসতুল্লা মিঞা তাঁর সাপে কাটা রোগী ঝাড়ার চামর, লাঠি, ডুগডুগি ও অন্যান্য উপকরণ মনসার সামনে রাখেন। কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজের অন্যান্য অনেক পূজা পার্বণের মত এখানেও এক জোড়া হাঁসের ডিম দেওয়া হয়। পূজার দিন শুধু বালাভূত নয়, অন্যান্য অঞ্চলের ওঝারাও বিশেষ করে রসতুল্লা ওঝার শিষ্যরা সবাই উপস্থিত থাকেন। এই পূজা উপলক্ষ্যে স্থানীয় জনশ্রুতি হল (এমনকি রসতুল্লা ওঝা নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় বলেন) পূজার দিন মন্ত্রপাঠের সময় জীবন্ত সাপ চলে আসে মূর্তির পাশে।

কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজে মূলত দুই রকমের বিষহরি পূজার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম হল পারিবারিক এবং দ্বিতীয় রূপ হল 'মারাই' পূজা বা 'গিদালী বিষহরি' পূজা। এই পূজার মূল উদ্দেশ্য নবদম্পতির জীবনের নিরাপত্তা, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা। বিয়ের পূর্ব থেকেই অনেক পরিবারে এই পূজা শুরু হয়। বিয়ের আনুষ্ঠানিক লোকাচারে দেখা যায় মারাই দেবীকে প্রণাম করে বর কন্যার বাড়িতে যাত্রা করেন; ফিরে এসে বরকন্যা দুজনে পুনরায় বিষহরি দেবীকে ফুলজল দিলে রাতে গানবাজনার মাধ্যমে পূজার লোকাচার শেষ হয়।

"রাজবংশী গৃহস্থের বাড়িতে তুলসীতলায় তুলসীগাছের পার্শ্বে দুইটি ছোট ছোট ঢিবি তৈরী করা হয়। এই ঢিবির একটি বিষহরি। মাটির ঢিবি বলে একে অনেকে 'মাটিয়া বিষহরি' বলেন।"[৩২] কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমায় 'মাটিয়া বিষহরি' পূজার প্রচলন বেশী।

জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষহরির মাটি ও শোলার তৈরী মূর্তি পূজার প্রচলনই বেশী। আবার সন্তান কামনায় 'সাইটল বিষহরি' পূজাও করেন অনেকে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস সাইটল বিষহরির কৃপাতেই বিবাহিতা রমণীগণ সন্তান ধারণ করেন।

গিদালী বিষহরি পূজায় গিদালীগণ দুই রকম গীত পরিবেশন করেন— জাগানী ও ভাসানী গীত।

মনসা বা বিষহরির অলৌকিক মাহাত্ম্য নিয়ে কোচবিহারের লোকজীবনে একটি জনপ্রিয় লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। এই লোকশ্রুতিকে কেন্দ্র করেই এতদঞ্চলে মনসার নাম হয়েছে 'হাড়হাড্ডি মনসা'। কোচবিহারের মদনমোহন বাড়িতে প্রতি বছর শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন এই হাড়হাড্ডি মনসার পূজা অ[illegible] অনুষ্ঠিত হয়।

এতদঞ্চলের বিষহরি পূজার বৈশিষ্ট্য হল এই পূজাকে উপলক্ষ্য করেই লোকসাহিত্য, লোকবিশ্বাস ও লোকসঙ্গীতের সব কটি শাখাই সমৃদ্ধ হয়েছে।

থানসিড়ি ঃ

জেলার রাভা উপজাতি সমাজে বিয়ের আগের দিন গৃহদেবী 'থানসিড়ি' পূজার আয়োজন করা হয়। থানসিড়ি রাভা উপজাতি সমাজের গৃহদেবী। থানসিড়ি শব্দটির অর্থে বোঝায় বসতবাড়ী বা গৃহস্থবাড়ীর সৌন্দর্য। অর্থাৎ গৃহস্থবাড়ীর মঙ্গল কামনা থেকেই এই দেবতার নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে তুলসী মঞ্চে অধিষ্ঠিত বাস্তু দেবতার মতই জেলার কৃষিজীবী রাভাগণ এই স্ত্রীদেবতার পূজা করেন। পূর্বদিকের বড়ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অথবা উত্তর দিকের বড়ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে দুই হাত উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বংশদন্ড মাটিতে পুতে সিঁদুর ও সরষে তেল লেপন করে স্থানীয় রাজবংশীগণ এই লৌকিক গৃহদেবতার পূজা করলেও রাভা সমাজের থানসিড়ি দেবতার রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। থানসিড়ি কোচবিহার জেলার রাজবংশীদের ধারণায় রন্ধনের দেবী এবং এই লৌকিক দেবীর পূজার নির্দিষ্ট কোন দিন নেই। স্থানীয় রাজবংশীদের মত কৃষিজীবী রাভাগণ পুত্র বা কন্যা সন্তানের বিবাহের পর থানসিড়ির সঙ্গে অনেক সময় শোলার মূর্তিতে 'কানিবিষহরি'র পূজাও করেন। থানসিড়ি রাভা সম্প্রদায়ের গৃহদেবী এবং কালীর প্রতিরূপ। এই দেবীর মূর্তি বলতে বোঝায় বাড়ীর উত্তর বা পূর্ব দিকের বড়ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছোট্ট একটি বাঁশের মাচার উপর দাম না করে অর্থাৎ একদামে কেনা এক হাঁড়ি চাল, তার উপর দুটি হাঁস বা মুরগীর ডিম বসিয়ে দেওয়া হয়। ডিম দুটির গায়ে দেওয়া হয় সিঁদুরের ফোঁটা। চকত বা হাতে তৈরী মদ এই পূজার প্রধান প্রসাদী উপকরণ। তুফানগঞ্জ মহকুমার ছাট্রামপুর গ্রামের নৈচান রাভা তাঁর পুত্র স্বপন রাভার বিয়ের পূর্বে থানসিড়ি পূজা করেন ২৭শে বৈশাখ ১৪০৫ সন। কোচবিহারে বসবাসকারী কৃষিজীবী রাভাগণ অপর এক লৌকিক দেবতার পূজা করেন, যার নাম 'নাখোব ঠাকুর'। গ্রামের কোন নির্জন প্রান্তে এই লোকদেবতার থান প্রতিষ্ঠা করেন তারা। নববর্ষ বা 'নভাতখোয়ার' দিন এই দেবতাকে পূজা দেওয়া তাদের অবশ্য কর্তব্য। মূর্তিহীন একটি প্রস্তর খন্ড অর্থাৎ বুড়া ঠাকুর বা মাসানের অনুরূপ এই দেবতার পূজায় রাভাগণ ফলমূলের সঙ্গে নিজস্ব তৈরী মদ অবশ্যই নৈবেদ্য হিসেবে দেন। জেলার কৃষিজীবী রাভা সম্প্রদায় বাড়ীর বলরাম বা তুলসী মঞ্চের পাশে অর্ধেক প্রোথিত কোন প্রস্তর খন্ডকে বৈদ্যনাথ ঠাকুর জ্ঞানে পূজা করেন। গৃহদেবতা বৈদ্যনাথ রাভা সম্প্রদায়ের কাছে শিবের প্রতিরূপ।

বারভাই বাইশ্যাল ঃ

বর্তমান বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার পোড়াবাড়ী গ্রামের স্থানান্তরিত লোকদেবতা এই 'বারভাই বাইশ্যাল'। এই দেবতার পূজায় কোন মৃন্ময় মূর্তি নেই। বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় শনিবার এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার একমাত্র তুফানগঞ্জ মহকুমার ভানুকুমারী অঞ্চলের থ্যাটারপাট গ্রামে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান পুরোহিত কৈবর্ত্য দাস-সম্প্রদায়ের স্বর্গত কবিরাজ সয়ম্বর দাসের পুত্র দীনেশচন্দ্র দাস। বারভাই বাইশ্যাল লোকদেবতার মৃন্ময় মূর্তি না থাকলেও পুরোহিত দীনেশচন্দ্র দাস নিজের হাতে পূজার মন্দিরের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থানে সিঁদুর দিয়ে যে তেরোজন দেবতার মূর্তি চিত্রিত করেন, তাঁরাই বারভাই বাইশ্যাল নামে পূজিত হন। স্থানীয় কৈবর্ত্য, ঝালমালো, দাস-সম্প্রদায় এই তেরোজন লোকদেবতাকে জাগ্রত মাসানের মত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। তেরোজন লোকদেবতা হল— "১। জলকুমার, ২। পুষ্পকুমার, ৩। কৃষ্ণকুমার, ৪। রূপকুমার, ৫। মধুভঙ্গিরা, ৬। হরিপাতাল, ৭। রূপমালী, ৮। গভূরদলন, ৯। ডোকরানাং, ১০। নিশাচরা, ১১। সুচিমুখী, ১২। মহামালী, ১৩। জনযক্ষিণী।"[৩৩]

'জনযক্ষিণী' এই বারোজন দেবতার একমাত্র বোন। এই তেরোজন দেবতার উদ্দেশ্যে তেরোটি খোলে ফলমূল নৈবেদ্য দিয়ে পূজার অর্ঘ্য সাজানো হয়। কোন শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ এই পূজা করেন না। বর্তমান পূজারী দীনেশচন্দ্র দাস।

শীতলা/বুড়িমা ঃ

জেলার রাজবংশী সমাজে বসন্ত রোগের দেবী হিসেবে পূজিত হন শীতলা, কোথাও বুড়িমা বা মাঠাকুরুণ নামেও পূজিত হন। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও সবার আজন্ম বিশ্বাস, এই শীতলা বা বুড়িমাই যেমন বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায় তেমনি এই রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও রাখেন। লোকায়ত বিশ্বাস মতে জেলার সকল গ্রামাঞ্চলে সরাসরি এই রোগের নাম উচ্চারণ না করে বলা হয় 'মায়ের দয়া' হয়েছে। এই রোগের নাম উচ্চারণ করলে শীতলা বা বুড়িমার কোপ সরাসরি পড়তে পারে। এমনকি শিশুদের গায়ে হাম হলেও বলা হয় 'মাসি-পিসি' হয়েছে। রোগ প্রতিরোধকারিণী এই লৌকিক দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত বিশেষ পূজা পদ্ধতি গড়ে উঠলেও জেলার একাধিক গ্রামে যেমন মাঘপালা গ্রামে বুড়িমা, হলদিবাড়ী থানার পয়ামারী গ্রামে বুড়িরপাট, তুফানগঞ্জ মহকুমার ছাট্‌রামপুর গ্রামে মা ঠাকুরাণী নামে পূজিত হন। এই পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সর্বত্রই পূজা অনুষ্ঠিত হয় গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এবং এজন্য মাগন সংগ্রহ করা হয়।

এই মহকুমারই ২ নং ব্লকের অন্তর্গত ভানুকুমারী অঞ্চলের থ্যাটারপাট গ্রামের বুড়িমা পূজিত হন প্রতি বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় শনিবার। বুড়িমাকে গ্রামবাসীগণ নবদুর্গা ও শীতলা জ্ঞানে পূজা ও ভক্তি করেন। স্থানীয় লোকশ্রুতি হলদি মেখে বুড়িমার আবির্ভাব হয়েছিল। সেজন্যই

বুড়িমার গায়ের রঙ হলুদ। লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরিহিতা এই দেবী ত্রিনয়নী। অবিভক্ত বাংলার টাঙ্গাইল মহকুমার পোড়া বাড়ীর স্থানান্তরিত কৈবর্ত্য সমাজ এই পূজার প্রবর্তন করেন। শীতলার বিকল্প বুড়িমার পূজার মানত স্বরূপ এক কুলা ধান, একটি গামছা, কাপড়, পাঁঠা ও পায়রা অনেকে উৎসর্গ করেন। জেলার হলদিবাড়ী থানার অন্তর্গত পয়ামারী গ্রামে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় শ্রীদাম দাস নামে এক ভ্রাম্যমান শীতলার মাগন সংগ্রহকারী ও পূজারীর সন্ধান পাওয়া যায়।

জয়নাথ মুন্সীর রাজোপাখ্যান মতে কোচবিহারে "বুড়ো-বুড়ি বলতে শিব-দুর্গা বোঝাত। বুড়া শব্দের অর্থ বাবা, বুড়ি মা। হীরা দেবী প্রত্যহ প্রাতে গাত্রোত্থান করে চিকনা পর্বতের প্রান্তস্থিত নদীতে স্নান করে তটস্থিত বুড়ির মন্ডপ নামক দেবস্থানে বনপুষ্প ও বিল্ব পত্র আহরণ করে পার্বতীসহ মহাদেবের পূজায় ধ্যানস্থ ও তদ্গত চিত্ত হয়ে থাকতেন।"[৩৪]

সাত বইনী ঃ

সাত বইনী বা সপ্ত মাত্রিকার পূজার প্রভাব বাংলাদেশ বা বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে 'সাত বইনী' নামক এই লৌকিক দেবীর পূজার প্রচলন থাকলেও কোচবিহার জেলায় এই দেবীর অস্তিত্ব খুব বেশী নেই। হলদিবাড়ী ব্লকের তিস্তাবুড়ি পূজার প্রবীণা মারেয়ানী বা দেওধা রেবতীবালা রায়ের মতে 'তিস্তাবুড়ি পাঁচ বইনীর অন্যতম।' কল্পিত এই পাঁচ বইনী হলেন দুর্গা, কালী, গঙ্গা, সরস্বতী ও তিস্তা। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখা যায় কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ী ১ নং অঞ্চলের অন্তর্গত বাঁশরাজা গ্রামে প্রতি বছর চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমী তিথিতে সাতবোনের মূর্তি করে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। "বাংলাদেশেও মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, শড়িবিবি, আসানবিবি, আজগইবিবি, বাহরাবিবি. ঝেটুনবিবির প্রভাব আছে।"[৩৫] লোকসংস্কৃতিবিদ ডঃ ওয়াকিল আহমেদের মতে বাংলাদেশে এর প্রভাব বেশী থাকলেও এপার বাংলার একমাত্র ২৪ পরগণা জেলাতেই এই লৌকিক দেবীর প্রভাব বেশী। সাত বইনীর বিকল্প সাতবিবির সম্পর্কে অনেক লোকগাঁথাও শোনা যায়। কোচবিহারে পাঁচটি মহকুমার গ্রামাঞ্চলে পূজিত শীতলা, বুড়ি, কালী, তিস্তাবুড়ি, যখি প্রভৃতি নামে একক ভাবে পূজিত হলেও সাতবোন একসঙ্গে পূজিত হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল। বর্ণহিন্দু সমাজে সপ্ত মাত্রিকার পূজা হয়। এক্ষেত্রে নাম পাওয়া যায় ব্রাহ্মী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, বরাহী প্রভৃতি শাস্ত্রীয় দেবীর। কোচবিহারের সাত বইনীও সপ্ত মাতৃকা বা সপ্তবিবি কল্পনাপ্রসূত বললে অত্যুক্তি হবে না।

উত্তরবঙ্গের অন্যতম কোচবিহার জেলা লোকসংস্কৃতির উৎসভূমি। এই জেলারই আসাম সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত তুফানগঞ্জ মহকুমার বাঁশরাজা গ্রাম। রাজবংশী রাভা অধ্যুষিত এই গ্রামের পাঁচশটি রাভা জনজাতি পরিবার কৃষি নির্ভর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসে একাত্ম হয়ে থানসিড়ি ও রঙতুক পূজা যেমন করেন তেমনি গ্রামের রাজবংশী সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিব, বুড়াঠাকুর, মহাকাল, বলরাম ও বৈদ্যনাথ ঠাকুরের পূজাও করেন। এই গ্রামেরই

প্রবীণ নৈচান রাভার পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র রাভা তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি রাভা ক্ষেত্র-সমীক্ষায় এক সাক্ষাৎকারে গ্রামের সাত বইনী লোকদেবীর পূজা ও মেলার কথা শোনান। বোনকে স্থানীয় রাজবংশী ভাষায় বলা হয় বইনী। তুফানগঞ্জ মহকুমার বাঁশরাজা গ্রামের পূর্ব প্রান্তে রায়ডাক নদীর এক মরাখাতে শেওড়া গাছের নীচে ছনের চালাঘরে সাত বইনীর সাতটি মূর্তি পাশাপাশি শীতলার মত পা নামিয়ে বসা অবস্থায় এই দেবী পূজিত হন। এই দেবীর কোন বাহন নেই। সাতবোনের মাঝের মূর্তিটি বড় বোনের। প্রত্যেকের ডানহাতে শাঁখা, বাঁ হাতে বরাভয়। তিন বোনের মুখের রঙ হলুদ, বাকি চার বোনের কমলা, সাতবোন সাত রঙের শাড়ি পরা। মূর্তিশিল্পী রাজবংশী সমাজের স্থানীয় তিলেশ্বর বর্মণ। চৈত্র মাসের অষ্টমী তিথিতে পূজা হয়। রাজবংশী, রাভা ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ও এই পূজা করেন। সবই উৎসর্গ করা হয়, বলি হয় না। স্থানীয় অধিকারী সম্প্রদায় পৌরোহিত্য করেন। কোচবিহার জেলায় এরূপ স্বতন্ত্র মূর্তি দিয়ে একই সঙ্গে সাতজন লোকদেবীর পূজার দৃষ্টাণ্ড খুবই বিরল। রোগ, ব্যাধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শিশুরোগ ও অপদেবতার হাত থেকে রাজবংশী ও রাভা সম্প্রদায়ের সৃষ্ট এই পূজা ও মেলা জেলার একমাত্র উল্লেখযোগ্য লোকায়ত নিদর্শন বলা যায়।

সুঙ্গাই ঃ

কোচবিহার জেলার প্রায় সব মহকুমায় বসবাসকারী পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বিক্রমপুর অঞ্চলের বারুজীবী সম্প্রদায়ের এক আরাধ্য দেবতা 'সুঙ্গ াই'। কোন শাস্ত্র গ্রন্থে এই দেবতার নামও উল্লেখ নেই। অশাস্ত্রীয় এই লৌকিক দেবতা পান উৎপাদনকারী বারুজীবী সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা। এই সম্প্রদায়ের লোকবিশ্বাস, সুঙ্গাই দেবী সদয় হলে যেমন পানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে পানের বরজ রক্ষা পাবে। প্রতি বছর আশ্বিন মাসের শারদীয় নবমী তিথিতে পানের দেবতা সুঙ্গাই পূজিত হন। এই লোকদেবতার কোন মূর্তি বা মন্দির নেই। তাৎক্ষণিক ভাবে পানের বরজেই এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারের বারুজীবী সম্প্রদায়ের পান চাষীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা সুঙ্গাই দেবীর পূজা করেন একটি বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও বারুজীবী সমাজে উপাস্য দেবী সুঙ্গাই অনেকের মতে 'অকুমারী' এবং এই দেবীর অধিষ্ঠান পানের বরজে। এই বিশেষ সম্প্রদায়ের আজন্ম লালিত বিশ্বাস, এই দেবীর আর্শীবাদেই পৃথিবীতে পান উৎপাদন সম্ভব। লোকশ্রুতি এই যে সুঙ্গাই দেবী বারুজীবী সম্প্রদায়ের কাছে পূজা প্রার্থনা করে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি তাঁদের রক্ষা করবেন। তাই বারুজীবী সমাজ তাঁদের জীবন ও জীবিকার স্বার্থেই প্রতি বছর শারদীয়া নবমী তিথিতে এই পূজা করেন। ডঃ কাঞ্চন মিত্র তাঁর বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ গ্রন্থে একটি লোকশ্রুতির উল্লেখ করেছেন ঃ "সুঙ্গাই কার্তিকের বাগদত্তা ছিলেন, বিবাহ বাসরে দেবী সুঙ্গাই জানতে পারেন কার্তিক প্রজনন ক্ষমতায় অক্ষম। তাই তিনি বিবাহে নারাজ হন। বাগদত্তা সুঙ্গাই লগ্ন ভ্রষ্টা হন। তাই তিনি কুমারী এবং সধবা নন। ফলত দেবী অকুমারীই থেকে যান।"

এই পূজায় মেয়েদের কোন ভূমিকা নেই। ঘট স্থাপন পূর্বক পুরুষরাই দেবীর অধিষ্ঠান পানের বরজে এই পূজা দেন। দেবী সুঙ্গাই-এর হারানো কুমারীত্বের যন্ত্রণা ও সধবার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের কারণে এতদঞ্চলের বারুজীবী সম্প্রদায়ের মহিলারা এই পূজা করেন না। পূজার উপকরণ পান, সুপারী, তেল, সিঁদুর, বাতাসা ও আম্রপল্লবসহ একটি ঘট। কোন মন্ত্র নেই। ভক্তি-বিনম্র চিত্তে অর্ঘ্য প্রদান করে প্রণামই এই পূজার মূল আঙ্গিক।

ক্ষেত্র-সমীক্ষায় এক সাক্ষাৎকারে (১৭/১০/৯৭ইং) তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রবীণ বারুজীবী সম্প্রদায়ের ধীরেন্দ্র দত্ত ও সুমতি দত্ত জানান— "বর্তমানে তাঁদের মধ্যে যাঁরা শুধুমাত্র পান চাষের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ যাঁদের পানের বরজ আছে তাঁরাই এই পূজার সঙ্গে যুক্ত। যাঁরা ভিন্ন পেশা বা অন্য পেশায় যুক্ত তাঁরা এই পূজা করেন না।"

জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার ধলপল গ্রাম কোচবিহারের বাবুরহাট গ্রামাঞ্চলের বারুজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশী।

ভান্ডানী ঃ

লোকসংস্কৃতির এক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জেলা হল কোচবিহার, আর তার ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীক হল লৌকিক দেবদেবী যার অন্যতম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ভান্ডানী / ভান্ডালী দেবী। জেলার লোকজীবন ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে এই লৌকিক দেবী ভান্ডানীর মাধ্যমে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার ভান্ডানী দেবী কোন কোন গ্রামে 'ডাংধরী মাও' নামেও পূজিতা। ভান্ডানী দেবী জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায় স্থান ভেদে ভান্ডালী কিংবা ভান্ডারনী নামেও পরিচিতা। পৌরাণিক দুর্গা পূজার দশমীর পরদিন অর্থাৎ একাদশীর দিন থেকে তিনদিন ধরে এই পূজা হয়ে থাকে। জলপাইগুড়ি জেলার সকল গ্রামে এই পূজার প্রচলন থাকলেও কোচবিহার জেলার তিস্তা ও তোর্ষা নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে এই লৌকিক দেবীর পূজার প্রচলন দেখা যায়। ব্যাঘ্রবাহনা নারীমূর্তি এই দেবীর প্রতীক। দ্বিভুজা এই দেবীর এক হাতে পাত্র অন্য হাতে বরাভয়। আবার জলপাইগুড়ি জেলার ভান্ডানী গ্রামের মূর্তির দুটি হাতই খালি। এখানে ভান্ডানীর সঙ্গে শিব/মহাদেব কিংবা অন্য কোন মূর্তি নেই। ভান্ডানী পূজার মূল উপকরণ দুধ, দই, চিনি, বাতাসা, আতপ চাল, কলা, নারকেল, বাতাবি লেবু, বিল্বপত্র, ধান, দুর্বা, ফলমূল। যজ্ঞের জন্য আটরকম জ্বালানী কাঠ। স্থানীয় পুরোহিত দেউসী রাজবংশী ভাষায় ভান্ডানী দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা, আবাহন, বিসর্জন যাবতীয় মন্ত্র পাঠ করে পূজা শুরু করেন। বর্তমানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পূজার পুরোহিত আসামের শর্মা উপাধিধারী ব্রাহ্মণ। এক ক্ষেত্র-সমীক্ষায় মেখলীগঞ্জ মহকুমার নিজতরফ গ্রামে ভান্ডানী পূজায় উপস্থিত থেকে বর্তমান পূজারী উপেন্দ্রনাথ শর্মার কাছ থেকে একটি ধ্যানমন্ত্র শোনা যায়। এটি হল—

"ওঁ দেবীং দানব মাতরম নিজ সদাঘূর্নম্মহালোচনাম্।
দংষ্ট্রাভামমুখী জটানিবিল সম্মৌলী, কপাল স্রজন্,
বন্দোলোক ভয়ঙ্করীং খম রুচিং নাগেন্দ্র হাড়োজালাম্।
সর্পাবদ্ধ নিতম্ব বিপুলাং বানালধনুকি প্রতীম্।"[২২]

ভান্ডানী পূজা জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় সকল গ্রামে অনুষ্ঠিত হলেও কোচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ মহকুমার ডাঙ্গার হাট, নিজতরফ গ্রাম, রাণীর হাট, কামাত চাংড়াবান্দা, দেবীর ডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে সার্বজনীন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীনত্বের বিচারে নিজতরফ গ্রাম ও রাণীর হাট গ্রামের পূজা অগ্রণী। নিজতরফ গ্রামের বাঁধানো ভিতের উপর টিনের চালাঘরের দক্ষিণমুখী মন্দিরে ভান্ডানী দেবীর বাৎসরিক পূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের সকল পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি হয় মানত স্বরূপ। ভান্ডানী অনেক গ্রামে বনদুর্গা নামেও পরিচিত। জলপাইগুড়ির অনেক গ্রামে পশু বলি হয় না। ভান্ডানী দেবীর সঙ্গে দুর্গার মত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ থাকে না। মহকুমার সব কটি পূজা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট গ্রামে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার কেশরীবাড়ী ও কেদার হাটে ভান্ডানী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মেখলীগঞ্জ মহকুমার মাথাভাঙ্গা ও হলদিবাড়ীর নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রাম ব্যতীত জেলার আর কোন মহকুমার গ্রাম বা শহরাঞ্চলে এই পূজার প্রচলন নেই।

ভান্ডানী দেবী মূলতঃ দ্বিভুজা, ব্যাঘ্রবাহনা। তা সত্ত্বেও কালের বিবর্তনে কোন কোন ক্ষেত্রে চতুর্ভুজা, দশভুজা এবং সিংহবাহনাও দেখা যায়। এই দেবী সম্পর্কে তিনটি লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। জেলার পাটছড়া গোপালপুর গ্রামে প্রতি বছর আশ্বিন মাসের দুর্গা পূজার পরদিন অর্থাৎ একাদশী তিথিতে ব্যাঘ্রবাহনা চতুর্ভুজা ভান্ডানী দেবীর পূজা হয়।

কোচবিহারে লোকায়ত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে লৌকিক দেবদেবীর অবস্থান কত গভীরে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ভান্ডানী দেবী। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে একদা উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহারের অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলের এই লৌকিক দেবীকে অরণ্যদেবী বা বনদেবী বললেও অত্যুক্তি হবে না।

হিন্দু মুসলিম মিলিত সংস্কৃতির দেবতা ও অনুষ্ঠান (পীর, দরবেশ ইত্যাদি)

মুসলিম সুফী দর্শন অনুযায়ী পীরবাদ এবং হিন্দু ধর্মানুযায়ী গুরুবাদ একই ধারণা প্রসূত। দুটি তত্ত্বই অধ্যাত্ম সাধনার বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দু মতে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে সম্পর্ক, মুসলিম মতেও তেমনি আল্লা ও বান্দার সম্পর্ক তৈরী হয় ভক্তি ও উপাসনার দ্বারা।

ভারতবর্ষে পীর-দরবেশের আগমন দশম শতাব্দীতে ঘটলেও কামরূপে খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে ধর্মাবলম্বী সাধুসন্তগণ এতদঞ্চলে আসতে শুরু করেন। ইসলামের ভক্তি-শাস্ত্র অনুযায়ী এদের স্থান ভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিতি আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণ পর্যটকের ভূমিকায় এসে পীর, ফকির, দরবেশ নামে পরিচিতি লাভ করেন। এঁদের অনেকে হিন্দুর আখরা, ধাম, সত্র প্রতিষ্ঠানের মত ধাম বা আখরা প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম প্রচার করেন এবং অনেকে দেহরক্ষা করে উক্ত স্থানকে দেবত্বের মহিমায় ভূষিত করেন। কোচবিহার জেলায় এমনি উল্লেখযোগ্য একাধিক প্রাচীন মাহাত্ম্যমূলক দরগাহ বা ধাম আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

কোচবিহারে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সংস্কৃতিজাত ও ধর্মীয় ভাবনার উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পীর মাহাত্ম্যসূচক দরগা ও মাজারগুলি। এই জাতীয় পীর দরগা নির্ভর উৎসবের প্রচলন ও উদ্ভবের পেছনে যে সমকালীন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক কারণ বিদ্যমান তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। "মুসলিম কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরভারত থেকে মুসলিম ফকিরগণ বাংলাদেশে এসে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেন এবং সমকালীন রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তায় তাঁরা এদেশীয় হিন্দু সমাজের জনমানসে ইসলাম ধর্মীয় চেতনার প্রভাব বিস্তারে মনযোগী হন।"[৩৭]

বাঙ্গালীর জাত-পাত নির্ভর বর্ণভেদ প্রথা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচার, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে বিভেদ ও ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলেও অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

কোচবিহারের মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি স্বরূপ কয়েকজন পীরের জীবন মাহাত্ম্য, অলৌকিক কার্যকলাপ, ধর্মীয় প্রচারমূলক বৃত্তান্ত ও পীরগণের আত্মত্যাগ ও তাঁদের পূত চরিত্র নিয়ে অনেকে গীত ও পাঁচালী রচনা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরবঙ্গের হিন্দু কবি কৃষ্ণহরি দাস। তিনি রচনা করেন সত্যপীরের পাঁচালী। বিস্ময়ের ব্যাপার এই হিন্দু কবির গুরু ছিলেন মুসলিম মামুদ সরকার—

" তাহের মামুদ গুরু শমস নন্দন
তাহার সেবক হয়ে কৃষ্ণহরি গান।"

প্রাচীন কামতাপুর, ধলুয়াবাড়ী, কোচবিহার সদরের তোর্ষা পীর ধাম নামক মুসলিম পীরের দরগা আজ ঐতিহাসিক পুরাসম্পদে পরিণত হয়েছে। কোচবিহারের তোর্ষা পীর, শাহফকির কামাল পীরগণ উল্লিখিত দরগায় একদিন নিরাপদে নিশ্চিন্তে বাস করে তাঁদের ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। বর্তমানে উক্ত স্থানগুলি পীরোত্তর বা পীরপাল ভূমি হিসেবে কোচবিহার রাজ আমল থকে চিহ্নিত।

পীর দরবেশদের বাৎসরিক 'ওরস' বা 'ইসালে সাওয়াব' নামক ধর্মসভা বা ধর্মীয় মিলন মেলা একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান যা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় পীরগণের সমাধিস্থল, মাজার বা দরগাহে। এই উৎসবের সঙ্গে হিন্দুর মেলা নামক উৎসবের সাদৃশ্য আছে। জেলার লোকউৎসব ও মেলায় ধর্মীয় সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করে চলেছেন ভক্তপ্রাণ মুসলিমগণ তাঁদের নির্দিষ্ট বিভিন্ন তিথি ও তারিখে। এমনই এক উল্লেখযোগ্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত পীর, দরগাহ বা মাজার-নির্ভর উৎসব হল হলদিবাড়ী ব্লকের হুজুর সাহেবের মেলা। হিন্দুর মেলায় মুসলমান, মুসলমানের মেলায় হিন্দুর আগমন এরূপ উৎসবকে এক মিলনমেলায় পরিণত করেছে। শুধু কোচবিহার জেলাই নয় হলদিবাড়ীর হুজুর সাহেবের মেলা আজ দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসামের ভক্তপ্রাণ মানুষের কাছে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোচবিহারের হিন্দু বাঙালীর লোকায়ত ধর্মীয় জীবন, কৃষিকর্ম ভিত্তিক সমাজ জীবন, আর্থ সামাজিক ও লৌকিক সংস্কৃতিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থার অন্তস্থলে পীরবাদের শেকড় নিহিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে জেলার তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলীগঞ্জ ও হলদিবাড়ী ব্লকের জনজীবনে লোকবিশ্বাস-জাত যে ধ্যান-ধারণা ও শ্রদ্ধাভক্তি মিশ্রিত অখন্ড বিশ্বাস গড়ে উঠেছে পীর ও দরবেশগণের সর্ম্পকে তা হল—

১। সকল পীরগণই আধ্যাত্মিক মহিমায় মহিমান্বিত ধর্মগুরু, যাঁদের জীবনে ভোগের চেয়ে ত্যাগের আদর্শই বড়।

২। প্রত্যেক পীরই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁদের ক্ষমতা ও কেরামতি দ্বারা তাঁরা যেমন যে কোন জিনিস ঘটাতে পারেন তেমনি যেখানে খুশী যাতায়াত করতে পারেন। প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও দুর্ঘটনাকেও প্রতিরোধ করতে পারেন। কোচবিহারের তোর্ষা পীর ও পাগলা পীর এই শ্রেণীভুক্ত।

৩। প্রায় সকল পীরগণই ভবিষ্যৎ বাণী করার অধিকারী।

৪। সকল পীরগণই মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ করেন, সন্তানহীনকে সন্তান দান করেন, ফলহীন বৃক্ষকে ফলবতী করেন। এঁদের অনুগ্রহে আরব্ধ কাজে সফলতা লাভ করা যায়। খোয়াজ পীর এই শ্রেণীভুক্ত।

৫। পীরগণ দুরারোগ্য ব্যাধি নিবারক ও প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখেন। মানুষের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দূর করেন, মহামারীর আক্রমণ প্রতিরোধ এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করেন। পীরগণ তুকতাক, ঝাড়ফুঁক লোকচিকিৎসার কাজ করেন। বাংলা তথা উত্তরবঙ্গের সর্বত্র পূজিত সত্যপীর এই শ্রেণীভুক্ত।

৬। পীরগণ শুধু মানুষের উপরই কর্তৃত্ব করেন না জীব-জন্তুর উপরও করেন। সাপ, বাঘ, কুমীর, কুকুর তাঁদের বশ মানে। এ সকল জীব-জন্তু মানুষকে আক্রমণ করলে বা কামড়ালে পাগলা পীরের স্মরণাপন্ন হলে মুক্তি পাওয়া যায়। এই বিশ্বাস সমগ্র কোচবিহারের মত উত্তরবঙ্গেও সমধিক প্রচলিত।

ডাঃ ওয়াকিল আহমেদের মতে পীরগণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন— "ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, লৌকিক।"[৩৮]

জেলার সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী হলেও পীর পূজার ক্ষেত্রে কোন মূর্তির আরাধনা করেন না। সকল ক্ষেত্রেই পাট বা প্রস্তরখন্ডকে পীরের প্রতীক হিসেবে পূজা করেন। কোচবিহার জেলার বিভিন্ন গ্রামে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় যেসব পীরের প্রতীক আমরা চাক্ষুষ করেছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী হল সত্য পীর, পাগলা পীর, তোর্ষা পীর ও হুজুর একরামুল হক-এর মাজার সরীফ। জেলার লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই পীরগণের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির কেরামতি ও লৌকিক কাহিনী উত্তরবঙ্গের লোকমানসে এক চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে।

কোচবিহার জেলার হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বিত যে সকল পীরের মাহাত্ম্য কোচহিারের লোকসংস্কৃতির এক ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন, তা হল— ১। পাগলা পীর, ২। তোর্ষা পীর, ৩। খোয়াজ পীর, ৪। সত্য পীর, ৫। পীর একরামুল হক (হুজুর সাহেব)।

পাগলা পীর ঃ

পীর কথাটি মুসলিম ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিচয়বাহী হলেও কোচবিহারের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিশেষ করে গ্রামের শিশু-কিশোরদের মধ্যে পাগলা পীরের পূজার প্রচলন দেখা যায় বেশী। কোন কোন মহকুমার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ দলবদ্ধ ভাবে মাগন সংগ্রহের মাধ্যমে এই পাগলা পীরের পূজা উৎসবে মেতে ওঠেন। হলদিবাড়ী, মেখলীগঞ্জ মহকুমায় গ্রামীণ বালকগণ একটি বাঁশের কঞ্চির মাথায় পাট এবং মান্দার গাছের লাল ঝুমকো ফুল বেঁধে দিয়ে দলবদ্ধ ভাবে বাড়ী বাড়ী ঘুরে পাগলা পীরের মাগন তুলে বেড়ান। গৃহস্থ বাড়ীর উঠোনে প্রবেশ করে সোনারায়ের মাগন তোলার ঢং-এ প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের ১৩ তারিখে এই পাগলা পীরের ভক্তের দল বলে ওঠেন— "পাগলা পীরের নিমাত্তে বলো আল্লা"। "হুকা করে টোরোৎ টারাৎ ছিলিমের পুটকিত ছাই, এই বাড়ীর ভিক্ষা পাইলে অন্য বাড়ী যাই"। অর্থাৎ হুকার জলে শব্দ হয়ে কল্কিতে ছাই জমেছে, এই বাড়ীর মাগন পেলে অন্য বাড়ী যাওয়া হবে ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে পাগলা পীরের ভক্তগণ মাগন দেওয়ার পর দাতাকে এটি মাদারের ফুল আশীর্বাদ স্বরূপ দেন।"[৩৯]

এই অনুষ্ঠান জেলার একমাত্র মেখলীগঞ্জ মহকুমার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়। সারাদিন অর্থ ও মাগন সংগ্রহের পর ভক্তগণ দই, চিনি, কলা, বাতাসা প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে গ্রামের কোন পাটে বা থানে উক্ত পাগলা পীরের প্রতীককে পূজা দেন। কোচবিহার জেলায় পাগলা পীর গ্রাম/গেরাম ঠাকুরেরই অন্যতম রূপভেদমাত্র। অনেক পাড়াতেই গোষ্ঠীবদ্ধভাবে হিন্দু রাজবংশীগণের পূজিত গ্রাম ঠাকুরের থানে বা পাটে পাগলা পীরের আসন বা থান নির্দিষ্ট আছে। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই রাজবংশী যুবকগণ এই পূজার উদ্যোগী। নির্দিষ্ট থান বা পাটের বাইরেও জমিতে ১-২ ফুট উঁচু বেদী তৈরী করে মাগনে অংশগ্রহণকারী বালকগণ একটি করে লাঠি পুঁতে দেন। বালকদের মধ্যে বয়সে যিনি জ্যেষ্ঠ পশ্চিম দিকে মুখ করে দুধ, চিনি, কলার 'ছিন্নি' তৈরী করে পাগলা পীরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। এ সময় পরিধেয় ধুতির কাছা খুলে তিন বার প্রণাম করেন। এ পূজায় নির্দিষ্ট কোন পূজারী বা মন্ত্র নেই। জেলার একমাত্র মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ী ব্লকেই পাগলা পীরকে কেন্দ্র করে এরূপ অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। পূজার সময় পাগলা পীরের নিমিত্তে আঙ্গিক ও মাগন তোলার পদ্ধতি সব কিছুর সঙ্গেই জেলার হিন্দু রাজবংশীগণের পালিত সোনারায়ের পূজার, আঙ্গিক ও লোকাচারের সাদৃশ্য আছে। গত ৯/৩/৯৮ ইং তারিখে জেলার দিনহাটা মহকুমার কিশমৎদশ গ্রামে এক ক্ষেত্র-সমীক্ষায় আমরা প্রত্যক্ষ করি উক্ত গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে ময়না, জিগা ও বটগাছের নীচে মূর্তিহীন পাকা বেদীর লোকদেবতা "ডাংধরার" পাটের পাশেই পাগলা পীরের বাঁধানো বেদীর অবস্থান। এই ডাংধরার পাটের পাগলা পীরের পাশাপাশি পূজিত হন কালী ও পোষামাসান। ষাট উর্ধ্ব গ্রামবাসী সিন্ধু বর্মন জানান জীব-জন্তু কামড়ালে বিশেষ করে পাগলা কুকুরের কামড়ের ফলে জলাতঙ্ক রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য এবং যাতে পাগলা কুকুর না কামড়ায় তার জন্যই গ্রামবাসীগণ এই পাগলা পীরের থানে মানত পূজা দেন। মূর্তিহীন এই সিমেন্টের বেদীই এখানে পাগলা পীরের প্রতীক এবং এই মানত পূজার কোন নির্দিষ্ট দিন তারিখ নেই। অনেকে মনস্কামনা পূর্ণ হবার পর পায়রা বা কবুতর উৎসর্গ করেন।

জেলার হলদিবাড়ী ব্লকের মাইল দশেক দক্ষিণে বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার অন্তর্গত চিলমারী গ্রামে (তিস্তা নদীর প্রান্ত দেশে) পাগলা নদীর তীরে প্রতি বছর চৈত্র মাসে পাগলা পীর বা পাগলা দেও-এর নামে একটি মেলা বসে।

কোচবিহার জেলার গুদাম মহারাণীগঞ্জ অঞ্চলের তোর্ষা পীরের সমাধি সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে তোর্ষা পীর, সত্য পীর পূজিত হন। প্রতি বছর পবিত্র মহরমের দিন পাগলা পীরের শ্বেত-শুভ্র বেদীতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তপ্রাণ মানুষ লাল ও সাদা রঙের নিশান, খই, বাতাসা ও ধূপকাঠি নিবেদন করেন। দেড় ফুট উঁচু পাকা বেদীর উপর উল্টানো পেঁয়াজের মত চুনকাম করা তিনটি বেদী এই পীরের প্রতীক। বেদীর সামনে ষোলটি সিঁদুরের ফোঁটা।

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী ২নং অঞ্চলের চারালজানি গ্রামের মাহুত পাড়ায় জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন এক পাগলা পীরের পাট অবস্থিত। পূর্বমুখী দরমার বেড়ায় ঘেরা একটি টিনের চালাঘরেই এই পাগলা পীরের অধিষ্ঠান। থানের মধ্যে দুটি লাল শালুর নিশান, দুটি বাতিগছা, জোড়া তরোয়ালের মত দুটি জোড়া বাঁশ মাটির বেদীর উপর অধিষ্ঠিত এবং উপরে ছোট লাল কাপড়ের চাঁদোয়া টাঙানো এটাই পাগলা পীরের প্রতীক। এই থানে পাগলা পীরের পাশাপাশি সত্য পীরও পূজিত হন। "মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শতাধিক বছরের প্রাচীন পাগলা পীরের এই থানে শৃগাল, পাগলা কুকুরের কামড়, দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি ও মনস্কামনা পুরণের জন্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষই এখানে দুধ, কলা, আতপ চাল, পাঁঠা, পায়রা, মোরগ উৎসর্গ করেন। পাগলা পীরের নামে সোয়া কেজি দুধ, চাল দিয়ে সিন্নি দেন অনেকে।"[৭০] পাগলা পীরের এই থানে দৈনিক ফুল জল দেন গ্রামবাসীগণ। গ্রামবাসী মহম্মদ মহীউদ্দিন মিঞা ও সবে মিঞার মতে পাগলা পীর ও সত্য পীর এখানে গ্রামবাসীর রক্ষক ও জাগ্রত গ্রামদেবতা। উক্ত অঞ্চলের মাছুয়াটারির ধামে কালী, বাঘশূর, বিষহরী, বুড়া-বুড়ি, মুরিয়া মাসান ও কুমীরদেবের পাশাপাশি পূজিত হন পাগলা পীর। কোচবিহার জেলার হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় সংস্কৃতি সমন্বয়ের এটি একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত শিতলকুচী থানার মুসলিম অধ্যুষিত বড় মরিচা গ্রামের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পাগলা পীরের নামে খই, বাতাসা, মোমবাতি দেন। অনেকে মুরগীও মানত করেন। এছাড়াও পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের থান ও পাটে মাসান, কালী ও বুড়া ঠাকুরের পাশাপাশি পাগলা পীর ও সত্য পীর পূজিত হন।

তোর্ষা পীর ঃ

কোচবিহার জেলার হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত সংস্কৃতির অপর এক নিদর্শন হল 'তোর্ষা পীর' ধাম বা দরগা। কোচবিহার জেলার পুরাকীর্ত্তি বা প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন স্বরূপ এই স্থানটি আজ কেবল কোচবিহারই নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে একটি পবিত্র ভূমি। বর্তমানে কোচবিহার শহরের পৌর এলাকা থেকে আধ মাইল দক্ষিণে তোর্ষা নদীর রেল সেতুর উত্তর পার্শ্বে গুদাম মহারাণীগঞ্জ অঞ্চলে তোর্ষা পীরের মাজার অবস্থিত। স্থানীয় জনমানসে 'তোর্ষা পীর ধাম' নামে পরিচিত। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের আমলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে এই পীরের আবির্ভাব ঘটে। জেলায় প্রচলিত জনশ্রুতি হল এই তোর্ষা পীরের প্রভাবে ও তাঁর অলৌকিককর্মকান্ডে অভিভূত হয়ে বহু মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই পীরের প্রকৃত নাম কেউ জানে না। শুধুমাত্র তোর্ষা নদীর তীরে সাধন ভজনের জন্য বাস করতেন বলে তাঁর নাম 'তোর্ষা পীর' হয়। কোচবিহার জেলায় তোর্ষা নদী এবং তোর্ষা পীর সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী ও লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। তোর্ষা পীর সম্পর্কে জেলার মানুষের অখন্ড বিশ্বাস 'তিনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যেমন একাধারে

অনেকক্ষণ বা কয়েকদিন ধরে তোর্ষা নদীর জলে ডুবন্ত অবস্থায় যোগাভ্যাস করতে পারতেন, তেমনি ঐ অবস্থায় যদি কোন দর্শনার্থী বা ভক্ত তাঁর দর্শন প্রার্থনা করেন তাহলে তিনি হাত তুলে তাঁর অবস্থানের কথা জানাতেন এবং মনস্কামনা পূর্ণ করতেন।'

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন তাঁর একান্ত অনুগত ভক্ত। "তৎকালীন অন্যান্য রাজাগণও এই পীরের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন এবং তোর্ষা পীরের দরগায় নিয়মিত সিন্নি প্রদানের জন্য তৎকালীন রাজ সরকার দীর্ঘদিন ধরে অর্থ সাহায্য করতেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ পীরের এই দরগার বা মাজারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমি পীরপাল বা পীরোত্তর হিসেবে দান করেন।"[৭২]

বর্তমানে কোচবিহারে এই অঞ্চলটি গুদাম মহারাণীগঞ্জ নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের তোর্ষা পীরের বর্তমান মাজার কোচবিহারের দেবত্র ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষকতায় রক্ষণাবেক্ষণ হয়। মাজারটি প্রায় চার ফুট উঁচু, প্রায় দশ ফুট লম্বা, চওড়া চার ফুট। চারচালা টিনের ঘরের মধ্যে অবস্থিত চারদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

বিগত ৭/৫/৯৮ ইং তারিখ, মহরম উৎসবের দিন ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে উক্ত মাজারের মহরম উৎসবের তাজিয়া শিল্পী গাটু মিঞা ও আকবর মিঞা জানান— মহরমের দিন এই তোর্ষা পীরের "সমাধিস্থলে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মোরগ, পোলাও, সাদা কাপড়ের ঝুটিসহ লাল নিশান, বাতাসা, খই, মুড়ি মানত হিসেবে নিবেদন করেন।"[৪২]

জেলার জাগ্রত এই পীরের সমাধিস্থলে ভক্তপ্রাণ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনস্কামনা নিয়ে হাজির হন প্রতি বছর মহরমের দিন। তোর্ষা পীরের সমাধি বেদীর রং সাদা, ওপরে মধ্যস্থলে একটি মৃন্ময় ঘট চক ও সিঁদুরের তিনটি ফোঁটা দিয়ে সজ্জিত। ঘটের উপর আম্রপল্লব এবং ঘটের সম্মুখে শোলার ফুল। এই মাজার বা দরগায় লাল নিশান এবং খই বাতাসা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন দর্শনার্থীগণের একটি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করা হয়।

পীরের সমাধির উপর লাল শালু, মাটির ঘট তার উপরে সিঁদুর ও চকের টিপ, সাতটি পাতাযুক্ত আম্রপল্লব— হিন্দুর ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাব বলে মনে করা হয়।

তোর্ষা পীর ধামের তোর্ষা পীরের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত সত্য পীর, গাজী পীর, পাগলা পীরের বেদী। উন্মুক্ত স্থানে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা এই তিন পীর একই সঙ্গে মহরমের দিন সকল মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিবেদন স্বরূপ লাল নিশান ও খই বাতাসা পেয়ে থাকেন। প্রতি বছর পাঁচ পীরের উদ্দেশ্যে মহরমের পাঁচ দিন আগে সোয়া কেজি দুধ দিয়ে সিন্নির নৈবেদ্য নিবেদনের প্রাচীন প্রথা এখনও বিদ্যমান।

খোয়াজ পীর ঃ

উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত পীর হলেন খোয়াজ পীর। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এই পীর কোচবিহার জেলায় একদিন দেব-মহিমায় উন্নীত হন। "উত্তরবঙ্গের মানুষের লোকায়ত বিশ্বাস জলের হাত থেকে খোয়াজ পীর মানুষকে উদ্ধার করেন। নৌকাডুবির সম্ভাবনা থাকলে খোয়াজ পীরের নাম স্মরণ করলেই মানুষ নৌকাডুবি থেকে রক্ষা পায়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে খাল, বিল, নদী, নালা যখন জলে ভরে যায় তখন শিশুগণের যাতে জলমগ্ন অবস্থায় মৃত্যু না ঘটে সেজন্য খোয়াজ পীরের উদ্দেশ্যে বেড়া ভাসানো অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে এই দিন রোজা পালন করেন। সাধারণত ভাদ্র মাসে খোয়াজ পীরের বেড়া ভাসানো অনুষ্ঠানটি পালিত হয়।"[৪৩]

নদীপ্রধান কৃষিনির্ভর কোচবিহার জেলায় রাজবংশী সমাজে প্রতি বছর ভাদ্র মাসের বৃহস্পতিবার খোয়াজ পীরের বেড়া ভাসানো পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যদিও জেলার সব মহকুমায় এর অস্তিত্ব বেশী নেই। জেলার হলদিবাড়ী ব্লকের একাধিক গ্রামে খোয়াজ পীরের বেড়া ভাসানো অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ নারীনির্ভর এই অনুষ্ঠানে অনেক সময় পুরুষরাও অংশগ্রহণ করেন।

"ভাদ্র মাসের বৃহস্পতিবার ও রবিবার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানের আঙ্গিকে দেখা যায় একটি কলাগাছের ভেলা তৈরী করে তার উপর শোলার তৈরী রঙিন কারুকার্যমণ্ডিত বেড়া দিয়ে একটি নৌকার মত তৈরী করা হয়। সন্ধ্যার সময় এটি স্থাপন করা হয় কোন গৃহস্থ বাড়ীর পার্শ্ববর্তী পুকুর বা নদীতে এবং গৃহস্থ নারীগণ ও বয়স্ক স্ত্রী লোকেরা সন্ধ্যার সময় জলাশয়ের ধারে গিয়ে উক্ত ভাসমান বেড়া সজ্জিত নৌকায় পান, সুপারী, ফুলসহ দুধ, কলা, চিনির সিন্নির নৈবেদ্য দিয়ে পশ্চিম মুখে খোয়াজ পীরের উদ্দেশ্যে হিন্দুরা প্রণাম ও মুসলিমগণ সালাম জানিয়ে বেড়াটি ঠেলে দেন। এভাবেই খোয়াজ পীরের উদ্দেশ্যে বেড়া ভাসান পার্বণটি সম্পন্ন হয়।"[৪৪]
খোয়াজ পীরের এই শোলার বেড়াকে অনেকে 'দোনা'ও বলে। এই পীরের নামে বেড়া ভাসানো পর্বের পবিত্র মুহূর্ত হল গোধূলী লগ্ন। আর ময়দা, চিনি, গুড়, কলার সিন্নি এর নৈবেদ্যের প্রধান উপকরণ।

"খোয়াজ পীরের প্রকৃত নাম বলীয়ান এবং বংশগত নাম আবুল আব্বাস । তিনি হজরত নূহের বংশধর এবং ইহুদি বংশধর ছিলেন বলে কোচবিহারে প্রচলিত জনশ্রুতি আছে। জীবনের শুরুতেই তিনি একজন বণিক এবং রসায়নবিদ্ ছিলেন। পরোপকার ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি ঈশ্বর পরায়ণ এবং সন্ন্যাসীর জীবন পালনের মাধ্যমে ধর্মপ্রচারে আত্মনিবেদন করেন।"[৪৫]

সাধারণ মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন ও তাদের দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য তিনি সকল সময় সচেষ্ট ছিলেন। পূর্বে কোচবিহারের অনেক গ্রামেই খোয়াজ পীরের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শিত হলেও বর্তমানে ভাদ্র মাসে এই পীরের ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠানটি প্রায় বিলুপ্তির পথে। নবাবী আমলে বিশেষ করে মুর্শিদাবাদে এই উপলক্ষ্যে বিরাট অনুষ্ঠান হয়। ভাগীরথী নদী বক্ষে এবং দুই তীরে উপস্থিত সহস্র দর্শকের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল আলোক-ছটা এবং অগ্নি-ক্রীড়ার তুমুল শব্দ ও অতুল স্বপ্ন-শোভার বিস্তার করতে করতে তারা চলে যেত। কথিত আছে যে, ঢাকার নবাব মোকরম খাঁ এই উৎসবের প্রবর্তক ছিলেন। মতান্তরে, 'ব্যাড়াভাসান' চীন দেশীয় একটি প্রাচীন উৎসব বিশেষ।

সত্য পীর ঃ

সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বিত যে সকল দেবতার পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশী তার মধ্যে সত্য পীর অন্যতম। সত্য পীরই একমাত্র পীর যাঁকে নিয়ে সর্বত্রই ছড়া, কথা, পুঁথি, পাঁচালী ও কাহিনী রচিত হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

"সত্য পীরের পাঁচালীর মধ্যে বৃহত্তম ও বিচিত্রতম উত্তরবঙ্গের কবি কৃষ্ণহরি দাসের রচনা। কবি হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গুরু ছিলেন মুসলিম মামুদ সরকার।

তাহের মামুদ গুরু শমস-নন্দন
তাহার সেবক হয়ে কৃষ্ণহরিদাস ।

কৃষ্ণহরি দাসের গ্রন্থে সত্য পীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত হয়েছেন। মালঞ্চার রাজা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ময়দানবের অবিবাহিতা কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে সত্য পীরের জন্ম হয়েছিল। শঙ্কর আচার্যের পাঁচালীতেও সত্যপীরের ইতিহাস অনেকটা এই রকম, সেখানে তিনি আলা বাদশাহের কানীন দৌহিত্র। শঙ্কর আচার্যের গ্রন্থ লেখা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, কৃষ্ণহরির বই অষ্টাদশ শতাব্দীর অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে।"[৪৬]

এছাড়াও লোকসাহিত্যের বহু শাখা প্রশাখায় সত্য পীরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় সত্য পীরের ভিটা এখনও বর্তমান।

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই রকম ভাবে সত্য পীরের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমত কোন বাড়ীতে অসুখ, মামলা-মকদ্দমা বা কোন ব্যক্তি রাহুগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করা হলে সত্য পীরের ফকিরের মাধ্যমে এই পূজা দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে সত্য পীরের পালাগানের মূল ব্যক্তিকেই ফকির বলা হয়।

কোচবিহারে প্রচলিত সত্য পীরের পূজার দিন দেখা যায় গৃহকর্তা সস্ত্রীক উপবাস করেন এবং বাড়ীর উঠোনের পশ্চিমাংশে কাঁচা দুধ, কলা ও চিনির সাহায্যে 'ছিন্নি' তৈরী করে

নৈবেদ্যর মাধ্যমে সত্য পীরের পূজা করা হয়। "কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী ও মুসলিম সমাজের বিশ্বাস ফকিরের মাধ্যমে ছিন্নি দিয়ে পূজা দিলেই সত্য পীর সন্তুষ্ট হন এবং বিপদ-আপদের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়।"[৪৭] জেলার সর্বজন পরিচিত ও প্রাচীন সত্য পীরের পাট অবস্থিত গুদাম মহারাণীগঞ্জের তোর্ষা পীর ধামে। প্রতি বছর মহরমের পাঁচ দিন পূর্বে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তপ্রাণ মানুষ এই পীরের থানে সোয়া কেজি দুধ দিয়ে ছিন্নি তৈরী করে সত্য পীরের নামে উৎসর্গ করেন।

কোচবিহার জেলায় সত্য পীরের পূজার দ্বিতীয় রূপটি হল মানসিক পূজা অর্থাৎ বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বা মনস্কামনা থাকলে এই পূজার আয়োজন করেন। জেলার বেশীর ভাগ গ্রামেই কৃষিকর্মের অবসর মুহূর্ত অর্থাৎ মাঘ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক গ্রামেই এই পূজা উপলক্ষে সত্য পীরের পালাগান অনুষ্ঠিত হয়। আবার অনেক গ্রামে সত্যনারায়ণ এবং সত্য পীর পৃথক পৃথক ভাবে পূজিত হন।

"কোচবিহারের ইতিহাসকার খান চৌধুরী আমানতুল্লা সত্য পীর নামটিকে একটি উপাধি হিসেবে মনে করেছেন। সৈদলন (মহিদলন) নামে কোন রাজার কুমারী কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে ভগবৎ ইচ্ছায় সত্য পীরের জন্ম হওয়ার বৃত্তান্ত পুঁথি এবং গীতে উক্ত হয়েছে। কোচবিহারে প্রচলিত প্রবাদ আছে যে গৌড়ে পাঠান রাজত্ব কালে সৈদলন মালঞ্চার রাজা ছিলেন। সত্য পীর সম্পর্কে অনেক বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে। তিনি হিন্দু বংশজাত ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন পূর্বক তিনি উক্ত ধর্মের প্রচারে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর নাম-মাহাত্ম্যের জন্য উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।"[৪৮]

কৃষিনির্ভর কোচবিহার জেলায় শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলেই সত্য পীরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নিদর্শনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সংহতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সত্য পীর কোচবিহার জেলায় লৌকিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক যাই হোক না কেন জাগ্রত এই পীর জেলার লোকায়ত বিশ্বাস ও জনমানসে দৈবশক্তির প্রতিভূ হিসেবে ও অসহায় গ্রামীণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আপদ-বিপদের নিয়ামক হিসেবে আধিপত্য বিস্তার করেছেন। জেলার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্দ্য অঙ্গ এই পীরকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলি। ডঃ সুকুমার সেন এই পীরবাদকে যথার্থই নব-পৌরাণিক ধারা বলে উল্লেখ করেছেন।

পীর একরামুল হক্ (হুজুর সাহেব) (হলদিবাড়ী) ঃ

সমগ্র উত্তরবঙ্গের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অন্যতম পীর দরবেশ হলেন 'হজরত মৌলানা শাহ সুফী একরামুল হক্'। জন্মভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার পুনাশী গ্রামে হলেও সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত পরিভ্রমণের পর ইনি কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ী ব্লকে নিজের দেহ রাখেন। পীর একরামুল হক্ বর্তমানে সমগ্র উত্তরবঙ্গে মানবতার মূর্ত প্রতীক 'হুজুর সাহেব' নামে পরিচিত। দীর্ঘ ষাট

বছর পাহাড়, পর্বত, বনে-জঙ্গলে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পীর একরামূল হক্ বহু মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করেন। দীর্ঘ উনিশ বছর সাত মাস অত্যন্ত কঠোর সাধনায় নিমগ্ন থেকে তিনি তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান। সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর খেলাফৎ প্রাপ্ত হয়ে আল্লার প্রেরিত দূত রূপে অবিভক্ত বাংলা ও আসামের মানুষেব সত্য ও সুন্দরের পথ-প্রদর্শক রূপে পরিচিতি লাভ করেন। সমকালীন মুসলিম সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে কোচবিহারের হুজুর সাহেব জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার বাণী শোনান। শুধু তাই নয় অসংখ্য ভক্তেব অনুরোধে তিনি অনেক অলৌকিক কাজকর্ম প্রদর্শন করতেন।

''সুফী আদর্শে বিশ্বাসী এই মহামানব পীর একরামূল হক্ তৎকালীন কোচবিহার রাজার কাছ থেকে ১২৬ বিঘা জমি হলদিবাড়ী শহর সংলগ্ন স্থানে কেনেন। উক্ত স্থানেই ভক্তগণের ইচ্ছা অনুসারে ১৩৫১ সনের ১৩ই ভাদ্র ৯৩ বছর বয়সে জলপাইগুড়ি শহরের এক ভক্তের বাড়ীতে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটলে, হলদিবাড়ীর ভক্ত শিষ্যগণ তাঁকে নিজস্ব জমিতেই সমাহিত করেন। হলদিবাড়ী শহর সংলগ্ন স্থানের শবাধারই বর্তমানে কোচবিহারের তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসামের পরিচিত মাজার শরীফ।''[৪১]

বর্তমানে হুজুর সাহেবের মাজার শরীফের তত্ত্বাবধায়ক খোন্দেকার আব্দুল হামিদের মতে (ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের পর প্রয়াত), হুজুর সাহেব ছিলেন পীরের অন্যতম। হুজুর একরামূল হক্ যেমন সুফী আদর্শ বিশ্বাস করতেন তেমনি নিজেকে নিঃস্ব ফকির ভাবতেন। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন প্রচার বিমুখতার আড়ালে। বর্তমানে হুজুরের এই মাজার শরীফে দক্ষিণমুখী পাকা দরগার মধ্যস্থলে হুজুরের দেহ সমাহিত। এখানেই প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক 'ইসালে সওয়াব' বা ধর্ম সভা যা শুধু কোচবিহারেই নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গে হুজুরের মেলা নামে পরিচিত। ইসলামী ধর্মীয় সাধনায় বিশ্বাস করা হয় আল্লার অলিরা মরেন না, দেহ রাখেন মাত্র। প্রকৃত ভক্তের মত আল্লাকে ডাকতে পারলে হুজুরের আশীর্বাদ বা দোয়া থেকে কেউ বঞ্চিত হন না। তাই হুজুরের সমাধিস্থলে হাজির হন মানত স্বরূপ চাল, টাকা, গরু, বাছুর, মুরগী, চাদর, ধূপকাঠি নিয়ে কখনো চিররুগ্ন বা বন্ধ্যা রমণীগণ। স্থানীয় বাসিন্দা ও হুজুরের এই মাজার শরীফের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ফজলুল হক্ ও জালাল উদ্দিনের মতে, 'হুজুর মানুষের সবরকম মুশকিল আসান করেন। হতাশগ্রস্ত হাজার হাজার নরনারী এই হুজুরের আশীর্বাদে পেয়েছেন নূতন করে বাঁচার প্রেরণা'।

যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের যুগে যার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। নির্দিষ্ট দিনেই নয় সারা বছর হলদিবাড়ী হুজুর সাহেবের মাজার শরীফে চলে অসংখ্য মানুষের যাতায়াত। শুধু কোচবিহার নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহামিলনের এমন পবিত্র ভূমি আজ

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্বধর্মের মানুষের তীর্থ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। তাই পীর একরামুল হক্ বা হুজুর সাহেব হলেন সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক এবং হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বিত অনুষ্ঠানের দিশারী।

এছাড়াও কোচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ মহকুমার কামাত চাংরাবান্দা অঞ্চলে হুজুর সাহেবের এক পুত্রের সমাধিস্থলে একটি দরগা আছে। প্রতি বছর মাঘ মাসের শেষে হুজুরের মেলার পরবর্তী সময়ে সমগ্র কোচবিহারের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ এখানে ইসালে সওয়াব উপলক্ষ্যে একত্রিত হন।

জাগ্রত এই পীরের দরগা ও মাজারগুলিকে বাদ দিলেও কালের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত প্রায় অস্তিত্বহীন কিছু দরগার সন্ধান পাওয়া যায়। কোচবিহার জেলার চার মাইল দক্ষিণ-পূর্বে প্রাচীন রাজধানী ধলুয়াবাড়ী অঞ্চলে (বর্তমান ঘুঘুমারী সংলগ্ন) শাহ ফকির সাহেবের সমাধি আছে। এক সময় কোচবিহার রাজ সরকার এই দরগার ব্যয় নির্বাহের জন্য ৭৭ বিঘা জমি "পীরপাল" দান করেন।

"এছাড়াও বর্তমানে গোসানীমারী অঞ্চলের কামতাপুর দুর্গের বহির্ভাগে এবং বাঘ দুয়ারের অদূর দক্ষিণ-পশ্চিমে 'শাহ গরিব কামাল' নামে এক পীর সমাহিত রয়েছেন। এই পীর আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে অথবা তার পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। পীর শাহ গরিব কামালের যোগবল এবং ধর্মপ্রচার সম্পর্কে অলৌকিক বৃত্তান্ত কোচবিহারে আজ জনশ্রুতি।"[৫০]

দেবদেউল-দরগা, থান-পাট

ভূমিকা ঃ

জেলার লোকায়ত সমাজে আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ এখনও আন্দোলিত হয় বিভিন্ন তিথিতে এতদঞ্চলের দেবদেউলগুলির পবিত্র প্রাঙ্গণে। এক বিচিত্র ধর্মীয় মিশ্রণের ফলে এতদঞ্চলে আদিবাসী জনগণের লোকায়ত বিশ্বাসের প্রচুর উপকরণ দৃষ্ট হয় এই প্রাচীন মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে। কোচবিহারের রাজপরিবারকে কেন্দ্র করে যে ধর্মীয় বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল একদিন তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় জেলার বিভিন্ন মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে হিন্দুর মন্দির এবং মুসলমানদের মস্‌জিদ। রাজধর্ম শৈব হওয়া সত্ত্বেও ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মহারাজাগণ হয়ে ওঠেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠে সত্র-প্রতিষ্ঠান। যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখি এতদঞ্চলে শাক্ত-বৈষ্ণবের সহাবস্থান। জেলা সদরের সকল মহকুমাতেই শাক্ত ও শৈব মন্দিরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যে কারণে কোচবিহারকে শৈব তীর্থ বলা হয়ে থাকে। জেলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্কের

ক্ষেত্রে, এমন কি বিশাল ইতিহাস সৃষ্টিতে এই দেবদেউলগুলির ভূমিকা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

কোচবিহারের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহ থেকে মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত (১৫২২ - ১৫৪৯খ্রীঃ) এই রাজবংশের রাজত্বকালে নির্মিত, পুনর্নির্মিত, সংস্কৃত হয়েছে বহু দেবদেউল-দরগা।

ভৌগোলিক বিচারে কোচবিহার একটি সীমান্ত অঞ্চল হওয়ার সুবাদে এতদঞ্চলে এসেছে নানাজাতি, নানামত, নানাসংস্কৃতি ও নানাধর্ম। কোচবিহারের রাজবংশ ধর্মের দিক থেকে শৈব। এক সময় এই অঞ্চলটি তন্ত্রের পীঠস্থান ছিল। বৌদ্ধ প্রভাব কাজ করেছে অনেক।

নদীপ্রধান এতদঞ্চলে অতি প্রাচীনকালের তেমন কোন দেবদেউল দৃষ্ট হয় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ধ্বংস হয়েছে অনেক দেবদেউল। ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হওয়ার সুবাদে বাঁশ, খড়, মাটির দেওয়াল ও টিনের চাল ছিল একাধিক মন্দিরের উপকরণ। সম্ভবত ষোড়শ শতকের পর থেকে এখানে ইঁটের প্রচলন শুরু হয়। অনেক ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক মন্দির নির্মাণ রীতিতে মুঘল প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। জেলার পাকা দেবদেউলগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর উপর মসজিদের অনুকরণে গম্বুজ, যা কোচবিহার ব্যতীত রাজ্যের অন্য কোন জেলায় দৃষ্ট হয় না। কোন কোন মন্দিরের বাইরের দেওয়ালেও মিনারের মত অট্টালক (সরু থাম) দেখা যায়। এ সবই মুসলমান সংশ্রবের কথা মনে করিয়ে দেয়। বেশীর ভাগ মন্দিরই অলঙ্করণহীন এবং পোড়া মাটির কাজ নেই বললেই চলে। একমাত্র ব্যতিক্রম ধলুয়াবাড়ী শিবমন্দির।

"মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ তৎকালীন দেবদেউল ও মন্দিরগুলির এবং দেবোত্তর স্থাবর সম্পত্তি থেকে বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের সুনিশ্চিত ব্যবস্থার জন্য ১৮৬২ সনের ১৩ই এপ্রিল থেকে প্রতিষ্ঠা করেন Debutter Sherista."[৫১] এই দেবোত্তর সেরেস্তাই পরবর্তীকালে দেবোত্তর ট্রাস্টে রূপান্তরিত হয়। ১৮৬৪ সন থেকেই তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের প্রথম ডেপুটি কমিশনার মিস্টার এইচ্ বেভারেজ সাহেব দেবোত্তর ট্রাস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেন।

মদনমোহন মন্দির ঃ

কোচবিহার জেলার উল্লেখযোগ্য দেবদেউলগুলির মধ্যে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মদনমোহন মন্দিরটি শুধু কোচবিহারের মানুষের কাছেই নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিকচিহ্ন রূপে পরিচিত। কোচবিহারের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহের সময় পর্যন্ত কোচবিহারের রাজধর্ম ছিল শাক্ত এবং দেবী দুর্গা বা ভবানী ছিলেন এই রাজবংশের কুলদেবতা। রাজধর্ম যে শাক্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক তথ্যের বিচারে বলা যায় পরবর্তী কালে ষোড়শ শতকে মহারাজা বিশ্বসিংহের দ্বিতীয় পুত্র মহারাজা নরনারায়ণই প্রথম কুলদেবতা হিসেবে মদনমোহন-গোপীবল্লভ জীউকে প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাপারে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ভারতের ভক্তি

আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, আসাম ও বাংলার মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কর্তৃক। মহারাজা নরনারায়ণ শুধু এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বা চিলারায়, পরবর্তী কালে লক্ষ্মীনারায়ণ ও প্রাণনারায়ণ একশরণ বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শঙ্করদেব ও তাঁর শিষ্য মাধবদেব ও দামোদরদেবকে একাধিক সত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহায়তা করেছিলেন। জয়নাথ মুন্সী তাঁর 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— "মহরাজা রূপনারায়ণ (১৭০৪-১৭১৭ খ্রীঃ) মদনমোহনের অপূর্ব মূর্তি প্রকাশ করে তাঁর সেবার ব্যবস্থা করে দেন।"[৫২]

কোচবিহারের জনশ্রুতি শঙ্করদেবের পরামর্শে মহারাজ নরনারায়ণ যে বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করেন সেই মূর্তিই মদনমোহন ঠাকুর (মদনমোহনের সেই মূর্তি বর্তমানে নেই)। মদনমোহন ঠাকুর এখানে একাকী পূজিত হন। শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবগণের মতে নারায়ণের সঙ্গে তাঁর শক্তিরূপিনী লক্ষ্মী বা রাধার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। এই ধ্যান-ধারণায় বলা হয় কৃষ্ণের মধ্যেই রাধা বিলীয়মান। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কোচবিহারের মদনমোহন একাকী পূজিত হন। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'আলমগীরনামা' গ্রন্থে এবং স্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থেও কোচবিহারের অধিদেবতার এই নাম উল্লিখিত আছে। ঐতিহাসিক হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এই মতকে সমর্থন করে বলেছেন— "Maharaja Rupnarayan profoundly versed in all religious knowledge, and became celebrated for his sanctity. He constructed an image of idol Madan Mohan and established a magnificient worship."[৫৩]

অনেকে প্রাণনারায়ণকে কোচবিহারের মদনমোহন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা রূপে বর্ণনা করলেও নানা সাক্ষ্য প্রমাণে মনে হয় যে মহারাজা রূপনারায়ণই ছিলেন এঁর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। "বর্তমান মদনমোহন মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানা যায় ১৮৮৯-৯০ খ্রীঃ আধুনিক কোচবিহারের রূপকার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বৈরাগী দীঘির উত্তরে সাত বিঘা তেরো কাঠা জমির উপর এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন।"[৫৪] বর্তমান মন্দিরের শীর্ষদেশে এক শিলালিপিতে দেখা যায়— "বিধু বিধু সংহিত গজবিধু সম্মিত শাকমিথুনগতমিত্র। নরপনরেন্দ্রাত্মজনি নৃপেন্দ্রাহ্বয়নৃপতি শরণেত্রে দিনইহ দৈবত গৃহভূস্থাপিত। মকরোদাত্ম করেণ। বাস্তুকৃতোচিত রূপ্যবিনির্মিত শস্ত্রবিশেষধরেণ।"[৫৫]

১২১০ ফুট বেষ্টনী দৈর্ঘ্যের আয়তনে প্রাচীর ঘেরা এই দক্ষিণ মুখী প্রবেশ দ্বারের উপরেই আছে নহবতখানা। কোচবিহারের অধিকাংশ মন্দিরের মতই নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরেও বাংলা চারচালার অনুকরণে কার্ণিশের উপর গম্বুজ বসিয়ে নির্মিত। পাশাপাশি একাধিক ঘর থাকায় একে দালান মন্দিরের মত মনে হয়। মূল মদনমোহন-মন্দিরের উপরেই সোনালী রঙের গম্বুজ আছে, তার উপর আছে পদ্ম, কলস, তাম্রপত্র ইত্যাদি। মন্দিরটির ছাদের

সমতলে আছে এক বারান্দা। মূল মন্দিরের চারটি ঘরেই বহু দেবদেবীর অবস্থান। প্রধান বিগ্রহ মূল মদনমোহন ছাড়াও কষ্টিপাথরের তিনটি (বড়টি ৭৮ সে.মি. ও অন্য দুটি ৪৭ সে.মি.) মূর্তি আছে। বড় মূর্তিটি রূপার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়াও আছে মূল মন্দিরে পাটদেবী বা দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ ও নারায়ণ শিলা। মদনমোহন মূল মন্দিরের ডান দিকের ঘরে শ্বেতপাথরে শায়িত মহাকাল মূর্তির উপর কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি আছে। এটি প্রায় দুই ফুট উঁচু। মন্দিরের বামপাশে আছে অষ্টধাতুর জয়তারা অন্নপূর্ণা, কাত্যায়নী, মঙ্গলচন্ডীর মূর্তি। প্রতি বছর রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে এই মদনমোহনকে কেন্দ্র করে ১৫ দিন ব্যাপী এক মেলাও বসে। পূজা ও রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব বর্তমানে কোচবিহারের দেবোত্তর ট্রাস্টের কর্মীদের উপরই ন্যস্ত। প্রতি দিন নিত্যপূজার আয়োজন ছাড়াও বছরের বিভিন্ন তিথি, বিশেষ করে রাসপূর্ণিমা, মদনভুঞ্জি বা বাঁশ পূর্ণিমা, রথযাত্রা এবং বিষহরি, সুবচনী, মঙ্গলচন্ডী, দোল সোয়ারী উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়ে থাকে। শাস্ত্রীয় দেবদেবীগণের পাশাপাশি অশাস্ত্রীয় লৌকিক দেবদেবীগণ যেমন পূজিত হন এখানে তেমনি শাক্ত বৈষ্ণবের সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল নিদর্শন এই মন্দির।

সিদ্ধেশ্বর মন্দির ঃ

এই মন্দিরের দেবীর নামেই গ্রামের নাম সিদ্ধেশ্বরী গ্রাম। কোচবিহার সদর মহকুমার অন্তর্গত এই গ্রামটি শহর থেকে ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। জেলার অন্যতম পুরাসম্পদ এই সিদ্ধেশ্বরী কালিকা দেবীর মন্দির। বানেশ্বর থেকে একটি কাঁচা রাস্তা সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের দিকে চলে গেছে। এই রাস্তার পাশেই সিদ্ধেশ্বরী কালিকা দেবীর মন্দির। দক্ষিণমুখী পাকা আটকোণা ও গম্বুজ বিশিষ্ট এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। উচ্চতা ৩০ ফুট। এই মন্দিরের সম্মুখে আড়াই ফুট উঁচু এক পাকা চত্বর আছে। মন্দিরের দরজা ও উচ্চতা অনেকটা বানেশ্বর শিব মন্দিরের মত। মন্দিরের গর্ভগৃহে সিংহাসনের উপর অষ্টধাতুর সিদ্ধেশ্বরী দেবী উপবিষ্টা। মূর্তির উচ্চতা ১৫.৫ সে.মি., দেবী চতুর্ভুজা, শায়িত শিবরূপী মহাকালের উপর সমাসীনা। এক কথায় দেবী সিদ্ধেশ্বরী কালিকা শবরূপী শিবের উপর আসীন। তাঁর উপরের দুই হাতে কর্তরী ও খড়্গ এবং নীচের দুই হাতে কপাল বা দর্পণ ও বরাভয় প্রদায়িনী মুদ্রা। সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে এই দেবীকে কালীজ্ঞানে পূজা করা হয়। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখেই একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে একটি কামরাঙা গাছকে কামাখ্যা দেবী জ্ঞানে পূজা করা হয়। বৃক্ষ পূজার অতীত স্মৃতিকে এই কামাখ্যা দেবীই স্মরণ করিয়ে দেয়। আটকোণা গম্বুজ বিশিষ্ট মন্দির জেলার আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

বানেশ্বর শিবমন্দির ঃ

উত্তরবঙ্গের শৈব তীর্থ কোচবিহার জেলার উল্লেখযোগ্য পুরাসম্পদ বানেশ্বর গ্রামের বানেশ্বর শিবমন্দির। কোচবিহার শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার উত্তরে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার পাকা রাস্তার ধারে বানেশ্বর রেল স্টেশনের পূর্ব প্রান্তে উত্তর-পূর্ব ভারতের এক পবিত্র শৈবতীর্থ এবং দ্রষ্টব্য বানেশ্বর শিবমন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে একাধিক মতবাদ

ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এঁর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সমগ্র উত্তরবঙ্গের জনমানসে প্রচলিত নামগুলি হল— রাজা বান বা বানাসুর, রাজা জল্লেশ্বর, রাজা নীলাম্বর, মহারাজা নরনারায়ণ এবং প্রাণনারায়ণ। জনশ্রুতি অনুযায়ী পৌরাণিক বান রাজা বা বানাসুরের নামেই এই শিবের নাম হয় বানেশ্বর। পশ্চিমমুখী চৌকোণাকৃতি প্রাচীন এই মন্দিরটি আজও সুদৃশ্য এবং মজবুত। মন্দিরের উপরিভাগে গম্বুজ এবং কয়েকটি কলসীর উপর একটি ত্রিশূল প্রোথিত আছে। মন্দিরের দুটি প্রবেশ পথ, একটি পশ্চিমে, অন্যটি উত্তর দিকে। মন্দিরের দুই পাশে চণ্ডী ও ভুবনেশ্বরী দেবীর অধিষ্ঠান। বানেশ্বরের শিবমন্দিরের আকর্ষণীয় বস্তু হল মন্দিরসংলগ্ন এক বৃহৎ দীঘিতে বিশালাকার কচ্ছপ (পাণিমাছ) যা মোহন নামে পরিচিত। বাবা বানেশ্বর শিবের পূজার ভোগের প্রসাদ প্রথম মোহনকে দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই দীঘি সংস্কারের সময় পদ্মাসনে উপবিষ্ট একটি অষ্টধাতুর শিবমূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি বর্তমানে মন্দিরেই আছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে বানেশ্বর শিবের গৌরীর পাটসহ কৃষ্ণবর্ণের পাথরের একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। কোচবিহারের ইতিহাসকার খান চৌধুরী আমানতুল্লা সাহেব তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "রিপুঞ্জয় দাস স্বরচিত বংশাবলীতে লিখেছেন যে— 'মহারাজ নরনারায়ণ কোচবিহার রাজ্যে বানেশ্বর শিব মন্দির স্থাপন করে ঐ অঞ্চলের নাম রেখেছিলেন 'গের্দ্দসাগুারা' মতান্তরে পুরাণে প্রসিদ্ধ বানাসুর নিজের নামে এই শিব স্থাপন করেছিলেন'।"[৫৬] দুর্গাদাস মজুমদারের মতে "১৬৬৫ সাল নাগাদ মহারাজা প্রাণনারায়ণ বানেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।"[৫৭]

ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে সীমান্তবর্তী আসাম ও বাংলার যোগসূত্র সৃষ্টিতে কোচবিহারের বানেশ্বর শিবমন্দির এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। বানাসুরের বানেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা এবং বংতী নদী সৃষ্টির কাহিনী কোচবিহারে বহুল প্রচলিত। জেলা শহরে অসংখ্য শিবমন্দির থাকলেও উত্তরবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় জল্লেশ শিব মন্দিরের পাশাপাশি বানেশ্বর শিবমন্দির পুরাকীর্তি ও দেবদেউলের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বানেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে অনার্য ও তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পায়রা ও খাসি বলি ও উৎসর্গ (ঘার মুচড়ে এবং খিল ঠুকে) একটি বিস্ময়কর ঘটনা। শিবচতুর্দশীর দিন চার প্রহরে চার বার সাড়ম্বরে আনুষ্ঠানিক পূজা, হোম, যজ্ঞ হয়। বানেশ্বর শিবের ভোগ ও বলি প্রদানকে এতদঞ্চলে আসুরিক প্রথাও বলা হয়।

বড়দেবী মন্দির ঃ

কোচবিহার শহরের সাগরদীঘির পশ্চিম প্রান্তে দেবীবাড়ী নামক একটি পল্লীতে বড়দেবী মন্দিরের অবস্থান। মণ্ডপবিশিষ্ট পশ্চিমমুখী এই মন্দিরে কোন স্থায়ী মূর্তি নেই। বড়দেবীর এই মন্দিরই কোচবিহারের দেবীবাড়ী নামে সর্বত্র পরিচিত। দেবী দুর্গা বা ভবানীকেই এখানে বড়দেবী বলা হয়। প্রতি বছর শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় দেবীর মাটির মূর্তি গড়ে পশ্চিমমুখী উঁচু এই স্থায়ী দেবালয়ে পূজার অনুষ্ঠান হয়। প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু এবং আটটি করিন্থিয়ান পিলার এবং মণ্ডপের

উপর বড় গম্বুজ সবার দৃষ্টি আর্কষণ করে। একে অনেকে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব বলে মনে করেন। এই মন্দিরে ছাদের কার্নিশের নীচে পেডিমেন্ট জাতীয় একটি তিনকোণা অলঙ্করণ দেখা যায়। গম্বুজের চারপাশে সমতল ছাদটি লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। শুরুতে নাকি খড়ের ঘরে পূজা হত। তখন ওই ঘরে প্রোথিত হত উডুন কাঠের খুঁটি যার নাম দেওপোয়া। আজ আর খড়ের ঘর নেই, বড়দেবীর পাকা মন্দির, কিন্তু দেওপোয়া পূজার প্রচলন আজও অক্ষুন্ন আছে।

সিদ্ধনাথ শিবমন্দির ঃ

জেলা সদর থেকে কোচবিহার দিনহাটা সড়ক পথে ছয় কিলোমিটার দূরত্বে ধলুয়াবাড়ী গ্রামে এই মন্দির অবস্থিত। পাকা সড়ক থেকে দক্ষিণমুখী এবং পঞ্চরত্ন পোড়ামাটির ফলকযুক্ত সুদৃশ্য এই শিবমন্দিরের অবস্থান। এই মন্দিরটির বাঁকানো চালের উপর চারকোণে চারটি রত্ন আছে। পোড়ামাটির ফলক এবং গম্বুজাকৃতির রত্ন ছাড়া এই মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য হল, এর দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকের বাইরের দেওয়ালে পোড়ামাটির অলঙ্করণ। পুরাতত্ত্ববিদ্ মাধোস্বরূপ বৎসের মতে এই মন্দিরের স্থাপত্য শৈলীতে মুসলিম প্রভাব দেখা যায়। মন্দিরের পশ্চিম দিকের দেওয়াল ৯ (নয়) ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মিহিরাবের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। "অষ্টাদশ শতকে কোচবিহারের সাময়িক মুসলিম আধিপত্যের সময়ে মন্দিরটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।"[৫৮] মন্দিরের সম্মুখস্থ দেওয়ালের বহির্ভাগে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ক্ষয়িষ্ণু পোড়ামাটির মূর্তি দেখা যায়। দক্ষিণমুখী ইষ্টক নির্মিত এই মন্দিরের সামনের দেওয়ালে খাঁচকাটা খোপে বহু পোড়ামাটির ফলক যুক্ত আছে। কালের বিবর্তনে এর কিছুটা ভগ্নপ্রাপ্ত। অনেকগুলিতে দশাবতার পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি, নর্তকী ও লতাপাতার অলঙ্করণে সজ্জিত।

বৈকুণ্ঠপুর দামোদরদেবের ধাম ঃ

শঙ্করদেবের ভাবশিষ্য দামোদরদেব গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোচ রাজ্যে মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তৎকালীন কোচরাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রসার কল্পে ধর্মপ্রাণ মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এক নির্জন স্থানে তাঁর বাসস্থান ও সত্র তৈরী করে দেন। পরবর্তী কালে এই স্থানের নাম হয় বৈকুণ্ঠপুর দামোদরদেবের ধাম ও সত্র।

"পরম আনন্দে রাজা নানা অর্চা করি
বৈকুণ্ঠপুরত থান দিলন্ত সাদরি।"[৫৯]

এই দামোদরদেবের অনুরোধেই মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে কোচরাজ্যে সমসাময়িক বিভিন্ন পূজা পার্বণে পশুবলি নিষিদ্ধ ছিল। সাত বছর কোচরাজ্যে অবস্থান করার পর এক শত দশ (১১০) বছর বয়সে ১৫৪৮ খ্রীঃ দামোদরদেবের মহাপ্রয়াণ ঘটে এই স্থানে।

এই দেবস্থানটির বর্তমান রূপ হল চারচালা টিনের ঘর ও টিনের বেড়া। মাটির বেদীতে কৃষ্ণ-বলরামের মূর্তি। একদিন কোচবিহারের রায়কত পদাধিকারী মন্ত্রীদের বাস ছিল এই বৈকুণ্ঠপুর ধামে। বর্তমান সত্রের গর্ভগৃহে দামোদরদেবের পাদুকা রক্ষিত আছে। শুধুমাত্র দামোদরদেবের তিথি অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শুক্লা প্রতিপদে এবং ফাল্গুনের শুক্লা দশমী তিথিতে এই পাদুকা ভক্তগণ দর্শন করতে পারেন।

কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির ঃ

কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি ও দেবদেউলের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ মন্দির হল দিনহাটা মহকুমার গোসানীমারী বা ভিতর কামতা মৌজার অন্তর্গত 'কামতেশ্বরী দেবী'র মন্দির। দেবী এখানে মূলত মূর্তিবিহীন লৌকিক দেবী। উত্তরবঙ্গ ও আসামের জনমানসে গোসানীদেবী নামেও পরিচিত। এই দেবীর অলৌকিক কর্মকাণ্ড ও বৃত্তান্ত 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে খেন বংশীয় রাজা নীলধ্বজ কামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কামদা বা কামতা দেবী তাঁর উপাস্য দেবী ছিলেন। দেবীর নামানুসারে রাজ্যের নাম রাখেন কামতা রাজ্য এবং রাজধানীর নামকরণ করেন কামতাপুর। এতদঞ্চলের সাধারণ মানুষ এই দেবীকে গোস্বামিনী বা সর্বাধিশ্বরী বা গোসানা নামে অভিহিত করেন। এই জন্যই পরবর্তী কালে কামতাপুর গোসানীমারী নামেও পরিচিত। বর্তমানে গোসানীমারীতে কামতেশ্বরী বা ভবানী দেবীর যে মন্দির দেখা যায় সেটি কোচবিহার রাজ্যের চতুর্থ রাজা প্রাণনারায়ণ কর্তৃক ১৬৬৫ খ্রীঃ নির্মিত। ১৬৬১ খ্রীঃ মীরজুমলা কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করে যখন বহু মন্দির ও দেবালয় ধ্বংস করেন এটি ছিল তার অন্যতম। বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণ কোচবিহার ও কামরূপে যে সব মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার করেন তার মধ্যে কামতেশ্বরী মন্দির, কামাখ্যা মন্দির, হাজোর হয়গ্রীব মাধব মন্দির উল্লেখযোগ্য।

১৮৬৫ খ্রীঃ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে দেবোত্তর সেরেস্তা প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই দেবীর পূজা, সেবা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয়ভার গ্রহণ করে উক্ত সেরেস্তা। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের উল্লেখযোগ্য এই প্রাচীন পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ দেবদেউলটির সম্পর্কে একটি কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। মন্দিরের বর্তমান বংশানুক্রমিক পুরোহিত সাবর্ণগোত্রের মৈথিলী ব্রাহ্মণ রূপনারায়ণ ঠাকুর। এক সাক্ষাৎকারে (৯/৫/৯৮ ইং তারিখে) তিনি জানান— "এই দেবীর প্রাচীন ও অলৌকিক মাহাত্ম্য ও কোচবিহারের মানুষের অখণ্ড লোকায়ত বিশ্বাস ও ভক্তির জন্য সারাবছর ভক্ত সমাগম হলেও বৈশাখ মাসই এই মন্দিরে পূজা ও মানতের শ্রেষ্ঠ সময়।" বিশেষ করে কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ, বিষুয়া সংক্রান্তি, দোল সোয়ারী, অম্বুবাচী, তালনবমী প্রভৃতি তিথিতে ভক্তপ্রাণ মানুষের সমাগম হয় বেশী। কামতেশ্বরী দেবীর মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে সিংহাসনের উপর স্থাপিত মহাদেব, নারায়ণ, গোপাল ও প্রজাপতি ব্রহ্মার বিগ্রহ স্থাপিত আছে। প্রাচীর বেষ্টিত এই দেবদেউলের প্রাঙ্গণের মধ্যেই অবস্থিত মহাদেব ও ভৈরবী মন্দির।

দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত মহাদেব ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তারকেশ্বর শিব ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত উন্মুক্ত দোলমঞ্চ আজও বিদ্যমান। কোচবিহার সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ রাজোপাখ্যানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ আছে— "নরকাসুর বশিষ্ঠের অভিশাপে কামতাপুরের কামতেশ্বর নামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।"

ভেলাডাঙা সত্র ঃ

মহাপুরুষ শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন কোচরাজ্যে প্রথম সত্র ভেলাডাঙা সত্র। ডঃ এস. এন. শর্মার মতে এই সত্র প্রতিষ্ঠা করেন মাধবদেব, ১৫৯০-৯৬ সনের মধ্যে। সেনাপতি চিলারায় শঙ্করদেবের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় তোর্ষা নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে এই সত্র নির্মাণ করেন। এই অঞ্চলে কিছু মৎস্যজীবীর বাস এবং তারা কলাগাছের ভেলাতে মাছ শিকারে বেরোতেন বলে এই অঞ্চলের নাম হয় ভেলাডাঙা। বিদগ্ধ অসমীয়া সাহিত্যিক উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু তাঁর 'কথাচরিত' গ্রন্থের ১৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন— "তৈতে আছে দোবাত মাছ খাব অনেক ভেলা করি। তাতে নাম জন্মিল ভেলা।"

ভেলাডাঙায় শঙ্করদেবের প্রথম আগমনের পর শঙ্করদেব তাঁর 'রাম বিজয়' নাটকটি চিলারায় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে এই সত্রে বসেই লেখেন। ভেলাডাঙা সত্র বর্তমানে পূর্বাবস্থায় নেই। তেমনি এর প্রাচীন জৌলুসও হারিয়ে গেছে। "প্রায় এক বিঘা জমির উপর বর্তমান সত্রটির অবস্থান। সত্রের পশ্চিম প্রান্তে টিনের চালাঘরে রাজ আসনে প্রতিষ্ঠিত চতুর্ভুজ মূর্তিটির নিত্যপূজা হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহে নরসিংহ নারায়ণ, গোপাল, বলরাম, চতুর্ভুজ ও মদনমোহন বিগ্রহ আছে।" বর্তমানে কোচবিহার দেবত্রবিভাগ থেকে বাৎসরিক অনুদান দেওয়া হয় ১২৭৫ টাকা।

এ ছাড়াও জেলা সদরের যে সকল প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী দেবদেউলগুলি সম্বৎসরে বিভিন্ন তিথি ও পবিত্র দিনে কোচবিহারের লোকজীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলি হল ডাঙরআই ঠাকুরবাড়ী, হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির, অনাথনাথ শিব মন্দির, বোকালীর মঠ, হরিহর শিব মন্দির, রাজমাতা ঠাকুরবাড়ী, তুফানগঞ্জ মহকুমার দামেশ্বর ও ষন্ডেশ্বের শিব মন্দির।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক নির্মিত হয় উত্তরবঙ্গের প্রথম ব্রাহ্ম মন্দির। জেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই নববিধান ব্রাহ্ম মন্দির উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন সেতুবন্ধন করেছিল একদিন। যার ঐতিহাসিক স্মৃতি আজও কোচবিহারের মানুষ বিস্মৃত হন নি।

শাহগরীব কামালের দরগা (দিনহাটা) ঃ

বর্তমান কামতাপুর দুর্গের বহির্ভাগে এবং বাঘ দুয়ারের নিকট দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে সমাহিত হয়েছিলেন শাহপীর গরীব কামাল। তৎকালীন কোচরাজ্যে

এই পীরের যোগবল ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনী শোনা যায় এতদঞ্চলে। ১৮৭৭ খ্রীঃ রাজকীয় বন্দোবস্ত কাগজে একজন হিন্দু এই দরগার সেবায়েত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন বলে লিখিত আছে। বর্তমানে প্রায় অস্তিত্ব বিহীন, লোকচক্ষুর আড়ালে অবস্থিত এই দরগার কথা বিশেষ দিনে বিশেষ পর্বে সবাই স্মরণ করেন।

শাহপীরের দরগা ঃ

কোচবিহারের প্রাচীন রাজধানী বর্তমান ধলুয়াবাড়ী অঞ্চলের সিদ্ধনাথ শিব মন্দিরের এক কিলোমিটার উত্তরে এই দরগার অবস্থান। এটি শাহপীরের দরগা নামে পরিচিত। কোচবিহারের প্রচলিত জনশ্রুতি— অষ্টাদশ শতাব্দীর এই পীর ছিলেন ধর্মপ্রচারক এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। সমকালীন কোচবিহার রাজ সরকার এই দরগার ব্যয় নির্বাহের জন্য সাতাত্তর (৭৭) বিঘা জমি পীরপাল হিসেবে দান করেছিলেন। বর্তমানে এই পীরের দরগার মূল অবস্থানের কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা এই সমাধিস্থলে বা দরগায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন ভক্তি অর্ঘ নিয়ে মানত করতে এবং মনস্কামনা পূর্ণ করতে। মুসলিম বিভিন্ন পরবে আনুষ্ঠানিক মানত ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এখানে।

থান/পাট ঃ

থান বলতে আমরা সাধারণত বুঝি গ্রাম বাংলার জনমানবহীন প্রান্তরে লৌকিক বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থানকে। 'স্থান' থেকেই 'থান' শব্দের উৎপত্তি বলা যায়। আবার পাট বলতে আমরা বুঝি নির্দিষ্ট স্থানের বা মন্দিরের গর্ভগৃহে বা মুক্তাঙ্গনের যে স্থানে দেবতার আসন স্থির হয় সেই উঁচু বেদীর আসনকেই। এরূপ থান বা পাটের বৈশিষ্ট্য হল এদের অবস্থান সব সময়ই বাসগৃহ বা লোকালয় থেকে দূরে, রাস্তার পাশে, তিনরাস্তার মোড়ে, নির্জন কোন মাঠের কোণে, কোন ঝোপঝাড় বেষ্টিত বৃক্ষতলে, নদী বা নির্জন কোন জলাশয়ের ধারে, বট, পাকুর, শেওড়া, সিজ, বেল, নিম বা জিগা বৃক্ষতলে।

গ্রামবাসীগণ বিভিন্ন দেবতার নামে ভক্তিভরে মানত করেন, পশু ও পক্ষী বলি দেন ও উৎসর্গ করেন এ সকল থান ও পাটে। কোচবিহারের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন থান ও পাটে পাঁঠা, পায়রা, ও শূকর বলি দিয়ে উৎসর্গ করার প্রচলন আছে। জেলার একাধিক গ্রামের বিভিন্ন থান ও পাটের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল সেখানে মাটির ঢিবি, বাঁশের গছা বা ঠকা, প্রস্তর বা ত্রিকোণাকৃতি শিলাখণ্ড, মাটির পাত্র, সরা, প্রদীপ, কদলীবৃক্ষ, ছলন, পোড়ামাটির বিভিন্ন মূর্তি, সর্বোপরি ত্রিকোণাকৃতি লাল নিশান থাকে। কোচবিহারের ধর্মীয় লোকজীবনে জেলার বিভিন্ন গ্রাম ঠাকুরের থানে ও পাটে নিশান ব্যবহার এক প্রাচীন ঐতিহ্য। দেবদেবীর মূর্তি পূজার প্রচলনের পূর্বে এই নিশানই ছিল এতদঞ্চলের দেবদেবীর প্রতীক। এটি প্রাচীন ভারতীয় ধর্মানুষ্ঠানেরও একটি ঐতিহ্য। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে— "একেক কোম বা গোষ্ঠীর একেক পশু বা পক্ষী

লাঞ্ছিত ধবজা। সেই ধবজার পূজাই বিশেষ গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কোমগত পূজা এবং এটাই তাদের পরিচয়। দেব-দেবীর মূর্তি পূজার সঙ্গে এই পশু পক্ষী লাঞ্ছিত ধবজা পূজার প্রচলন সুপ্রাচীন।"[৬০]

দীর্ঘ ক্ষেত্রানুসন্ধানে আমরা দেখতে পাই সকল গ্রামেই লোকদেবতা, অপদেবতা বা দেও-দেবতার স্থানগুলিতে গ্রামের মানুষ যখনই কোন অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ, খরা-বন্যা, মহামারী প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েন তখনই এসে হত্যে দিয়ে মানত করে পশু পাখী ও বিভিন্ন ফলমূল উৎসর্গ করেন। W.W. Hunter সাহেব কোচবিহারের এরূপ থান ও পাটের মাহাত্ম্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে— "Every village has its thakur-pat, the seat of its God, where the deos or evil spirits, are supposed to reside, and whenever anything goes wrong in a family, the members make offerings there in order to appease the worth of the deo."[৬১]

জেলায় অবস্থিত এরূপ থান বা পাটগুলি সম্বৎসরে গ্রামীণ শিশু-কিশোরদের ক্রীড়ার স্থল হলেও বাৎসরিক পূজার সময় উক্ত স্থানগুলি হয়ে ওঠে ভক্তপ্রাণ মানুষের দেবস্থান। জেলার উল্লেখযোগ্য এরূপ লোকদেবতার থান বা পাটগুলি হল মাথাভাঙ্গা মহকুমার কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা সড়কের আখড়ারহাট থেকে উত্তর-দক্ষিণ দিকে মাঘপালা গ্রামের রাস্তার ডান দিকে ঢেল দেবতার থান। একটি শেওড়া ও জিগা গাছের নীচেই এই দেবতার থান। এই মহকুমারই নবীনেরদোলা গ্রামে রাস্তার ধারে আর এক ঢেল দেবতার থান আছে। যদিও এই দেবতার নাম এখানে 'জুড়াবান্দা ঠাকুর'। এই মহকুমার আঙ্গারকাটা গ্রামের পূর্ব প্রান্তে 'বুড়ার পাট' নামে একটি দেবস্থান আছে। এই দেবতা শিবের লৌকিক রূপ। উনিশবিঘা গ্রামেও একটি মাসানের পাট আছে। এখানে পূজা পান 'ছোট ঠাকুর' ও 'বড় ঠাকুর'। জেলার দিনহাটা মহকুমার একাধিক গ্রামেও এরূপ বহু থান বা পাটের অবস্থান আছে। মহকুমার খলিসামারী এবং আলোকঝাড়ী গ্রামে শীতলা ও মাসান পাটে গ্রামবাসীগণ পাঁঠা ও পায়রা বলি দিয়ে উৎসর্গ করেন। উক্ত মহকুমার শহর সংলগ্ন উত্তরপার্শ্বস্থ প্রধান সড়কের ধারে পুটিমারী অঞ্চলে অবস্থিত 'বুড়ির পাট'।

জেলার অনেক গ্রামের নামকরণ হয়েছে এ সকল লোকদেবতার থান ও পাটগুলির নামে। যেমন— তুফানগঞ্জ মহকুমার বারকোদালী- ২ নং অঞ্চলের চণ্ডীরপাট গ্রাম, জেলা সদরের গোপালপুর গ্রাম, দিনহাটা মহকুমার মাসানের পাট, বোকালীর মঠ।

এ সকল থান ও পাটের বাইরেও অপর এক ধরনের দেবস্থান আছে যেগুলি ধাম নামেই সমধিক পরিচিত। মুসলিম পীরের ঐতিহ্যমণ্ডিত হয়েও তোর্ষা পীরের সমাধিস্থলের নাম 'তোর্ষাপীর ধাম'। জেলার সর্বত্রই সংশ্লিষ্ট থান ও পাটগুলিতে বিভিন্ন বৃক্ষের অবস্থান দেখে মনে হয় আদিম বৃক্ষপূজার নিদর্শন আজও বর্তমান এখানে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই দেবস্থানগুলির নাম হয়ে থাকে গেরাম ঠাকুরের থান বা পাট।

উত্তরপূর্ব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং স্থান মাহাত্ম্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য একটি ধাম হল একশরণ নামধর্মের প্রবর্তক শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের পদধূলিপূত 'মধুপুর ধাম'। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের স্মৃতি বিজড়িত এই মন্দির বা ধাম উত্তরবঙ্গ ও আসামের ধর্মীয়, সামাজিক, সংস্কার আন্দোলনের প্রতীক এবং বাংলা-আসামের মেলবন্ধনে বিশাল ভূমিকা পালন করে।

প্রাচীন কোচবিহারে বিভিন্ন সময়ে ধর্ম প্রচারকগণের আবির্ভাব ঘটেছিল। যাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল কোচবিহারের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নাথ ধর্মের প্রচারক গোরক্ষনাথ। খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম ধর্মপ্রচারক তোর্যাপীর, শাহফকির খোন্দকার, গাজিপীর, পীর একরামুল হক ও শাহগরীব কামাল। এঁদের মধ্যে অনেকেই কোচবিহারের পবিত্র ভূমিতে দেহরক্ষা করেন এবং সেই পবিত্র স্থানগুলি জেলার উল্লেখযোগ্য পীরের দরগা ধাম নামে আজও পরিচিত।

দেবদেউল বা মন্দিরময় কোচবিহার জেলার একটি বৈশিষ্ট্য হল শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের সহাবস্থান। শৈব সংস্কৃতি ও তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান হিসেবে শিব মন্দিরের প্রাধান্য দেখা যায় এখানে। কালের করাল গ্রাসে শীর্ণ জেলার মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই দেবদেউল বা মন্দিরগুলি আবহমান কাল ধরে জেলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রবাহকে অক্ষুন্ন রেখেছে। তাই অখণ্ড ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আজও আবর্তিত হয় দেবদেউলগুলির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পুষ্টিসাধনেও সকল ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতীকধর্মী মন্দির, মস্‌জিদ ও গীর্জাগুলির অবদান অনস্বীকার্য।

জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দেবদেউল মন্দিরগুলি শুধুমাত্র পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবেই নয় জেলার সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসও আজ এদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অমূল্য এই পুরা-সম্পদগুলির সঠিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ জেলার প্রাচীন ইতিহাসকেই শুধু সমৃদ্ধ করে না বাংলার পর্যটন মানচিত্রেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বৃক্ষ পূজা ঃ নানা অনুষ্ঠান ঃ

ভূমিকা ঃ

নদীমাতৃক কৃষি প্রধান এই জেলায় সারা বছরই নারী ও পুরুষগণ অগণিত পালা পার্বণের অনুষ্ঠান করে থাকেন। সারাবছর জেলায় অনুষ্ঠিত প্রত্যেক পার্বণের যেমন কিছু নির্দিষ্ট আচার ও রীতি আছে তেমনি সময় ও তিথিও আছে। পার্বণ বা ব্রত অনুষ্ঠানের ব্রতীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নারী। অনেক ক্ষেত্রে আবার অবিবাহিত কুমারী মেয়েদেরও প্রাধান্য থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলার মত কোচবিহারের অনেক পার্বণে আল্পনা দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্ববঙ্গীয়দের 'পৌষ পার্বণ' এবং স্থানীয় রাজবংশীদের 'পুষুনা'। অনেক ব্রত বা পার্বণে এমন কিছু আচার পালন করা হয় যেগুলির উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রেই ঐন্দ্রজালিক এবং আদিম ভাবাপন্ন। শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের বাইরে লৌকিক বিশ্বাসের ফলে উদ্ভুত অনেক পার্বণ আছে এই জেলায়। যেমন— তিস্তাবুড়ি, মেছেনীখেলার ব্রত, সুবচনী, কাত্যায়নী ব্রত, মঙ্গলচন্ডী ব্রত, নাটাইচন্ডী ব্রত, তেরা বেরা, গার্সী ব্রত, পুরুষ চালিত মদন কামের ব্রত এবং সোনারায়ের মাগন সংগ্রহের ব্রত।

কৃষি প্রধান কোচবিহারের ধত্তি পূজা একটি লোকায়ত কৃষি নির্ভর সমাজের অনুষ্ঠান। ফসলের মঙ্গল কামনায় ক্ষেতের ধারে কলাগাছের চারা রোপণ করে দুধ কলা দিয়ে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আবার গাছকে দেবতা জ্ঞানে পূজার প্রচলনও আছে এই জেলায়।

বিষুয়া, বৈশাখী, আমাতি, আষাঢ়িসেবা, ধানের ফুল আনা, গোছরপানা, গুছিদেওয়া, ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজা, গমীরা, গেরাম ও বাস্তু পূজা প্রভৃতি লোকায়ত পূজা পার্বণ প্রকারান্তরে এই জেলার কৃষিপূজা বা ভূমি পূজা মাত্র। এমনি করেই বার মাসে তের পার্বণের হাত ধরে ঋতু পরিক্রমায় কৃষি কাজের স্তর ভেদে বিভিন্ন কৃত্য কোচবিহারের লোক মনে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে।

বৃক্ষ পূজা ঃ

রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষকে পৃথিবীর "আদি প্রাণ" বলেছিলেন। আবার পন্ডিতগণের মতে ধর্মের আদিমতম রূপ প্রকাশ পায় বৃক্ষ উপাসনাকে কেন্দ্র করে। বনবাসী মানুষের একদিন আশ্রয়স্থল ছিল এই বৃক্ষ। আত্মরক্ষা এবং জীবন-জীবিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ছিল গাছপালা। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক এই বৃক্ষ মানুষের নীরব বন্ধু। শারদীয়া দুর্গা পূজায় সপ্তমী তিথিতে নবপত্রিকা পূজা অর্থাৎ যে নয়টি বৃক্ষের উদ্দেশ্যে পূজা উৎসর্গ করা হয় যা সম্পূর্ণই দৈবী পুরাণ, কালী পুরাণ, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নির্দেশিত। অশ্বথ বা বট গাছে দেবত্ব আরোপের ঘটনা শুধুমাত্র লোকায়ত বিশ্বাসের ফল নয়। ভারতের আপামর জনসাধারণের মত প্রাচীন কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসে এতদঞ্চলের লোকজীবনও আপ্লুত। কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়, মেচ, রাভা ও অন্যান্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় বিভিন্ন উপলক্ষে সম্বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বৃক্ষ পূজার বৈচিত্র্যমূলক নিদর্শন দেখা যায়। শারদীয়া দুর্গা পূজার কলাবউ যেমন সম্মানিত ও পূজিত তেমনি রাজবংশী সম্প্রদায়ের ধান্য রোপণের গোছরপানা বা গচি বোনা অনুষ্ঠানেও কলা গাছকে দেবতার প্রতীক হিসেবেই পূজা করা হয়। এই পূজার বিস্তারিত বর্ণনা অন্য অধ্যায়ে আছে। এই পূজায় পাট ও কচু গাছ একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ।

জেলার পাঁচটি মহকুমায় প্রায় সকল গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ বছরের বিভিন্ন সময়ে যে উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ দেবতার পূজা করেন সেগুলি হল— ১) জুরা বান্ধা ঠাকুর, ২) জিগা গাছ পূজা

ও সই পাতানো, ৩) বট পাকুরের বিবাহ দান, ৪) চৈত্র বৈশাখ মাসে মদন ভুঞ্জি তিথিতে বাঁশ পূজা, ৫) রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে চড়ক পূজা বা গমীরা খেলার শুরুতেই শিশু ও শিমূল বৃক্ষ পূজা, ৬) জেলা সদরের সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে কামরাঙ্গা বৃক্ষ পূজা উল্লেখযোগ্য।

সমাজ বিজ্ঞানী J.G. Frazer তাঁর Golden Bough গ্রন্থে বৃক্ষ উপাসনার বিভিন্ন ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন— বৃক্ষই বৃষ্টি ও সূর্য কিরণের উৎস "Trees or tree-spirits are believed to give rain and sunshine."[২২] শস্য উৎপাদনে সহায়ক, উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক বৃক্ষ উপাসনার সঙ্গে মৌলিক ভাবে উপরোক্ত ধারণাগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

কোচবিহার জেলায় বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায় জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীপূজায় কাঁঠাল গাছের ডাল পুঁতে পূজা করেন। পৌষ সংক্রান্তির দিন বাড়ীর উঠোনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে জিগাগাছ পুঁতে বাস্তু পূজায় "চরু" নামক পায়েস উৎসর্গ করেন। সর্বপ্রাণবাদী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ দিনের বিশ্বাস মাসান নামক ভয়ঙ্কর লোকদেবতার আশ্রয়স্থল শেওড়া গাছ।

জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব কৃষ্টিতে অনুষ্ঠিত চড়ক বা গমীরা খেলায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায় মাথাভাঙ্গা মহকুমার 'চেঙ্গারখাতা, খাগরিবাড়ী' ও মেখলীগঞ্জ মহকুমার 'বানিয়ারটারী' গ্রামে। উক্ত অনুষ্ঠানের দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকালে প্রথমেই চড়কের উপযুক্ত শিশু ও শিমূল গাছকে বনের মধ্যে নির্বাচনের পর ছেদনের পূর্বে স্থানীয় দেওবংশী নিজস্ব মন্ত্রে পাঁঠা-পায়রা বলি দিয়ে পূজা দেন। উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন কোচবিহারের বড়দেবী পূজার বিভিন্ন লোকাচাব। বড়দেবী পূজার বৈশিষ্ট্য হল তাঁর শিরদাড়া তৈরী হয় ময়নাকাঠে। এই উপলক্ষ্যে পূর্বে বনের মধ্যেই পাঁঠা ও পায়রা বলি দিয়ে ময়নাগাছ কাটার অনুষ্ঠান পালন করা হত। পূজার নৈবেদ্য ছিল দুটি গোবরের পুতুল কলাপাতায় রেখে কলার খোলে দই, বাতাসা, আতপচাল, ফলমূল দিয়ে এই বৃক্ষ পূজা অনুষ্ঠিত হত। এই পূজাকে বড়দেবী ঠাকুরাণীর যূপচ্ছেদন পূজাও বলা হয়। বর্তমানে প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে দেবত্র ট্রাস্ট নির্দেশিত পূজার নির্ঘন্ট অনুযায়ী পূজা হয় ডাঙর আয়ী ঠাকুরবাড়ীতে। "কলার খোলে পায়েস, তেল, সিঁদুর ও বটপাতা সহ চিত্রিত একটি হাড়ির মধ্যে দাঁড় করিয়ে ময়না গাছের কান্ডটি কেটে দেবীর শিরদাঁড়ার কাঠাম তৈরী করা হয়। কোচবিহারে এই পূজা বড়দেবীর কাঠাম পূজা নামেও পরিচিত। কাঠামের মাথায় স্থানীয় চিত্রকর সম্প্রদায় কর্তৃক দেবীর কাল্পনিক মুখোশ পরানো হয়।" এই ময়না কাঠ ও বড়দেবীর পূজা প্রসঙ্গে কোচবিহারের জনমনে একাধিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

বৃক্ষ পূজা বলতে শুধু কোন বৃহৎ গাছকে পূজা করা বোঝায় না। বৃহত্তর অর্থে শস্য ও যে কোন উদ্ভিদকেও বোঝায়। "বাংলাদেশের ধান্য উপাসনা (Paddy Cult) বা ফসল কাটার অনুষ্ঠান ও পূজা (Harvest Festival) তাও বস্তুত বৃক্ষ পূজারই অন্তর্গত।"

কোচবিহারের অন্যান্য বৃক্ষপূজাগুলি হল— বট, পাকুর, অশ্বত্থ, শেওড়া, সিজ, শিমূল, ধানের আড়া, জিগা গাছ প্রভৃতি। শাস্ত্রীয় পূজা পার্বণের মধ্যেও বৃক্ষ পূজার প্রচ্ছন্ন প্রতীকী আভাস আমরা দেখতে পাই।

জেলার প্রাচীন লৌকিক দেবদেবীর পূজার ইতিবৃত্তে দেখা যায় স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় বিভিন্ন রোগ ভোগ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় যে সকল লৌকিক দেবদেবীর পূজা করেন তাদের মধ্যে বৃক্ষ পূজা অন্যতম। এমন অনেক লোকদেবতা আছেন যাদের অবস্থান অবশ্যই হবে নির্জন কোন গ্রামে বিশেষ কোন গাছের তলায়। জেলার বারুজীবী সম্প্রদায়ের পানের বরজের সুঙ্গাই পূজাও বৃক্ষ পূজারই সামিল। ভূমিলক্ষ্মী পূজায় অবশ্যই থাকবে একটি জিগাগাছ। জেলার মেচ উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিকারের পূর্বে যে লৌকিক দেবী (শাল বৃক্ষকে) পূজার প্রচলন আছে তার নাম শালেশ্বরী। আবার শাল্ সিড়ি পূজাতেও শালগাছ ব্যবহৃত হয়। মদনকাম বা বাঁশপূজায় বাঁশগাছ উল্লেখযোগ্য উপকরণ।

অরণ্য সমৃদ্ধ কোচবিহার জেলার অনেক গ্রামেই একদিন পাকা রাস্তা ও বিদ্যুতের আলোর প্রচলন ছিল না। জনবসতিহীন নির্জন রাস্তায় গ্রামের মানুষ চলা ফেরার সময় অজানা আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়তেন এবং এইরূপ ভীতি থেকেই কোচবিহারে এক লোকদেবতার উদ্ভব হয়েছে যার নাম জুরাবান্ধা বা ঢেল ঠাকুর। পথ চলতি নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষ ভয় মিশ্রিত ভক্তিতে রাস্তার পাশের তেঁতুল, শেওড়া বা পাকুর গাছের গোড়ায় কোন দুটো বস্তুকে পেচিয়ে বা জোড়া দিয়ে ঢিল মেরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনেক ক্ষেত্রে পথিকগণ কোন কাঠের টুকরো বা পাথরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মনস্কামনায় গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেন। এতেই জুরাবান্ধা ঠাকুর বা ঢেল ঠাকুর সন্তুষ্ট হন বলে গ্রামের মানুষের বিশ্বাস। কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটা মহকুমার পার্শ্ববর্তী আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় এই ঢেল ঠাকুরের থান দেখতে পাওয়া যায়। শুধু কোন বিশেষ সম্প্রদায়ই নয় সমগ্র গ্রামবাসী মিলিত হয়ে এই ঢেল দেবতার পূজা দেন ও মানত করেন।

কামরাঙ্গা বৃক্ষ পূজা ঃ

কোচবিহার জেলার পূর্ব প্রান্তে সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে দক্ষিণমুখী সিদ্ধেশ্বরী কালিকা দেবীর মন্দির। এই মন্দিরের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত বৃক্ষ রূপিণী কামাখ্যা দেবীর স্থান। একটি প্রাচীন কামরাঙ্গা বৃক্ষই দেবীর প্রতীক এবং পীঠস্থান নামে পরিচিত। বৃক্ষটির চার পাশ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং নীচের অংশ সম্পূর্ণ বাঁধানো। এই বাঁধানো বেদীতেই দেবীর নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত

হয়। কোচবিহারের স্থানীয় জনমানসে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় এই গাছটি কামাখ্যা দেবী জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। জেলার বৃক্ষ পূজার লৌকিক নিদর্শন ও প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের এই কামরাঙ্গা বৃক্ষ। বানেশ্বর মন্দির থেকে দেড়মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এই সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে মহারাজা প্রাণনারায়ণ কর্তৃক নির্মিত এই মন্দির প্রাঙ্গণে কামরাঙ্গা বৃক্ষরূপী কামাখ্যা দেবীর পূজার ঐতিহ্য আজও বর্তমান।

জিগাগাছের সঙ্গে সই পাতানো অনুষ্ঠান ঃ

ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে সই পাতানো বা বন্ধুত্ব স্থাপনের একাধিক লৌকিক অনুষ্ঠান কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের ঐতিহ্য। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় আরও একটি অনুষ্ঠান পালনের প্রচলন আছে তা হল জিগাগাছের সঙ্গে সই পাতানো। পূজার দিন নির্ধারিত জিগাগাছকে নারী রূপে কল্পনা করে একটি শাড়ি পরিয়ে দেওয়া হয় এবং গাছের দুটি শাখায় শাঁখা পরানো হয়। একজন স্ত্রীলোকের মাথা ও উচ্চতা অনুযায়ী গাছের দেহে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। প্রতিবেশী বা বাড়ির স্ত্রী লোকেরাই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। দুধ, দই, কলা, চিনি, মুড়কি, খই ইত্যাদি এই পূজার প্রধান উপকরণ। জিগাগাছটির পাদদেশে এগুলি রেখে স্ত্রীলোকটি তাঁর কামনা ও মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করেন— "সই জিগা তুই তো অমর। মোর ছাওয়া জন্মের পর মরি যায়। সই তুই আর্শীবাদ কর মোর ছাওয়া যেন যুগ যুগ ধরি বাঁচি থাকে।"[৬৫] সাধারণত মৃত বৎসা বা বন্ধ্যা নারীরা এই পূজা বা অনুষ্ঠান করে থাকেন সন্তান কামনায়। পশু-পাখীর মত বৃক্ষ প্রজনন শক্তি উপলব্ধি করার ধর্মীয় প্রথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত আছে।

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী রমণীগণের লোকায়ত সংস্কৃতির এই ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান শুধু রাজবংশীদের মধ্যেই নয়, উত্তরবঙ্গের অন্য সম্প্রদায় এমনকি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত। নির্দিষ্ট একটি গাছের সঙ্গে সখ্যতা সৃষ্টির এমন অনুষ্ঠানে স্বাভাবিকভাবেই জাতি, ধর্ম বা বর্ণের কোন প্রভাব থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে একই গাছের সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকই সই পাতান।

শাল শিড়ি ঃ

কোচবিহার জেলায় রাজবংশী,রাভা ও মেচ জনজাতি কর্তৃক পূজিত শাল শিড়ি নামক বৃক্ষদেবতাকে শালেশ্বরী নামেও উল্লেখ করেছেন অনেকে। শালের সঙ্গে স্ত্রী শব্দ সহযোগে শালেশ্বরী নামের উদ্ভব। স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বৃক্ষ দেবতা শাল বাগানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে পূজিত হন।

কোচবিহার জেলার রাজবংশী সম্প্রদায় এই বৃক্ষ দেবতার পূজা করলেও জলপাইগুড়ির মেচ উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেই এর প্রচলন বেশী। অরণ্য দেবতা হিসেবে শাল শিড়ির পূজা দিয়েই মেচ ও রাভাগণ শিকার যাত্রার সূচনা করতেন। দক্ষিণবঙ্গের বনবিবির সাদৃশ্যে এই

দেবতাকে স্ত্রী হিসেবেও কল্পনা করা হয়। বনের হিংস্র পশু, মানুষ ও তার গৃহ পালিত পশুর জীবনহানি যেন না ঘটায় সেজন্য এই পূজার প্রচলন। বন্য জন্তুরা যেমন ধান ও শস্য ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করত, তেমনি মানুষ ও তার গৃহপালিত পশুও জীবন হানি ঘটাত। তাই গৃহপালিত পশু, শস্য ও ব্যক্তি মানুষের জীবন রক্ষার তাগিদেই কোচবিহারের রাজবংশীগণ শাল শিড়ি বৃক্ষ পূজার প্রচলন করেন।

পুরুষ নিয়ন্ত্রিত এই পূজার মূল উপকরণ হল ধূপ, ধূনা, ফলমূল, দুধ, দই, আতপচাল, কলা ও একটি মাটির পুতুল। সাধারণত বৈশাখ মাসেই অধিকারী বামুন কর্তৃক এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারের শাল শিড়ি বৃক্ষ দেবতা এক অর্থে 'গেরাম ঠাকুর'। অনেকে মানত করে এই বৃক্ষ দেবতাকে মুরগি উৎসর্গ করেন। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর বিখ্যাত 'Rajbansis of North Bengal' গ্রন্থে শাল শিড়ি বৃক্ষ দেবতাকে মহাময়ী নামে ভূষিত করেছেনএবং এই পূজার মন্ত্রে উল্লেখ করেছেন —

"শালেশ্বরী মহাময়ী, গায় গারাম
সন্ন্যাসী ঠাকুর তিসসাল গুড়ি দেবতাগণ
সহায় হন বাবা।"

মন্ত্রটির আক্ষরিক অর্থ হল 'মহাময়ী শালেশ্বরী গারাম, সন্ন্যাসী ঠাকুর, ত্রিশাল কোটি দেবতা সকল তোমরা সহায় থাকিবেন।'

বট পাকুরের বিয়া ঃ

বৃক্ষ উপাসনা সমগ্র ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় সংস্কৃতি। এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে বৃক্ষের বিবাহদানমূলক একটি লোকায়ত অনুষ্ঠান। "মহারাষ্ট্রে কোন বিবাহিত স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রীলোকটিকে প্রথমে শমী বৃক্ষের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। কারণ স্ত্রীলোকের তৃতীয় বিয়েতে কোন দোষ থাকে না।"[৬৪]

গাছের সঙ্গে গাছের বিয়ে দেওয়ার রীতি-নীতি জেলার রাজবংশী সমাজের দীর্ঘ দিনের ধর্মীয় সংস্কার। বৃক্ষের বিবাহমূলক অনুষ্ঠান সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানী জে. জি. ফ্রেজার সাহেব বলেছেন— "যেহেতু বৃক্ষ ও উদ্ভিদদিগকে সজীব পদার্থ বলে ধারণা করা হয় সেহেতু স্বাভাবিক ভাবে তাদের নারী ও পুরুষ কল্পনা করা হয়ে থাকে। এরা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।"[৬৫] জেলার রাজবংশী সমাজে পুত্র কামনায় অনেক বিবাহিত রমণী বট ও পাকুর গাছের বিবাহ দিয়ে থাকেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বট-পাকুরের বিয়েকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন বলেও মনে করেন।

কোচবিহারের ইন্দোমঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত সর্বপ্রাণবাদী রাভা, কোচ, মেচ ও পূর্ববঙ্গীয় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বৃক্ষ পূজা, প্রস্তর খন্ড পূজা, মাটির ঢিবি পূজা, অচেতন বস্তুর

মধ্যে চেতনাময় সত্তার কল্পনা করা, পশু পূজা, নিশান পূজা সবই প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বাস উদ্ভূত সংস্কার। কোচবিহারের লোকায়ত জীবনের প্রতিটি স্তরে আজও সচল, সক্রিয় ও বহমান এই সংস্কার। সত্যকে জীবনের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে গ্রহণ করেই সৃষ্টি হয়েছে এখানে লোকায়ত ধর্ম। তাই শাস্ত্রীয় যুক্তি তর্কের বাইরে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে লোকায়ত বিশ্বাস ও স্থানীয় মানুষের আন্তরিকতার গভীরে জন্ম নিয়েছে শিব, বুড়াঠাকুর, গেরাম ঠাকুর ও অসংখ্য বৃক্ষ পূজার লোকাচার।

বাঁশ পূজা ঃ

সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন আসামের রাজবংশী কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে বাঁশ পূজার ঐতিহ্য এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোচবিহারে এই বাঁশ পূজাকে মদনকাম বা কামদেবের পূজা বলা হয়। 'তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ'-এর মতে মদন কামদেবের পুত্র। কালিকা পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে কামদেব ব্রহ্মার মানস পুত্র। এ ছাড়াও বাঁশের জন্মস্থান জল হিসেবে আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় বাঁশকে 'ইরাজ' বলা হয়। কালিকা পুরাণ মতে মানুষকে মত্ত করার জন্য এই দেবতার নাম হয়েছে মদন। দীর্ঘ একটি বাঁশকে লালকাপড়ে সজ্জিত করে মদনদেব হিসেবে তাকে পূজা করা হয়। যেহেতু বাঁশ এই দেবতার প্রতীক সেহেতু গোয়ালপাড়া ও কোচবিহারের সর্বত্র এই পূজার নাম 'বাঁশ পূজা'। পূজার পূর্বে বাঁশের যে অংশটি দেবতার প্রতীক হিসেবে নির্বাচন করা হয় সে সম্পর্কে আসামের গোয়ালপাড়ার বিভিন্ন গ্রামের মত তুফানগঞ্জের বারকোদালী ও মাথাভাঙ্গার শিকারপুর গ্রামে একটি লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে—

"গোরখান ফেলাইল বাঁশের গুরুয়া বুলিয়া
আগালখান ফেলাইল বাঁশের আগালী তুলিয়া
ঝিক ঝুটুলি ফেলাইক বাঁশের চেচিয়া ছিলিয়া
মধ্যখান নিল বাঁশের মদনকাম বুলিয়া।"[৬৬]

এতদঞ্চলে বাঁশ পূজায় বাঁশকে দেবতায় উন্নীত করার লোকায়ত বিশ্বাস, কৃষিনির্ভর লোকায়ত জীবনে বাঁশের প্রয়োজনীয়তা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন এতদঞ্চলের মানুষ। আর সে কারণেই দেখা যায়—

(ক) আদিম যুগে জনবিরল স্থানে লোকদেবতার পূজার সময় দীর্ঘ বাঁশ নিশান সহকারে পুঁতে রাখা হত, যাতে দূর থেকে এই দেবস্থান সবাই চিনতে পারেন। পূর্বে বন থেকে তুলে আনা সাধারণ বাঁশকেই পূজা করা হত এবং দীর্ঘ বাঁশের প্রতিযোগিতাও হত।

(খ) বাঁশ পূজার প্রশস্ত সময় চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী। দ্বাদশীতে হরিঠাকুর, ত্রয়োদশীতে কামদেব আর চতুর্দশীতে শিব পূজার প্রথা এতদঞ্চলে দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য। এই সূত্র

ধরেই চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর মদনকাম বা বাঁশ পূজা রাজবংশী সমাজের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য হিসেবে চলে আসছে।

(গ) বাঁশ পূজার প্রধান উপকরণ হল, চালের গুড়া, দুধ, চিনি মিশিয়ে এক প্রকার নাড়ু তৈরী করে মদনকামরূপী বাঁশ দেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে নাড়ুর সঙ্গে ভাং মিশিয়ে দেওয়া হয়। দিনহাটা মহকুমার গোসানীমারী অঞ্চলে বাঁশরূপী মদনকামের পূজার একটি গানে এঁর জন্ম সম্পর্কে শোনা যায় —

"গিরিবর বলে প্রভু শুনহ বচন
কামের পুত্র জন্ম হইল ঠাকুর মদনকাম।"

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বারোকোদালী ও নাককাটি গাছ গ্রাম, মাথাভাঙ্গার শিকারপুর গ্রাম, জেলা সদরের বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম ও মাঘপালা গ্রামে বাঁশ পূজার বৈশিষ্ট্য হল এই পূজার জন্য নির্দিষ্ট কোন মন্দির নেই। নির্দিষ্ট কোন নীচু জমির নির্জন স্থানে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় রাজবংশী সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী আদিম বৃক্ষ পূজার এই নিদর্শন কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ

তিস্তাবুড়ি পূজা ঃ

নদীমাতৃক কোচবিহারে নদীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা, উপাসনা এবং সেই উপলক্ষ্যে নদী প্রশস্তি রচনা, নদীকে নারী কল্পনা করে গান রচনার (বৈদরগান) পেছনে লোকায়ত বিশ্বাস ও আঞ্চলিক সংস্কার নীরবে অন্ত সলিলা ফল্গু ধারার মত প্রবাহিত। হলদিবাড়ী, মেখলীগঞ্জের লোকায়ত জীবনে তিস্তাবুড়ির পূজা, ব্রত উদ্‌যাপন একটি কৃষি কৃত্য এবং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এই উপলক্ষ্যে তিস্তাবুড়ির পূজা রাজবংশী সমাজের প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি হলেও জেলার হলদিবাড়ী ও মেখলীগঞ্জ মহকুমা ব্যতীত অন্য কোথাও এই নদী-দেবতার পূজা ও ব্রতের প্রচলন নেই। ডুয়ার্স এলাকা এবং তিস্তা নদীর অববাহিকা অঞ্চল এই পূজার উৎস ভূমি হলেও একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলায় এই পূজার প্রচলন বেশী। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারেই ব্রতিনীরা সমবেত নাচ ও গান করেন এই পূজা চলাকালীন। হলদিবাড়ীর প্রবীণা তিস্তাবুড়ি পূজার মারেয়ানী রেবতীবালা রায় এবং দেহরা যিনি এ পূজায় ছাতা ধরেন তাঁর মতে "তিস্তাবুড়ি এখানে সাত বইনির অন্যতম।" ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের মতে "এই পূজা জেলার তিস্তা নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই সৃষ্টি হয়েছে।" হলদিবাড়ী ও মেখলীগঞ্জের প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে দেবাদিদেব শিব এবং পার্বতীকে কেন্দ্র করেই মেছেনী খেলা ও গানের প্রচলন হয়েছে। জেলার এই দুটি অঞ্চলে এই পূজার সঙ্গে দুটি উপলক্ষ্য দেখা যায়। প্রথমত— বর্ষাকালে তিস্তার বিধ্বংসী বন্যায় ঘর

বাড়ি, মানুষ, গরু-ছাগল, ক্ষেতের ফসল প্রভৃতি ধ্বংস হয় এবং প্রাণহানিও ঘটে। দ্বিতীয়ত— নদীমাতৃক উত্তরবঙ্গের মানুষ নদীকে মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করেন, নদী এখানে জননী স্বরূপা।

সারা বৈশাখ মাসই তিস্তাবুড়ি পূজার প্রশস্ত সময়। এই পূজার উপকরণের মধ্যে দেখা যায় আতপচাল, চিড়া, বাতাসা ও ধূপকাঠি। পাঁঠা ও পায়রা বলি হয় স্বাভাবিক ভাবেই। নৈবেদ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বার খোল।

তিস্তাবুড়ি পূজার শুরুতে বৃদ্ধা মারেয়ানীর নেতৃত্বে যুবতী কিশোরী মেয়েরা বাড়ী বাড়ী এবং হাট-বাজার ঘুরে মেছেনী খেলার গান গেয়ে মাগন তোলেন। বৃদ্ধা মারেয়ানীর এক হাতে থাকে সুসজ্জিত ছাতা ও অন্য হাতে থাকে একটি ফুলের সাজিতে এক খন্ড পাথর, ফুল, সিঁদুর ও তিস্তা নদীর মাটি দিয়ে তৈরী বিমূর্ত তিস্তাবুড়ি দেবী। ব্রতিনীগণ মাগন তোলার সময় সমবেত কণ্ঠে গান গায় —

"মুঠি মুঠি মোর বথুয়া শাক
ছনে মুটি মোর তিতলি পাতে
ঐনা মোরকে হে টারির চ্যাংরা
রসিয়া খোচিয়া ধরিছে মোর
গায়ের পাছরা।"[৬৭]

হলদিবাড়ীর তিস্তাবুড়ি পূজার ব্রতিনী ঝর্ণা রায় ও ভারতী রায়, মারেয়ানী রেবতী বালা রায় এক সাক্ষাৎকারে (১৫/৫/৯৮ ইং) বলেন — "এই পূজার মারেয়ানী কেউ হঠাৎ হতে পারেন না। সধবা বা বিধবা যিনিই হন না কেন তাঁকে বংশানুক্রমিক ভাবেই আসতে হয়।" মেখলীগঞ্জের নিজতরফ গ্রাম এবং হলদিবাড়ী ব্লকের পয়ামারি, বোয়ালীমারী, ডাঙ্গাপাড়া, ফিরিঙ্গি পাড়া, হেমকুমারী গ্রামে এবং জলপাইগুড়ি জেলা সংলগ্ন বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মানিকগঞ্জ গ্রামে বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখ থেকে ব্রতিনীরা এই পূজার ব্রত শুরু করেন। পূজার সকল প্রকরণ ও লোকাচার সধবা, বিধবা. যুবতী, কিশোরী মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায় তাঁর উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের লৌকিক দেবদেবী ও পূজা পার্বণ গ্রন্থে বলেছেন— "মেচ সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই রাজবংশীগণ এই পূজার লোকাচার গ্রহণ করেছেন।"

তিস্তাবুড়ি পূজায় ও মেছেনী খেলায় পুরুষের কোন ভূমিকা নেই। বৈশাখের শেষ দিনে এটি অনুষ্ঠিত হয়, যে কোন নদীতে (তিস্তা, পাঙ্গা) স্নান ও জলখেলা, ভেলা ভাসানো হয়। সুসজ্জিত ভেলায় দুধ, দৈ, কলা, ফলমূল, বাতাসা ও প্রদীপ প্রভৃতি নৈবেদ্য দিয়ে জলে ভাসানো হয় এবং হাঁটু জলে নেমে এই পূজার মারেয়ানীকে মাঝখানে রেখে যুবতী ব্রতিনীরা জল ছিঁটিয়ে গান করে বৃত্তাকারে নাচেন। এটি মেছেনী খেলাব অন্যতম অঙ্গ। এর পর ব্রতিনীরা স্নান করে মারেয়ানীর বাড়িতে খরের চালা করে বহির্বাড়ীর পূর্ব দিকে বিমূর্ত তিস্তাবুড়ির মূর্তি তৈরী করে

অধিকারী ব্রাহ্মণ কর্তৃক পূজা দেন ও মানত করেন। এখানে পূজারীকে মারেয়াও বলা হয়। এই পূজার সময় মারেয়া ভক্ত বাঞ্ছা পূরণের অনেক কথা বলেন। তিস্তাবুড়ির পূজা ও মেছেনী খেলা উপলক্ষ্যে স্থানীয় রাজবংশী ভাষায় একাধিক গান প্রচলিত আছে উক্ত অঞ্চলে। বিজ্ঞান ও সভ্যতার রথচক্রে জেলার প্রাচীন ও লৌকিক অনেক কৃষ্টি বিলুপ্ত হলেও জেলার এই দুটি অঞ্চলে আজও লোকসংস্কৃতির এই নিদর্শন বর্তমান।

W.W. Hunter তাঁর Statistical Account of Bengal গ্রন্থের ২৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন — "The chief deity of the villagers is Burithakurani, The goddes of the tista"[৬৮]

বুড়ির পাট, বুড়ির থান, বুড়ি পূজা জেলার অনেক গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলেও নদীর নামের সঙ্গে এই বুড়ির নাম যোগ হয়ে পূজার প্রচলন জেলার এই দুটি অঞ্চলেই বেশী। তিস্তাবুড়ির পূজার প্রাচীনত্ব বিচারে হান্টার সাহেবের দৃষ্টান্ত বাদ দিলেও দেখা যায় ১৮০৯ খ্রী: ডঃ বুকানন হ্যামিল্টন তাঁর Account of Rangpur গ্রন্থে লিখেছেন "ফকিরগঞ্জ থানার গ্রামবাসীদের প্রধান দেবতাও তিস্তা।"

হনুমান-নিশান ঃ

কেচবিহারের রাজবংশী ও অন্যান্য উপজাতি সমাজে নিশান বা ধ্বজা পূজা একটি প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কার। "দেব-দেবীর মূর্তিপূজার সঙ্গে ধ্বজা বা নিশান পূজার প্রচলন সুপ্রাচীন। দেবদেবীর মন্দিরের স্তম্ভ বা চূড়ায় উড্ডীয়মান ধ্বজা বা কেতনের পূজা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে যেমন গরুড়, তালধ্বজ, মকর, কেতন প্রভৃতির পূজা থেকে আরম্ভ করে বর্তমানের চড়কপূজা, ধর্মপূজা, অশ্বত্থ ও অন্যান্য বৃক্ষ পূজা পর্যন্ত সর্বত্রই বর্তমান। সাঁওতাল, রাজবংশী, মুন্ডা, খাসিয়া, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ বা নিম্নস্তরের জনগণের মধ্যে কোন ধর্ম-কর্ম বা পবিত্র অনুষ্ঠান ধ্বজা পূজা ছাড়া অনুষ্ঠিত হয় না বলা যায়। সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জুড়ে ধর্মস্থান বা থানের সঙ্গে ধ্বজা পূজার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।"[৬৯] ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের উপরোক্ত মন্তব্যকে সমর্থন করে আমরা বলতে পারি কোচবিহারের রাজবংশী, আদিবাসী, কোম ও অন্ত্যজ জনসাধারণের মধ্যে ধ্বজা বা নিশান পূজার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। জেলার প্রত্যেক রাজবংশী পরিবারের গৃহস্থবাড়ীর তুলসী মঞ্চের পাশে কালী, বিষহরি, বুড়া ঠাকুরের পাশাপাশি লাল কাপড়ের ত্রিকোণাকৃতি দন্ডায়মান ধ্বজা সর্বত্রই পূজিত হন। এরূপ ক্ষেত্রে ধ্বজা বা নিশান পূজার সময় হিসেবে উক্ত সম্প্রদায় বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটিকে পবিত্র বলে মনে করেন। উক্ত প্রথম মাসের প্রথম দিনে স্থানীয় অধিকারী সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্যে বছরের অন্যান্য স্বাভাবিক পূজার ন্যায় দুধ, দই, চিড়া, আঠিয়াকলার নৈবেদ্যে অনেক পরিবারে বলরাম, সীতা, শিব, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, হনুমান ও বৈদ্যনাথ প্রমুখ দেবতাগণও পূজা পেয়ে থাকেন।

জেলার পাঁচটি মহকুমার একাধিক গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই প্রায় সকল গ্রামের সকল রকমের মাসান ও কালী ঠাকুরাণীর পাশে যেমন তুফানগঞ্জ মহকুমার দরিয়া বলরাম মূর্তির পাশে, আবার দোল সোয়ারীর মদনমোহন, মদনকামের পূজায়, হলদিবাড়ী ও মেখলিগঞ্জ মহকুমার তিস্তাবুড়ির পূজায় নিশান পূজিত হয়। নিশান পূজার ব্যাপক প্রচলন ও আয়োজন দেখা যায় দিনহাটা মহকুমার গোসানীমারী অঞ্চলের আলোকঝারি গ্রামের গড়কাটা মাসানের পূজা উপলক্ষ্যে।

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী ২ নং অঞ্চলের চারালজানি গ্রামের মাহুতপাড়ায় পাগলাপীর ও সত্যপীরের থানে নিশান উক্ত পীরের প্রতীক হিসেবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ভক্তি শ্রদ্ধা পান। মহরমের দিন মুসলিম তোর্ষাপীর ধামের মাজারে হিন্দু - মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণ খই, বাতাসা ও সাদা বুটি যুক্ত ত্রিকোণাকৃতি লাল নিশান নিবেদন করেন। কোচবিহার জেলায় তোর্ষাপীরকে ভক্তি নিবেদনের এটি একটি প্রাচীন প্রথা।

আবার চৈত্র, বৈশাখ মাসের মদন চতুর্দশী তিথিতে মদনকাম বা বাঁশ পূজার সঙ্গে নিশানকেও পূজা করা হয়। তিস্তাবুড়ি পূজার ব্রতিনীগণ হাতে রঙ-বেরঙের নিশান নিয়ে মাগন সংগ্রহ করে থাকেন। নিশান পূজার অনুষঙ্গেই কোচবিহার জেলায় হনুমান পূজার প্রচলন। আমরা হলদিবাড়ী সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ গ্রামের তিস্তাবুড়ি পূজার দেওধা বা পূজারী রেবতীবালা রায়ের বাড়ীতে কালী, মহাকাল ও বুড়াঠাকুর দেবতার সঙ্গে নিশান ও হনুমান পূজাও প্রত্যক্ষ করি। কোচবিহারের বড়দেবীর গৃহারম্ভ ও দেওপই পূজার পর হনুমান দন্ড পূজার লোকাচার দীর্ঘদিনের। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বৈশাখ মাস কিংবা বাৎসরিক পূজার দিন নিশান পাল্টানো হয়। নিশান বা ধ্বজার অবস্থান সকল ক্ষেত্রেই তুলসী মঞ্চের দক্ষিণ দিকে হয়। জেলার রাজবংশী সমাজের বিশ্বাস এই ধ্বজা বা নিশান হনুমান দেবতার প্রতীক। "এই সম্প্রদায়ের আরও বিশ্বাস যে ধ্বজার বংশদন্ডটির উচ্চ প্রান্তে অবস্থান করে হনুমান ঠাকুর বাড়ীতে যাতে কোন উপদেবতা বা অপদেবতা প্রবেশ করে ক্ষতিসাধন করতে না পারে তার জন্য প্রহরা দিয়ে থাকেন।"[১০]

সিতাই থানার চামটা গ্রামের ধুমদাহপাড়ের অশোকাষ্টমী মেলার মূল আরাধ্য দেবতা ষড়ভুজ হনুমান। প্রতি বছর রাধা অষ্টমী তিথিতে বড়দেবীর যুপকাষ্ঠ বা শিড়দাঁড়া মূলমন্দিরে আনয়নের পর উডুন কাঠের খুঁটি পুঁতে দেওপোয়া বা দেওপই পূজার পর সাড়ম্বরে মদনমোহন বাড়ী থেকে হনুমান দন্ড বহন করে আনা হয় এবং কোচবিহারের বড়দেবীর মন্দির অভ্যন্তরে বা পার্শ্বে এই হনুমান দন্ড আনয়ন ও প্রত্যাগমন করান বংশানুক্রমিক ভাবে "হালুয়া সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি।"[১১]

স্বপ্নাদিষ্ট মহারাজা বিশ্বসিংহকে একবার মহাদেব প্রসন্ন হয়ে আদেশ দেন "রজত দ্বারা এক বানর নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যে বানরের মস্তক ও অস্থিসকল রাখিয়া তাহা দন্ডোপরি স্থাপন করিবে। তাহারই নাম 'হনুমান দন্ড' হইবে। ছত্র ও দন্ড ভিন্ন রাজা সিদ্ধ হন না।"[৭২] আজ পর্যন্ত রাজ আমলের ঐতিহ্য মেনে কোচবিহার মদনমোহন বাড়ীতে হনুমান দন্ড রক্ষিত আছে এবং বিভিন্ন পার্বণ, বিশেষ করে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে হনুমান দন্ড পূজা হয়ে থাকে।

কোচবিহারের বড়দেবী পূজার পূর্বে হনুমান দন্ড পূজা রাজ আমলের একটি প্রাচীন প্রথা। আজও অব্যাহত এই পূজায় এক জোড়া পায়রা ও এক ঘটি চাল দিয়ে বড়দেবীর পূজা প্রার্থনা করে হালুয়া সম্প্রদায়ের পুরোহিত বলেন— "মা দুর্গা আমি পূজা দিলাম তোমরা ন্যান।"[৭৩]

ক্ষেতিলক্ষ্মী ঃ

ধান ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা বাংলার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার মিল দেখতে পাই। বঙ্গোপসাগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উৎপাদিত এই শস্যই বাংলার প্রধান খাদ্যবস্তু। আবার দেখা যায় ধান চাষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মাতৃপূজার ইতিহাস। মাতৃপূজার পীঠস্থানও বাংলা। ঐতিহাসিকদের মতে বাংলায় নবপোলিও বিপ্লবের সূচনাও হয় ধান চাষের মাধ্যমে। বাংলায় লক্ষ্মীপূজার প্রচলন হয় এই ধান চাষের সূত্র ধরেই। তাই ধানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী। এই কথা মনে রেখেই লক্ষ্মী পূজাকে এখনও কোচবিহারের কৃষিনির্ভর সমাজে খন্দপূজা বলা হয়। 'খন্দ' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই 'ফসল' শব্দটি। কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের ক্ষেতিলক্ষ্মী, ভূমিলক্ষ্মী, ডাকলক্ষ্মী, গুছিদেওয়া রাভা সম্প্রদায়ের থানসিড়ি পূজা সবই প্রাচীন মাতৃপূজার বা খন্দ পূজার অনুষঙ্গে উক্ত বিভিন্ন নামে পূজিত হন। লক্ষ্মীর অপর নাম 'শ্রী'। কোচবিহারের রাভা উপজাতি সম্প্রদায়ের থানসিড়ি 'থান শ্রী' থেকে উদ্ভূত এবং রাভা সমাজের থান শ্রী বা লক্ষ্মীও এক লোকায়ত গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। "সৎপথ ব্রাহ্মণে প্রথম এই দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং অন্য অর্থে লক্ষ্মীকে উর্বরতার দেবীও বলা হয়।" ক্ষেতিলক্ষ্মী নামের মধ্যেই স্পষ্ট বোঝা যায় এই দেবী ক্ষেতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা নামে যে পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাতে পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে মৃন্ময় মূর্তি, মাটির সরা ও পটের মূর্তিতে পূজার প্রচলন থাকলেও কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দিন অনেকে সোলার তৈরী লক্ষ্মীর মঞ্জুষাকেও পূজা করেন। কিন্তু ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজার লোকচার, রীতি-নীতি সার্বজনীন গৃহলক্ষ্মী পূজা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ এখানে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোন ভূমিকা থাকে না। সমগ্র কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের মানুষ ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজাকেই আদিম লক্ষ্মী পূজা বলে মনে করেন।

কোচবিহারের ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজার প্রশস্ত সময় হিসেবে ধরা হয় আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিনের বৃহস্পতিবার অথবা বৃহস্পতিবারে সংক্রান্তি না পড়লে কার্তিক মাসের প্রথম দিনটিতেই

এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারের লোকধর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও কৃষিভিত্তিক সভ্যতার আদিম নিদর্শন ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজা। সংশ্লিষ্ট উৎসবের বেশীর ভাগ দায়িত্ব গ্রহণ করেন গ্রামের সচ্ছল জোতদার ও জমির মালিকগণ। এতে সহযোগিতা করেন আধিয়ার বা বর্গাদারগণ, যাঁরা সারা বছর ভূস্বামীর কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকেন। মেখলিগঞ্জ মহকুমার ফুলকা ডাবরি, কাশিয়াবাড়ী গ্রামের কৃষক রবীন্দ্র দাস ও শান্ত বর্মন এক সাক্ষাৎকারে (৩/১০/৯৭ইং) বলেন, 'পূজার অনেক কাজের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত থাকলেও আর্থিক দায়ভার তাঁদের বহন করতে হয় না।' পূজার নির্দিষ্ট দিনে সকাল থেকেই প্রস্তুতি পর্ব চলে। বহির্বাড়ীর উঠোনে টিন বা খড় দিয়ে পশ্চিমমুখী একচালা ঘর তৈরী হয়। এটাই ক্ষেতিলক্ষ্মীর মূল মণ্ডপ। পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় অধিকারী সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। পূজার মূল উপকরণ আতপ চাল, দুধ, দই, কলা ও চিনি প্রভৃতি কলাগাছের ঢোঙলে (খোল) নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদন করলেও এই পূজার প্রধান সামগ্রী হল আতপ চাল, চিড়া, চিনি, দুধ, দই, কলা, বাতাসা, বাতাবিলেবু, ধূপ-ধূনা।' ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজায় কোন মৃন্ময় বা শোলার মূর্তি থাকে না। এখানে মূর্তি হিসেবে মন্ডপে অবস্থান করেন আশ্বিন-কার্তিক মাসের ধানের ফুল শুদ্ধ কয়েকটি থোপ। এই থোপ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ রীতি বা লোকাচার আছে। যেমন এই থোপ সর্বদা হবে বিজোড় সংখ্যক, নয়, এগারো, তের প্রভৃতি। "এই পূজা প্রসঙ্গে স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস— বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ভূমির প্রকৃতি অনুসারে ক্ষেতিলক্ষ্মীর প্রকৃতি ও স্বভাবে ভিন্নতা দেখা যায়। কোন কোন অঞ্চলের ক্ষেতিলক্ষ্মী দেবী জীবের রক্ত গ্রহণের জন্য লালায়িত। এরূপ কোন জীব-জন্তুর রক্তদান না করলে জমির মালিকের বিপর্যয় ঘটে থাকে।"[৭৪]

বলি প্রদত্ত ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজা প্রকৃত পক্ষে একটি কৃষি কৃত্য বিশেষ। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের বিশেষ করে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় কৃষক সম্প্রদায়ের ধান ও ধানের ফুল সংক্রান্ত বিভিন্ন লোকাচারের সঙ্গে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের এই ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজার সাদৃশ্য দেখা যায়। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় এই পূজার লোকাচারে দেখা যায় পূজার দিন রাত্রি বেলা ক্ষেতে জল ছিটানো হয় এবং পাটকাঠিতে কলার ঢোঙলের (খোল) প্রদীপ বানিয়ে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হয়। কিন্তু উক্ত অঞ্চলে (বীরভূম, বাঁকুড়া) এই কৃত্যটিতে দেখা যায় ভোরবেলা ক্ষেতে, সারের গাদায়, সর বা নল গাছ পুঁতে দিতে হয় এবং সঙ্গে একটি পুটলিতে থাকে কাঁচা হলুদ, ওল, শালুক ডাঁটা ইত্যাদি।

যাত্রা পূজা ঃ

বিজয়া দশমী তিথিতে সাধারণত এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নবমীর দিনও এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারে দুর্গা পূজাকেও যাত্রাপূজা বলে মনে করা হয়। যাত্রা পূজার উদ্ভব সম্পর্কে শোনা যায় এই দিনটিতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের কৃষকগণ হৈমন্তিক ফসলের

জন্য প্রথম হলকর্ষণের সূচনা করেন। শীতের মরশুমের অর্থকরী অথচ গুরুত্বপূর্ণ ফসলের ভূমি তৈরীর জন্য যে হাল চালনার যাত্রা শুরু হয় সেই সুবাদেই এই পূজার নাম 'যাত্রা পূজা' হয়েছে বলে আমরা মনে করি। এটিও একটি কৃষিকৃত্য বিশেষ অথবা Fertility-cult এর নিদর্শন। বিজয়া দশমীর দিন এই যাত্রাপূজা উপলক্ষ্যে অনেক নূতন কাজেরও সূচনা হয় এখানে। প্রাচীন কালেও যুদ্ধযাত্রা, পশুশিকার ও হলকর্ষণ শুরু হ়ত এই দিনে। কোচবিহারের কৃষকগণ মূল পূজা পর্বের শেষে আড়াই পাক হল কর্ষণ করে কৃষি কর্মের সূচনা করেন। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয় 'হাল পাইত্রা'।

বিষুমা পার্বণ ঃ

সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশেষ করে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আসামের গোয়ালপাড়া এবং বর্তমান বাংলাদেশের রঙপুরের ক্ষত্রীয় রাজবংশীগণ চৈত্র সংক্রান্তির দিনটিকে 'বিষুমা' স্থান ভেদে 'বিষুয়া' পার্বণ হিসেবে পালন করেন। বাংলার সর্বত্র এই দিনটিকে মহাবিষুব বা বিষুবসংক্রান্তি বলা হয়। বিষুব থেকেই বিষুম বা বিষুয়া শব্দের উৎপত্তি বলে অনুমান করা যায়। কোচবিহারে এই পার্বণের নাম 'বিষুমা' হলেও জলপাইগুড়ি ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় এই পার্বণকে বলা হয় 'বিষুয়া'। প্রাচীন কাল থেকে স্থানীয় এই ক্ষত্রিয় সমাজে 'বিষুয়া' পার্বণ পালিত হয়ে আসছে।

চৈত্র সংক্রান্তির বিষুয়া বা বিষুমা পার্বণের দিন রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাড়ীর মানুষ সকলেই প্রত্যুষে উঠে স্নান করেন। গৃহবধূগণ বাড়ির উঠোনে ও বহির্বাড়ী ঝাড় দিয়ে গোবর জল ছিটিয়ে দেন। ঐদিন অধিকারী ব্রাহ্মণ কর্তৃক তুলসী মঞ্চে পূজা দেওয়া হয়। গৃহপালিত পশুদেরও পরিচর্যা করা হয়। এই পার্বণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল— চিড়া, তিল, সরিষা, মটর, গম, ছোলা, চাল ইত্যাদি আট রকমের ভাজা খাওয়া। এই ভাজার সঙ্গে কাঁচা পেয়াজ, রসুন, আদা, কচি আম, লবণ, সরষের তেল মেখে তা সুস্বাদু করা হয়। এ ছাড়াও পাটপাতা, নিমপাতা, কারিপাতা ভাজা এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। অনেকে কিছু ভাজা হাতে বা ছোটপাত্রে নিয়ে বাড়ীর উঠোনে, ঘরের চালে ও বহির্বাড়ীতে ছিটিয়ে দেন। এই ভাজা-ভুজি খাওয়া প্রসঙ্গে কোচবিহারে প্রচলিত লোকশ্রুতি হল— 'প্রথমে খাবার মুখে দিয়ে একটু চিবিয়ে ফেলে দিতে হয়। এতে সারা বছরের বিষ উদ্গীরণ হয়।' 'বিষুমা' পার্বণের অনুষঙ্গ হিসেবে কোচবিহার জেলার প্রায় সকল গ্রামেই দেখা যায় গৃহপালিত পশুর পরিচর্যা। তাই বাড়ীর কিশোর যুবকরা এই দিন হালের গরু ও গাভী বাছুর প্রভৃতিকে নদী অথবা নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে নিয়ে গিয়ে স্নান করান। শুধু কোচবিহার নয় এই পার্বণের দিন উত্তরবঙ্গের সকল ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ই দুপুরে আহারের সময় বাড়ীর উঠোনের প্রতিটি ঘরের প্রবেশ পথের উপরের চালে গুজে দেন আস্ত রসুন, পেঁয়াজ এবং বিভিন্ন তেতো ও বিষাক্ত পাতা। যার মূল উদ্দেশ্য যাতে কোন অপদেবতার কু-দৃষ্টি বাড়ীতে না পড়ে।

এই পার্বণের অপর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল শিকার পর্ব। এই সম্পর্কে স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রাচীন বিশ্বাস হল তাঁরা ক্ষত্রিয় এবং রাজবংশোদ্ভুত। প্রাচীন রাজ-রাজাদের সেই শিকারের ঐতিহ্যকে স্মরণ করেই শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। এটি তাঁদের কাছে এই পার্বণের একটি ঐতিহ্যবাহী লোকাচার।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এই পার্বণের দিন জীব-জন্তু শিকারের পরিবর্তে মাছ ধরার প্রথা আছে। উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলাতে এই প্রথা নেই। 'বিষুয়া' পার্বণে শুধু জাগতিক মানুষই নয় এর সঙ্গে জড়িত জীবজগতের সকল বস্তুই কম-বেশী সম্পর্কিত। পার্বণের দিন শিকার পর্বে জেলার সবকটি মহকুমারই গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখা যায় বিষুয়ার দিন দুপুর বেলা ভাজা-ভুজি, দই-চিড়া, তেতো বস্তু খাওয়ার পরেই রাজবংশী তরুণ যুবকগণ দলবদ্ধ ভাবে লাঠি-সোটা, তীর-ধনুক, বল্লম নিয়ে জঙ্গল থেকে জঙ্গলে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। যদিও এক্ষেত্রে কোন বাঘ-ভাল্লুক শিকারের উদ্দেশ্য তাঁদের নয়। মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিকারপুর গ্রামের দেবী বর্মন বলেন যে, মূল লক্ষ্য খরগোশ যাকে স্থানীয় ভাষায় 'শেশা' বলা হয়। কোন ক্ষেত্রে সেই শশক শিকার করতে না পারলে অন্ততপক্ষে একটি শৃগালকে হত্যা করতেই হবে। মোটকথা কিছু একটা শিকার করে বাড়ী ফিরতেই হবে। এই শিকার পর্বে শুধু স্থানীয় সম্প্রদায়ের যুবকগণই নন অন্যান্য হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবকগণও এতে অংশ গ্রহণ করেন। কবিরত্ন শ্যামাপদ বর্মনের মতে— "এই শিকার অভিযানটি প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজাদের কৃষ্টি ও কীর্তি রক্ষার নিয়ম হিসেবেই রাজবংশী সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে।"[৭৫] কোচবিহারের এই পার্বণ উপলক্ষ্যে পশু শিকারের পাশাপাশি মৎস্য শিকারও করা হয়। সেদিন গ্রামের কোন এক প্রান্ত থেকে শিকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 'শিঙ্গা' বাজান এবং শিঙ্গার শব্দ শুনেই সবাই বুঝতে পারেন যে এখন কোন নদী বা জলাশয়ে মৎস্য শিকারে বেরোতে হবে। এতদঞ্চলে মৎস্য শিকার পর্বকে 'বাহো' বলা হয়। এই শিঙ্গার শব্দ অনুসরণ করে দলবদ্ধভাবে মানুষ 'চাক', 'ঝোকা' ও 'জাল' নিয়ে নদী বা জলাশয়ে হাজির হন। এক সময় এই জাল দিয়েই শশক ও শূকরও শিকার করা হত।

বিষুয়া পার্বণের একটি বড় শর্ত হল সেদিন রাতে আমিষ আহার করতে হয়। তাই সন্ধ্যা বা রাত্রিতে পাঁঠা বা খাসি মেরে কোথাও পারিবারিকভাবে কোথাও প্রতিবেশীদের নিয়ে মাংস-ভাত খেয়ে থাকেন। কোচবিহারে এই পার্বণের অপর প্রথা হল সারা চৈত্র মাস পর্যন্ত বারোটি মাসের নামে বারোটি কচু গাছের পাতার আটি বেঁধে রাখা হয়। সেই কচু পাতায় জমানো জলের পরিমাণ অনুযায়ী কোন্ মাসে কি পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে তা অনুমান করা হয়। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের মতে "মেছেনী খেলার মত বিষুয়া পার্বণের বিভিন্ন লোকাচার ও সংশ্লিষ্ট সংস্কারগুলি মেচ উপজাতি কর্তৃক প্রভাবিত।" এই পার্বণের অপর এক উপলক্ষ্য হল কৃষিকাজের সরঞ্জামের পরিচর্যা করা। এর মূল উদ্দেশ্য যার সহযোগিতায় এই ক্ষত্রিয় সমাজ জীবন ও জীবিকার সংস্থান করেন তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। এই আচারটির সঙ্গে বিশ্বকর্মা পূজার

একটি মৌলিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র-সমীক্ষায় একটি জিনিস আমরা উপলব্ধি করতে পারি— রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের কৃষি নির্ভর প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির এই ঐতিহ্য আজ বিলুপ্তির পথে।

পুষনা ঃ

জেলার বার মাসে তের পার্বণের অন্যতম 'পুষনা' পার্বণ। পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুগণ এই অনুষ্ঠানকে 'পৌষপার্বণ' হিসেবে পালন করেন। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন এই পার্বণের মূল সময়। কোচবিহারের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের উল্লেখযোগ্য পার্বণ হল 'পুষনা'। পূর্ববঙ্গীয় বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর অঞ্চলের অধিবাসীগণ এই পার্বণ উপলক্ষ্যে পিঠে ও দই-চিড়া খান। অপর পক্ষে পুষুনা পার্বণের দিন রাজবংশী রমণীগণ বিশেষ করে বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর উঠোন ও বহির্বাড়ী ঝাড় দিয়ে গোবরজল দিয়ে লেপামোছা করেন। সেই দিন প্রত্যুষে স্নান করে বাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত শিব, দুর্গা, কালী, রাধাকৃষ্ণ, বলরাম, বুড়া ঠাকুর সহ তুলসী মঞ্চে পূজা দেন। সেই সময় পূজার উপকরণ হিসেবে থাকে নতুন ধানের আতপচাল, দুধ, দই, কলা ও চিনি। স্থানভেদে অনেকে নতুন ধানের তৈরী পিঠে পুলি দিয়ে গৃহ দেবতা এবং পিতৃমাতৃ কুলকে পূজা দেন। এরপর বাড়ীর সবাই, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে আমন্ত্রণ করে পিঠে খাওয়ান এবং রাত্রে কেউ ভাত খান না। পুষুনা পার্বণের সূচনা হয় নির্দিষ্ট দিনে প্রত্যুষে স্নানের মাধ্যমে। কোচবিহার ও আসামের সর্বত্রই ঐ দিন গরু-বাছুরকে গা ধুইয়ে দেওয়া হয় এবং চালের গুড়ো দিয়ে কল্কির মাধ্যমে গরুর গায়ে ছাপ দিয়ে তিনটি সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয়। গরুর গলায় ফুলের মালা পরানো হয়। শিঙ্গে মাখানো হয় তেল। তারপর ধানের পিঠে ও ধাপনা পিঠে গরুকে খাইয়ে প্রণাম করা হয়। এ সময় গোধন রক্ষাকল্পে সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন আসামের লোকজীবনে আর এক লোকদেবতা সোনা রায় পূজিত হন। যিনি এতদঞ্চলের গো রক্ষক দেবতা হিসেবে মান্য। এই দেবতার পূজার মূল উদ্দেশ্যই হল যাতে বাঘ গরু বাছুর বা গৃহপালিত কোন পশুর ক্ষতি করতে না পারে। কোচবিহার ও গোয়ালপাড়া জেলায় এই প্রসঙ্গে সোনা রায়ের একটি গানে আছে— 'বাঘ না মিললে চিতিয়া পাকড়া।' কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকবিশ্বাস পুযুনা-পার্বণ অতিক্রান্ত না হলে গোলার ধান বের করা যায় না। "পুষুনার পর ধানের মাচাতে ফুল দিয়ে নূতন কাপড় পরে ভক্তি নিবেদন সহ গোলা থেকে ধান পাড়া হয়।"[৭৬]

এই পার্বণ উপলক্ষ্যে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে দেখা যায় "পৌষ সংক্রান্তির পূর্বেই সাধারণত ধান কাটা শেষ হয়ে যায়। এই কাটাধানের আটিগুলি স্তূপিকৃত করে বাড়ীর উঠোনে রেখে দেওয়া হয়। মাঘ মাসের মধ্যেই ধান মাড়াই শেষ হয়ে যায়। এই স্তূপগুলির নাম পুঞ্জি বা পোলাই। পিঠে খাওয়ার পূর্বে স্থানীয় সম্প্রদায় প্রথম পিঠে তেল মাখানো কলাপাতা দিয়ে

আবৃত করে এই পুঞ্জিতে রেখে দেন। এর অন্তর্নিহিত অর্থ পরবর্তী বছরে অধিক ফসল প্রাপ্তির কামনা।" কৃষি ভিত্তিক সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে আদিম যাদুবিদ্যা নির্ভর এই পার্বণ অনুষ্ঠান পুষুনা কোচবিহারের লোকধর্ম, লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতিকে বয়ে নিয়ে চলেছে আজও। তাই এই পার্বণ শুধু কোচবিহারের নয় বাংলার লোকসংস্কৃতিরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

অম্বুবাচি / আমাতি ঃ

Fertility cult অনুযায়ী নারী ও প্রকৃতিকে অভিন্ন কল্পনার যে সংস্কার রাজবংশী ও পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু-বিধবাদের মধ্যে আজও মজ্জাগত, অম্বুবাচি ও আমাতি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্রত-পার্বণ। ঋতুচক্রের আর্বতনে বর্ষার বারিধারায় পৃথিবী যখন বর্ষণসিক্ত হয়ে ওঠে তখন তাকে প্রথম ঋতুময়ী নারী কল্পনার আদিম সংস্কার থেকে সৃষ্টি হয়েছে অম্বুবাচি নামক ধর্মীয় কৃত্য। ঋতু কাল রজঃস্বলা নারীর জীবনে যেমন সন্তান ধারণের পক্ষে উপযুক্ত সময় ঠিক তেমনি অম্বুবাচির ঠিক পরবর্তী সময় প্রকৃতির কোলে ফসল ফলানোর পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময় বলে মনে করা হয়। অম্বুবাচির তিনদিনের সময়কালে যে প্রচলিত বিশ্বাস দেখা যায় অর্থাৎ জমিতে লাঙ্গল দেওয়া, মাটিকাটা বা গাছের কোন ফল ছেড়া কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে ট্যাবু বলে মানা হয়।

সূর্যের দক্ষিণায়নের শুরু থেকে তিনদিন এই পার্বণ জেলার সর্বত্রই পালিত হয়। বিধবাদের একাদশী পালনের উদ্ভবও এই কারণে। আসাম ও উড়িষ্যায় এই ব্রত-পার্বণের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে।

অম্বুবাচি প্রকৃতপক্ষে দেবী কামাখ্যার পূজা। এই দেবীর রজঃপ্রাপ্তির সঙ্গে এই পূজা বা পার্বণের যোগ আছে। আবার কোচবিহার রাজবংশের প্রতি কামাক্ষ্যা দেবীর অভিশাপের কথা এতদঞ্চলে বহুশ্রুত লোকশ্রুতি। প্রাচীন এই লোকশ্রুতি শুধু কোচবিহার নয় সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের জনমানসে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই বর্ষাকালীন ঋতুতে হিন্দু বিধবাগণ এই পার্বণটি পালনে অভ্যস্ত। এই অম্বুবাচি পার্বণই কোচবিহার তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের কাছে আমাতি বলে পালিত এবং পরিচিত।

জেলার হলদিবাড়ী ব্লকে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ অভিমুখী পাকা রাস্তায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদেরও আমাতি ঠাকুরের এক লৌকিক অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়। "হিন্দু বালক-বালিকাদের মত এরাও হাটবাজার ফেরত পথচারীদের কাছ থেকে ফল, সব্জী ও পয়সা সংগ্রহ করে এবং তাদের নির্মিত মন্ডপে হিন্দু দেব-দেবীর ছবির পরিবর্তে হজরত মহম্মদ বা কোন মসজিদ বা মহরমের কোন দৃশ্য মুদ্রিত ফটো টাঙিয়ে দেয়। ব্যতিক্রম হিন্দু বালকদের মত এরা কোন পূজার আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন না। সংগৃহীত অর্থ, সব্জী ও ফলমূল নিজেরা খেয়ে ফেলে।"

দুটি ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করার ফলে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরূপ লৌকিক অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে · জেলার একমাত্র হলদিবাড়ী ব্লকেই লোকায়ত শিশুমন এরূপ অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে। উত্তরবঙ্গের মালদা ও উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশী এবং অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকলেও সেখানে আমাতি পার্বণের নাম 'আমৈৎ'। উক্ত জেলাগুলিতে আমাতি পার্বণের দিন ঘরের বাইরের দেওয়াল গোবরের দাগ দিয়ে সাপের অনুকরণে চিত্রিত করা হয়। অনেকে এই চিত্রিত সাপের মাথায় একটি পেঁয়াজ ঝুলিয়ে দেন। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বিধবা নারীগণ অম্বুবাচির সময় সর্পভীতি দূর করার জন্য যেমন দুধ পান করেন এখানে তেমনি গোবর দিয়ে সাপের অনুকরণে চিত্রিত করার প্রথা প্রচলিত আছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে অম্বুবাচি একটি প্রজননী শক্তির পূজা আর সাপ প্রজননের বিশিষ্ট প্রতীক।

কলের মাগন ঃ

কোচবিহারে বসবাসকারী ঢাকার গ্রামীণ পরিবারের যুবক ও কোচবিহারের স্থানীয় যুবকগণ দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে নগদ পয়সা, চাল, সবজি সংগ্রহ করেন। এভাবে ৫-৭ দিন সংগ্রহের পর রাত্রিবেলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বনভোজন করেন। এতে গ্রামবাসীদেরও নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান হয়। এই ব্রতমূলক অনুষ্ঠানটি হয় সাধারণত পৌষ মাসে যখন অন্যান্য গ্রামে চলে চোরচুরনীর পালা। মূল অনুষ্ঠানটি হয় পৌষ সংক্রান্তির দিন। অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য মাগনের দলের প্রত্যেক যুবকের হাতে থাকবে লাঠি। বাড়ির উঠোনে হাজির হয়ে মাটিতে তাল ঠুকে ঠুকে যুবকগণ গান করবে। গানের কথাগুলি অনেকটা ছড়ার মত। যেমন—

"রাম ডেকে বলে গুনের ভাইরে
লক্ষ্মণ এসো আমার কোলে
পিতা মরলে পিতা পাবো
গুনের ভাই লক্ষ্মণ মরিলে
ভাই বলিব কারে রে।"[৭৮]

মেখলীগঞ্জ মহকুমার হলদিবাড়ী ব্লকের কাশিয়াবাড়ী গ্রামে আমরা এরূপ ব্রত সদৃশ অনুষ্ঠানের সাক্ষাৎ পাই।

ব্রত অনুষ্ঠান ঃ

ভূমিকা ঃ

ব্রাত্য জনের পালিত লোকাচার মূলক অনুষ্ঠানই হল ব্রত। ব্রত— এই কথাটির মধ্যেই অনার্য সৃষ্ট একটি লোকাচারের কথা মনে হয়। একদিন এই ব্রতধারীগণ আর্যভাষিক বৈদিক সভ্যতার দ্বারা নিন্দিত হয়েছেন।

উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক এই জেলার রাজবংশী রাভা ও পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু অধ্যুষিত কোচবিহারের লোক জীবনের নিত্যসঙ্গী হচ্ছে এতদঞ্চলের হিন্দু বাঙালী কর্তৃক পালিত বিভিন্ন লোকাচার মূলক অনুষ্ঠান ব্রত ও পার্বণ। এই প্রসঙ্গে আমরা কোচবিহারে প্রচলিত প্রাচীন কিছু ব্রতের উল্লেখ পাই হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী লিখিত 'Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement' গ্রন্থে।

বাংলার অন্যান্য জেলার মত কোচবিহারেও আমরা ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখতে পাই ব্রত অনুষ্ঠানের ব্রতিনীরা মূলত নারী। কোথাও যুবতী, কুমারী, বিবাহিতা নারী ও বিধবা। পিতৃ পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া বংশানুক্রমিকভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে ব্রত অনুষ্ঠানমূলক লোকাচার। আশা ও আকাঙ্ক্ষার বা প্রত্যাশা পূরণের নিমিত্তেই বিশেষ লোকাচার ও লোকবিশ্বাস নির্ভর কিছু কৃত্য বেশ কিছু সময় ধরে পালন করার মধ্যেই নিহিত আছে এতদঞ্চলের ব্রত অনুষ্ঠানের মূল কথাটি। এছাড়াও এর ভিতর প্রকাশ পায় আদিম যাদুবিদ্যার অনেক সংস্কার। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও মেয়েলী ব্রতের প্রাধান্য দেখা যায় বেশী। আদিম মানুষের লৌকিক ধর্মবোধকে কেন্দ্র করেই হাজার বছরের বিবর্তনে যে ব্রতের উদ্ভব ঘটেছিল তার কিছু নিদর্শন আছে এতদঞ্চলে।

লৌকিক ধর্মীয় চেতনার যে বিষয়গুলি এতদঞ্চলে ব্রত অনুষ্ঠানকে সজীব রেখেছে সেগুলি হল ব্রতের কথায় ও মন্ত্রে লোকদেবতার মূর্তি ও উপাচারে এবং আল্পনায়। প্রায় সকল ব্রতের মধ্যেই নিহিত আছে আদিম যাদু বিশ্বাস।

আধুনিক জীবন ধারার স্পর্শ জেলার কৃষি কেন্দ্রিক জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করলেও যাইটল, কাতি, হুদুম, মাটিয়া ব্রত, মঙ্গলচন্ডী ব্রত, আমাতী ব্রত, কাত্যায়নী ব্রতের মত লোকাচার, লোকবিশ্বাস এখনও এখানে সমানভাবে প্রচলিত। কোচবিহারের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন বয়সের রমণীগণ পালন করেন একাধিক ব্রত অনুষ্ঠান। বেশীরভাগ ব্রত অনুষ্ঠানের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ বা প্রধান শর্ত হল ব্রতের কথা বা কাহিনী। যদিও সব ব্রতের ক্ষেত্রে কাহিনী সমানভাবে প্রচলিত নয়।

স্থানীয় রমণীগণের জাগতিক আকাঙ্ক্ষা পুরণে কায়মনোবাক্যে পালিত ব্রত কাহিনী-গুলি তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোচবিহারের সুবচনী, যাইটল ও কাতিপূজায় রাজবংশী রমণীগণের প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জীবনাচরণের রূপ, ভাগ্যের বিড়ম্বনা, সাফল্য ও ব্যর্থতা প্রভৃতি ব্রতের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়।

কোচবিহারে প্রচলিত ব্রতগুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি— শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় বা লৌকিক। বক্ষ্যমান আলোচনায় শুধু লৌকিক ব্রতগুলিই প্রাধান্য পেয়েছে। এই

লৌকিক ব্রত আবার দু রকমের। পুরুষ এবং নারী কর্তৃক পালিত ব্রত। নারী ব্রত আবার তিন রকমের কুমারী, সধবা ও বিধবা। শাস্ত্রীয় ব্রতের মধ্যে কোচবিহারে সর্বাধিক প্রচলিত শিবরাত্রির ব্রত, জন্মাষ্টমীর ব্রত, আর লৌকিক ব্রতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুমারী ব্রত হল কাত্যায়নী ব্রত। অপরপক্ষে সধবা মেয়েদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত সুবচনী ব্রত। সুবচনী একমাত্র ব্রত যা জেলার স্থানীয় মানুষ প্রায় সর্বত্র সমান ভাবে পালন করেন। অপরপক্ষে কোচবিহারের লোকায়ত সংস্কার, বিশ্বাস ও যাদুবিদ্যার প্রতীক ধর্মী ব্রত হল হুদুম পূজার ব্রত। মেখলীগঞ্জ মহকুমার হুদুম পূজার ব্রতিনী সরোবালা, মাঘপালা গ্রামের হুদুমের ব্রতিনী নেন্দা বর্মন ও তুফানগঞ্জ মহকুমার বিলসী গ্রামের সুবচনী ব্রতের মারয়ানী ও হুদুমের ব্রতিনী পবনেশ্বরী বর্মন এক সাক্ষাৎকারে জানান "খরা ও অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি কামনায় তারা এই ব্রত পালন করেন।" লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে "মেয়েলী ব্রতগুলি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ারই লৌকিক রূপ।"

সধবা রমণীগণ পালিত অপর ব্রত হল মঙ্গলচণ্ডী ব্রত। অনেক অঞ্চলে হুদুম দেও পূজার ব্রতে কুমারীদের কোন অধিকার নেই। কুমারী, সধবা, বিধবা একত্রিত হয়ে জেলার মেখলীগঞ্জ, হলদিবাড়ী অঞ্চলে বৈশাখ মাসে তিস্তাবুড়ি পূজার ব্রত পালন করেন। জেলার অপর এক উল্লেখযোগ্য ব্রত হল গার্সী ব্রত। কোচবিহারে মেয়েলী ব্রতের মধ্যে একমাত্র তিস্তাবুড়ি ব্রতের মধ্যেই দেখা যায় ব্রতের শেষ দিন স্নানযাত্রার যোগ। প্রসঙ্গত বলা যায় "পুণ্যলাভ, ইষ্টলাভ, পাপক্ষয় প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠিত ধর্ম কর্ম ধর্মানুষ্ঠান তপস্যা সংযমই হল ব্রত।"[৭২] এতদঞ্চলে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও মাঘ মাসেই বেশীর ভাগ ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। অনেক আনুষ্ঠানিক ব্রতে নৃত্য একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যেমন— ষাইটল, কাতি। কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ব্রত হল হুদুম। গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম সমাজের মানুষের মধ্যে লৌকিক ব্রতানুষ্ঠানের অনেকগুলি আঙ্গিক দেখা যায়। যেগুলি আদিম বৃক্ষপূজারই সামিল এমন কিছু ব্রত এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। "গাছ পূজা আদিম সমাজের একটি অন্যতম উত্তরাধিকার।"[৭৩] এর মধ্যে এমন কতকগুলি বৃক্ষ দেবতায় উন্নীত হয়েছে যাদের অন্যতম কোচবিহারের বাঁশ গাছ। মদনকামের মূল আরাধ্য দেবতাই হল এখানে বাঁশ। কোচবিহারের পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে নারী ও পুরুষ কর্তৃক পালিত ব্রতের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে আদিম সমাজের প্রভাব ও স্থানীয় সহজ সরল মানুষের যে কামনা-বাসনাগুলি ব্যক্ত হয় যে ব্রতগুলির মধ্যে সেগুলি হল —

হুদুম দেও ব্রত ঃ

কোচবিহারে বৃষ্টির দেবতা এই হুদুম দেও। কোচবিহারে পূজিত প্রাচীন এই লৌকিক দেবতাকে নগ্ন বা বিবস্ত্র দেহধারী রূপে কল্পনা করা হয়। 'নগ্ন' অর্থে 'উদাম' বা 'উহুম' শব্দে 'হ' ধ্বনি যুক্ত হয়ে হুদুম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। আর কোচবিহারে স্থানীয় ভাষায় দেবতাকে দেও বলা হয়। এভাবে ধ্বনিগত বিবর্তনের ফলে সমগ্র উত্তরবঙ্গের মত কোচবিহারেও এই দেবতা 'হুদুম দেও' নামে পরিচিত।

অবিভক্ত বাংলার রঙপুর, দার্জিলিং, কোচবিহার, আসাম সীমান্তবর্তী বর্তমান গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি জেলায় অনাবৃষ্টি ও খরার সময় রমণীগণ বিবস্ত্র অবস্থায় নৃত্যগীতের মাধ্যমে এই ব্রত অনুষ্ঠান পালন করেন। রাজবংশী অধ্যুষিত বিহারের পূর্ণিয়া জেলাতেও এই পূজার প্রচলন আছে। এই ব্রত যে আদিম ও প্রাচীন তা পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন গবেষণাধর্মী গ্রন্থে লোকসংস্কৃতিবিদ্গণ উল্লেখ করেছেন। "হুদুম দেও পূজা মূলত স্ত্রীলোকের অনুষ্ঠান হলেও রঙপুর জেলায় হাতে 'পেন্টি বা পেনাচি' (গরু খেদাবার লাঠি) নিয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে পুরুষ ব্রতীগণ গান গায় এবং সেই লাঠি দিয়ে ভূমিতে খোঁচা দেয়। একে বলা হয় পেনাচি বা পেন্টি খেলা। এটা প্রকৃতই যৌবন লীলার খেলা।"[৮১]

কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী রমণীগণের এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ পুরুষবর্জিত এবং গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে এই ব্রত পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রির অন্ধকারে নির্জন স্থানে অনুষ্ঠিত এই পূজায় ঢাকিও দূর থেকে ঢাক বাজান। আদিম এই লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা কোচবিহারে কতটা পালিত হত তা উল্লেখ করেছেন W. W. Hunter সাহেব— "A Singular relice of old superstition is the worship of the God Hundumdeo. The women of village assemble together in some distant and solitary place, no male being allowed to be present at rite."[৮২]

দেবতার সঙ্গে ধরিত্রীর কল্পিত মিলনই হল ধরিত্রীর তৃষ্ণার্ত বুকে বৃষ্টির আবির্ভাবের পূর্ব সংকেতবাহী যাদুবিদ্যামূলক এই অনুষ্ঠান। এই আত্মবিশ্বাসেই জেলার বিভিন্ন নির্জন প্রান্তরে বিশেষ করে মেখলীগঞ্জ মহকুমার খরখরিয়া, হলদিবাড়ী ব্লকের পয়ারমারী, দিনহাটার বামনহাট ও বড় শাকদল, তুফানগঞ্জ-এর নাটাবাড়ী এবং হরিরহাট গ্রামে আজও ফাল্গুন-চৈত্র মাসে রুক্ষ পৃথিবীর বুকে বৃষ্টি নামানোর জন্য রাজবংশী কৃষক রমণীগণ গ্রামের নির্জন প্রান্তরে কৃষির কল্যাণে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এই ব্রত অনুষ্ঠানে মেতে ওঠেন। আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কতা বা শিক্ষিত কোন সংস্কারই লোকায়ত এই বিশ্বাসকে টলাতে পারে নি। পৃথিবীর অনেক দেশেই আদিম উপজাতি সমাজের নারীগণ বৃষ্টি কামনায় এরূপ অনুষ্ঠান করেন।

J. G. ফ্রেজার সাহেবও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে এরূপ বৃষ্টি কামনায় নগ্ন নৃত্যের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর Golden bough নামক বিখ্যাত গ্রন্থে— "A similar rain charm is resorted to some parts of India. Naked women drag plough across a field by night, while the men keep carefully out of the way, for their presence would break the spell."[৮৩]

জেলার মেখলীগঞ্জ মহকুমার কোন কোন গ্রামে মেয়েদের পরিবর্তে পুরুষরা পেন্টি খেলার অয়োজন করেন বৃষ্টি কামনায়।

বৃষ্টি কামনায় পূজা দেওয়ার রীতি পৃথিবীর বহু দেশেই প্রচলিত আছে। সূর্য কিংবা ধরিত্রীর প্রতীককে স্নান করালে পৃথিবী থেকে অনাবৃষ্টি দূর হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোকয়ত জীবনে এই আদিম বিশ্বাস আজও পরিদৃষ্ট হয়।

কোচবিহার জেলার দিনহাটা, মেখলীগঞ্জ, হলদিবাড়ীতে হুদুম দেও পূজায় ব্রতীদের দলে ৭/৮ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। মাঝরাত্রি বিশেষ করে অমাবস্যার রাত্রি এই পূজার প্রশস্ত সময়। পূজার দিন কোন ব্রতীর বা মারেয়ানীর বাড়ীতে সবাই একত্রিত হন। পূজার স্থানটি হবে নির্জন ধানক্ষেত বা ডাবরী অর্থাৎ সম্পূর্ণ জনবসতিহীন। কোথাও কলাগাছের পাতা, আবার কোথাও গোবর দিয়ে হুদুম দেও-এর মূর্তি তৈরী করে মূর্তিটি মাটিতে গেড়ে দেওয়া হয়। মাথাভাঙার শিকারপুর গ্রামে মাটি বা গোবরের বদলে একটি কলাগাছকে গেড়ে হুদুম দেও কল্পনা করা হয়। এই পূজার প্রথম লোকাচার হিসেবে ব্রতিনীগণ দেহের বস্ত্র খুলে মাথার চুল এলোমেলো করে নেন। এই ভাবে এলোচুলের বিবস্ত্র রমণীগণ অভীষ্ট দেবতাকে অশ্লীল ভাষায় গাল দিতে দিতে দল বেঁধে ধানের জমি ও গৃহস্থের বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে নৃত্য-গীত পরিবেশন করেন। এই অবস্থায় ব্রতিনীগণ কখনও প্রকাশ্য রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যান না। ধান ক্ষেতের আল দিয়ে চলাফেরা করেন। এই সময় এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী যাবার সময় যৌন আবেদনমূলক অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করেন আর মুখে ও - ও - ও - শব্দ করেন। ব্রতীগণ কোন বাড়ীতে প্রবেশ করার পূর্বে তাঁদের এই উচ্চারণের ফলে বাড়ীর পুরুষগণ বাইরে চলে যান এবং সে সময় বাড়ীতে কোন আলো জ্বলে না। ব্রতীগণ কোন বাড়ীতে প্রবেশের মুখে যে কথাটি অবশ্যই বলেন সেটি হল — "ব্যাটা ছাওয়া লোকগুলা তোমরা পালাও পালাও"। এই ব্রত পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল - এখানে পুরুষের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের মতে 'যদি কোন পুরুষ লুকিয়ে বা অন্য কোন ভাবে এই অনুষ্ঠান দেখার চেষ্টা করেন তবে একদিকে যেমন এই পূজার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে তেমনি সেই ব্যক্তিকে খুন করা হলেও তা স্বাভাবিক ঘটনা বলে বিবেচিত হবে'। এই পূজার প্রধান উপকরণ হল - একটি কলা গাছ, কোন অঞ্চলে গোবরের হুদুম মূর্তি, ফুল, মাটির ঘট, মনুয়া কলা, কাঁচা দই, চিড়া, স্থান ভেদে ফিঙে ও ঘুঘু পাখীর বাসা। হুদুম পূজার নৃত্য ও গীতের সময় এতদঞ্চলে বহুল প্রচলিত গানটি হল —

"হিলহিলাছে কমোরটা মোর
শির শিরাছে গাও
কোনঠে কোনা গেলে এলা
হুদুমার দেখা পাও
পাটানি খান পইড়ছে খসিয়া
আউল হইচে মোর খোপাটা
হুদুম দেখা দেও গো আসিয়া।"

জেলার কোন কোন গ্রামে, বিশেষ করে তুফানগঞ্জ মহকুমার শোলাডাঙ্গা, ভান্ডিজেলাস, নাটাবাড়ী গ্রামে "ছাম ও গাইন দিয়ে কোটা তুষ জল দিয়ে মাখা হয়। সাতবাড়ী থেকে জল নিয়ে ঐ তুষের পিঠা তৈরী করে হুদুম দেবতার প্রতীক হিসেবে কলাগাছকে উৎসর্গ করা হয়। এই পিঠা কেবলমাত্র কুমারী মেয়েরাই তৈরী করতে পারেন। মায়ের একমাত্র সন্তানই কেবলমাত্র কলাগাছটি রোপণ করতে পারেন।"[৮৪]

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বাহক স্থানীয় রাজবংশী রমণীগণ কৃষিকর্মের মঙ্গল কামনায় হুদুম দেও-এর ব্রত পূজা করে এক সামাজিক লোকয়ত, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক কর্তব্য পালন করেন। কোন ক্ষেত্রেই তাদের [illegible] কামনা বাসনা এখানে চরিতার্থ হয় না। অনুষ্ঠানটি পুরুষবর্জিত হলেও সমগ্র গ্রামবাসী [illegible] ও সমাজের মঙ্গল কামনাই এই পূজার মূল উদ্দেশ্য। এই পূজার আর একটি আঙ্গিক হল [illegible]ের অভিনয়। এতদঞ্চলে হুদুম সম্পর্কে প্রচলিত একটি ব্রতকথা হল - 'দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় বসুমতী অন্তঃসত্ত্বা হলে বসুমতীকে ঘৃণাভরে বিতারিত করেন সকল দেবতাগণ। এরূপ অবস্থায় বসুমতী কারো কাছে আশ্রয় না পেয়ে আটিয়াকলা (বিচি কলা) গাছের আশ্রয়ে জন্ম হয় বসুমতীর সন্তান হুদুমের।'

হুদুম দেও পূজার আনুষঙ্গিক রূপে ব্যাঙ বিয়া নামক একটি ব্রত অনুষ্ঠিত হয় এখানে। জেলার সর্বত্রই বরুণ দেবতার তুষ্টি বিধানে হুদুম পূজার সঙ্গেই প্রসঙ্গ এসে যায়।

তিস্তাবুড়ির পূজা ব্রত বা মেছেনী ব্রত ঃ

সমগ্র উত্তরবঙ্গের মধ্যে একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত থাকলেও কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ীর রাজবংশী রমণীদের মধ্যে এই ব্রতের প্রচলন দেখা যায়। নদী কেন্দ্রিক এই ব্রতের প্রশস্ত সময় সমগ্র বৈশাখ মাস। ১লা জ্যৈষ্ঠ এই ব্রত পূজার সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এই ব্রতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল একক ভাবে এই ব্রত পালিত হয় না। দলবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে সব বয়সের মেয়েরাই এই ব্রতে অংশগ্রহণ করেন। তিস্তাকে দেবী কল্পনা করে মেছেনী বলা হয়, তাই তিস্তাবুড়ির ব্রত মেছেনী ব্রত নামে পরিচিত।

এক ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখা যায় মেখলিগঞ্জ মহকুমার নালারটারী, খরখরিয়া, বাগডোকরা, এবং হলদিবাড়ী ব্লকের পয়ামারী, হুদুমডামা, দেওয়ানগঞ্জ ও সীমান্তবর্তী মানিকগঞ্জ গ্রামে প্রায় সারা বৈশাখ মাস ধরে কুমারী, সধবা ও বিধবা রমণীগণ দল বেঁধে এই ব্রত পালন করে থাকেন। বছরের প্রথম মাস বৈশাখ থেকেই কৃষকগণ আউস ও আমন ধান রোপণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। ধানের প্রাণই হল জল। আর সেই জলের আধার হল নদী। কোচবিহার, জলপাইগুড়ির প্রধান নদী তিস্তা তাই দুই জেলার কৃষিনির্ভর সমাজের রমণীগণ অধিক শস্য পাবার আশায় তিস্তাদেবীকে আরাধনা করেন এই ব্রতের মাধ্যমে। যাতে তিনি ধান ক্ষেতকে সোনালী ফসলে ভরে রাখেন। এই ব্রতের অপর বৈশিষ্ট্য হল— এর ব্রত কথা গানের মাধ্যমেই ব্যক্ত হয়।

হলদিবাড়ীর পয়ামারী গ্রামে মেছেনী ব্রতের দেওধা রেবতীবালা বায় কর্তৃক গীত এই ব্রতের একটি বন্দনা গীতে দেখা যায়--

" তিস্তাবুড়ীর নামান গেহচে
বড়য় হাউসালি;
আলন্দে বড়িয়া নেহ গে
হুমার পাঞ্চ বহিনী।।"

ব্রতীগণ ব্রত চলাকালীন মারেয়ানীর নেতৃত্বে হাট-বাজার ও বাড়ী ঘুরে ঘুরে গান করতে করতে মাগন তোলেন। এ সময় মারেয়ানীর হাতে থাকে ফুল ও লাল কাপড় দিয়ে সজ্জিত একটি ডালা এবং ডালার মধ্যে থাকে তিস্তা নদীর মাটি দিয়ে তৈরী তিস্তাবুড়ির প্রতীক। প্রতীকটির উপর সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে তার উপর দই মাখানো চাল ও ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মারেয়ানীর অপর হাতে থাকে নানা রঙের সজ্জিত ফুল ও কাগজে কারুকার্য মন্ডিত ছাতা। অনেক সময় তিস্তাবুড়ির প্রতীকসহ ডালাটিকে ছাতার বাটের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। এসময় সঙ্গী ব্রতিনীদের প্রত্যেকের হাতে থাকে লাল নীল কাগজের নিশান। কতদিন ধরে এই ব্রত চলবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি এই ব্রত শুরু হয়। বৈশাখ সংক্রান্তির দিন অথবা ১লা জ্যৈষ্ঠ এই ব্রতের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। ঐদিন দেওধার বাড়ীতে পুরুষ মারেয়া কর্তৃক তিস্তাবুড়ীর পূজা হয়। ঐদিন ফুল, বেল, দই, চিড়া ইত্যাদি পূজার নৈবেদ্য সহ লাল নীল কাগজে সজ্জিত একটি ভেলা ভাসানো হয় নিকটবর্তী নদীতে।

হলদিবাড়ী ব্লকের মারেয়ানী ও তিস্তাবুড়ি বা মেছেনী ব্রতের প্রবীণা ব্রতিনী রেবতীবালা রায় ও পবনেশ্বরী বর্মন-এর মতে এই ব্রতের উদ্দেশ্য হল 'তিস্তার ভয়ঙ্করী ও বিধ্বংসী বন্যার হাত থেকে বাড়ী-ঘর, মানুষ, গবাদি পশু ও ক্ষেতের ফসলকে রক্ষা করা।' তাঁদের মতে দ্বিতীয় কারণ হল -' নদী হচ্ছে স্নেহময়ী জননীর মত। তিস্তা নদীর বন্যা ধ্বংসের পাশাপাশি তার উর্বর পলি দিয়ে কৃষি জমিকেও সমৃদ্ধ করে তোলে।' ডঃ শীলা বসাক তাঁর 'বাংলার ব্রত পার্বণ' গ্রন্থে বলেছেন — সন্তানলাভই এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের এই ব্রত হল Fertility cult-এর নিদর্শন।

যাইটল ব্রত ঃ

কোচবিহারের অন্যতম ব্রত যাইটল ব্রত। যাইটোল বা ষষ্ঠী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণে আমরা পাই ষষ্ঠী - সটবী - সাটি - সাইট + অব+ অন + সাইটর, সাইটোল। ষষ্ঠী থেকে সাইটোল শব্দের উৎপত্তি। কাগজ ও শোলার মঞ্জুষা মূর্তিতে সাধারণত এই দেবীর পূজা হয়। ঢাকের বাজনা এই পূজার অপরিহার্য অঙ্গ। কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, বাড়ীর কর্ত্রী নিজেই এই পূজা করেন। ফল, মূল, বাতাসা, খই, কলা, দই , চিনি, ইত্যাদি উপকরণ সহ ব্রতকথার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়।

সাধারণত পৌষ-মাঘ মাসে নিঃসন্তান রাজবংশী রমণীগণ সন্তান কামনায় এই ব্রত পূজার অনুষ্ঠান করেন। যার বাড়ীতে এই পূজা হয় তাকে স্থানীয় ভাষায় মারেয়া বলে। মেয়েরাই এই পূজার মূল ব্রতী, দুজন বৈরাতীও থাকেন। সাইটোল পূজায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই একজন গিদালী থাকেন, যার পরিচালনায় সাইটোল পূজাব গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। গিদালী দলে পাঁচ-ছয়জন দোহারও থাকেন। পূজা ও নৃত্যের সময় চাইলন বাতি বৈরাতি বা মারেয়ার স্ত্রীর হাতে থাকে। দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের ষষ্ঠীদেবী উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের সাইটোল মূলত প্রজননের দেবী। কোচবিহারে সাইটোল দেবী শোলার মূর্তিতে পূজিত হলেও পূর্ববঙ্গীয়রা পিটুলীর তৈরী মূর্তি, মাটির ঘট, বট ও কাঁঠাল গাছের ডাল পুঁতে পূজা করেন। পূজান্তে গিদালীর নেতৃত্বে লোকগীতি পরিবেশনের রেওয়াজ আছে। এই পূজায় পূজার দিন স্থির করার পরেই মারেয়া ঢাকের বায়না দেন, যার দৃষ্টান্ত এই ব্রতের গানে দেখা যায় — "আমার বাড়ী সাইটোল পূজা, ঢাকেব বায়না দে।"

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী ১নং অঞ্চলের মাড়ুয়াটারী গ্রামের সাইটোল ব্রতের গীদালী খুকি নমদাস ও নীলেশ্বরী নমদাস সাইটোল ব্রত পূজার ঘটবন্দনী গানে সন্তান কামনার আর্তি ফুটিয়ে তোলেন –

"সাইটোল মাও সাইটোল মাও
তুই আসিনু আমার ঘরে
তোরে বরে মা পুত্র পাইলাম কোলে
তোক বানেয়া আইনলোং মা মালাকারেব ঘরে
পূজা খাবার বইসেক মা তুই আমাব ঘরে।"

কোচবিহারে সাইটোল ব্রতপূজাব প্রধান আঙ্গিক হল এর গান। ব্রত কথাই এখানে গানের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। সন্তান কামনাই এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। তাই এর নির্দিষ্ট সময় বা তিথির ধার ধারেন না অনেকে। নারীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে সাইটোল পূজার লোকাচার জেলার কোন কোন গ্রামে মুসলিম সমাজেও প্রচলিত আছে।

কোচবিহারের সাইটোল, রঙপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামে যাইটোর নামেও পরিচিত। আঞ্চলিক লোকভাষায় ষষ্ঠী দেবীকেই যাইটোল এবং সাইটোল বলা হয়।

কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে বিষহরি পূজার অনুষঙ্গে ও সাইটোল দেবীর প্রসঙ্গের কথা শোনা যায়। মাথাভাঙ্গার শিকারপুর ও তুফানগঞ্জের নাটাবাড়ী গ্রামে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ীতে বিয়ের পূর্বে বিষহরির প্রচলিত গানে যাইটোল বিষহরির গান করে থাকে। উক্ত গ্রামে প্রচলিত কিংবদন্তী হল - "সাইটোল দেবী বিষহরির কৃপায় সন্তানবতী হয়েছিলেন। সেই সন্তানের বিয়ের সময় দেবী বিষহরির পূজা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন বলে অধিবাস কালে তাদের মৃত্যু হয়।

পরে বিষহরির আশীর্বাদেই তারা পুনর্জন্ম লাভ করে।"[৬৮] এই সাইটোল বা সাইটোন জেলার অন্যতম প্রভাবশালী লৌকিক গৃহদেবী। জেলার দিনহাটা মহকুমার কিসমতদশ গ্রামের রাজবংশী সমাজে সাইটোল দেবীর শোলার মঞ্জুষা পূজার সময় গিদালীগণ শোলার জন্মবৃত্তান্ত ব্যক্ত করে যাইটোল মায়ের বন্দনা করেন। যেমন—

এক হাঁটু জলোতে তোক শোলা কাটুনু
তোক শোলক মুই রইদোতে শুকানু রে - এ।

কাতি বা কার্তিক পূজা ব্রত ঃ

কার্তিক মাসের শেষ দিনে ফসল কাটার পূর্বে এই পূজো ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের রমণীগণ ব্রত উদ্‌যাপনের মাধ্যমে এই পূজা করেন। শুধু কোচবিহার জেলাই নয় উত্তরবঙ্গ, আসামের ধুবরী, গোয়ালপাড়ায় রাজবংশী রমণীগণের সবচেয়ে ঘরোয়া ধর্মীয় ব্রত উৎসব অনুষ্ঠান এই কাতি পূজা ও সংশ্লিষ্ট নাচ যাকে এতদঞ্চলে বলা হয় কাতি নাচ। এই লোক দেবতার পূজা ব্রতের বিশেষত্ব হল এর নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন এই পূজা দিতে না পারেন তবে তাঁরা অগ্রহায়ণ মাস বা মাঘ মাসেও এই পূজা দেন। এতদঞ্চলে বিলম্বিত এই পূজাকে বলা হয় নমলা কাতি ব্রত পূজা।

গৃহস্থ বাড়ির উঠোনে দক্ষিণ মুখ করে উঁচু মাটির বেদীর উপর এই দেবতাকে বসানো হয়। মূর্তি মাটি বা শোলা দুই রকমের হতে পারে। পূর্বে পোয়ালের বা খড়ের ভূতি দিয়ে মূর্তি তৈরী হত। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় কাতি ঠাকুরের বাহন ময়ূর কিন্তু আসামের ধুবরী ও গোয়ালপাড়া জেলার বহু গ্রামে হাতি : উপর ময়ূর তার উপর উপবিষ্ট কাতি ঠাকুর পূজিত হন। তবে সব ক্ষেত্রেই কার্তিকের হাতে থাকে তীর ও ধনুক।

মূল বেদীর চারদিকে কলাগাছ পুঁতে গাছগুলির তিনটি দিক দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় এবং দড়ির সঙ্গে শোলার ফুল, আটিয়া কলা ও মনুয়া কলা দুটো করে বেঁধে দেওয়া হয়। মূর্তির পেছনে একটি ময়না গাছের ফলশুদ্ধ ডাল ও একটি শেওড়া গাছের ডাল গেড়ে দেওয়া হয়। মূর্তির বেদী সংলগ্ন কলাগাছ চারটির গোড়ায় চারটি ঘট, একটি করে ধনুক রাখা হয়। এক আটি শিস শুদ্ধ ধানগাছ গোড়া থেকে তুলে এনে মূর্তির বাঁদিকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। চালের গুড়োর পিটুলি দিয়ে ঘট নৈবেদ্য দিয়ে পূজার উপকরণ সাজানো হয়। আনুষ্ঠানিক এই ব্রত পূজার লোকাচার ও নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সুবচনী ব্রত পূজার আনুষ্ঠানিকতার মিল রয়েছে। স্থানীয় অধিকারী ব্রাহ্মণ পূজার পৌরোহিত্য করলেও মাটির মূর্তি দিয়ে পূজার সময় অনেকে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা করান।

এই ব্রত পূজার আনুষঙ্গিক নৃত্যগীতের সময় সেখানে কোন পুরুষ মানুষ থাকেন না। কারণ অনেক সময় গানের ভাষা ও নৃত্যের অঙ্গভঙ্গি শালীনতা ছাড়িয়ে যায়। পুত্র সন্তান

কামনাই এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। অনেক কুমারী মেয়ে সুন্দর বর লাভের জন্যও এই ব্রত করেন। কাতি ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করলে বংশবৃদ্ধি হয় ও শস্য বৃদ্ধি হয়। এটা শুধু কোচবিহার নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গের লোকায়ত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের উপর ভর করে কাতিনাচের গিদালীর দল যে গান ধরেন তা হল—

"হাটুয়া মানষে পোছে রসিক বামনারে
কি ও বাসনা কি করেন আগল কলার ঝুঁকি।
কাতিঠাকুরের বরে পুত্র পাইছোং কোলে
কাতি ঠাকুরের বরে শষ্য আসিচে ঘরে
কাতিঠাকুরের বরে ধন আসিচে ঘরে
তারে না করিমু স্যাবা পূজা।"[৮৭]

কাতিপূজার প্রথম পর্বে রাজবংশী রমণীগণ পান, সুপারী, ধূপ-ধুনা দিয়ে ঠাকুর বরণ করেন। পূজার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর 'কাতিসিজ্জন' (সৃজন) কাহিনীটি সঙ্গীতের মাধ্যমে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের সামনে ব্যক্ত করেন গীদালীর দল।

উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন আসামের আদিবাসী সম্প্রদায় পূজিত ব্রতমূলক এই পূজা অনুষ্ঠান সন্তান কামনায় অনুষ্ঠিত হলেও একে উর্বরতা কেন্দ্রিক শস্য উৎসবও বলা যায়। শস্য উৎসব পালনের যে ঐতিহ্য বাংলার বিভিন্ন জেলায় দেখা যায় কোচবিহারের কাতিপূজা তারই দৃষ্টান্ত।

সুবচনী ব্রত ঃ

সুবচন বা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিষ্ঠাত্রী লৌকিক দেবীর নাম সুবচনী। বিশুদ্ধ উচ্চারণে কখনও কখনও শুভচনীও বলা হয়। পূর্ববঙ্গীয় এবং স্থানীয় সধবা হিন্দু নারী কর্তৃক পূজিত হন এই দেবী। অরণ্য ষষ্ঠী, নাগ পঞ্চমী, সুবচনী এরা সবাই আদিম সমাজেরই দেবী।

পুত্র ও পুত্রবধূদের মঙ্গলকামনায় অবিভক্ত বাংলাদেশে যেমন, তেমনি বর্তমান কোচবিহারের লোকজীবনে ক্ষীণ অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে এই দেবীর পূজা ও ব্রত অনুষ্ঠান। এই ব্রত পালনের প্রশস্ত সময় হচ্ছে প্রতি সপ্তাহের সোম ও বুধবার। প্রকৃত পক্ষে সুবচনী ব্রত আদিম সমাজের স্ত্রী শক্তিকে তুষ্ট করার প্রচেষ্টা থেকেই উদ্ভুত। সুবচনী, শুভচনী, শুভচণ্ডী, সুবচনী দুর্গা, প্রভৃতি নামেও দেবীকে আরাধনা করা হয়। এই দেবী হংসবাহনা এবং দেবী চণ্ডীকারই লৌকিক রূপ মাত্র। কোচবিহার জেলার কয়েকটি গ্রামে বিশেষ করে তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলাখানা, জেলা সদরের মাঘপালা, দিনহাটার গোসানীমারী গ্রামের পূজা পদ্ধতি, আচার, রীতি দেখে একথা মনে হয় যে আদিম লোক সমাজের চিন্তাভাবনার সঙ্গে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ্য ভাবনা যুক্ত হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছেন এই দেবী।

পূর্বে মূর্তিহীন সুবচনী পূজিত হলেও বর্তমানে হংসবাহনা সুবচনী মাটির মূর্তিতে পূজিত হন। ১২/৬/৯৮ ইং তারিখে তুফানগঞ্জ মহকুমার জায়গীর চিলাখানার কামিনীকুমার অধিকারীর বাড়ীতে সুবচনী ব্রত পূজার এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সুবচনী পূজার মূলানী বা গীদালী বৃদ্ধা পবনেশ্বরী বর্মনের সাক্ষাৎকারে জানা যায় 'পূর্বে এই পূজা স্থানীয় অধিকারী ব্রাহ্মণ কর্তৃক হলেও বর্তমানে এর পৌরোহিত্য করেন অসমিয়া ব্রাহ্মণগণ'। পূজা শুরু হয় ভোরবেলায় এবং মূলানী ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক নৃত্যগীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে দিনের শেষে পূজা শেষ হয়। এখানে সুবচনী দেবীর ব্রতপূজার মূল উপকরণে দেখা যায় ঘট, চাইলনবাতি, আস্ত কাঁচা সুপারী ও পান, কলা চার পাঁচ ঝুকি ইত্যাদি। তবে এই পূজার মূল প্রসাদ হচ্ছে পান ও সুপারী। দেবীর ডান দিকে সাজানো থাকে মাছ ধরার জাকই, চঙ্গাই, দাও, কুড়াল, কাস্তে, ডোল, কুলা ধুয়ে মুছে সিঁদুর দিয়ে এগুলিকেও দেবীর সঙ্গে পূজা করা হয়। পূজার উপকরণ হিসেবে দুটি সাটিমাছ চালুনে রাখা হয়। সাতটি কলার কাদি, পানসুপারী এবং দই, চিড়া, আটিয়াকলা সহ দশখোল নৈবেদ্য দেওয়া হয়। এই পূজায় একটি বা দুটি হাঁসের ডিম দিতেই হয়। এই ডিম সুবচনীর বাহন হাঁসের প্রতীক। জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলে শুধুমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূদের মঙ্গল কামনাতেই এই পূজা হয় না। এর বাইরে বিভিন্ন ব্যাপারে যেমন— বিবাহ, পরীক্ষার ফল, মামলা-মোকদ্দমা, ব্যাধিমুক্তি, বিবাদ-বিসম্বাদ, সন্তান কামনা ইত্যাদি ব্যাপারেও অনেকে এই পূজায় মানত করেন। কোচবিহার জেলায় সুবচনী ব্রতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে পূজার অব্যবহিত পরেই প্রবীণ রাজবংশী বিধবা রমণীদের মধ্যে যারা মূলানী বা গিদালী নামে পরিচিত তাঁর নেতৃত্বে মণ্ডপের চারদিকে এই ব্রত কথা ঘিরে গান ও অভিনয়ের প্রদর্শন।

কাত্যায়নী ব্রত ঃ

বছরের বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন দিনে ধর্মীয় লোকাচারের অনুষঙ্গে কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের রমণীগণ ব্রতিনী হয়ে যে ব্রত অনুষ্ঠান পালন করেন তাদেরই অন্যতম 'কাত্যায়নী ব্রত'। এই মেয়েলী ব্রতটি আজ বিলুপ্তির পথে। এই ব্রত অনুষ্ঠানের মূল সময় হল রাসপূর্ণিমা। 'শুকর' তৈরী করা এই ব্রতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিসলং অথবা ময়না গাছের ডাল কেটে ১১-১/৪ x ১-১/৪ হাত পিড়ামিড আকারের মঞ্জুষা বানানো হয়। মঞ্জুষার মাথায় মোচার চূড়া এবং থাক থাক কারুকার্য করা কলার খোলের আচ্ছাদন থাকে। মঞ্জুষার ভেতরে বসানো থাকে একটি মাটির প্রদীপ। যে জায়গায় এই ব্রতটি অনুষ্ঠিত হয় সেখানে শোলার পাখী, ফুল, ঝাড় ইত্যাদি দিয়ে সাজানো থাকে। সহজ সরল এই ব্রত অনুষ্ঠানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই নিমন্ত্রিত হন। এই ব্রতে নৈবেদ্য হিসেবে থাকে মিষ্টি আলু, কমলা, বাতাসা। সাত বছর হলে বাড়ীর মেয়েরা ভাল স্বামী লাভের আশায় এই ব্রত করেন। সেই হিসেবে একে 'কুমারী ব্রত' বলা হয়। তবে এই ব্রতের পেছনে বাড়ীর মা কাকীমাদের উৎসাহই বেশী। এই ব্রত একবার শুরু করলে হয় তিন বছর না হয় পাঁচ বছর ধরে করতে হয়। ব্রতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর

লোকসঙ্গীত। ব্রতিনী মেয়েরা এই সঙ্গীত গেয়ে থাকেন। ব্রতিনীরা সন্ধ্যায় গৌরীর ঘট নিয়ে নদীতে বা কোন জলাশয়ে জল আনতে যাওয়ার সময় সমবেতভাবে এই গানটি গেয়ে থাকেন—

"উঠ উঠ বাস্কুম পানি তুলিবার যাই
বেলা নাই আবো পানি তুলিবার যাই।

কাত্যায়নী ব্রত কোচবিহারের প্রচলিত ব্রতগুলির মধ্যে সর্ব প্রাচীন। কারণ কোচবিহার রাজ্যের সৃষ্টিতে কোচবিহারকে শিব ভূমি বলা হয় এবং শিব এখানে জামাতা জ্ঞানে স্নেহ-যত্ন ও হাসি-ঠাট্টার যোগ্য হয়ে ওঠেন। কোচবিহারে প্রথম শৈব ও শাক্তধর্মের প্রচলন ছিল, তাই এই ব্রতকথায় কেবল শিব-পার্বতীর পূজা ও বিবাহের কথা আছে।"[৬৮]

তুলসী ব্রত ঃ

কোচবিহারে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে তুলসীমঞ্চে ঝড়াদানের মাধ্যমে এই ব্রত পালন করা হয়। এই ব্রতের মূল উপকরণ তুলসী গাছ ও ছিদ্রযুক্ত একটি ঘট। প্রত্যেক রাজবংশী সধবা, বিধবা, রমণীগণ স্নান করে ভিজে কাপড়ে জল এনে ঐ ফুটো ঘটের মধ্যে ঢেলে দেন। যাতে তুলসী গাছের মাথায় অনবরত জল পড়ে। এবং সেই সময় ব্রতীগণ একটি ছড়াও বলেন। বাস্তুঠাকুর তুলসী ঠাকুরের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই জন্য এই ব্রত প্রচলিত হতে পারে। আবার অনেকের মতে তুলসী গাছ মরে গেলে রাজবংশীগণ অমঙ্গলজনক বলে মনে করেন। তাই খরার সময় গাছটি যাতে মরে না যায় সেজন্য এই ব্রত প্রচলিত আছে। বৈশাখ মাসের শেষ দিনটি অতিক্রান্ত হলে যে কোন একটি শুভদিন দেখে ঝড়া নামানো হয়। অধিকারী সম্প্রদায়ের পুরোহিতরা এই ঝড়া নামানো অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করে থাকেন।

অথাই-পথাই ব্রত ঃ

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার স্থানীয় সম্প্রদায়ের রমণীদের মধ্যে এই ব্রতের প্রচলন আছে। প্রতি বছর শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। মূল উদ্দেশ্য পরিবারের সবার দীর্ঘ জীবন ও সুস্থ শরীর কামনা। সন্ধ্যাবেলায় যে কোন মেঠো পথের উপর এই ব্রতের অনুষ্ঠান হয়। রমণীগণ এই ব্রতের ব্রতিনী হলেও সংশ্লিষ্ট গ্রামের রাখাল বালকগণ এই পূজায় পৌরোহিত্য করেন। বিপদ সঙ্কুল গ্রাম্য পথে যাতে সবাই নির্ভয়ে নিরাপদে পথ চলতে পারে সেজন্য এই ব্রত করা হয়। হলদিবাড়ী ও মেখলিগঞ্জ মহকুমার অনেক গ্রামে দেখা যায় পথের মাঝখানে একটি বিন্নাগাছের ঝোপ বা থোপ স্থাপন করা হয় এবং তার পাশেই একটি গরু চরানোর লাঠি বা পেন্টি রেখে ফুল বেলপাতার মত কিছু উপকবণ সহ পূজা করা হয়। বিন্নার ঝোপের উপর একটি ছাতাও মেলে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ী অঞ্চলে ব্রত কথাও প্রচলিত আছে। প্রধান ব্রতী রাখাল বালক ও ব্রতের সংশ্লিষ্ট সবাইকে সুখিনী ও দুখিনী নামক দুই বোনের কাহিনীও শোনান।

গার্সী ব্রত ঃ

কোচবিহার জেলার একটি অন্যতম মাইগ্রেটেড ব্রত হল গার্সী ব্রত। এই ব্রত অনুষ্ঠানটিও মূলত পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে প্রচলিত বেশি। আশ্বিন সংক্রান্তির দিন এই ব্রত পালনের প্রশস্ত সময়। বিবাহিত রমণীগণই সাধারণত এই ব্রত পালন করেন এবং ব্রতের দিন তাঁরা নিরামিষ আহার করেন। পূর্ববঙ্গীয় ঢাকা অঞ্চলের হিন্দুগণ এদিনটি বিভিন্ন লোকাচারে গারু সংক্রান্তি হিসেবে পালন করেন। এদিন বিশেষ করে শালুকের গুড়ি, কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা হলুদ ইত্যাদি দিয়ে তৈরী ডাল ও তেতো খাওয়ার নিয়ম আছে। রাতভর একবালতি জল, তেঁতুল, কাঁচা হলুদ, শুকনো পাটপাতা, সরষা, কলার পাতার তৈরী কাজল উঠোনে বা ঘরের চালের মাথায় কুয়াশায় রেখে দেওয়া হয়। পর দিন ঘুম থেকে উঠে ঐ তেঁতুল দাঁতে মেখে মুখ ধোয়া এবং কাঁচা হলুদ গায়ে মেখে স্নান করার নিয়ম আছে। মূলত খোস-পাচরা জাতীয় রোগ নিরাময়ই এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে অনেকে পাট কাঠির মাথায় আগুন নিয়ে সিগারেটের মত ধোঁয়া ছাড়ে। এতে সর্দি কাশি নিরাময় হয়। যাঁদের জমি আছে তাঁরা ক্ষেতের সামনে ভোরবেলা তেল-সিঁদুর ও একটি আমের পল্লব দিয়ে ঘট বসিয়ে পূজা করেন।

এতদঞ্চলে বসবাসকারী ঢাকা জেলার বারুজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে গার্সী ব্রত উপলক্ষ্যে গারু সংক্রান্তির দিন তেঁতুল পুড়ে পাট কাঠিব মাথায় আগুন দিয়ে বাড়ির চারদিকে ঘোরানোর নিয়ম আছে। গার্সী ব্রতে এই সম্প্রদায়ের মানুষ ধানকে সাধ খাওয়ান যাকে পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বলা হয় 'ধানকে হোন্দা খাওয়ানো'। এসময় তাঁরা একটি ছড়াও বলেন।

এতদঞ্চলে গার্সী ব্রতে আর একটি লোকাচারও দেখা যায়। আশ্বিন সংক্রান্তির দিন বাড়ির উঠোনে একটি কুলগাছ গেড়ে একটি প্রতীকধর্মী পুকুর কাটা হয়। পুকুরের ধারে বসে থাকা একটি শিশুর কোলে বৃদ্ধার মূর্তি থাকে। একটি বড় পাত্রে আট রকমের সব্জী অড়হর বা খেসারীর ডাল সম্ভার না দিয়ে বানিয়ে দিতে হবে এবং ফুল, বেল পাতা, ধূপ-ধূনা জ্বালিয়ে দিয়ে ব্রত কথা শুরু করতে হবে। এইরূপ ডালকে বলা হয় গারুর ডাল। এই ডালের মূল সব্জীর উপকরণ হল— সাপলার শেকড়, কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা হলুদ, সাদা পুরনো চালকুমড়ো, মিষ্টি কুমড়ো, শোলাকচু, গাটি কচু, মুখি কচু,মুখি আলু, কলমি শাক প্রভৃতি। এই ডাল আশ্বিন সংক্রান্তিতে রান্না করে পরের দিন খাওয়ার রেওয়াজ আছে। গার্সী ব্রতকে এতদঞ্চলে লক্ষ্মী ব্রতও বলা হয়। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় এখানে একটি ছড়াও প্রচলিত আছে। যেমন — 'আশ্বিনে রাইন্দা যে কার্তিকে খায় সে জন ভাইগ্যবতী হয়।'

নিষ্কলঙ্ক ব্রত ঃ

কোচবিহারের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের রমণীরা এই ব্রত পালন করেন। পৌষ মাসের অমাবস্যার সময়ই এই ব্রত পালনের প্রশস্ত সময়। এ সময় নতুন ধান, দই, চিড়া, চালের গুড়ো ও বিভিন্ন ফল দিয়ে লক্ষ্মী, বাসুদেব ও বৈদ্যনাথ ঠাকুরের ব্রত পালন করেন মেয়েরা। এই ব্রতে

কোন গান নেই তবে ব্রতকথা আছে। এতদঞ্চলে লোকায়ত বিশ্বাস এই ব্রত পালন করলে বিবাহিত নারীদের জীবনে কোন দিন কলঙ্কের ছোঁয়া লাগবে না। তাই নিষ্কলঙ্ক জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে সধবা রমণীগণ কায়মনোবাক্যে সংযমের সঙ্গে এই ব্রত পালন করেন।

মঙ্গলচণ্ডী ব্রত ঃ

কোচবিহার জেলায় পূর্ববঙ্গীয় সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের রমণীগণ এই ব্রত পালন করেন জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার। অনেক সময় বছরের যে কোন মঙ্গলবারও এই ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। বিবাহিতা রমণীরা সন্তানের মঙ্গল চিন্তাতেই মঙ্গলচণ্ডী ব্রত পালন করেন। এখানে মঙ্গলচণ্ডীর অপর নাম 'জয় মা মঙ্গলচণ্ডী'। প্রকৃতপক্ষে দেবী চণ্ডি, দেবী দুর্গার প্রতিরূপকে অবলম্বন করে এই ব্রতের সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্রত পালনের উদ্দেশ্য রোগভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া, যেমন তেমন পারিবারিক সুখ শান্তি কামনা। কুমারী, সধবা সবাই এই ব্রত পালন করেন। ব্রত পালনের প্রধান শর্ত নির্জলা উপবাস এবং অর্ঘ্য প্রদান। ধান থেকে খুটে আটটি অখণ্ড আতপচাল বের করতে হয়, তার সঙ্গে থাকে আটগাছা দূর্বা, কলাপাতা দিয়ে জড়িয়ে ব্রতিনীর সংখ্যা অনুযায়ী 'শেখর' বা 'গুজি' তৈবী করতে হয়। আবার অনেকে সতেরটি কাঁঠাল পাতা, আম পাতা, বেল পাতা, তুলসী পাতা, ধান, যব, চাঁপাকলা ও অন্যান্য ফল দিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

এতদঞ্চলে বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয় ঢাকার হিন্দুগণ এই ব্রতপূজার শেষে ব্রতিনীগণ কলা, তুলসী ও যব দিয়ে প্রসাদ তৈরী করে নদী বা পুকুর ঘাটে গিয়ে খান। ডঃ শীলা বসাক তাঁর 'বাংলার ব্রত পার্বণ' গ্রন্থে বলেছেন— "এই ব্রতের ফলে নির্ধনের ধন হয়, রোগী নিরোগ হয়, বন্ধ্যার সন্তান হয় এবং সর্প ভয় থাকে না। সধবা নারীগণ ব্রত অনুষ্ঠান চলাকালীন দেবী চন্ডীর কাছে অর্ঘ্য নিবেদন করেন এবং ব্রত কথা শোনেন। ব্রতিনী ব্রত কথা বলার সময় অন্যান্য ব্রতিনীরা একটি সুপারি হাতে নিয়ে একটি ছড়াও বলেন।"[৮১]

নিরাকলি ব্রত ঃ

এই ব্রত যে কোন মাসের রবি ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়। এটি সম্পূর্ণ নারী ব্রত। এতদঞ্চলের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল অঞ্চলের গৃহস্থ সধবা রমণীগণ স্বামী, পুত্র, কন্যা ও সংসারের মঙ্গল কামনায় এই ব্রত করেন। ব্রতের দিন দুই থেকে আড়াই ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট দুটো পাট কাঠি বা খোলা বাড়ির উঠোনে প্রোথিত করা হয়। পাট কাঠির গোড়ায় সিঁদুর লিপ্ত একটি পাথর স্থাপন করা হয়। কলার ফাত্রা দিয়ে ফুলের মালা গেঁথে শোলার গায়ে পরানো হয়। একটি ঘটে সিঁদুরের ফোটা দিয়ে আম্র পল্লবসহ বসানো হয়। দিনের শেষে গোধূলি লগ্ন এই পূজার মূল সময়। মঙ্গল-ঘটের সামনে একটি ছোট গর্ত করে পুকুর তৈরী করা হয়। এরপর মঙ্গলঘট ও পুকুরের সামনে কলার মাইচপাতায় নিরাকলি দেবীর ব্রত পূজায় মূল উপকরণ হিসেবে দেওয়া হয় কাঁচা দুধ, ফলমূল ইত্যাদি। এটি সম্পূর্ণ নারী ব্রত। এর পর শুরু হয় ব্রত কথা।

নাটাইচন্ডী ব্রত ঃ

এই ব্রতের সময়কাল অগ্রহায়ণ মাস। এটি অন্যতম সধবা ব্রত। এই ব্রতটিও জেলার অন্যতম পূর্ববঙ্গীয় ব্রত। তাই এর প্রচলন বেশী ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে। যে-ই ব্রত শুরু করুক তাঁকে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম বুধবার শুরু করতে হয় এবং একবার শুরু করলে চারবার পালন করতে হয়। এটি সম্পূর্ণ মেয়েলী ব্রত। এই ব্রতের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভুরি ভোজনের রীতি আছে। নাটাইচন্ডী ব্রতের উপকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আতপ চালের গুড়ো দিয়ে তৈরী এক ধরনের পিঠে। এই পিঠের মধ্যে থাকবে নুন ছাড়া ও নুন দিয়ে তৈরী পিঠে। যাকে বলা হয় লুনা ও আলুনা। মাথাভাঙ্গা নিবাসী এক ব্রতিনী নির্মলা পালের মতে এই পিঠে ভেরেন্ডা গাছের পাতায় দিতে হয় সঙ্গে থাকে একুশ গাছি দুর্বা ও একশটি ধান। এই ব্রতের সময়কাল সন্ধ্যা। ব্রতিনীগণ সারাদিন উপবাস থেকে বাড়ির উঠোনে পুকুর কেটে ঘট বসিয়ে ফলমূলের মত যাবতীয় উপকরণ দিয়ে এই পূজা করেন। এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য হল গৃহস্থ বাড়ির পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি।

ষষ্ঠী বা ষাট ব্রত ঃ

শুধু উত্তরবঙ্গেই নয় সমগ্র বঙ্গেই ষষ্ঠী দেবী সন্তান পালনের দেবী হিসেবে পূজিত হন। স্বাভাবিক ভাবেই বিবাহিতা বা সন্তানবতী রমণীগণই এই ব্রতের প্রধান ব্রতিনী। জ্যৈষ্ঠ মাস এই ব্রতের শ্রেষ্ঠ সময়। অনেক স্থানে সোম ও শনিবার ষষ্ঠী পূজা করায় মানা আছে। কোচবিহারের বেশীরভাগ গ্রামে পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠী তিথিতেই এই পূজার প্রচলন বেশী। এই পূজার মুল উপকরণ তিনকুড়ি তিনটি দূর্বা, ছয়কুড়ি ছয়টি করঞ্চা এবং আমের পল্লব। এই তিনটি বস্তুকে একত্রে কলার ফাত্রা দিয়ে পেচিয়ে গুছি বা শেকড় তৈরী হয়। প্রত্যেক ব্রতিনী ব্রতকথা শোনার সময় এই গুছি হাতে নিয়ে বসে ব্রত কথা শোনেন। ব্রতিনীগণ পূজার দিন সকালবেলা আম, কলা ও গুছি সহকারে নূতন শীতলপাখাতে সিঁদুরের ফোটা দিয়ে নদীতে বা পুকুরে স্নান করে এসে বাড়ীর ছোট বড় সবাইকে ষাট বা আশীর্বাদ দেন। স্নান করে এসে ব্রতিনীগণ বাড়ির বড় ঘরে ঘট বসিয়ে কলার মাইচ পাতায় ফলমূল ও বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে পুরোহিতের মাধ্যমে পূজা করেন। অনেকে আবার ঘরে কাঁঠালগাছের ডাল পুঁতে পিটুলীর ষষ্ঠী মূর্তি তৈরী করেও পূজা দেন। ব্রত পূজার সমাপ্তে ব্রত কথা শোনার রীতি আছে।

নিয়মসেবা ব্রত ঃ

কোচবিহার জেলার স্থানীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই সমগ্র কার্তিক মাস ব্যাপী এই ব্রত পালন করেন। এই ব্রতের নিয়ম অনুযায়ী ব্রতীগণ সমগ্র কার্তিক মাস ব্যাপী নিরামিষ আহার করেন এবং প্রতিদিন তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালান। নারীপুরুষ উভয়েই এই ব্রত পালন করেন অর্থাৎ এটি একটি যৌথ ব্রত। ব্রতীগণ সূর্য ওঠার পূর্বে স্নান সেরে প্রভাতে তুলসীমঞ্চে

এবং বাড়ী সংলগ্ন পথে নগর কীর্তনে অংশগ্রহণ করেন। ঐ মাসের প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ভাগবত পাঠ করা হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং কীর্তন হয়। এই সময় তুলসীমঞ্চে লম্বা বাঁশের সাহায্যে উঁচুতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, একে বলে আকাশ বাতি। এই ব্রতের সময়কাল অনেক সময় আশ্বিনের একাদশী থেকে কার্তিকের একাদশী পর্যন্ত। পূর্বে এটি শুধু মাত্র বিধবাদের একাদশী ব্রত হিসেবে পালিত হলেও বর্তমানে সধবা - বিধবা, নারী - পুরুষ সকলেই এই ব্রত পালন করেন।

জন্মাষ্টমী ব্রত ঃ

কোচবিহারে সর্বাধিক পালিত ও উদ্‌যাপিত, বৈষ্ণব ভাবাপন্ন স্থানীয় ও পূর্ববঙ্গীয় সবার মধ্যেই সর্বাধিক প্রচলিত ব্রত হল জন্মাষ্টমী ব্রত। শঙ্করদেব প্রভাবিত বৈষ্ণবীয় ধারণায় পুষ্ট হয়ে তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ী গ্রামে, কৃষ্ণপুর, দিনহাটায় অনুষ্ঠিত জন্মাষ্টমীর ব্রত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখা যায় জন্মাষ্টমীর আগের দিন পুরুষ ব্রতীগণ প্রভাতে স্নান সেরে স্থানীয় হরিমন্দির প্রাঙ্গণে স্বস্তিবাচন করে জন্মাষ্টমীর সারা দিনরাত শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-মূলক কীর্তনের মাধ্যমে রাত ভোর করার পর বিকেলে মেতে ওঠেন মথন বা নারকেল খেলায়। এটাই জন্মাষ্টমী ব্রতের মূল কৃত্য।

মদনকামের ব্রত ঃ

বাঁশ পূজায় মদনকামের ভক্তগণও নিয়মসিদ্ধ ও সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাপন করার পর মদন চতুর্দশীর প্রায় সাত-আটদিন পূর্ব থেকে বাঁশ পূজার ব্রত পালন করেন। এসময় ব্রতীগণ নিরামিষ আহার করেন ও মারেয়ার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন। এটি জেলার অন্যতম পুরুষ ব্রত।

আমাতি ব্রত ঃ

জেলার অন্যতম কৃষি সম্পর্কিত ব্রত হল আমাতি ব্রত। সকল সম্প্রদায়ের বিধবা রমণীগণ এই ব্রত পালন করেন। অধিক ফল বা শস্য কামনা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে শস্যকে রক্ষা করা এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। আষাঢ় মাসের অম্বুবাচি তিথি এই ব্রত পালনের প্রশস্ত সময়।

কুলো নামানো ব্রত ঃ

এটি সম্পূর্ণ মেয়েলী ব্রত। খরা বা অনাবৃষ্টির সময় প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে মুক্তি পেতে স্থানীয় কৃষক পরিবারের রমণীগণ এই ব্রত করেন। গান এই ব্রতের অঙ্গ। লোকায়ত বিশ্বাস এই ব্রতের মাধ্যমে কুলা নামালে বৃষ্টি হয়। এই ব্রতের সময়কাল হল ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাস।

কোচবিহার জেলার গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের লৌকিক ধ্যান-ধারণার মধ্যেই জেলার ব্রতগুলি বেঁচে আছে। আদিম ধ্যান-ধারণার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই এই ব্রতগুলির মধ্যে দেখা যায়। কোন ব্রতের লোকদেবতার মূর্তি কল্পনা বা উপাচার, কোথাও মূর্তি না থাকলেও আল্পনার মত শিল্পকলার প্রভাব, লোকায়ত ছড়ার মন্ত্র, আদিম যাদুবিদ্যার প্রতি বিশ্বাসও ফুটে ওঠে বিভিন্ন ব্রত কথা ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। জেলার কৃষিকেন্দ্রিক যাদুবিদ্যা-নির্ভর প্রাচীন ব্রতগুলির মধ্যে অন্যতম হল হুদুম পূজার ব্রত। আবার ব্রতের ক্ষেত্রে লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে নারী দেবতার প্রাধ্যান্য দেখা যায় বেশী। যেমন সাইটল, হুদুম, তিস্তাবুড়ি, কাত্যায়নী, মঙ্গলচণ্ডী, সুবচনী।

দেবদেবীর কল্পনার আদিম যুগের স্তর থেকে বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন পশুপাখি এসকল দেবদেবীর বাহন রূপে পূজিত হয়। যার মূলে আছে জেলার কিরাত সংস্কৃতি উদ্ভূত টোটেম ও কুলপ্রতীক সম্পর্কিত আদিম যুগের চিন্তা ভাবনা। তাই এতদঞ্চলের প্রচলিত কাতিপূজায় দেখা যায় ময়ূর, ষাইটল বা ষষ্ঠী যার বাহন বিড়াল ও সুবচনীর হাঁস। ব্রতগুলির মধ্যে যেমন হুদুমপূজা ব্রতে কলাগাছ, ষষ্ঠী ব্রতে বটের ডাল, সুবচনীর কলাগাছ ব্যবহারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই উর্বরতা কেন্দ্রিক প্রতীক পূজা ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃক্ষপূজার ধারা। কোচবিহারের প্রচলিত ব্রতগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত মন্ত্র ও কথার বিশ্লেষণ করলেও আদিম যুগের জীবন ধারার আভাস পাই।

কোচবিহারের প্রচলিত কয়েকটি ব্রতের মন্ত্রে ও লোকাচারে প্রতীক ব্যবহারের চেয়ে নৃত্যই প্রাধান্য পায় বেশী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্রত যাইটল ও কাতি পূজার ব্রত।

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মত এতদঞ্চলেও নদীভিত্তিক কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্রতগুলির প্রচলন বেশী। সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের অভিব্যক্তি দেখা যায় এই ব্রতগুলির মধ্যে। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করলে এই ব্রতগুলিকে একাধারে যাদুবিদ্যাও বলা যায়।

কোচবিহারের প্রায় সকল গ্রামেই পালিত ব্রতগুলির উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও আঙ্গিক বিচার করলে দুটি ভাগ দেখতে পাই। প্রথমত কতগুলি ব্রত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য পালন করা হয়। এর মধ্যে কাত্যায়নী ব্রতের মত কুমারী ব্রতগুলি পড়ে। দ্বিতীয়ত এমন কতকগুলি ব্রত ও লোকাচার আছে যেগুলির মূল উদ্দেশ্য হল পারিবারিক সুখ শান্তিকে সমৃদ্ধ করা। আবার কতকগুলি ব্রত আছে শুধুমাত্র অশুভ শক্তি থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য পালন করা হয়। এর বাইরেও এমন কতকগুলি ব্রত আছে যেগুলি প্রলোভন, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বর্তমান ভোগসর্বস্ব জীবনে মানুষকে ত্যাগ ও কঠোর সংযমের শিক্ষায় অভিষিক্ত করে। সেই অর্থে বিচার করলে বলা যায় কোচবিহারে পালিত নারী ব্রতগুলির মূল উদ্দেশ্যই হল

সামাজিক, পারিবারিক, প্রতিবেশী ও বিশেষ গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করা। আবার অনেক সময় শুধুমাত্র স্বামী-পুত্র-কন্যার ও পরিবার পরিজনের মঙ্গল কামনাই শুধু নয় এই নশ্বর জীবনের ও জগতের এবং প্রকৃতির প্রতি আকুল আবেদনও কতকগুলি ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। যেমন— কোচবিহারে পালিত হুদুমদেও পূজার ব্রত। এই ব্রতের মধ্য দিয়ে রাজবংশী রমণীগণ একটি বিরাট সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। এখানে তাঁদের নিজস্ব কোন কামনা-বাসনা নয়, সমগ্র সমাজের মঙ্গল কামনাই একমাত্র লক্ষ্য।

কোচবিহারের ব্রত, পার্বণ ও অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে দুটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি— লোকধর্মের অধিষ্ঠাত্রী লৌকিক দেবদেবীর প্রতি ভয় ভীতির পাশাপাশি তাঁদের প্রতি অখন্ড বিশ্বাস। শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে মানুষের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মন প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই ব্রত অনুষ্ঠানগুলিকে শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন বলে মনে করেন এবং এই যুক্তির বলেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই ব্রতগুলিকে উপেক্ষা করেন। কিন্তু সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আমরা দেখতে পাই ব্রতকথা ও অনুষ্ঠানগুলির পেছনে রয়েছে এতদঞ্চলের নারী জীবনের লোকায়ত বিশ্বাসের দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস। কোচবিহারে প্রচলিত ব্রত কথাগুলির মধ্যে এতদঞ্চলের শিক্ষা, সংস্কৃতি, লোকধর্ম ও ঐতিহ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট।

ব্রত ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক লোকনৃত্য

ভূমিকা ঃ

লোকনৃত্যই প্রাচীন কালে সৃষ্ট ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের ভিত্তি। লোকনৃত্যের দীর্ঘ অনুশীলনের ফলেই কতগুলো সুনির্দিষ্ট রীতিনীতির মাধ্যমে নূতন কিছু আঙ্গিকে ভরে ওঠার ফলেই জন্ম লাভ করে উচ্চাঙ্গের নৃত্যশৈলী। লোকনৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই নৃত্য কোন রীতিকেই সুনির্দিষ্ট ভাবে আঁকড়ে ধরে থকে না। যে কারণে এই নৃত্যের কোন ধরা বাধা নিয়ম নেই। যেখানে যেমন আনুষ্ঠানিক আঙ্গিক সেখানে তেমন সামঞ্জস্য রেখে পোষাক ব্যবহার করা হয়। আসামের বিহু নাচের পোষাক ও কোচবিহারের কাতি নাচের পোষাকের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত কোচবিহারেও আদিবাসী সমাজের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। কোচবিহারের রাজবংশী, রাভা ও মেচ সমাজের আচার সর্বস্ব জীবনে এক শ্রেণীর নৃত্য আছে। যেগুলিকে আমরা আচার নৃত্য বা Ritual Dance বলতে পারি। যেমন— কোচবিহারের ষাইটল, ষাইটোর, কাতিনাচ, হুদুম নাচ, বাঁশ পূজার নাচ এবং মেছেনী খেলার নাচ। মুসলিমদের মহরমের লাঠিখেলার নাচ, দুলদুল বা ঘোড়া নাচ। জেলার পূর্ববঙ্গীয়দের কালীনাচ, এতদঞ্চলের রাভা জনজাতিগণের বাইখোর নাচ, বছর পিদান, মাছ ধরার নাচ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "আসামের কলাগুরু বিষ্ণুরাভার সযত্ন প্রয়াসে রাভা

সম্প্রদায়ের লোকনৃত্য বাংলার সংস্কৃতির আঙ্গিনায় আজ উচ্চ প্রশংসিত। মাছ ধরা, শিকার, কৃষিকর্ম, তাঁতবোনা, দৈনন্দিন বহু কর্মের সঙ্গেই লোকগীতি ও লোকনৃত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই জনগোষ্ঠীর সমবেত নৃত্যে মোঙ্গলীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।"[২০]

কোচবিহারের চৈত্র সংক্রান্তিতে হরপার্বতীর ভুমিকায় যে গাজন নৃত্য এবং স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের চড়ক বা গমীরা খেলার নাচ প্রচলিত তা একদিন আচার সর্বস্ব নৃত্য হিসেবে পরিচিত হলেও সময়ের পরিবর্তনে আজ এগুলি আচার নিরপেক্ষ আনন্দানুষ্ঠান।

লোকনৃত্যের আচার বৈশিষ্ট্য বিচার করলে দেখা যায় এতে পুরুষের চেয়ে নারীর ভূমিকাই বেশী কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল হিন্দুর উচ্চতম সংস্কারে নৃত্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা স্বয়ং পুরুষ অর্থাৎ নটরাজ শিব। তবে শিকারজীবী আদিবাসী সমাজের নৃত্যে পুরুষের প্রাধান্যই বেশী।

নৃত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে জেলায় সারাবছর পালিত বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠানগুলি একটি বড় উপলক্ষ্য। জেলায় প্রচলিত এরূপ বহু ব্রত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বহু লোকনৃত্যের চর্চা এখনও বহমান এবং ব্রত অনুষ্ঠানের দেবদেবীগণ এখানে শাস্ত্রীয় দেবদেবী নন। এরা সবাই লৌকিক দেবদেবী। এদের পূজার প্রকৃতি ও লোকাচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে ঢাকা ময়মনসিংহ অঞ্চলের কালীকাচ নাচের ঐতিহ্য কোচবিহারে দীর্ঘদিনের হলেও এখন আর তেমন দেখা যায় না। অবিভক্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির অমূল্য এই নিদর্শন আজ বিলুপ্তির পথে।

"মালদায় গম্ভীরা পূজার চতুর্থ দিনে মাসান নাচ হয়ে থাকে। ভোরবেলা ঢাকের বাজনার তালে তালে বিকটবদনা বিচিত্রবেশে নারীরূপে সজ্জিত বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির নৃত্য এটি।"[২১]

জেলায় প্রচলিত এমন অনেক নৃত্য আছে যেখানে কেবল পুরুষরাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। এতে মেয়েরা অংশগ্রহণ করে না। যেমন— বাঁশপূজার নাচ, মাটিয়া খেলার নাচ, মহরমের লাঠিখেলার নাচ, দুলদুল বা ঘোড়া নাচ, গোষ্ঠের লাঠি খেলার নাচ। মেয়েদের অংশগ্রহণ না করার কারণ অপটুত্ব ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ বা ট্যাবু। যেমন বাঁশ পূজার নাচ। আবার হুদুমদেও পূজার নাচে শুধু মেয়েরাই অংশগ্রহণ করেন। এই দুটি বিধিনিষেধকে জেলার উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ট্যাবু বলা যায়। সাইটল বা কাতিপূজার নাচে শুধু মেয়েদেরই অংশগ্রহণের অধিকার আছে। জেলায় প্রায় সকল গ্রামেই ধর্মীয় ব্রতানুষ্ঠান উপলক্ষে মুলানী বা মারেয়ানীর নির্দেশে এই নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলায় প্রচলিত বহু লোকনৃত্যে দেখা যায় শুধু লোকবাদ্যের প্রাধান্য অর্থাৎ যেখানে কোন সঙ্গীতের ভূমিকা গৌণ। এটা অবশ্যই ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের প্রভাব। হলদিবাড়ী ব্লকের লাঠি

খেলায় যে নৃত্যের প্রদর্শন দেখা যায় সেখানে আমরা দেখি লোকবাদ্যই প্রধান, সঙ্গীত গৌণ। এটাও এক ধরনের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব। অথচ লোকনৃত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল সঙ্গীত নির্ভরতা। তবে লোকনৃত্যের অপরিহার্য অঙ্গ হল ঢাক। জেলার লোকায়ত জীবনের বিশেষ করে রাজবংশী রমণীগণ ফাল্গুণ, চৈত্র মাসে বা জ্যৈষ্ঠ মাসে অনাবৃষ্টির জন্য বৃষ্টি আহ্বান করে যে নৃত্য করেন তাকে বলা হয় হুদুমদেও নৃত্য। জেলার ঝালো মালো ও নমঃশূদ্র সমাজের মধ্যে গাজনের সময় থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত সং-এর নৃত্য নামে এক রকম নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। "পূর্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চলের হিন্দুগণ জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় সং-এর নৃত্য প্রদর্শন করেন।"

তুফানগঞ্জ মহকুমার রাধাচক্রের মেলা উপলক্ষে সারারাত ব্যাপী সং-এর নৃত্য ও অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। মাথাভাঙ্গা মহকুমার চেঙ্গারখাতা খাগরিবাড়ী ও গিলাডাঙ্গা গ্রামে এবং মেখলিগঞ্জ মহকুমার নিজতরফ, ধানিয়াটারী গ্রামে চরকের পর দিন মাটিয়া খেলা বাইশাল নৃত্যে পশুপাখির রূপধারে নৃত্যের প্রচলন আছে। যেমন— বাঘের সাজে বাঘ নৃত্যের প্রচলন আছে। একে বলা হয় বাঘ বাইশাল। হনুমানরূপী হনুমান নাচ, গমীরা খেলায় দেওবংশী বা দোয়ারীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় এই নৃত্য। কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ এই নৃত্যগুলি পশুনৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঘোড়া নাচ যা একমাত্র হলদিবাড়ী ব্লকেই দেখা যায়। উক্ত ব্লকের কিসিঙ্গিডাঙ্গার মহম্মদ বুদ্দা ও বক্সিগঞ্জের সামিরুল মিঞা হলদিবাড়ীর মহরমের লাঠিখেলায় দীর্ঘদিন ধরে এই দুলদুল বা ঘোড়া নাচের সঙ্গে যুক্ত। এখানে মুসলিম সম্প্রদায় কারবালার যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করে ঘোড়া নাচ না বলে দুলদুল নাচ বলেন। এখানে ঘোড়াকে বলা হয় দুলদুল। এই নাচে দেখা যায় অশ্বারূঢ় ব্যক্তিটি তাঁর কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত এমনভাবে আচ্ছাদিত করে যাতে মনে হয় তিনি প্রকৃতই ঘোড়ায় চড়ে অভিনয় করছেন। এই অবস্থায় সেই ব্যক্তিটি নিজের পায়ে নাচতে থাকলেও দেখে মনে হয় যে ঘোড়াটি নাচছে। এরূপ ঘোড়া নাচ একসময় তুফানগঞ্জ মহকুমার দরিয়া বলাই ও পানিশালার অষ্টমী স্নান মেলায় দেখা যেত।

কোচবিহারের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন জেলার লোকনৃত্য। প্রতিদিনের কর্মময় জীবনেই উদ্ভূত এই লোকনৃত্যগুলি একে অন্যের পরিপূরক। মুক্তাঙ্গণ নাট্যকলার মত জেলার শিল্পীদের প্রাণের আবেগ অনুযায়ী উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা লোকালয়ের অঙ্গণে মেলা, উৎসব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই নৃত্যানুষ্ঠানগুলি। শাস্ত্রীয় নৃত্যের কঠোর অনুশাসন এখানে দেখা যায় না। এখানে সহজ সরল গ্রামের মানুষের মুখজ অভিনয় অপটু দেহ সঞ্চালনই বেশী প্রাধান্য পায়। "যে অর্থে শাস্ত্রীয় নৃত্যে শিল্পীরা পেশাদারী সেই অর্থে লোকনৃত্যের শিল্পীরা পেশাদারী নয়।"[১০]

লোকনৃত্যের আবেদন লোকমনের সার্বজনীন আবেগ - অনুভূতি পুষ্ট। এরূপ নৃত্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল এতে ছেলেদের প্রাধান্য। তাই ছেলেদেরই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। মেয়েলী নৃত্যাভিনয় দীর্ঘ দিনের অনুশীলনে, অভ্যস্ত জীবনযাত্রায়, চলনে বলনে

চরিত্রাভিনয়ের নামে জনমনে পরিচিত হয়ে ওঠে। অবিভক্ত বাংলায় যে লোকনৃত্যের ধারা বহমান ছিল আজ খণ্ডিত লোকসংস্কৃতির এই ধারা ম্রিয়মান।

রসবোধের দৃষ্টিভঙ্গী ও আঙ্গিক প্রয়োগের কৌশলের পার্থক্য হেতু ব্রত, পার্বণ ও উৎসব উপলক্ষে কোচবিহারে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্যে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি দেখা যায় —

১। ধর্মীয় অনুষঙ্গে বিভিন্ন তিথিতে ব্রত ও পূজাপার্বণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নৃত্যশৈলী (মদনকাম, সাইটোল / সাইটোর, হুদুম, কাতি, সুবচনী, বিষহরি, মেছেনী খেলার নাচ)।

২। সামাজিক অনুষঙ্গে (উৎসবে) অনুষ্ঠিত লোকনৃত্য (মহরমের লাঠিখেলা ও দুলদুলের নাচ, চড়ক বা গমীরা খেলা উপলক্ষে মাটিয়া খেলার নাচ, জলভাঙ্গা নাচ, সং-এর নাচ, গোষ্ঠ ও কালীকাচ নাচ)।

৩। যুদ্ধ বা সমর নৃত্য (রাভা আদিবাসী সমাজের খাভাবারু নৃত্য, মাছধরা, যুদ্ধের নাচ ও ক্ষেতে বীজ বপনের নাচ, হাঙ্গারামানী, নাক চেংবেনী এবং মেচ সম্প্রদায়ের খরাই রণনৃত্য।

৪। লোকনাটকের লোকনৃত্য (কুষাণ, দোতরা ও বিষহরি পালার ছুকরী নাচ)।

১। (ক) সাইটোল নাচ ঃ

এই নাচের প্রধান সঙ্গী ঢাকী। ঢাকী ব্রতীদের সঙ্গে নিজেও নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। অনেকে এই সাইটোল নাচকে 'ঢাকুয়া নাচ'ও বলেন। এখানে মহিলা নৃত্যশিল্পী বা ব্রতীগণ ঢাকীকে ঘিরে নাচেন। অনেক অঞ্চলে এই ব্রতী বা বৈরাতীগণ এ সময় ধুতি পরেন। ঢাকের বোলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ব্রতিনীগণ ঢাকের বোলের তাল, লয়, ছন্দ মিলিয়ে নাচেন। এই ব্রত নাচে মেয়েদেরই প্রধান্য দেখা যায়।

(খ) কাতি নাচ ঃ

কাতিঠাকুরের সামনে ঢাকুয়া আসর বন্দনা করতেই আসর জমে ওঠে, নাচনীর দল আঁচল কোমরে বেঁধে নাচের প্রস্তুতি নেয়। কাতি নাচের ঢাকী স্বতন্ত্র ভাবেই ঢাক বাজায়। দিনহাটা মহকুমার কিসমৎদশ গ্রামের পওহারি ভুঁইমালি ও তার স্ত্রী মজভুঁইমালি কাতি নাচের দক্ষ ঢাকি ও নৃত্যশিল্পী। কাতি নাচে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চুক্তিবদ্ধ ভাবে গিদালীর নেতৃত্বে ব্রতীরা নৃত্য করেন। আসর বা কাতি দেবতাকে বন্দনা ও প্রণাম করেই এই নৃত্যের শুরু। কাতি নাচের বৈশিষ্ট্য হল এ নাচ কখনও ঢাকের সঙ্গে, কখনও গানের সঙ্গে হয়। সারারাত ধরে বিরামহীন ভাবে চলে নৃত্যের অনুষ্ঠান। একই আসরে পালা করে একাধিক দল নাচেন। কাতি নাচের দক্ষ শিল্পীদের কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলে "নাচনী" নামে খ্যাতি আছে। গিদালী ও নাচনীরাই কাতি নাচের প্রধান ব্যক্তি।

বাঁশ পূজার নাচ ঃ

আদিম বৃক্ষ উপাসনা, যৌন প্রতীক পূজা, অশুভ অলৌকিক শক্তিকে প্রতিরোধ ও রোগব্যাধি দূর করার জন্য স্থানীয় রাজবংশী যুবকগণ প্রতি বছর বৈশাখ মাসের মদন চতুর্দশী তিথিতে মদনকামের ভক্ত বা কামদেবের ব্রতী সেজে বাঁশ পূজার নৃত্য করেন। এটি নারী বর্জিত পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নাচ। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই নাচ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

হুদুম দেও নাচ ঃ

কোচবিহারের রাজবংশী রমণীগণ খরা ও অনাবৃষ্টির সময় কৃষি কার্যের অপরিহার্য উপাদান বৃষ্টির বা জলের প্রার্থনা করে হুদুম দেও পূজা করেন। মেয়েরা নির্জন কোন স্থানে একটি কলাগাছ ও বাঁশগাছ মাটিতে পুঁতে হুদুম দেও কল্পনা করে মধ্যরাতে এলোচুলে বিবস্ত্র অবস্থায় উক্তদেবতার চারদিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করেন এবং নৃত্যের তালে তালে গান করেন। এই নৃত্য ব্রত উদ্‌যাপন মূলক ঐন্দ্রজালিক নৃত্য ছাড়া আর কিছু নয়। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই নৃত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

(ঙ) সুবচনী পূজার নাচ ঃ

পারিবারিক বা ব্যক্তিগত মঙ্গল কামনায় বা কোন মনস্কামনা পূর্ণ হলেই গিদালীর নেতৃত্বে কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে সুবচনীর পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষে কালী নাচের আয়োজন করেন। এই কালী নাচে কোন মুখোশ ব্যবহার হয় না।

(চ) বিষহরি পূজার নাচ ঃ

কোচবিহারে প্রায় সকল গ্রামে সর্প দেবী মনসার পূজা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন নামে। যেমন বিষহরি, পদ্মকুমারী, কানী বিষহরি, সাইটোর বিষহরি, সাইটোল বিষহরি ইত্যাদি। এই পূজায় বিষহরি পালায় গিদালীর দল লক্ষীন্দর, বেহুলা, চাঁদ সদাগর প্রভৃতি ভূমিকায় বিভিন্ন পালার মাধ্যমে লৌকিক অভিনয় ও নৃত্যানুষ্ঠান করেন। এক্ষেত্রে গৃহস্থ বাড়ীর যিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন তাঁকে মারেয়া বলা হয়।

(ছ) ধান ভাঙ্গা ও বৈরাতি নাচ ঃ

কৃষিনির্ভর কোচবিহার জেলার গ্রাম-জীবনের আর একটি কাহিনীনির্ভর অনুষ্ঠান হল 'ধানভাঙ্গা' অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের পালায় দেখা যায় মেয়েরা জোড় বেঁধে নৃত্যের তালে তালে ঢেকিতে ধানভাঙ্গার প্রতিরূপে অভিনয় করে দেখান এবং এসময় নৃত্যের তালে তালে গানও করেন। এরূপ একটি প্রচলিত গান হল —

"আমি নারদের নাতি
গৃহস্থ ধান ভাঙে আমার পিঠে
আমার পিঠে মারে লাথি।"

"এতদঞ্চলের অপর একটি উল্লেখযোগ্য নৃত্যানুষ্ঠান হল 'বৈরাতি নাচ'। বিয়ের সময় রাজবংশী রমণীগণ বর ও কনেকে বরণ করার জন্য যে নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করেন তাকেই বলা হয় বৈরাতি নাচ।"[২২]

(জ) মেছেনী খেলার নাচ ঃ

মেছেনী খেলার নাচ মূলত উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত হলেও কোচবিহার জেলায় একমাত্র মেখলীগঞ্জ মহকুমা ও হলদিবাড়ী ব্লকে এর প্রচলন আছে। বৈশাখ মাসে প্রচলিত তিস্তাবুড়ি পূজায় মেছেনী খেলার নাচ ও গান একটি ব্রত অনুষ্ঠান। তিস্তাবুড়ি দেবীকে ঘিরে বৃত্তাকারে ব্রতিনীরা নাচ ও গান করেন। এই নাচে যুবতী মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে এবং নাচের সময় এঁদের হাতে থাকে লাল- নীল কাগজের পতাকা। তিস্তাবুড়ি পূজার সমাপ্তি দিনে নিকটবর্তী নদীর হাটুজলে সমবেত ভাবে ছত্রধারী দেওধাকে ঘিরে নাচ হয়। তিস্তাবুড়ি পূজার মূল অনুষঙ্গই হল মেছেনী খেলার নাচ।

২। (ক) মহরমের লাঠিখেলার নাচ ঃ

এটি সম্পূর্ণ পুরুষ প্রাধান্যের নাচ। প্রতি বছর মহরমের দিন শিশু যুবক মধ্যবয়স্ক প্রত্যেকে সমান উচ্চতার দৈর্ঘ্যে লাঠি ঘুরিয়ে বিভিন্ন কসরত দেখিয়ে নৃত্যানুষ্ঠান করেন। হলদিবাড়ীতে এই অনুষ্ঠানে একজন নির্দেশক মুখে বাঁশি নিয়ে নাচের ভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করেন। এ সময় তাঁদের পরনে থাকে হাফপান্ট ও ফুটবলের জার্সির অনুকরণে জামা ও গেঞ্জী।

(খ) গমীরা খেলার নাচ ঃ

চড়ক বা গমীরা খেলার নাচে শুধু পুরুষরাই অংশগ্রহণ করেন। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির গমীরা খেলার পরদিন ১লা বৈশাখ স্থানীয় রাজবংশী যুবক এবং মধ্য বয়স্ক যাঁরা চড়কের ভক্তা হিসেবে ব্রত পালন করেন তাঁরাই এইরূপ নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। মাটিয়া খেলার নৃত্যের দলে দশ থেকে পনেরো জন থাকেন। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। প্রসঙ্গত বলা যায় পশ্চিম দিনাজপুরেও গমীরা খেলার নাচ প্রচলিত আছে।

(গ) জলভাঙ্গা নাচ ঃ

কোচবিহারের রাজবংশী রমণীগণ একটি নৃত্যপ্রধান ব্রতানুষ্ঠান পালন করেন। যাকে বলা হয় 'জলভাঙ্গা নাচ'। জলের প্রত্যাশায় নানা আচার ও প্রতীকী ক্রিয়ার মাধ্যমে মেয়েরা এই নৃত্য পরিবেশন করেন।

(ঘ) সং-এর নাচ ঃ

জেলার সর্বত্রই চৈত্র সংক্রান্তির দিন শিব-পার্বতীর ভূমিকায় সং-এর নৃত্য পরিবেশন করেন জেলার জেলে, কৈবর্ত্য, ঝালো মালো সম্প্রদায়। চড়কের পর বৈশাখ মাস ধরে বিভিন্ন

উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক কাহিনীকে ব্যঙ্গ করে অঙ্গভঙ্গী পদক্ষেপ ও মুখোশ দ্বারা সং-এর নৃত্য পরিবেশন করেন। এই নৃত্যের মাধ্যমে তাঁরা অনেক সময় পাড়া-প্রতিবেশী ও পারিপার্শ্বিক কেচ্ছা কাহিনীকে হাস্য রসের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। সং-এর নৃত্য মূলত যুদ্ধ নৃত্য। এখানে মেয়েদের কোন ভূমিকা নেই। আধুনিক গানের সুর প্যারোডির মাধ্যমে লোকায়ত কাহিনীর দ্বারা ব্যক্ত করেন সং-এর নৃত্য শিল্পীগণ।

(ঙ) ভান্ডাভান্ডি নাচ ঃ

প্রতি বছর অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে রাজবংশী সম্প্রদায়ের শিশু, যুবকগণ মুখোশ পরে বাড়ী বাড়ী রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে গান করে মাগন সংগ্রহ করেন। এসময় তাদের হাতে থাকে একটি করে লাঠি। অঙ্গসজ্জায় থাকে কচুরীপানা, মুখে থাকে কলার খোলের মুখোশ। এই নৃত্যানুষ্ঠান জেলায় ভান্ডাভান্ডি নামে পরিচিত। জেলার হলদিবাড়ী ব্লক ও মেখলীগঞ্জ মহকুমাতেই এরূপ নাচের প্রচলন আছে। হলদিবাড়ী ব্লকের কাশিয়াবাড়ী গ্রামের ভান্ডিনাচের একটি গানে আমরা দেখতে পাই—

"নাচ ভান্ডি নাচ ঘুরে ফিরে নাচ
হাটেরও চুরি করি মাছ, বাড়িরও বাইগন
তাক খায়া আমার ভান্ডি ধরিছে নাচন।"[১৫]

(চ) গোষ্ঠের নাচন ঃ

জেলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন রাজবংশী সম্প্রদায়ের কিশোর ও যুবকগণ জগদ্ধাত্রী পূজার অষ্টমী তিথিতে রাখাল বালকের ভূমিকায় হাতে লাঠি মাথায় গামছার পাগড়ি পরে এরূপ নৃত্য পরিবেশন করেন। কোচবিহার জেলায় এই নাচকে গোষ্ঠের লাঠি খেলার নাচ বলে।

(ছ) কালী নাচ ঃ

কাঠ বা শোলার কালীর মুখোশ পরে গ্রামীণ মেলার মত বিভিন্ন লোকউৎসবে অনেক ব্যক্তি চামুন্ডা কালীর মানত স্বরূপ কালী নাচ করেন। হাতে দা, মুখে মুখোশ, গায়ে কালো রং মেখে ঘাগরার মত করে কাপড় পরে ঢাকের বাজনার তালে তালে এই কালী নাচ অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সময় বিভিন্ন সংক্রান্তিতে মাগন তোলার জন্য এরূপ নৃত্য পরিবেশন করেন।

(জ) কালীকাচ নাচ ঃ

চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের সময় সর্বাঙ্গ কালিতে লেপে নকল জিহ্বা, কারুকার্যমন্ডিত মুকুট পরে, হাতে ঢাল তরোয়াল নিয়ে পূর্ববঙ্গীয়, বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলের অধিবাসীগণ কালী বা কাচ নাচের পরিবেশন করেন। কোচবিহারে এই ধরনেব কালীকাচ নাচে সূত্রধর ও নমশূদ্র সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বেশী দেখা যায়।

৩। ক) যুদ্ধসমর নৃত্য ঃ

উত্তর বাংলার প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার ভাড়েয়া, বাঁশরাজা, ছাটরামপুর, হরিপুর, রসিকবিল গ্রামের বনবাসী ও কৃষিজীবী রাভা সম্প্রদায় তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের ঘরকন্না ও কৃষিকর্মের সঙ্গে সঙ্গে বহু নৃত্যানুষ্ঠানের সঙ্গেও অভ্যস্ত। দেহচর্চা তথা যুদ্ধমহরায় জেলার এই আদিবাসী রাভা রমণীগণ হান্ডাখারু, মাছধরা, নববর্ষ উপলক্ষ্যে বছর পিদান, হাঙ্গারমানি, হাপাড়ি, চিকাবারায় প্রভৃতি নৃত্য পরিশেন করেন। শত্রু নিধনের কৌশল ও প্রক্রিয়াকে নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে রাভা রমণীগণ তাঁদের কোমল হাতে তুলে নেন ঢাল ও তরোয়াল। নিজেদের মধ্যে আত্মরক্ষণ ও আক্রমণাত্মক কলা বিভিন্ন ছন্দের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। এরূপ একটি নৃত্য হল 'হাঙ্গাইপানি'।

জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জোড়াই, বোচামারী, আটিয়ামোচরের বনবাসী রাভা ও মেচ রমণীগণ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে "ঢাল থুংমী গেলে নায়" নামক এক সমর নৃত্যের আয়োজন করেন। জেলার এই রাভা সম্প্রদায়ের গীতিমূলক সব অনুষ্ঠানই সমবেত বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে হয়ে থাকে। লোকায়ত এই সমাজের নৃত্যে পদক্ষেপণ, অঙ্গের অবনয়ন ও উন্নয়নের কাজ বেশী। এরূপ নৃত্যে গ্রীবা, মুখ ও চোখের কাজ কম। রাভা রমণীগণ নাচের সময় রঙীন নক্সী, নকুন, কামরাং, ফাকচেক নামক নিজস্ব পোষাক পরেন। কোমরে থাকে কোমর বন্ধনী, গলায় থাকে খুচরো পয়সার মালা। নৃত্য পরিবেশনায় রাভা সমাজের পুরুষগণ পরেন রঙীন উত্তরীয়। এক ক্ষেত্র-সমীক্ষায় তুফানগঞ্জ মহকুমার ভাড়েয়া গ্রামের রাভা সম্প্রদায়ের নৃত্যগীত পারদর্শী ধনঞ্জয় রাভা জানান— "রাভা নৃত্যের অনুকূল পরিবেশ একমাত্র খোলা আকাশের নীচে মুক্তাঙ্গণ, সামনে পেছনে ডাইনে বায়ে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নিজস্ব সম্প্রদায়ের হেম, বাঁক ডিং ডিং কালবাঁশি, চিলিঙ্গির তালে তালে সবাই নাচেন।"[১৫]

রাভা সম্প্রদায় ধানের বীজ রোপণ করার সময় 'হাঙ্গারমানী' নৃত্য পরিবেশন করেন। এই সম্প্রদায়ের গভীর বিশ্বাস নৃত্যের সময় যত উঁচুতে লাফ দেওয়া যাবে ধানগাছগুলি তত উঁচু হবে এবং ফসল ভাল হবে। এই সম্প্রদায়ের চিংড়িমাছ ধরা নাচকে বলা হয় 'নাক চেঙরেনি'। এইরূপ নৃত্য দেখা যায় নদী বা খালবিলের ধারে মাছ ধরার সময়। পুরুষ ও মেয়েরা কোমরে খালই বেঁধে জলে নেমে এই নৃত্য করেন। এসময় তাঁরা যে গানটি করেন সেটি হল—

"ফালা কাটাঙি পালাউ আনাও
ফালা কাটাঙি পালাউ
শিঙি মারিঙি দুকু আনাও
শিঙি মারিঙি ঢুকু।"[১৬]

হলকর্ষণ বা প্রথম জমি চাষ করার সময় এরা যে নৃত্য করে তাকে বলা হয় 'হাপাড়ি' নৃত্য। কৃষিজীবী রাভা সমাজে স্থানীয় রাজবংশীদের মত মেয়েরাও কৃষিকাজে সহযোগিতা করেন। এই উপলক্ষে নৃত্যগীতে সবাই অংশগ্রহণ করে।

প্রতি বছর বৈশাখ মাসে বিশেষ করে ১লা বৈশাখে নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় রাভা সমাজে নৃত্যগীতের আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় 'বছর পিদান'। কালীপূজার আগে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ভালুকের মুখোশ পরে এই সম্প্রদায় যে নৃত্য করে তাকে বলা হয় 'মাক্ পর বসিনি'। রাভা সমাজে মৃতদেহ সৎকার করার সময়ও নৃত্যানুষ্ঠানের প্রথা আছে। এটি এই সম্প্রদায়ের শোকের নৃত্য। জেলার আদিম এই জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস মৃত ব্যক্তি পরলোকে গিয়েও সংসার জীবন নির্বাহ করেন। তাই তাঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন পরলোকে গিয়েও মৃত ব্যক্তি যেন সুখেই থাকেন। ফাল্গুন মাসে রাভা সমাজের লৌকিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়, যাকে বলা হয় 'হুর পূজা'। এই উপলক্ষে তাঁরা নৃত্য গীতের আয়োজন করে। কৃষিজীবী রাভা সম্প্রদায়ের সকল নৃত্যগীতের উদ্দেশ্যই হল সৃষ্টি। আর এই সৃষ্টির আনন্দেই এই সম্প্রদায় সারা বছরেই দৈনন্দিন কৃষিকর্মের মাঝে মাঝে আনন্দ ও উৎসবে মেতে ওঠেন।

খ) লোকনাটকের নৃত্য ঃ

আদিম যুগে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস থেকে জীবন ধারণের প্রয়োজনে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি সৃষ্টি হয়েছিল আদিম নৃত্যানুষ্ঠান বা ঐন্দ্রজালিক অভিনয়। কুষাণ উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির অনুরূপ একটি নিদর্শন। রামায়ণ কাহিনী ও লোকবিশ্বাস-নির্ভর নাটকীয়তা নিয়েই এই কুষাণ পালার অনুষ্ঠান। কোচবিহারের পালাগানের অন্যতম আকর্ষণ এর নৃত্যশৈলী। এতদঞ্চলে প্রচলিত পালাগুলিতে দেখা যায় নৃত্যের মাধ্যমে সংলাপ, সঙ্গীত, দেহজ অভিনয় দর্শকমনকে আপ্লুত করে তোলে এমনই এক প্রাচীন অভিনয়-নির্ভর পালা হল কুষাণ। লোকসংস্কৃতির বিরল এই নিদর্শনটি জেলায় রামকথায়, লোকশিক্ষা এবং নৃত্য ও গীত প্রধান আঙ্গিকটি কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির অন্যতম বাহন।

লোকনাটকের অন্যতম শর্তই হল এর নৃত্যশৈলী। যার অপর নিদর্শন আমরা দেখতে পাই সামাজিক ও কাহিনীনির্ভর চোর চুর্ণীর পালায়। লোকনাটকের এই মাধ্যমটির চর্চা জলপাইগুড়ি জেলাতে বেশী হলেও কোচবিহার জেলার একমাত্র হলদিবাড়ী ব্লক ও মেখলীগঞ্জ মহকুমার একাধিক গ্রামে এর চর্চা অব্যাহত। উপরিউক্ত দুটি পালায় ছুক্রী নাচ অন্যতম আঙ্গিক। পূর্বে ছেলেরাই মেয়ে সেজে এই নৃত্যের অভিনয় করত। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট কুষাণ পালার 'মূল' ললিত কুষাণির মতে এখন মেয়েরাই ছুক্রী নাচে অংশগ্রহণ করে।

গ) কাঢ নাচ / কালীকাঁচ নাচ ঃ

কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হল কাঁচনাচ। বিলুপ্ত প্রায় এই নিদর্শনটি মূলত চড়কের অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। এইরূপ নৃত্যানুষ্ঠানের মূল উপজীব্য ছিল দুর্গা,

লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতির কাঠাম নাচ, এক কথায় সপরিবারে দুর্গার আবির্ভাব ঘটে এরূপ নৃত্যশৈলীর অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই দেখা যায় লোকবাদ্যের শিল্পীগণ তাঁদের নিজস্ব বাদ্য-ভান্ড নিয়ে নৃত্যাঙ্গণে প্রবেশ করেই উচ্চগ্রামে বাজাতে শুরু করেন। এরূপ অনুষ্ঠানের মূল স্থান হল গৃহস্থের বাড়ীর উঠোন। চড়ক পূজার দিন দশেক আগে থেকে চড়কের সঙ্গে যুক্ত ভক্তাগণই বাড়ী বাড়ী ঘুরে রাতে কালীকাঁচ, কৃষ্ণকাচ নাচ দেখিয়ে বেড়ান। এরা কেউই পেশাদারী নৃত্যশিল্পী নন। বর্তমান কাচনাচ বা কালীকাচ নাচের অনুষ্ঠান পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্বে কালীকাঁচ নাচের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও ছিল। পূর্ববঙ্গাগত নমঃশূদ্র ও কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এতদঞ্চলে কালীকাঁচ নাচ ও সঙের নাচের প্রচলন বেশী। ছিন্নমূল এই মানুষগুলি এপার বাংলায় এলেও তাঁদের নিজের সম্প্রদায়গত কৃষ্টিকে সঙ্গে করে এনেছেন। সেই অর্থে এই কালীকাঁচ নাচকে আমরা এতদঞ্চলে মাইগ্রেটেড কালচার বলতে পারি। সারা চৈত্র মাস ধরে গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে এই অনুষ্ঠান হয়। কাঁচনাচের শুরুতে আবির্ভূত হন দশ প্রহরণ ধারিণী দেবী দুর্গা। দশভুজা সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনীর সপরিবারে নৃত্যের পর গগনভেদী গর্জন করতে করতে বাড়ীর উঠোনের মুক্তাঙ্গাণে প্রবেশ করে দেবীর বাহন সিংহ। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে সঙ্গীত মূর্ছনায় বিভিন্ন রূপ অর্থাৎ দেবীর দশমহাবিদ্যার পর কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী এবং বংশীধারী কৃষ্ণরূপ ধারণ করেন। এতদঞ্চলে এই নৃত্যানুষ্ঠানের নাম কালীকাঁচ নাচ বা কাঁচনাচ হলেও মহাশক্তিধারিণী দেবী দুর্গা কর্তৃক অসুর নিধন এই নাচের প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠান। অসুর নিধনের মধ্যেই উপস্থিত দর্শক শ্রোতাগণ আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়েন। অশুভ শক্তির পরাজয় এবং শুভ শক্তির জয় সাময়িকভাবে মানুষের নীতিবোধকে উদ্বেলিত করে তোলে। লোকবাদ্য ঢাক এরূপ নৃত্যের মূল বাদ্যযন্ত্র। এভাবে পর্যায়ক্রমে বংশীধারী কৃষ্ণের পর মুক্ত মঞ্চে আবির্ভূত হন মুন্ডমালিনী মহাকালী। কালীরূপী নৃত্যশিল্পী তাঁর তাল ও ছন্দে শুধুমাত্র সবাইকে মাতিয়ে তোলেন যা শিশু-কিশোর, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইকে শিহরিত করে তোলেন। কারণ মৃন্ময়ী কালীকে দেখে অভ্যস্ত মানুষ জ্যান্ত কালী মনে করে শিহরিত হয়ে ওঠেন।

কোচবিহারের লোকায়ত সংস্কৃতির বিলুপ্তপ্রায় এই নিদর্শন বিভিন্ন তিথি বিশেষ করে পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র সংক্রান্তি ও বিভিন্ন গ্রামীণ মেলায় কালীর মুখোশ লাগিয়ে ঘাঘরা পোশাকে মুখে কৃত্রিম জিহ্বা লাগিয়ে হাতে খাড়া ও মালসা নিয়ে হাটে-বাজারে এখনও মাগন তুলতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে কালীর সঙ্গী একমাত্র ঢাকী। কালীর ভূমিকায় শুধু পুরুষরাই এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যেও কালীকাঁচ, মুখোশ পরে পুরুষদের দল বেঁধে ঢাকের বাজনার সঙ্গে এরূপ নাচের প্রচলন আছে। হাতে তরোয়াল নিয়ে এরূপ কালীবেশে নাচের সঙ্গে একসময় যুদ্ধের ভঙ্গিতে নাচের প্রচলন ছিল এতদঞ্চলে। কোচবিহারের রাভা

সম্প্রদায়েব অন্যতম প্রাচীন কৃষ্টি ঢাল তয়োয়াল নিয়ে যুদ্ধনাচের প্রদর্শন এখনও দেখা যায় মহকুমার বারকোদালী, বাঁশরাজা, হরিরহাট অঞ্চলের রাভা সম্প্রদায়ের মধ্যে। এতদঞ্চলের বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ফলেই এই যুদ্ধ নৃত্যের আঙ্গিক পরিবর্তিত হয়ে ভক্তিধর্মী গীতিনাট্যে রূপান্তরিত হচ্ছে। এতদঞ্চলে এরূপ নাচের মূল উদ্দেশ্য ছিল মহামারী নামক দৈত্যকে বধ করার প্রতীকী অভিনয়। এ ছাড়াও এর পেছনে আছে প্রচ্ছন্ন ঐন্দ্রজালিক প্রভাব।

লৌকিক দেবদেবীর অনেক কিছুই পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় দেবতাদের থেকে ভিন্ন। তার প্রমাণ এর পূজা পদ্ধতি, লোকাচার ও বৈশিষ্ট্যগুলি। সমাজ-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলিকে অষ্ট্রিক দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে উদ্ভব বলে মনে করা হয়। লৌকিক দেবদেবীর মূর্তির রূপ এককথায় আঙ্গিকের বিবর্তন থেকে মনে করা হয় কালের বিবর্তনে লৌকিক দেবতারা আজ অনেক সুসংস্কৃত। তাই যে মাসান দেবতার প্রসাদ খেতে ভয় পেতেন একদিন মানুষ সেই লোকদেবতার প্রতি ভয় মিশ্রিত ভক্তি ও শ্রদ্ধায় নত হন আজ শহুরে শিক্ষিত প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষ। অনেক ক্ষেত্রেই মাসান আজ আর শুধুমাত্র নিম্নবর্ণীয় অন্ত্যজদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। কোচবিহারের পরাক্রমশালী এই লোকদেবতাগণ আজ অনেক ক্ষেত্রেই সার্বজনীন।

নারী উর্বরতার প্রতীক, মেঘ ও বৃষ্টি ফসলের প্রতিশ্রুতি বহন করে আনে। এই বিশ্বাসে রাজবংশী রমণীগণের পূজিতা হুদুম দেবতার সম্পর্ক কল্পনাই এই সমাজের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। ফসলের জন্য বৃষ্টি কামনায় জেলার এই উৎসব লোকায়ত সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকেই স্মরণ করে চলেছে।

জেলার প্রত্যেকটি গ্রামেই লৌকিক দেবদেবীর প্রতি সবাই শ্রদ্ধাবনত। আবার হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতিতে সমন্বিত হয়ে বহু লোকদেবতা পূজিত হন এখানে। সত্যপীর, পাগলাপীর, তোর্ষাপীর, হুজুর সহেব এদেরই প্রতিনিধি। ধর্মীয় সহনশীলতার নিদর্শন হিসাবে এখানে দেখা যায় মাসান, কালী, বুড়াঠাকুরের পাশাপাশি পূজিত হন পাগলাপীর, সত্যপীর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এতদঞ্চলের স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ শাক্ত-শৈব উভয় ধারার অনুসারী। গ্রাম গ্রামান্তরে অসংখ্য দেবদেবীর অবস্থান দেখে মনে হয় তাঁরা তেত্রিশকোটি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং তাঁরা কোন কালেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় তাঁদের অনেকের গৃহাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্বকোণে ঠাকুর পাটে অতি দীর্ঘ একটি বাঁশের মাথায় একগোছা পাটের চামর বাঁধা দেখা যায় এবং এটি তাঁদের পাগলাপীরের থান। আবার অনেক গ্রামে একদিন স্থানীয় ভক্তপ্রাণ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ খোয়াজপীরের দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য প্রতি বছর ভাদ্র মাসের বৃহস্পতিবার অনেক ক্ষেত্রে শেষ দিকে পুকুর বা নদীতে সুসজ্জিত ভেলা ভাসাতেন। বলাবাহুল্য এই দুই দেবতা পাগলাপীর ও খোয়াজপীর হচ্ছেন

মুসলিম সম্প্রদায়ের দেবতা। এ থেকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল প্রতীক।

জেলার প্রত্যেকটি লোকদেবতাকেই একাধারে কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর রক্ষক ও আধার বলে মনে করা হয়। লৌকিক দেবদেবীগণ এখানে সামগ্রিকভাবে গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মঙ্গল-অমঙ্গলের জন্য দায়বদ্ধ। এক কথায় বলা যায় বিশেষ বিশেষ গ্রামে বিশেষ বিশেষ লোকদেবতা জেলার লোকজীবনের নিয়ন্ত্রক। লৌকিক দেবদেবীগণের এসকল বৈশিষ্ট্য থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে লোকদেবতার এই পরিকল্পনা এমন একটি সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ বিভিন্ন গ্রামে গ্রামীণ কৃষিকর্মের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

সভ্যতা, সংস্কৃতির বিবর্তন ও বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার প্রসারের ফলে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম্যজীবন আজ বিচ্ছিন্ন হলেও গ্রামীণ লোকদেবতার পূজা-পার্বণ ও উৎসব এখনও জেলার ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িক সংহতি সৃষ্টির প্রধান মাধ্যম।

নদীর ভাঙন থেকে মহামারী, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সংকট মুহূর্তে সমগ্র গ্রামবাসীই গ্রামের সবার মঙ্গল কামনায় লোকদেবতার আশীর্বাদ ও কৃপাদৃষ্টি কামনা করেন এখানে। জেলার লোকদেবতার আরাধনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তিনি কারও ব্যক্তিগত মনস্কামনা পূর্ণ করেন না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বন্যা বা প্লাবন যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে শুধু মানুষের জীবন ও ঘরবাড়ীই বিনষ্ট হয় না, গবাদি পশুকুলও রক্ষা পায় না। যদিও এর ফলে জমির উর্বরতা বাড়ে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মানুষের উপরিউক্ত দুর্যোগ থেকে মুক্তি লাভের আশাই নদী পূজার দৃষ্টান্ত। যার উপলক্ষ তিস্তাবুড়ি ও গঙ্গা পূজা। তিস্তাবুড়ি পূজার সংশ্লিষ্ট ব্রতীগণের নৃত্যগীতগুলিও কৃষিকৃত্যের নিদর্শন বলা যায়। আবার কৃষিকর্মের সূচনায় ও শেষে সর্বত্রই বিভিন্ন গ্রাম দেবতা নির্দিষ্ট স্থানে পূজিত হয়ে আসছেন। কোচবিহারের গ্রামজীবনেও এর ব্যতিক্রম নেই। জেলার গ্রামাঞ্চলে পূজিত গেরামঠাকুর, গোছরপানা, আগনেওয়া, কাতিগছা ও গোষ্ঠ উৎসব প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। রাজবংশী সমাজের গেরাম ঠাকুরের পূজা লৌকিক শিবেরই পূজা। জেলার বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের অর্থাৎ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও লোকধর্ম, লোকবিশ্বাস ও লোকঐতিহ্যের মধ্যে একটি ঐক্য বা মিল ও সম্প্রীতি চোখে পড়ে বিভিন্ন পুণ্য তিথিতে বিভিন্ন উৎসব এবং গ্রাম দেবতার থান ও পাটে। সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস থেকে এরূপ ঐক্য ও সংহতির সৃষ্টি হয়েছে। এতদঞ্চলে তাই জেলার বৈচিত্র্যময় লোকজীবনের মধ্যেও লোকদেবতার প্রতি মানুষের চেতন অবচেতন মন আজও আদিম বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। হিন্দু ধর্মাশ্রিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও জনসমাজ কাল্পনিক ভাবে এখানে দেবদেবীর মূর্তি পূজায় অর্ঘ্য নিবেদন করেন। আবার যাদু-

বিদ্যার প্রতি বিশ্বাসের ফলেও বিভিন্ন ধর্মের নরনারীগণ আজও এখানে গ্রাম দেবতার থানে হত্যে দেন এবং বিশ্বাস করেন গ্রামীণ লৌকিক দেবদেবীগণই হলেন সর্বশক্তির আধার।

তথ্য সূত্র

১। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ-৫৫ (১৯৩৬)।

২। জাগগান — সুখবিলাস বর্মন, পৃ-২৯ (১৯৯৭)।

৩। রাজবংশী সমাজে শিবের স্থান — শ্রী গোপালচন্দ্র রায় সরকার, পৃ-১৪৯, কোচ রাজবংশী ক্ষত্রিয় কৃষ্টি সম্মিলনীর মুখপত্র, ১৯৯৩, সম্পাদক - উপেন্দ্রনাথ সরকার, গৌরীপুর, ধুবরী, আসাম।

৪। উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কামতা কোচরাজবংশ — ডঃ প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, দৈনিক বসুমতী, ২৭ মার্চ (১৯৯৬)।

৫। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ-৬০ (১৯৩৬)।

৬। ব্যাঘ্রবাহন দেবতা সোনারায় — ডঃ ফণী পাল, পৃ-১২, বাঘ ও সংস্কৃতি — সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, পৃ-১৩ (১৯৮০)।

৭। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — শশীমোহন বর্মন, শিকারপুর, মাথাভাঙ্গা, তাং - ১৩/০৪/১৯৯৮।

৮। প্রান্তবাসীর ঝুলি — নীহারবালা বড়ুয়া, দেশ — ১২ই পৌষ, ১৩৫৯, পৃ-৫৪০, বিংশবর্ষ এবং লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সংগৃহীত, তাং - ২৫/০৪/১৯৯৯।

৯। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — শশীমোহন বর্মন, শিকারপুর, মাথাভাঙ্গা, তাং - ১৩/০৪/১৯৯৮।

১০। প্রসঙ্গ গোরক্ষনাথ — অমলকুমার চক্রবর্তী, 'কোবিদ', সম্পাদক-অমরেন্দ্র বসাক, শারদীয়া ১৩৯৭।

১১। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (১ম খন্ড), সম্পাদক অশোক মিত্র, পৃ-১৫৫ (১৯৬৯)।

১২। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ-৩৩১ (১৯৭৪)।

১৩। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ-২৪, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)।

১৪। সাক্ষাৎকার ও ক্ষেত্র-সমীক্ষা — পূর্ণচন্দ্র রাভা, গ্রাম - শালবাড়ি, বোচামারী, তাং - ০৩/০৯/১৯৯৭।

১৫। গাবাম ঠাকুরের গান — চিত্তরঞ্জন দেব, লোকসংস্কৃতি কোষ - ডঃ বরুণ চক্রবর্তী, পৃ-১০৪।

১৬। সাক্ষাৎকার ও ক্ষেত্র-সমীক্ষা — দীনেশ দাস, গ্রাম - খেটারপাটি, বক্সিরহাট, তাং - ২৫/০৪/১৯৯৮।

১৭। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ-৫৯, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)।

১৮। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ওয়াকিল আহমেদ, পৃ-২৬৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, সন - ১৯৭৪।

১৯। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — বিনন্দ বর্মন, পেশা - কৃষিকাজ, গ্রাম বালাঘাট, তাং - ২৮/০৬/২০০০, তুফানগঞ্জ।

২০। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — কমলেশ সরকার, কদমতলা, নাটাবাড়ী, তুফানগঞ্জ, তাং ২৪/১১/১৯৯৯।

২১। Rajbanshis of North Bengal Dr Charuchandra Sanyal P - 162 (1965)

২২। Rajbanshis of North Bengal Dr Charuchandra Sanyal P - 162 (1965)

২৩। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — ফুলেশ্বরী রায়, মাসানের ওঝা, বড়শাকদল, পরানের ছড়া, দিনহাটা, তাং - ১০/০৫/১৯৯৮।

২৪। লোকসংস্কৃতি গন্তীবা — প্রদ্যোত ঘোষ, পৃ-২০ (১৯৮২)।

২৫। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — কালীচরণ বর্মন, ভোংরিয়া - কালারায়ের ধাম, ছাটগেন্দুগুড়ি, ছাটবামপুর, তুফানগঞ্জ, তাং - ০৭/১২/১৯৯৯।

২৬। উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী — নির্মল চৌধুরী, চারুচন্দ্র সান্যাল - স্মারকগ্রন্থ, পৃ-২২০ (১৯৯২)।

২৭। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — ভোংরিয়া নরেন বর্মন, জায়গীর চিলাখানা, তুফানগঞ্জ।

২৮। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা — ডঃ আশোককুমার মিত্র, পৃ-১৬৮ (১৯৬৯)।

২৯। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — শরৎচন্দ্র বর্মন (বর্তমান পূজা কমিটির সম্পাদক) ভবেন্দ্রনাথ বর্মন (গ্রামবাসী), ধীরেন্দ্রনাথ বর্মন (পূজা কমিটির সভাপতি), গ্রাম - পাথরশোন, বামনহাট, দিনহাটা, তাং - ০৩/০৪/১৯৯৯।

৩০। A Statistical Account of Bengal - W W Hunter, P 378 , Reprint (1974) Vol-X

৩১। আসামের লোকসংস্কৃতি — যোগেশ দাস, পৃ - ৩৩ (১৯৮৩)।

৩২। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোক-সঙ্গীত — ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ - ২৬ (১৯৭৭)।

৩৩। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — দীনেশচন্দ্র দাস, বর্তমান পূজারী, গ্রাম - ভানুকুমারী, থ্যাটারপাট, তাং - ১১/০১/১৪০৫, পূজার দিন।

৩৪। রাজোপাখ্যান (দশম খন্ড) — জয়নাথ মুন্সী, পৃ-৭ (১৯৮৪)।

৩৫। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, পৃ- ৩৩৯, বাংলা একাডেমি, ঢাকা (১৯৭৪)।

৩৬। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — উপেন্দ্রনাথ শর্মা, পিতা - চন্ডীচরণ শর্মা, নিজতরফ গ্রামের ভান্ডানী পূজার তিনপুরুষের পূজারী, তাং - ১৪/১০/৯৭ ইং (ভান্ডানী পূজার অষ্টমী তিথি) নিজতরফ গ্রাম, মেখলিগঞ্জ।

৩৭। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ-৩১ (১৯৭০)।

৩৮। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, পৃ-২৮২, বাংলা একাডেমি, ঢাকা (১৯৭৪)।

৩৯। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ — ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়, পৃ-১৩৫, গবেষণা গ্রন্থ (১৯৭২)।

৪০। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — মহম্মদ মহীউদ্দীন মিঞা, সয়দোর মিঞা, গ্রাম - মাস্তপাড়া, চারালজানি, ২ নং নাটাবাড়ী অঞ্চল, তাং ০৫/১১/১৯৯৯ ইং।

৪১। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, কোচবিহার স্টেট, পৃ-৬৭, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)।

৪২। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — গাটুমিঞা (ঘুঘুমারী), আকবর মিঞা, ডাকুমিঞা (গুদাম মহারণীগঞ্জ) তাং - ০৭/০৪/১৯৯৬ ইং, মহরম।

৪৩। উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি — ডঃ শিবতপন বসু, গবেষণা গ্রন্থ, পৃ-৩৯।

৪৪। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — ফজলুল হক, হলদিবাড়ী পৌর এলাকা, তাং - ২৭/০২/১৯৯৮ ইং।

৪৫। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ-৭৩, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)।

৪৬। ইসলামী বাংলা সাহিত্য — সুকুমার সেন, পৃ-৮১ (১৩৮০)।

৪৭। সাক্ষাৎকার — আকবর মিঞা ও ডাকুমিঞা, ঘুঘুমারী ও গুদাম মহারাণীগঞ্জ, তাং - ০৭/০৪/১৯৯৮ ইং, মহরম।

৪৮। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ-৭০, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)।

৪৯। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — খোন্দকর আব্দুল হামিদ একরামুল হকের মেয়ের ঘরের নাতি, বয়স - ৬৭, স্থানীয় জনমানসে খোকা হুজুর নামে পরিচিত (আব্দুল হামিদ সাহেবের বক্তব্য টেপ রেকর্ডে সংরক্ষিত) হলদিবাড়ী, হুজুরের মেলা, তাং - ০৬/০৩/১৯৯৮ ইং (বর্তমানে প্রয়াত)।

৫০। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, কোচবিহার স্টেট, পৃ-৬৭, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)।

৫১। Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement – Harendra Narayan Choudhury, P-676 (1902)

৫২। বাজোপাখ্যান — জয়নাথ মুন্সী, সম্পাদনা - বিশ্বনাথ দাস, পৃ-৪১ (১৯৮৫)।

৫৩। Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement – Harendra Narayan Choudhury

৫৪। কোচবিহার পরিক্রমা, সম্পাদক - কৃষ্ণেন্দু দে, কোচবিহার গ্রন্থ প্রকাশনা সমিতি, ১৯৮৪।

৫৫। মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, পৃ-৮১, সম্পাদক - অজিতেশ ভট্টাচার্য (১৩৯৬)।

৫৬। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, কোচবিহার স্টেট, পৃ-১২৮, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)।

৫৭। Gazetteer of India, Cooch Behar, by D D Majumdar, P-208 (1977)

৫৮। কথাগুরু চরিত — সম্পাদনা - উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু, পৃ-১৯৮।

৫৯। কোচবিহার রাজ্যে শঙ্করদেব ও তাঁর সত্র — (দিলীপকুমার দে, 'কোবিদ' সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয়া, ১৪০০, ২৫ অগ্রহায়ণ, সম্পাদক— অমরেন্দ্র বসাক।)

৬০। বাঙালীর ইতিহাস — ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃ - ২৯৭-৯৮, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

৬১। A Statistical Account of Bengal - W.W Hunter, V - X, P-378, Reprint (1974)

৬২। The Golden Bough - J G Frazer, P-155. 1967

৬৩। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা পার্বণ, গবেষণা গ্রন্থ — ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়, পৃ-১১৮ (১৯৭২)।

৬৪। Tree Symbol worship in India Shankar Sengupta, P-144

৬৫। The Golden Bough J G Frazer P-24, V-2, Part-I, (1967)

৬৬। সাক্ষাৎকার - শশীমোহন বর্মন, শিবপুর গ্রাম, অঞ্চল - মাথাভাঙ্গা, হরিনাথ বর্মন (পানিয়া), ভারেয়া গ্রাম, বারকোদালী ১ নং অঞ্চল, তুফানগঞ্জ।

৬৭। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - রেবতীবালা রায় (দোহারী), ঝর্ণা ও ভাবতী রায়, (ব্রতিনী), হলদিবাড়ী, মেখলিগঞ্জ, তাং-১৫/০৫/১৯৯৯ ইং।

৬৮। A Statistical Account of Bengal W W Hunter, P-265 Reprint (1974)

৬৯। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) - ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃ - ৪৮২ (১৪০০)।

৭০। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ — ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়, পৃ-১০৮ (১৯৭২)।

৭১। সূত্র কোচবিহারে রাজ আমল থেকে রাজবাড়ী ও বড়দেবী পূজার ফুল, বেলপাতা, ফলমূল, যাবতীয় পূজার উপকরণ সংগ্রহকারীকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'হালুয়া'। বড়দেবী পূজার বহু লোকাচারের সঙ্গে এখনও দশমীর দিন এই সম্প্রদায়ের বংশধরেরা ঘাট পাড়ের 'চালিয়া বাড়িয়া' পূজার পৌরোহিত্য করেন। সাক্ষাৎকার - শচীনচন্দ্র দাস, হালুয়া সম্প্রদায়ের প্রবীণ 'চালিয়া বাড়িয়া' পূজার পুরোহিত, গ্রাম - টাকাগাছ, তাং - দশমী পূজার দিন, ১৪০৭।

৭২। বাজোপাখ্যান -- জয়নাথ মুন্সী (দেবখন্ড), পৃ-১৩, (১৯৮৫)।

৭৩। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - শচীনচন্দ্র দাস, হালুয়া সম্প্রদায়ের প্রাক্তন পুরোহিত, গ্রাম - টাকাগাছ।

৭৪। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ — ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়, পৃ-১২৬ (১৯৯৯)।

৭৫। উত্তরবঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজবংশী সমাজে বিষুয়া পার্বণ — কবিরত্ন শ্যামাপদ বর্মন, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৯৮।

৭৬। পুষুণা - শ্রী শ্যামল রায়, কোচরাজবংশী ক্ষত্রিয় কৃষ্টি সম্মিলনের মুখপত্র, পৃ-১৫৩, গৌরীপুর, ধুবরী, আসাম (১৯৯৩)।

৭৭। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - ফজলুল হক, হলদিবাড়ী ব্লক, ২৭/০৮/১৯৯৯।

৭৮। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - রামশঙ্কর সরকার, গ্রাম - কাশিয়াবাড়ী, হলদিবাড়ী ব্লক, তাং - ২৮/০৮/১৯৯৯ ইং।

৭৯। সংসদ বাংলা অভিধান সঙ্কলন — শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, পৃ-৫৩৩, সাহিত্য সংসদ (১৯৮৭)।

৮০। বাংলার ব্রত পার্বণ — ডঃ শীলা বসাক, পৃ-৮ (১৯৯৮)।

৮১। হুদুম বা হুদুমদেও -- ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি, কোষ, ডঃ বরুণ চক্রবর্তী, পৃ-৪৫২ (১৪০২)।

৮২। A Statistical Account of Bengal - W W Hunter, V-X, P-378 Reprint (1974)

৮৩। The Golden Bough J G Grazer, P-93, ed (1974)

৮৪। উত্তরবাংলার টোটো উপজাতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ — ডঃ পবিত্রকুমার গুপ্ত, পৃ-৩৬ (১৯৮৮)।

৮৫। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার -- খুকি নমদাস ও নীলেশ্বরী নমদাস, চাবালজানি, গ্রাম - মাছুয়ারটারী, নাটাবাড়ী ১ নং অঞ্চল, তাং - ০৭/১১/১৯৯৯ ইং।

৮৬। প্রান্ত উত্তর বাংলার লোকসঙ্গীত — ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ-২৭ (১৯৭৭)।

৮৭। নমলাকাতি — প্রান্তবাসীর ঝুলি, নীহারবালা বড়ুয়া, দেশ পত্রিকা, ২১ বর্ষ, ১৮ই পৌষ (১৩৬০) পৃ-৫৭৮।

৮৮। কোচবিহারের প্রাচীন ব্রত কথা — হিমাদ্রিশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ-১৬ (১৯৮৩)।

৮৯। বাংলার ব্রত পার্বণ — ডঃ শিপ্রা বসাক, পৃ-১৩৭ (১৪০৫)।

৯০। উত্তর বাংলার টোটো উপজাতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ — ডঃ পবিত্রকুমার গুপ্ত, পৃ-১৪ (১৯৮৮)।

৯১। লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা — প্রদ্যোৎ ঘোষ, পৃ-২০ (১৯৮২)।

৯২। লোকউৎসবের আঙ্গিনায় — শিশির মজুমদার, দেশ - ২৩ শে জুন, ১৯৯০, পৃ-৫৪।

৯৩। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার — মনোতোষ রায় প্রামাণিক, কাশিয়াবাড়ি, হলদিবাড়ী, তাং - ২৮/০৪/১৯৯৯ ইং।

৯৪। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - ধনঞ্জয় রাভা, গ্রাম - ভারেয়া, তাং - ১২/০১/২০০১।

৯৫। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার --- পূর্ণচন্দ্র রাভা, বোচামারী, তুফানগঞ্জ, তাং - ০৭/০৪/১৯৯৮ ইং।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আনুষ্ঠানিক লোকপ্রিয় খেলা, মেলা ও লোকউৎসব

আনুষ্ঠানিক লোকপ্রিয় খেলাধূলা ঃ

ভূমিকা ঃ

প্রচলিত লৌকিক খেলাধূলা শুধুমাত্র আমোদ প্রমোদের জন্য নয়। এমন একদিন ছিল যখন গ্রামীণ সকল খেলাধূলাই ছিল উদ্দেশ্যহীন বিনোদনের জন্য। কিন্তু কোচবিহারের লোকায়ত সমাজজীবনে দেহচর্চামূলক এবং শিক্ষাবিষয়ক খেলাধূলার বাইরেও এমন কিছু খেলাধূলা প্রচলিত আছে যার সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস, আচরণ, লোকাচার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা যায়। তাই জেলার বিভিন্ন গ্রামে সংবৎসরে অনুষ্ঠিত কতকগুলি খেলার উৎসমূলে আমরা ধর্মীয় প্রেরণা লক্ষ্য করি। এগুলিকেই আমরা বক্ষ্যমান আলোচনায় আনুষ্ঠানিক লোকপ্রিয় খেলাধূলা নামে অভিহিত করেছি। যার মূল উৎসই হল ধর্মীয় অনুষ্ঠান। প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক খেলাধূলার মধ্যে আমরা লোকবিশ্বাস ও যাদুবিদ্যার প্রচ্ছন্ন প্রভাব দেখতে পাই। বৃষ্টি আহ্বানমূলক বা বৃষ্টি নামানোর জন্য মেখলিগঞ্জ মহকুমার খড়খড়িয়া গ্রামের 'পেন্টি খেলা', কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পরদিন উক্ত মহকুমার স্টেট ঠাকুরবাড়ী প্রাঙ্গণে, দিনহাটার কিসমতদশ গ্রামের বলরামের পাটে, জেলা সদরের মাঘপালা গ্রামের হরিমন্দির প্রাঙ্গণে, তুফানগঞ্জ মহকুমার বিলসী, ঝলঝলি, কৃষ্ণপুর, শালবাড়ি গ্রামের হরিমন্দির প্রাঙ্গণে 'নারকেল খেলা' বা 'দধিকাদো খেলা' এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভক্তপ্রাণ মানুষ ধর্মীয় অনুষঙ্গে এই লোকক্রীড়ার মধ্যে আনন্দ পেলেও এতে এক আদিম চিত্ত বিনোদনের আভাস আমরা দেখতে পাই। চিত্ত বিনোদন ও শরীর চর্চা অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। কোন কোন লৌকিক ক্রীড়ায় জ্ঞান ও বুদ্ধি চর্চার প্রকাশও দেখা যায়। কালের বিবর্তনে কোচবিহারের সমাজ ও সভ্যতা উৎকর্ষ লাভ করেছে। সেই সঙ্গে লৌকিক খেলাধূলার চর্চার বিভিন্ন পদ্ধতি উন্নত হলেও এতদঞ্চলের লোকক্রীড়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক বজায় রেখে আজও অনেক খেলাধূলা বিভিন্ন গ্রামে প্রচলিত যার বেশীরভাগই লোকধর্মের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণাপুষ্ট হয়ে ধর্মীয় জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত কোচবিহার জেলার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বৈবাহিক অনুষ্ঠানেও খেলাধূলার প্রচলন আছে, যার উল্লেখযোগ্য দুটি হল 'কাড়িখেলা' ও 'আংটি খেলা'। কোথাও বিয়ের দিন বাসর ঘরের মেঝেতে শীতল পাটিতে বসে কড়িখেলা অনুষ্ঠিত হয় আবার কোথাও

বেতের ডালার মধ্যে চাল দিয়ে বর কর্তৃক আংটি লুকিয়ে রেখে নববধূকে খুঁজে বার করতে দেওয়া হয়।

আনুষ্ঠানিক এই লৌকিক খেলাধূলার বৈশিষ্ট্য হল, অন্যান্য লৌকিক ক্রীড়ার মত এখানে কোন উপকরণ ব্যবহার না হলেও এগুলি যন্ত্রসঙ্গীত (লোকবাদ্য) ও সঙ্গীত নির্ভর। এক কথায় বলা যায় নৃত্য, গীত ও লোকবাদ্যের সমাহারে এই খেলাগুলি দর্শক মনে ভক্তির উদ্রেক করার পাশাপাশি আনন্দ ও মনোরঞ্জন সৃষ্টি করে। জেলার উল্লেখযোগ্য প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী লোকপ্রিয় খেলাধূলাগুলি হল নিম্নরূপ—

গোষ্ঠের লাঠি খেলা, গমীরা খেলা, মেছেনী খেলা, মহরমের লাঠি খেলা, বাঁশপূজার খেলা, কালী খেলা, মথন খেলা, পেন্টি খেলা এবং বিবাহ উপলক্ষ্যে খেলা।

গোষ্ঠ উপলক্ষ্যে খেলা ঃ

কোচবিহার জেলায় প্রচলিত আনুষ্ঠানিক খেলার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন গোষ্ঠপূজা উপলক্ষ্যে লাঠি খেলা। প্রতি বছর কার্তিক মাসে জগদ্ধাত্রী পূজার অষ্টমী তিথিতে 'গোষ্ঠাষ্টমীর দিন' গোষ্ঠপূজা (কৃষ্ণ) উপলক্ষ্যে প্রথমে গ্রামের ছোট ছোট শিশু ও কিশোরদের শ্রীকৃষ্ণ, কানাই, বলাই, শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রমুখের অনুকরণে রাখাল বালক সাজিয়ে সঙ্গে একটি গরু নিয়ে ক্ষেতে ধান খাওয়ানো হয়। এর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণকে স্মরণ করেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পৌরাণিক কৃষ্ণ সেদিন জীবন্ত হয়ে ওঠেন এখানকার গ্রামে গ্রামে রাখাল বালক বা রাখাল রাজা রূপে। "গোচারণে যাওয়ার সময় বালক কৃষ্ণ সবান্ধব যে খেলাধূলা করেছিলেন সেই উপলক্ষ্যকে স্মরণ করেই গোষ্ঠ তিথিতে বিকেলে জেলার প্রায় সকল গ্রামেই বিশেষ করে বৈষ্ণব অধ্যুষিত গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাখাল বালকদের লাঠি খেলার প্রচলন।"[১]

দিনহাটা মহকুমার 'কিসমতদশ' গ্রামের বলরামের পাটে, তুফানগঞ্জ মহকুমার 'ঝলঝলি', 'কৃষ্ণপুর', 'বিলসী', 'মুগাভোগ', চিলাখানায় গোষ্ঠপূজা উপলক্ষ্যে এই খেলার রেওয়াজ বেশী। গোষ্ঠের লাঠি খেলার দৃশ্যপটে দেখা যায় প্রতি চারজন লাঠিয়াল বাঁশের লাঠি নিয়ে লোকবাদ্যের তালে তালে নেচে নেচে লাঠি খেলা প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন কায়দায় লাঠি পরিচালনা করে বালক লাঠিয়ালগণ একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে; সঙ্গে থাকে লোকবাদ্যের ঝংকার। পূজার মূল মণ্ডপের সম্মুখে চারদিকে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান উৎসুক জনতার মাঝে বৃত্তাঙ্গণে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। কখনো একা বা কখনো প্রতিযোগিতার ভঙ্গিতে দুজন করে মুখোমুখি লাঠি খেলা প্রদর্শন করে। এ খেলায় খেলোয়াড়দের পোষাক বলতে পরনে থাকে হাফ প্যান্ট গেঞ্জি, আবার অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেরা ধুতির সঙ্গে গেঞ্জি পরে। আর অন্য উপকরণ বলতে একমাত্র লাঠি। সম্পূর্ণ ছেলেদের নিয়ন্ত্রিত এই খেলায় লাঠি চালনার সঙ্গে সঙ্গে করকা, ঢোলক ও সানাইয়ের গগন ভেদী শব্দ ঝংকারে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য ফুটে ওঠে।

গমীরা খেলা ঃ

কোচবিহার জেলার বিভিন্ন গ্রামে বিশেষ করে মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ মহকুমায় কোচবিহারের স্থানীয় কৃষ্টিতে অনুষ্ঠিত গাজনের চড়ক উৎসব চড়ক খেলা নামে পরিচিত। এই জেলার দিনহাটা, তুফানগঞ্জ ও সদরের কয়েকটি গ্রামের পূর্ববঙ্গীয় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের চড়কের গাজন বা হাজরা পূজা উপলক্ষ্যে চড়কের অনুষ্ঠান হলেও চৈত্র সংক্রান্তির এই অনুষ্ঠান এই জেলার দুটি মহকুমার বিশেষ করে মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জের একাধিক গ্রামে স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় তাঁদের নিজস্ব কৃষ্টিতে চড়ক পূজা উপলক্ষ্যে চড়কের খেলা বা গমীরা খেলা প্রদর্শন করেন। বিশেষ করে মেখলিগঞ্জ মহকুমার বানিয়ারটারি, দেবীরডাঙা, ডাঙারহাট, নিজতরফ, খড়খড়িয়া গ্রামের এবং মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিকারপুর, গোপালপুর, চেঙ্গারখাতা খাগরিবাড়ি ও গিলাভাঙা গ্রামে দেউসী বা দেববংশীর নেতৃত্বে ভক্তাগণ গ্রামের কোন ধনাঢ্য মানতকারী মাড়েয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় চৈত্র সংক্রান্তির চড়কের মূল অনুষ্ঠানের সাত-আট দিন পূর্ব থেকেই গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে মদনকাম বা সঙের দলের মত খেলা ও কসরত দেখিয়ে বেড়ান; সঙ্গে অবশ্যই থাকে ঢাকি। চৈত্র সংক্রান্তির দিন দেববংশীগণ তাঁদের ভক্তাগণ সহ শ্মশান খেলা, বানফোঁড়, কাটা ঝাঁপ, আগুন ঝাঁপ, রামদায়ের উপর শুয়ে বুকে সাম গাইন (উদখুল) দিয়ে ধান ভানার মত বীভৎস ও অলৌকিক খেলা প্রদর্শন করেন। পরের দিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ সংশ্লিষ্ট দেববংশী ও ভক্তাগণ মাড়েয়ার বাড়িতে প্রদর্শন করেন 'মাটিয়া খেলা'। "এই খেলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নাচ ও গানের মাধ্যমে ও ঢাকির বাজনার তালে তালে গ্রামবাসীকে আনন্দ দান। এ ছাড়াও বহুরূপীর মত বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে ভক্তাগণ প্রদর্শন করেন আঠারো রকমের বাইশ্যাল খেলা।"[২]

মেখলিগঞ্জ মহকুমার বানিয়ারটারি গ্রামে মাটিয়া খেলা উপলক্ষ্যে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে দেখা যায় বাঘ বাইশ্যাল, হনুমান বাইশ্যাল, পাগল বাইশ্যাল, শুকর বাইশ্যাল খেলা ইত্যাদি। এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় পয়লা বৈশাখ সকাল সাতটা থেকে দুপুর পর্যন্ত। মাড়েয়ার বাড়ির উঠোনে জল ঢেলে কাদা করে ভক্তাগণ যে কসরত দেখান, সেটাই প্রকৃতপক্ষে মাটিয়া খেলা। এই খেলার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল— মনঃশিক্ষামূলক গান গেয়ে ঢাকির বাজনার তালে তালে নৃত্যের মাধ্যমে খেলা প্রদর্শন করা। এই প্রসঙ্গে বলা যায় এই অনুষ্ঠান বা খেলা পরিচালনা করেন 'দোয়ারী' (মূল বা পরিচালক)। মেখলিগঞ্জ মহকুমার বানিয়ারটারি গ্রামে চড়কের পরের দিন উপস্থিত থেকে (মাড়েয়ার বাড়িতে) এই খেলা প্রত্যক্ষ করা যায়। গমীরার দলের মূল শিবেন বর্মন ও সোমারু বর্মনের নেতৃত্বে মনঃশিক্ষা মূলক গানের মাধ্যমে এই মাটিয়া খেলা কতকটা দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। এখানে দেববংশী ছিলেন উক্ত মহকুমার পাঁচমাইল গ্রামের রতিকান্ত রায়। এই গমীরা খেলা বা চড়কের অপর উল্লেখযোগ্য গ্রাম হল মাথাভাঙ্গা মহকুমার 'চেঙ্গারখাতা খাগরিবাড়ি' গ্রাম। এখানে খেলার আঙ্গিকে দেখা যায় মাটিতে হাত পা ছুঁড়ে গড়াগড়ি দিয়ে গান

ও লোকবাদ্যের বাজনার অনুষঙ্গে বিভিন্ন দৈহিক কসরত প্রদর্শন। বানিয়ারটারি গ্রামের মাটিয়া খেলার একটি মনঃশিক্ষামূলক গানে দেখা যায় এক বালবিধবার করুণ আর্তি ঃ

দারুণ বিধিরে কি দোষে
বিধুয়া হনু কপালের দোষে
গাবুর বয়সে বিধুয়া হনু
মনটা কান্দিছে।।

মেছেনী খেলা ঃ

বৈশাখ মাসে তিস্তাবুড়ি পূজা ও ব্রত উপলক্ষ্যে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত জলপাইগুড়ি জেলায় এই খেলার প্রচলন বেশী। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমা ও হলদিবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম ব্যতীত অন্য কোথাও এই খেলা দৃষ্ট হয় না। বৈশাখ মাসে তিস্তাবুড়ি পূজার একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ হল এই খেলা। অবিভক্ত বাংলার রঙপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী সমাজের মধ্যেই এই আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতনির্ভর খেলা প্রচলিত। এই খেলাকে তিস্তাবুড়ির ব্রতিনীদের খেলাও বলা যায়। এটি সম্পূর্ণই পুরুষবর্জিত মেয়েদের খেলা। গান এই খেলার প্রাণ।

উত্তর বাংলার লোকায়ত জীবনের এই মেছেনী খেলা রাজবংশী সমাজের একটি প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। কবিরত্ন শ্যামাপদ বর্মনের মতে "বৈশাখ মাস সম্পূর্ণ শেষ করে সংক্রান্তির দিন মহাসমারোহে পূজা উপলক্ষ্যে এই খেলার প্রশস্ত সময়।" তিস্তাবুড়ি পূজার ব্রতিনীরা বাড়ি বাড়ি মাগন সংগ্রহের সময় সুসজ্জিত ছাতাবেষ্টিত তিস্তাবুড়ির দেওধা বা মূলানীকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে দুই হাতে চাটি বাজিয়ে যে গান করেন এটাই খেলার মূল আঙ্গিক। সঙ্গে থাকে উলুধ্বনি। দীর্ঘ বৈশাখ মাস বাড়ি বাড়ি মাগন তুলে খেলা প্রদর্শনের পর বৈশাখ মাসের শেষ দিন নদীতে ভেলা ভাসানোর সময় যুবতী ব্রতিনীরা একই ভাবে হাটু জলে নেমে ঘুরে ঘুরে গান করেন। এখানে হাত নাড়ার ভঙ্গি এবং পরস্পরকে জল ছিটানোর মাধ্যমেই খেলার আঙ্গিক প্রকাশ পায়। মেছেনী খেলা মূলত আনুষ্ঠানিক নৃত্যগীত হলেও এর সঙ্গে খেলা নামটি যুক্ত হওয়ায় জেলার ঐ দুটি গ্রাম্য শহরে একটি সার্বজনীন রূপ পেয়েছে। যার জন্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষই এর মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করেন। তিস্তাবুড়ির পূজাকে মেছিনী খেলা না বলে একে নৃত্যগীতের শারীরিক ভাষা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খেলাও বলা যায়।

মহরমের লাঠি খেলা ঃ

এই জেলার শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমগণের মহরম উপলক্ষ্যে তাজিয়া সহ লাঠি খেলা প্রদর্শনকে একটি পবিত্র কর্ম বলে মনে করেন। কোচবিহার জেলার গুদাম মহারাণীগঞ্জ বা তোর্ষাপীর ধাম এই উৎসব উপলক্ষ্যে লাঠি খেলার একটি পীঠস্থান। সুসজ্জিত তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে জেলা সদর, ধলুয়াবাড়ি ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে বেশ কয়েকটি লাঠি

খেলার দল হাজির হন উক্ত ধামে। এখানে লাঠিয়ালগণ খেলার সময় পোষাক হিসেবে ব্যবহার করেন নিত্য ব্যবহার্য হাফ / ফুল প্যান্ট ও গেঞ্জি। অনেকের মাথায় থাকে ফেট্টি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুসলিম যুবকগণ এই খেলায় অংশগ্রহণ করেন। কখনও এক হাত বা দুই হাতে অপূর্ব কৌশলে খেলোয়াড়গণ লাঠি ঘোরান, কখনও মুখোমুখি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বিভিন্ন কৌশলে লাঠি ঘুরিয়ে খেলা দেখিয়ে থাকেন। কখনও বা জারি নাচের ভঙ্গিতে নেচে নেচে খেলা দেখান। মহরমের লাঠি খেলার অপর মূল আকর্ষণ হল সুসজ্জিত পোষাকের লোকবাদ্যের দল। এই লাঠি খেলা সাধারণত বৃত্তাকারে দর্শক বেষ্টিত মুক্তাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। জেলার অপর উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মহরমের লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত হয় মেখলিগঞ্জ মহকুমার হলদিবাড়ি ব্লকে। এখানে লাঠি খেলার আড়ম্বর, বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এক অনুরণন সৃষ্টি করে।

ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখা যায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টিতে হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবের মাঠে বিভিন্ন লাঠি খেলার দল জমায়েত হলে এক মেলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। হলদিবাড়ি ব্লকের হেমকুমারী, কাশিয়াবাড়ি, ফিরিঙ্গিডাঙা, বক্সিগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, হুদুমডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি লাঠিয়ালদের দলের সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য প্রদর্শনী, পরিক্রমা উক্ত গ্রাম্য শহরের একটি বাৎসরিক সার্বজনীন অনুষ্ঠান। মুসলিম সমাজের শিশু কিশোর বয়স্ক সবাই এখানে এই খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। মহরমের চার পাঁচদিন আগে থেকেই বিভিন্ন গ্রামের মুসলিম যুবকগণ পনের-কুড়ি জনের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে লাঠি খেলা দেখান। বিনিময়ে দক্ষিণাও পান। এখানে লাঠি খেলায় একজন পরিচালক লাঠি পরিচালনার প্রতিটি মুদ্রায় 'হুইসিল' বা বাঁশি দিয়ে এই খেলাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। খেলোয়াড়দের প্রত্যেকের হাতেই থাকে সমান মাপের একটি করে লাঠি এবং পোষাক থাকে সাদা হাফ প্যান্ট ও ফুটবলের জার্সির মত দুই রঙের গেঞ্জি অথবা হাফ শার্ট। এখানকার লাঠি খেলার মূল বৈশিষ্ট্যই হল ঢোল, করকা, সানাই ইত্যাদি লোকবাদ্যের তাল। খেলোয়াড়গণ সারিবদ্ধ, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দক্ষতার সঙ্গে কখনও তরোয়াল-এর ভঙ্গিতে লাঠি ঘুরিয়ে উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দেন। "মহরমের চাঁদ দেখার দিন থেকে এই খেলা শুরু হয়ে চলে মহরমের দিন পর্যন্ত।"[৩]

বাঁশপূজার খেলা ঃ

প্রতি বছর চৈত্র অথবা বৈশাখ মাসের মদন ত্রয়োদশী থেকে "মদন পূর্ণিমা"[৪] পর্যন্ত জেলার তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও সিতাই ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে মদনকামদেবের দল বা ভক্তাগণ দোয়ারীর নেতৃত্বে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বিভিন্ন কসরত দেখিয়ে মাগন তোলেন আবার "এই মদনকামের দলই বাঁশ পূজার অন্তিম দিনে থলা বা মেলা প্রাঙ্গণে কৃষি কর্মের বিভিন্ন আঙ্গিক বৃত্তাকারে বেষ্টিত উপস্থিত দর্শকগণের মাঝে প্রদর্শন করেন।"[৫] এটাই কোচবিহারে স্থানীয় রাজবংশী

সমাজে মদনকামের বাঁশ পূজার খেলা নামে পরিচিত। মাঝ বয়সী রাজবংশী যুবকগণ আদুল গায়ে কাদা মাটি মেখে মাছের জাল, চটের পোষাক, সুপারীর খোলের টুপি পরে সুসজ্জিত হয়ে কৃষি কর্মের বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা করেন। যেমন— জমিতে মাটি কাদা করা, রোয়া গারা, ধান কাটা, একজনের পিঠে আর একজন দাঁড়িয়ে চক্রাকারে ঘোরা, কাঁধে উঠে পিরামিডের আকৃতিতে দাঁড়ানো ছাড়াও মুখে আগুন নিয়ে খেলা ইত্যাদি বাঁশ পূজা উপলক্ষ্যে মদনকামের ভক্তাগণ প্রদর্শন করেন। জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বারকোদালী গ্রামের বাঁশ খেলা উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ করা যায় এই খেলার দর্শক হিসেবে কোন নারী এবং শিশু উপস্থিত থাকেন না।

কালী খেলা ঃ

জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমা ও হলদিবাড়ী ব্লকেই এই খেলার প্রচলন বেশী। ধর্মীয় ভাবনা ও লোকবিশ্বাস এই খেলার উৎসমূলে আছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় হলদিবাড়ীর ফিরিঙ্গিডাঙ্গায় মানত উপলক্ষ্যে কোন কোন ব্যক্তি মুখে কৃত্রিম জিভ লাগিয়ে সর্বাঙ্গে কালি মেখে এক হাতে দা ও অন্য হাতে মাণসা নিয়ে চামুন্ডা কালীর মূর্তি ধারণ করে ঢাকের তালে তালে নেচে নেচে মাগন তোলেন। সঙ্গে থাকে শিশু শিব-পার্বতী। এটাই হলদিবাড়ীর বিভিন্ন গ্রামে 'কালী খেলা' নামে পরিচিত।

মথন/দধিকাদো/নারকেল খেলা ঃ

শ্রাবণ, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণের কাছে ঐ দিনটি পবিত্র বলে পরিচিত। এই উপলক্ষ্যে কোচবিহার জেলার প্রায় সকল গ্রামে কর্দমাক্ত স্থানে নারকেল সহযোগে যে লোকক্রীড়ার অনুষ্ঠান হতে দেখা যায় তাকেই কোচবিহারে বলা হয় 'নারকেল খেলা' বা 'মথন খেলা'। "পশ্চিম দিনাজপুরের কামারতোড় গ্রামে প্রতি বছর পালিয়া সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ নারকেল খেলা উৎসব পালন করেন।"[৬] গ্রামের হরিমন্দির, পাট, ধাম নামক স্থানে কখনও বা খোলা মাঠে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির নামের সঙ্গে খেলা কথাটি যোগ হওয়ায় এটি ধর্মীয় আবেগে আবর্তিত হলেও গ্রামাঞ্চলে অনেকটা সার্বজনীন ও অ-সাম্প্রদায়িক রূপ পেয়েছে। এই খেলায় দেখা যায় পৌরাণিক কৃষ্ণ এখানে লৌকিক বা গ্রামীণ সমাজে রাখাল বালক রূপে আবির্ভূত হন। অর্থাৎ কৃষ্ণ এখানে কোন কৃষক পরিবারের গ্রাম্য যুবক। কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার কিসমতদশ গ্রামের বলরামের পাটে, মাঘপালা গ্রামের হরিমন্দির প্রাঙ্গণে, মেখলিগঞ্জ মহকুমার দেবত্রচালিত ঠাকুরবাড়ী প্রাঙ্গণে, তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ী ও নাটাবাড়ীর কদমতলা হরিমন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি বছর জন্মাষ্টমীর পরদিন স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় এবং পূর্ববঙ্গীয়দের একটি ধর্মীয় কৃত্য এই মথন খেলা। এই খেলায় শুধু ছেলেরাই অংশগ্রহণ করে। ২৬/৮/৯৮ ইং তারিখে জন্মাষ্টমীর পরদিন তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ী গ্রামে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমরা দেখতে পাই উক্ত গ্রামের দক্ষিণমুখী

হরি মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে পাশাপাশি সাতটি গর্ত খুড়ে কাদামাটি দিয়ে সাত খালের যমুনা তৈরী করা হয়—

এর পর প্রত্যেকটি ঘরে থাকে সাফলা ফুলের ঢ্যাপ, জাম্বুরা, তলমু (পেঁপে), মাঝখানে থাকে একটি ঝুনা নারকেল। এই নারকেলকে নিয়েই খেলার আকর্ষণ। স্থানীয় কীর্তনীয়াগণ লোকবাদ্যের, বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, দম্প, কড়কা, সানাই প্রভৃতির সাহায্যে প্রথমে বারমাসি নাম এবং পঞ্চতালে বাজনার মাধ্যমে সাতপাক পরিক্রমা করে খেলার সূচনা করেন। এ সময় যে গানটি করেন তা হল —

"গোপাল দধি মথন খেলেরে
যাদু খেলেরে
খেলিবারে মন
কোলারও ছাওয়া কান্দে
তাকে না দেন তন।"[৭]

জন্মাষ্টমীর এই খেলায় যেমন ছেলেরাই অংশগ্রহণ করে তেমনি মহকুমার নাটাবাড়ির কদমতলায় রাধা অষ্টমীর তিথিতে যে খেলা হয় সেখানে শুধু মেয়েরাই অংশ গ্রহণ করে। খেলার অভিব্যক্তিতে দেখা যায় সাত যমুনা, বাদ্যযন্ত্র ও কীর্তনের মাধ্যমে সাতপাকের পরিক্রমা চলতে থাকাকালীন শিশু ও কিশোরগণ দুই দিকে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় তাদের পোযাক থাকে খালি গা এবং পরনে হাফ প্যান্ট বা গামছার নেংটি। সাত-যমুনার পাড় ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুকুরের মাটিগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তৎক্ষণাৎ দুই পক্ষের খেলোয়াড় ঐ কল্পিত যমুনায় হুমরি খেয়ে পড়ে যে প্রথম নারকেলটি নিয়ে পাশের মন্দিরে নাড়ুগোপালের কাছে পৌঁছাতে পারে। যে দল নারকেল নিয়ে মন্দিরে গিয়ে প্রথম পৌঁছবে সে দলই বিজয়ী বলে ঘোষিত হয়। খেলার শেষটাতে এর আদল হুড়োহুড়ি কুস্তির মাধ্যমে অনেকটা কাদা খেলায় পর্যবসিত হয়।

পেন্টি খেলা ঃ

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার অনেক গ্রামেই বিশেষ করে খড়খড়িয়া গ্রামে মেয়েদের পরিবর্তে পুরুষরাই বৃষ্টি কামনায় একটি খেলার আয়োজন করেন যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'পেন্টি খেলা'। খেলাটি দিনের বেলায় অনুষ্ঠিত হয়। লাঠি, লাঙ্গল, জোয়াল নিয়ে কৃষি

কাজের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও খেলা দেখিয়ে মাগন সংগ্রহ করেন স্থানীয় গ্রামবাসী যুবকগণ। মূল উৎসবের দিন ইন্দ্রদেবের নামে ধ্বজা পূজা দেন। এটি নারী বর্জিত সম্পূর্ণ পুরুষ কর্তৃক পালিত একমাত্র বৃষ্টি আহ্বানমূলক অনুষ্ঠান। এখানেও ঢাকের বাজনা অপরিহার্য।

বিবাহ উপলক্ষ্যে খেলা ঃ

বিয়ে উপলক্ষ্যে প্রায় সকল দেশেই বৈবাহিক লোকাচারে কিছু খেলার প্রচলন আছে। কোচবিহার জেলার প্রায় সর্বত্রই সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই বৈবাহিক মূল অনুষ্ঠানের পর যে খেলাগুলির প্রচলন আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জল খেলা, কড়ি খেলা, আংটি খেলা, গুয়াফাটা খেলা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশা খেলা।

জল খেলা ঃ

কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী ও পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের মধ্যে বিয়ের মূল অনুষ্ঠানের দিন কন্যাদান বা সম্প্রদান হয়ে যাওয়ার পর বর ও কনেকে ঘিরে আই বৈরাতি বা এয়োরা যে খেলাটি পরিচালনা করেন সেটি হল "জল খেলা"। এটি অনুষ্ঠিত হয় ঘরে। বরকনে গাঁটছড়া বাঁধার পর ঘরে এসে বসেন। এয়োতি এবং আত্মীয়-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে এই খেলার পরিবেশ রচনা করেন। মূল উপকরণ কালো পাথরের থালার মধ্যে এয়োতিগণ জল দিয়ে ভরে দেন। হাত দিয়ে জল ঘুরিয়ে মুকুটের দুটি টুকরো অংশ জলে ফেলে দেওয়া হয়। তার পর দুটি টুকরো যদি একসঙ্গে জুড়ে যায় তখন তার অর্থ হয় এই নব-দম্পতি সুখে ঘর বাঁধবেন। কোন কোন সময় দুটি টুকরো একসঙ্গে জোড়া না বাঁধলে বারবার জল ঘুরিয়ে জোড়া বাঁধাবার চেষ্টা করা হয়। এয়োতিদের সঙ্গে বর ও কনেকে একাদিক্রমে আঙ্গুল দিয়ে জল ঘোরাতে হয়। এই জল ঘোরাতে হবে সব সময় ঘড়ির গতির বিপরীত দিকে। বিয়ের পর এই লোকাচারটি খেলার আঙ্গিকে অনুষ্ঠিত হলেও এর পেছনে আছে নবদম্পতির ভাবী জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা।

কড়ি খেলা ঃ

জেলার বর্ণহিন্দু ও স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ের পর কড়ি খেলাকে একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বলে মনে করা হয়। এ খেলাও বিয়ের অব্যবহিত পরে গৃহে প্রবেশ করার পর শীতল পাটিতে বসে বর ও বধূ আত্মীয়-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে এই খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। এ খেলার কৃতিত্ব কড়ির চিৎ-উপুর ধরে নিয়েই নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ বর ও কনের মধ্যে যার কড়ি সবচেয়ে বেশীবার চিৎ হয়ে থাকবে তার কৃতিত্ব বেশী। কড়ির সংখ্যা কোথাও সাত, পাঁচ, বারোটিও থাকে। হিন্দুর বিয়ে বাড়ি বর-বধূর বাসর ঘরের কড়ি খেলার ঐতিহ্য প্রাচীন। অনেকে কড়ি খেলায় "হলুদ মাখানো চাল ও একুশটি কড়ি সুচিত্রিত একটি হাড়িতে পুরে বর ও বধূর সম্মুখে রাখেন। বর তখন হাড়ির সরা বা ঢাকনা সরিয়ে পাটির ওপর চাল বা কড়ি ছড়িয়ে দেয়; বধূ তা কুড়িয়ে রাখে। পরের বার নববধূ চাল বা কড়ি ছড়িয়ে দেয় বর তা কুড়িয়ে

রাখে। এভাবে তিন, পাঁচ, সাত বার খেলা চলে। তারপর উপস্থিত আত্মীয়স্বজনগণ জিজ্ঞাসা করেন কে জিতল, বর না বধূ? কন্যা পক্ষের মেয়েরা প্রথমেই বধূর জেতার কথা ঘোষণা করে। এ খেলায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কন্যা পক্ষই জয়ী হন।"[৮]

বিয়েতে কড়ি খেলার প্রচলন পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

আংটি চোরা খেলা :

বিয়ে উপলক্ষ্যে বৃহত্তর বঙ্গের মত কোচবিহার জেলাতেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই আংটি খেলার চল আছে। এ খেলাকে অনেকে পাশা খেলাও বলে। স্থানীয় রাজবংশী হিন্দুসমাজে বিয়ের দিন বাসর ঘরে শীতল পাটিতে বসে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। লুকোনো আংটিকে খুঁজে বার করাই হল বর ও কনের কৃতিত্ব। এক ধামা চালের মধ্যে কনে আংটি লুকিয়ে দিলে বরকে খুঁজে বের করতে হয়। আবার বর লুকিয়ে দিলে কনেকে তা খুঁজে বার করতে হয়। পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের মধ্যে বিয়ের পর দিন এই খেলাকে 'বাসি বিয়ের আংটি' খেলা বলা হয়। সে ক্ষেত্রে বাড়ির উঠোনের মাঝে চারটি কলাগাছ পুঁতে ছাদনা তলার মাঝে একটি আয়তাকার গর্ত করে জল ঢেলে পুকুর তৈরী করা হয়। জল ও কাদার মধ্যে এয়োতিগণের বুদ্ধিমত কনে আংটি লুকিয়ে রাখলে বরকে তা খুঁজে বের করতে হয়। এভাবে খেলা চলে পর্যায়ক্রমে।

গুয়োফাটা খেলা :

স্থানীয় রাজবংশী সমাজের বৈবাহিক অনুষ্ঠানের একটি জনপ্রিয় মাঙ্গলিক লোকাচার এই খেলা। বিয়ের পর বর ও কনে ঘরে এসে বসার পর তাদের হাতে দুটি কাঁচা সুপারী দিয়ে খালি হাতে ফাটাতে বলা হয়। সেই সুবাদেই এই খেলার নাম 'গুয়াফাটা খেলা'। বৈরাতিগণ দুটি সুপারির মধ্যে একটি আগেই ফাটিয়ে দিয়ে কন্যার হাতে দিয়ে ফাটাতে বলেন। আর আস্ত সুপারিটি বরকে দিয়ে ফাটাতে বলা হয় এবং না পারলে তার হার। যদিও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বর অবলীলাক্রমে খুব সহজেই খালি হাতে সুপারিটিকে ফাটান। এরূপ খেলার মধ্যে ধাঁধাঁর মত বরকে বলা হয়, একটি লম্বা বেগুনকে এক হাত দিয়ে এক বারে তিন টুকরো করতে। বুদ্ধিমান বর তখন একটি কাঁসার গ্লাস দিয়ে বেগুনটির মাঝ বরাবর আঘাত করে তিন টুকরো করেন। এরূপ খেলার সময় অনেক ক্ষেত্রেই বর ও কন্যাপক্ষের মধ্যে রঙ্গ-রসিকতার উচ্ছ্বাস শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

মুসলিম বিয়ের পাশা খেলা :

স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিয়ে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন লোকাচারনির্ভর খেলার প্রচলন আছে। এদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পাশা খেলা। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয় বিয়ের পর দিন, বর ও কনে ছেলের বাড়িতে আসার পর। খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ঘরে দিনের বেলায়। ঘরের মধ্যে চারকোণা গর্ত খুঁড়ে জল দিয়ে পুকুর তৈরি করা হয়। এর পর জলের মধ্যে

খুচরো পয়সা দিয়ে বর ও কনেকে খুঁজে আনতে বলা হয়। বর ও কনের মধ্যে এক বারে যে বেশী পয়সা তুলে আনতে পারে তার জিৎ। যে কম পয়সা তুলে আনবে তার হার। বিয়ে উপলক্ষ্যে এই খেলাগুলির মধ্যে বুদ্ধিমত্তার চেয়ে বর ও কন্যাপক্ষের তাৎক্ষণিক আনন্দ ও রসিকতার প্রকাশ বেশী দেখা যায়। শহরাঞ্চলের বিয়ে বাড়িতে এ খেলার প্রচলন কম হলেও জেলার গ্রামের মানুষ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত, ধর্মীয় লোকাচারে মাঙ্গলিক এই অনুষ্ঠানগুলিকে এখনও মেনে চলেন। এর মূল কারণ বর ও কনের ভাবী জীবনের সুখ, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা।

জেলার লোকপ্রিয় লৌকিক খেলাধূলার বিশেষত্ব হল এখানে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদেরই প্রাধান্য বেশী। এক মাত্র ব্যতিক্রম বিয়ের লোকাচারনির্ভর আনুষ্ঠানিক খেলাগুলি। নান্দনিক বা শরীর চর্চামূলক যে খেলাই হোক সর্বত্রই পুরুষ প্রাধান্য চোখে পড়ে। এ কথা স্বীকার করতেই হবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ নির্ভর হয়ে মেয়েরা ইন্‌ডোর বা ঘরের খেলায় বেশী অভ্যস্ত। জেলার লোকক্রীড়ায় আমরা যেমন সমাজ ব্যবস্থা বা সামাজিক পরিবেশের কথা জানতে পারি তেমনি "মোগল পাঠানের" মত খেলায় দেখতে পাই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি। বক্ষ্যমান এই আলোচনায় উল্লেখিত অনেক খেলা সমগ্র উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও বাংলাদেশের মত পার্শ্ববর্তী দেশ এবং জলপাইগুড়ি জেলায় সমান ভাবে প্রচলিত। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে এখানে লোকাচারনির্ভর আনুষ্ঠানিক খেলাগুলি, যেমন— নারকেল খেলা, কড়ি খেলা, লাঠি খেলা, গমীরা খেলা ইত্যাদি প্রায় কালের গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ধর্মীয় অনুষঙ্গের খেলাগুলি আজও গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মেলা ঃ

ভূমিকা ঃ

নদীমাতৃক কৃষিপ্রধান কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলে সারা বছর অনুষ্ঠিত হয় শতাধিক মেলা। এই প্রসঙ্গে বলা যায় জেলার এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে কোন না কোন তিথিতে কোন উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয় না। জেলার পাঁচটি মহকুমায় একই সঙ্গে পূজা-পার্বণ ও মেলার প্রচলন হয় নি, কারণ স্থান ভেদে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, আদিবাসী জনগণ তাদের সংস্কার, লোকায়ত বিশ্বাস, লোকাচার, ধর্মীয় আচার, সহনশীলতার স্থানীয় এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, একই ভাবে সর্বত্র আত্মীকরণের বিশেষ প্রক্রিয়ায় একীভূত হয়ে একই সঙ্গে বিভিন্ন গ্রাম ও গঞ্জে বিস্তার লাভ করে নি।

কোচবিহার জেলায় অনুষ্ঠিত মেলাগুলির মধ্যে দুটি রূপ দেখা যায়, একটি ধর্ম নিরপেক্ষ অপরটি ধর্মীয় অনুষঙ্গের মেলা। জেলার দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ, সদর মহকুমা এবং হলদিবাড়ী ব্লকে বিভিন্ন লৌকিক শাস্ত্রীয় দেবদেবী ও নদীকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত

হয় বিভিন্ন মেলা। এর মধ্যে কোনটি স্বল্পস্থায়ী, কোনটি দীর্ঘস্থায়ী হয়। কোনটি এক দিন কোনটি আবার তিন দিন, পাঁচ দিন, পনেরো দিনও স্থায়ী হয়। কোন কোন মেলা শতাধিক বছরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। জেলার মেলাগুলির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— এর মধ্যেই প্রকাশ পায় কৃষিনির্ভর, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক চরিত্র ধর্ম। মেলাগুলির বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে চোখে পড়ে কৃষিকর্মের উপযোগী উপকরণ ও সরঞ্জাম। এই জেলায় অনুষ্ঠিত গ্রামীণ মেলাগুলির একটি বড় উপকরণ হল 'জুয়া'। আজও অনেক প্রাচীন মেলায় এর অস্তিত্ব বিরাজমান। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৮৭০ সনে তাঁর রাজ সরকারের আইন বলে এই জুয়াকে নিষিদ্ধ করলেও বর্তমানে এই খেলা অনেক মেলায় গোপনে চালু রয়েছে। কোচবিহারের ইতিহাস সম্বলিত বিভিন্ন গ্রন্থে কোচবিহার সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য থাকলেও মেলা সম্পর্কে সবাই নীরব। একমাত্র ব্যতিক্রম খান চৌধুরী আমানতুল্লার কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খন্ড), W.W. Hunter সাহেবের Statistical Account of Bengal, V (X) এবং হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর Cooch Behar State and it's Land Revenue Settlements, অশোক মিত্রের "পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা" গ্রন্থ চারটি। এঁদের গ্রন্থ চারটিতে কোচবিহারের কিছু প্রাচীন মেলার উল্লেখ আছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কৃষ্টির গুরুত্ব বিচার করে ধর্ম নিরপেক্ষ মেলাও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় এখানে। যেমন— সখীরমেলা, কৃষিমেলা, বইমেলা ইত্যাদি। এছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর পরিচালিত লোকসংস্কৃতি উৎসব ও মেলা। জেলার মেখলীগঞ্জ মহকুমার নিজতরফ ও দেবীরডাঙা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় কাঠাম মেলা যা কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির এক বিরল নিদর্শন। আবার কিছু মেলা অনুষ্ঠিত হয় ব্যক্তি মানুষের মাহাত্ম্য, আবির্ভাব ও তিরোধান তিথিকে স্মরণ করে। জেলার শতাধিক বছরেব প্রাচীন মেলাগুলি হল— কোচবিহারের রাস মেলা, তুফানগঞ্জ মহকুমার দোল মেলা, তুফানগঞ্জের ঘোগারকুঠি গ্রামের দরিয়াবলাই-এর স্নান মেলা, নাটাবাড়ী পানিশালা গ্রামের কালজানি ও গদাধরের সংযোগস্থলে চৈত্র মাসের আশোকাষ্টমীর স্নান মেলা।

ধর্মনিরপেক্ষ মেলার মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতি ও কৃষিনির্ভর মেলা ও উৎসবগুলি সাধারণত জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তা ও রুচিবোধের উপর নির্ভর করে অনুষ্ঠিত হয়। মেলার উৎস মূলে ধর্মীয় ভাবনা থাকলেও ধর্মকে ছাড়িয়ে এখানে সব মেলাই হয়ে ওঠে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মিলন মেলা।

কোচবিহারের লোকজীবন চৈত্রের সংক্রান্তিতে চৈত চড়ক বা গমীরা খেলায় মেতে ওঠে, কখনও বা বানফোর, আগুনঝাঁপের মত বীভৎস খেলায় উদ্দীপিত হয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীগণকে আনন্দ দান করে— দোল পূর্ণিমায় গোপীবল্লভ মদনমোহনকে কাঁধে নিয়ে উন্মুক্ত ধানক্ষেতে হাজির হন সওয়ারী সেজে। আবার ঐ একই মানুষ ভাদ্র মাসের বৃহস্পতিবারে পুকুর বা জলাশয়ে খোয়াজ পীরের বেড়া ভাসিয়ে আনন্দ ও তৃপ্তি পান, যদিও এই অনুষ্ঠানটি বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত।

প্রাক আর্য সমাজের ধারক ও বাহক কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মদনকামের বাঁশ পূজা বা বাঁশ খেলা নামক লোক উৎসবে আজও দেখা যায় আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের অভিব্যক্তি।

কোচবিহার জেলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উল্লেখযোগ্য মেলাগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

রাসমেলা ঃ

জেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত শতাধিক বছরের প্রাচীন মদনমোহন বাড়ীর রাধাবিহীন গোপীবল্লভকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয় রাসযাত্রা ও রাসমেলা। কোচবিহারের লৌকিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই মেলা। এই মেলার উৎস সম্পর্কে জয়নাথ মুন্সীর রাজোপাখ্যান গ্রন্থের প্রত্যক্ষ খন্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে— বাংলা ১২১৯ সালে (ইংরেজী ১৮১২ খ্রীঃ) রাজবাড়ীতে ভূতের উপদ্রব হওয়ায় মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর রাজধানী সিঙ্গিজানী-মওয়ামারী দুই তালুকের মধ্যবর্তী ভেটাগুড়ি নামক নদীর ছাড়ার মধ্যে নূতন রাজধানী ও অতি সুন্দর রাজবাড়ী নির্মাণ করেন। রাজপ্রাসাদ, মন্ত্রীর অট্টালিকা ও নানা প্রকার বিচিত্র মন্দিরও নির্মিত হয় এখানে। তৎকালীন বেহার নিবাসী বহু মানুষও এখানে বাসস্থান নির্মাণ করেন। অগ্রহায়ণ মাসের কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রার দিন সন্ধ্যার গোধূলি মুহূর্তে রাজা স্বজনসহ এই নূতন গৃহে প্রবেশ করেন। শত শত মানুষ অশ্ব ও গজে আরোহণ করে এতদঞ্চলে হাজির হন। এই উপলক্ষ্যে রাজার এই নূতন গৃহে যাত্রাই রাসযাত্রা নামে চিহ্নিত হয়।

"মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের গৃহপ্রবেশের এই দিন উক্ত অঞ্চলে সমাগমকেই রাসমেলার প্রথম সূচনা বলে মনে করা হলেও এই মেলার প্রকৃত কলেবর বৃদ্ধি এবং সাড়ম্বর জন সমাগম শুরু হয় ১৮৯৮-১৮৯৯ সন থেকে। ১৮৯৮-৯৯ সনের কোচবিহার রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে বলা আছে মদনমোহন ঠাকুরের রাসযাত্রা জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু এ রাজ্যের পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে বহু মানুষ এই মেলা দেখতে আসেন, মহারাজা বাহাদুর এজন্য অতিরিক্ত এক হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের দ্বারা তৈরী দেব-দেবীর মাটির মূর্তি দিয়ে ঠাকুরবাড়ীকে সাজানো হয়। এই উপলক্ষ্যে যাত্রা-গানও হয়। ঠাকুরবাড়ীর সামনে আট দিন ধরে বাজার বসে। প্রায় ত্রিশ হাজার লোক উৎসবে যোগদান করেন।"[৯]

শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই মেলার প্রধান আকর্ষণ হল এই 'রাসচক্রটি'। ধর্মীয় সংস্কৃতি ও লোকায়ত বিশ্বাসের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল রাসমেলায় 'সর্ণা' প্রথা। কোচবিহার রাজ আমল থেকে এই প্রথার প্রচলন ছিল। এই প্রথাটি হল রাস উৎসবের তৃতীয় দিনে দুপুর বেলায়

কয়েক ঘন্টার জন্য মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে পুরুষ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কেবলমাত্র মেয়েদেরই প্রবেশাধিকার ছিল ঐ সময়ে। এক সময় সম্পূর্ণ মেলাতেও একটা সময় নির্দিষ্ট ছিল যখন মহিলা ভিন্ন কোন পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। মদনমোহনবাড়ীর সর্ণা প্রথা আজ নেই কিন্তু এর মূল প্রাঙ্গণে এখনও রাস পূর্ণিমা থেকে চার পাঁচ দিন ধরে ভাগবত পাঠ, কীর্তন, নামগান জাতীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, যার দর্শক ও শ্রোতা হিসেবে সিংহ ভাগ থাকেন মহিলারাই। কোচবিহারের রাসমেলার একটি প্রাচীন লোকায়ত প্রথা ছিল মেলায় আগত পুণ্যার্থীরা মেলা প্রাঙ্গণেই কনে দেখার কাজটি সেরে নিতেন। মেলাতেই বামনহাটের বর পছন্দ করে নিতেন আসামের, ধুবরীর কনেকে। আবার নিজতরফ গ্রামের কোন গৃহবধূ তাঁর কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে আনন্দে বিহুল হয়ে উঠতেন। প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন এই রাসমেলায় যেমন আসেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ তেমনি আসেন মুসলিম, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরাগী মানুষও।

শিবরাত্রির মেলা (বানেশ্বর) ঃ

কোচবিহার শহর থেকে বারো কিলোমিটার উত্তরে বানেশ্বর গ্রামে শিব চতুর্দশী তিথিতে বানেশ্বর শিবের পূজা উপলক্ষ্যে মহা সমারোহে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার স্থিতিকাল সাত দিন। মানত ও মনস্কামনা পুরণের জন্য ভক্তগণ পাঁঠা, পায়রা ও খাসি উৎসর্গ করেন। এখানকার আসুবিক পদ্ধতিতে বলির প্রথা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাঁঠা বা খাসি আছাড় মেরে, ঘাড় মচকে, মাথায় খিল ঠুকে রক্তপাতহীন ভাবে মেরে দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়। উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য প্রাচীন এই শৈব তীর্থের বানেশ্বর শিব সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস ও কিংবদন্তী হল বানেশ্বর শিব করুণাময় এবং জাগ্রত। মনস্কামনা পুরণের জন্য এঁর কাছে মানত করলে সকল রকম মনোবাঞ্ছা পুরণ হয়। বাৎসরিক এই তিথি ছাড়াও সারা বছর নিত্য পূজায় বহু দূর থেকে ভক্ত সমাবেশ ঘটে। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশের পরেই এই মেলার স্থান। প্রকৃতপক্ষে মেলার প্রতিষ্ঠাকাল নিশ্চিতভাবে বলা শক্ত। ১৯২৩-২৪ সনে রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রথম এই মেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মেলার উল্লেখযোগ্য বিক্রয় পণ্য লোকায়ত মৃৎ শিল্পের সম্ভার।

জেলার সদরের পাঁচ মাইল দক্ষিণে ধলুয়াবাড়ি অঞ্চলে মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধনাথ শিবমন্দির প্রাঙ্গণেও এই একই তিথিতে বহু মানুষের সমাগমে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তবে বানেশ্বরের মেলার তুলনায় এই মেলা অনেক অর্বাচীন। দিনহাটা মহকুমায়ও শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এক মাস ব্যাপী একটি মেলা বসে। মাথাভাঙ্গা মহকুমার কেন্দ্রস্থলেও প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে শিবরাত্রি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রাচীন ষণ্ডেশ্বর ও দামেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত শতাধিক বছরের প্রাচীন শিবরাত্রির মেলা।

কালী পূজার মেলা ঃ

কালী পূজাকে উপলক্ষ্য করে কোচবিহার জেলায় বর্তমানে কয়েক লক্ষ লোকের সমাগমে উল্লেখযোগ্য এক মেলা অনুষ্ঠিত হয় দিনহাটা মহকুমার বামনহাট অঞ্চলে। অবিভক্ত বাংলার মাধাইখাল অঞ্চলের ভদ্রকালী স্থানান্তরিত হয়ে এখানে পূজিত হন ১৩৫৯ সন থেকে। বিগত ৩/৪/৯৯ ইং তারিখের এই মেলার ক্ষেত্র-সমীক্ষায় এক সাক্ষাৎকারে মেলা কমিটির বর্তমান সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ বর্মন জানান— "বাংলাদেশের রঙপুর জেলার কুড়িগ্রামের পূজারী খড়্গনাথ বর্মন এই কালী বিগ্রহ এখানে প্রতিষ্ঠা করেন।" এখানকার পূজা ও মেলার স্থিতিকাল ১২ দিন। ১৩৫৯ সালে খড়ের ঘরে পূজা শুরু হলেও বর্তমানে দক্ষিণমুখী পাকা মন্দির। অশোকাষ্টমী তিথির পরের মঙ্গলবার অথবা শনিবার এ পূজা ও মেলার আরম্ভ। পূজার আট দিনের মাথায় মহিষ বলি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমানে দুশো একর জমির উপর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃষিজ সরঞ্জাম, বাঁশ ও কাঠের আসবাবপত্র এবং শাঁখা। বর্তমান পূজারী আদ্যনাথ ভাগবতী এবং ভোংরিয়া দেবেন্দ্রনাথ বর্মন। প্রতিমার উচ্চতা একুশ হাত। মেলায় আধুনিক বিনোদনের সঙ্গে কুষান ও দোতরা গানের আয়োজনও করা হয়। সমগ্র উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য এই কালী পূজার মেলার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিবাহিতা রমণীগণ কালী প্রণাম করে শাঁখা পরেন। এই সুবাদে মেলায় বিক্রয় পণ্যদ্রব্যের মধ্যে শতাধিক শাঁখার দোকানের প্রাধান্য চোখে পড়ে।

জেলার অপর উল্লেখযোগ্য কালীপূজার মেলা হল তুফানগঞ্জ মহকুমার শালডাঙা গ্রামের বারো হাত কালী পূজার মেলা। পূজা হয় প্রতি বছর চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে। এটিও মাধাই খালের কালী পূজার মেলার মত উল্লেখযোগ্য 'মাইগ্রেটেড' মেলা। এমনি আর এক স্থানান্তরিত মেলা হল তুফানগঞ্জ ২ নং ব্লকের (বক্‌সির হাট) অন্তর্গত পলিকা গ্রামের মনস্কামনা কালী পূজার মেলা। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার দিন এই কালীপূজা উপলক্ষ্যে লক্ষ মানুষের সমাবেশে এক দিনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার ভণ্ডেশ্বর গ্রামের নাথ যোগী সম্প্রদায় এই অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়ে ১৩৬০ সালের মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে প্রথম মেলার সূচনা করেন। টাঙ্গাইল অঞ্চলের লোকবিশ্বাস এবং এতদঞ্চলের রাজবংশী সম্প্রদায়ের লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে এই মেলার সৃষ্টি হয়। পলিকা মেলার ২০ বছর পূর্তিতে ১৩৮১ সন থেকে এই দেবস্থানের নাম হয় মনস্কামনা মন্দির। এই মেলার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং জনশ্রুতি হল মন্দির সংলগ্ন পোয়াতি বিলে স্নান করে মনস্কামনা কালী মন্দিরে পূজা দিলে নিঃসন্তান বন্ধ্যা রমণীগণ সন্তান লাভ করেন। এই লোকায়ত বিশ্বাসের ফলেই আসাম ও বাংলার সীমান্তবর্তী এই গ্রামের মেলায় ছুটে আসেন হাজার হাজার সন্তানকামী মানুষ তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করতে। জেলার অপর এক প্রাচীন মেলা হল দিনহাটা মহকুমার বাউসমারী গ্রামে পুরনো কালীবাড়ীর সিদ্ধেশ্বরী মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বাউসমারী কালীপূজার মেলা। এই গ্রামের

কালীর প্রতিষ্ঠা বহু প্রাচীন হলেও মেলা শুরু হয় অনেক পরে। প্রতি বছর দোল পূর্ণিমার পরের শনিবার সিদ্ধেশ্বরী কালীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষ্যে সাত দিনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

সখীর মেলা ঃ

এই জেলার দিনহাটা মহকুমার অন্তর্গত নগর ভাঙ্নি গ্রামে প্রতি বছর চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমী তিথিতে শিব, অন্নপূর্ণা, মাসান ও শীতলার মন্দির প্রাঙ্গণে যে এক দিনের মেলা বসে তার নাম সখীর মেলা। ধর্মীয় অনুষঙ্গে মেলার সৃষ্টি হলেও এর বহিরঙ্গ রূপে দেখা যায় এই মেলা আত্মীয়তা, সখী পাতানো বা বন্ধুত্বের মেলা। শুধু উত্তরবঙ্গেই নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এরূপ বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তা উপলক্ষ্যে সৃষ্ট মেলার কথা শোনা যায় না। প্রতি বছর অশোকাষ্টমী তিথিতে অগণিত যুবক-যুবতী, বিবাহিত নারী-পুরুষগণ মাসান, শীতলা, অন্নপূর্ণার থানে পূজা দিয়ে হাতে পান-সুপারী ও বাতাসা নিয়ে পরস্পরের হাত ধরে মন্দির সংলগ্ন পুকুরে ডুব দিয়ে চিরদিনের মত সখীত্বের বা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর পর উভয়ে উভয়ের মুখে দই, মিষ্টি, পান সুপারী তুলে দেন। এ ব্যাপারে কোন পূজারী বা মন্ত্রপাঠের প্রয়োজন হয় না। এভাবে আত্মীয়তা সৃষ্টির পর উভয়ে উভয়ের প্রতি নিকট আত্মীয়ের মত অবশ্য কর্তব্য করেন এবং একে অন্যের পিতা মাতাকে তাওয়ই ও মাওয়ই বলে সম্বোধন করেন।

আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই এই মেলায় দেখা যায়। বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক সংকটের যুগে সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করলে এরূপ মেলার গুরুত্ব অপরিসীম।

হুন্ডার মেলা ঃ

কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার সিতাই ব্লকের চামটা গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের মধ্যে প্রতি বছর অশোকাষ্টমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় এই হুন্ডার মেলা। বর্তমান মেলা কমিটির সম্পাদক বিগত ৪/৪/৯৯ ইং তারিখে মেলা প্রাঙ্গণে এক সাক্ষাৎকারে জানান— "এই চামটা গ্রামে মেলা শুরু হয় ১৯৭৯ সাল থেকে। মেলার প্রকৃত নাম 'ধূমদাহপাড় অশোকাষ্টমী মেলা'। কিন্তু লোকমুখে বিকৃতির ফলে এই মেলার নাম 'ধুন্দার বা হুন্ডার মেলা' নামে পরিচিত হয়।" বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলের এই গ্রামীণ মেলার মূল আরাধ্য দেবতা হনুমান, জলুয়া মাসান ও কালী। মেলার স্থিতিকাল ১০ বা ১৫ দিন। বর্তমান মেলা কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বর্মন ও গজেন্দ্রনাথ বর্মন মেলা ও দেবস্থান শুরু সম্পর্কে এক অলৌকিক ঘটনাব কথা জানান। এঁদের মতে মেজর সন্তোষ সিং নামে এক সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষী এক সময় এই মেলাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সেদিন তিনি ক্যাম্পে ফেরার পর তাঁর রক্ত বমি শুরু হয়। এই ঘটনা সবাই জানার পর স্থানীয় গ্রামবাসীদের অনুরোধে তিনি বাবা হনুমানের স্থানে পূজা দেন এবং মেজর সন্তোষ সিং আরোগ্য লাভ করেন।

বাংলাদেশের বহু মানুষ এই মেলায় দর্শনার্থী হিসেবে আসেন। বর্তমান মেলা প্রাঙ্গণের মাসান দেবতার পূজারী আসামের নলবাড়ি অঞ্চলের বিমলেন্দু দেবশর্মা তিন পুরুষ ধরে এখানে পূজা করেন। তাঁর মতে এই মাসান ও শীতলা, কালী মন্দির সংলগ্ন জলাশয়ে পূর্বে গ্রামবাসীগণ সোনার চালুনবাতি দেখতেন। এই মেলার উৎপত্তি সম্পর্কে একটি লোকশ্রুতি স্থানীয় গ্রামবাসী ও মেলার বর্তমান উদ্যোগী ধীরেন্দ্রনাথ বর্মন এক সাক্ষাৎকারে জানান— "বর্তমান মেলার স্থানসংলগ্ন একটি 'কুড়া' ছিল। তাতে গ্রামবাসীগণ দেখতেন সোনার চালুনবাতি ভেসে বেড়াত। সেই দেখে গ্রামের মানুষ বিয়ের সময় এই চালুনবাতি প্রার্থনা করেন এবং বাড়ী নিয়ে যান। বিয়ের পর্ব শেষ হলে আবার সেই কুড়াতে ফেলে দিয়ে আসতেন"[১০]

বাংলাদেশের টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ অঞ্চলেও এরূপ চালুনবাতির কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ক্ষেত্রানুসন্ধানে আমাদের মনে হয় এটি একটি পূর্ববঙ্গীয় স্থানান্তরিত (মাইগ্রেটেড) লোকবিশ্বাস। এই মেলায় উল্লেখযোগ্য হল মেলায় কেউ কোন মুরগীর মাংস আহার করতে পারেন না। স্থানীয় শিল্পী চামটা ডাকঘরের অন্তর্গত সাতভান্ডারী গ্রামের কন্টেশ্বর বর্মনের মৃৎ শিল্পের একক প্রদর্শনী এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ।

দোলমেলা ঃ

নতুন শস্যের প্রত্যাশা, বসন্তের মদন উৎসব এবং নববর্ষের আহ্বান এসব কিছুকে মিলেই জেলার বিভিন্ন মহকুমায় গোপীবল্লভ মদনমোহন বিগ্রহকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয় দোল উৎসব ও মেলা। জেলার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী দোলমেলা হল তুফানগঞ্জ মহকুমার দোলমেলা। মহকুমার এই গ্রামীণ শহরে অনুষ্ঠিত শতাধিক বছরের প্রাচীন এই মেলার নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। ১৮৯২ সনের ১৫ই জুন মহকুমা প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই মেলার শুরু। পূর্বে নাম ছিল 'ফুলবাড়ি দোলমেলা'। শুরুতে ৭ দিনের মেলা হলেও বর্তমানে মেলার স্থিতিকাল ১৫ দিন। একদা তুফানগঞ্জ শহরের নানা বৈচিত্র্য, প্রাচীনত্ব, লোকসংস্কৃতির আদান-প্রদান, পণ্যের কেনাবেচা প্রভৃতি বৈচিত্র্যের সমাবেশে মহকুমার এই মেলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমানে এই দোলমেলার পূর্বেকার জৌলুস আর নেই। রায়ডাক নদীর গতি পরিবর্তনে এই মেলার স্থান পরিবর্তন হয়েছে বহুবার।

১৮৯৩ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ই.ই. ল্যুইস সাহেবের ফুলবাড়ি পরিদর্শনান্তে তৎকালীন দেওয়ানের সুপারিশক্রমে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক ফুলবাড়িতে গিরিধারী গোপীবল্লভ মন্দির নির্মিত হয়। বর্তমান রাণীরহাট বন্দরের উত্তর-পূর্ব কোণে এক উঁচু ঢিবির উপর তুফানগঞ্জ মহকুমা নামক গ্রামীণ শহরের মানুষ এই মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় উদীপ্ত হয়ে ওঠেন। সে সময় এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজকোষ

থেকে মঞ্জুর করা হয় ৩৫০ টাকা। এই বিগ্রহ দুটিকে প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গেই দোলপূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে মন্দির সংলগ্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছিল এক মেলার। লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব আজ বিলীয়মান। তুফানগঞ্জ দোলমেলা সম্পর্কে দেওয়ান কালিকাদাস দত্ত তাঁর রিপোর্টে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণকে জানিয়ে ছিলেন— "The people fully appreciated the kindness and large number of them assembled to do honour to thakurs. This took place on the occasion of the Doljatra. A fair was held and great enthusiasm was displayed."[১১]

দেওয়ান সাহেবের এই রিপোর্টের পবিপেক্ষিতেই তুফানগঞ্জ দোলমেলার প্রতিষ্ঠাকাল হিসাবে আমরা ১৮৯৩ সনকে মেনে নিতে পারি। তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল তুফানগঞ্জ দোলমেলা। পূর্বে এই মেলায় বাংলাদেশ, আসাম ও ভুটানের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বিক্রয়যোগ্য পণ্য নিয়ে হাজির হতেন ব্যবসায়ীগণ। এক সময় এই দোলমেলায় বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে গরু ও ঘোড়াও ছিল। "তুফানগঞ্জ দোলমেলার আঞ্চলিক ও গ্রামীণ চালচিত্র ফুটে ওঠে ১৯১৪ সনের ২৬শে জানুয়ারী কোচবিহার গেজেটে প্রকাশিত মেলা সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে। বর্তমান বর্ষে চাষী প্রজাদের অভাব অনটন দূরীকরণের জন্য শালকাঠ নির্মিত লাঙ্গলের ঈশ, লাঙ্গল, জোয়াল প্রভৃতি কৃষিকর্মের উপযোগী বহু দ্রব্য আমদানীর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।"[১২]

জেলার অন্যান্য মেলার মত এই মেলাও ইজারাদারের মাধ্যমে ডাক হয় এবং বিনোদনের উপকরণ হিসেবে মেলার মূল মদনমোহন প্রাঙ্গণে দোত্‌রা, কুষান, পালাগান ও কীর্তন এবং কবিগানের অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য আজও অটুট আছে। এই মেলার প্রধান আরাধ্য দেবতা গোপীবল্লভ মদনমোহন। দোল পূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে বুড়ির ঘর পোড়ানো নামক বহ্নি উৎসবের দিন থেকে পঞ্চমদোল পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণের অস্থায়ী মন্দিরে সাময়িকভাবে অবস্থান করেন এবং পূজিত হন গোপীবল্লভ মদনমোহন। এ সময়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সহযোগিতা করেন। ১৯৮০ সনের পর থেকে তুফানগঞ্জ দোলমেলা স্থানীয় পৌর এলাকার পূর্ব প্রান্তে রায়ডাক নদীর চড়ে কামাতফুলবাড়ি মৌজায় প্রায় কুড়ি বিঘা জমির উপর অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই মেলা তুফানগঞ্জ পৌরসভা, তুফানগঞ্জ ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি, নাককাটিগাছ ১ নং অঞ্চলের সৌজন্যে ও তুফানগঞ্জ দোলমেলা কমিটির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

জেলার দিনহাটা মহকুমার বামনহাট অঞ্চলের লাহিড়ী পরিবারের রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহকে কেন্দ্র করে শতাধিক বছরের প্রাচীন দোল উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও তুফানগঞ্জ মহকুমার জোড়াইতে (রামপুর ১ নং অঞ্চল) শতাধিক বছরের প্রাচীন দোলমেলা আজও অনুষ্ঠিত হয়।

স্নান মেলা :

সমগ্র কোচবিহার জেলায় যে মেলা ও উৎসব উপলক্ষে ব্যাপক সমাগম সৃষ্টি হয় সেটি হল চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমী তিথির পুণ্যস্নান। শাস্ত্র অনুযায়ী এদিন ব্রহ্মপুত্র স্নানে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি এবং সর্বপাপ নাশ হয়। কোচবিহারের স্থানীয় মানুষের বংশানুক্রমিক অখন্ড বিশ্বাস গদাধর ও কালজানি নদীতে উক্ত তিথিতে স্নান করলে বিগত জন্মের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

দিনহাটা মহকুমার নিগমনগর অঞ্চলের বানিয়াদহ নদীর ধারে অশোকাষ্টমী তিথি উপলক্ষ্যে বাসন্তী ও জলুয়া মাসানের পূজাকে কেন্দ্র করে স্নান মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং কিসমতদশ গ্রাম অঞ্চলের হোকদহ গ্রামের চৈতার ছড়া বিলের পশ্চিম প্রান্তে ও উত্তর প্রান্তে বাসন্তী ও যখা-যখীর মৃন্ময় মূর্তি পূজাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় একই তিথিতে স্নান মেলা। এই মহকুমার ভেটাগুড়ি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় বারুণী তিথিতে বারুণীর স্নান মেলা।

আশোকাষ্টমী স্নান মেলা :

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী ১ নং অঞ্চলের পানিশালা গ্রামে গদাধর ও কালজানি নদীর সঙ্গমস্থলে চৈত্র মাসের আশোকাষ্টমী তিথিতে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় জেলার প্রাচীনতম স্নান মেলা। কোচবিহারে শতাধিক বছরের প্রাচীন এই স্নান মেলাকে স্থানীয় মানুষ বড় অষ্টমী বা বুড়াগদাধরের স্নান বলে মনে করেন। এটি লোকায়ত উত্তরবঙ্গের অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্নান মেলা। গদাধর নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে জায়গীর চিলাখানা অভিমুখে ঘোগারকুঠি অঞ্চলে আর একটি স্নানমেলা অনুষ্ঠিত হয় যা কোচবিহারবাসীর কাছে দরিয়াবলাই বা ছোট অষ্টমী নামে পরিচিত।

এই মেলা দুটির মধ্যে কোচবিহারের কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনের সঙ্গে জড়িত সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষের কামনা-বাসনা প্রতিফলিত হয়েছে। সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে নদীভিত্তিক এরূপ স্নান মেলাগুলির ক্ষেত্র-সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে জেলার জনজীবনে অসীম প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে নদী কেন্দ্রিক এই মেলা ও উৎসবগুলি একদিকে যেমন আনন্দপূর্ণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে তেমনি সমৃদ্ধ করেছে জেলার লোকসংস্কৃতিকে। পানিশালা গ্রামের পুরনো এই গদাধর নদী বর্তমানে স্থানীয় মানুষের কাছে বুড়াগদাধর নামে পরিচিত। এই বুড়াগদাধরের পাশেই মেলা প্রাঙ্গণে একটি মন্দির অবস্থিত। যার মূল আরাধ্য দেবতা বুড়াগদাধর এবং শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ।

এই মেলারই অঙ্গ হিসেবে কালজানি নদীর পশ্চিম পাশে আর একটি মন্দিরে পূজিত হন মা-মহামায়ী। স্নান মেলায় আগত পুণ্যার্থীগণ ভক্তিভরে মনস্কামনা ও পুণ্যলাভের আশায় স্নান করে পূজা দেন এই দুই বিগ্রহের থানে। মেলার সূচনাকালের অবস্থান এখন আর নেই। মেলার অন্যতম বিশেষত্ব হল স্নানের পর দই, চিড়া, আঁটিয়া কলা আহার এবং মানত। মানত

হিসেবে পাঁঠা ও পায়রা মন্দিরে উৎসর্গ করেন এবং নদীতে উৎসর্গ করেন হাঁসের ডিম, নুন, বেল ও অশোকফুল। কালজানির দুই পাড়েই দুটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে এই মেলার স্থিতিকাল একদিন থাকলেও বর্তমানে তিনদিন। বর্তমান পশ্চিম পাড়ে মহামায়ীর মন্দির সংলগ্ন স্থানটি আমবাড়ি অঞ্চলের অন্তর্গত।

তুফানগঞ্জ মহকুমার পানিশালা গ্রামের এই স্নান মেলা সম্পর্কে প্রচলিত লোকশ্রুতি হল— "কোচবিহারের রাজাগণ এখানে হাতি নিয়ে শিকার করতে আসতেন এবং হাতি স্নান করানো হত এই নদীতেই। নিজেরাও স্নান করে দেবতার থানে পূজা দিয়ে মানত করতেন।" এই মেলার অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মৃত আত্মীয়ের অস্থি বিসর্জন এবং তর্পণ। স্নানের পর স্থানীয় অধিবাসীগণ গদাধর এবং রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন। বুড়াগদাধর এবং মাসানের নামে রাজবংশী ও রাভা সম্প্রদায়ের মানুষগণ বাতাসা, কলা, ডিম, লবণ, কবুতর, পাঁঠা ইত্যাদি নদীর জলে উৎসর্গ করেন।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে কিরাত সংস্কৃতি ও ফার্টালিটি কাল্ট-এর নিদর্শন হল এই প্রথা। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস চৈত্র মাসে বুড়াগদাধর শীর্ণ হলেও মেলার দিন কোন এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা কোথাও হাঁটু জল আবার কোথাও বুক পর্যন্ত জল হয় এবং এর জন্য কোন বৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয় বুড়া-গদাধরের 'সাইসকা'। চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমী তিথির ভোর থেকেই স্নান চলে এখানে সারাদিন পর্যন্ত। পুণ্যার্থীদের আগমন ঘটে মেলার আগের দিন থেকেই। বর্তমানে এই মেলা ডাক হয়। মেলার দিন সারা রাত ধরে নদীর দুই প্রান্তের মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহারের লোকায়ত কৃষ্টির কুষাণ, দোতরা পালা, পদাবলী ও কবিগান ইত্যাদি। মেলায় বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের মধ্যে কৃষিকাজের সরঞ্জাম, যেমন লাঙ্গল, জোয়াল, মই তেমনি গ্রামীণ হস্তশিল্প ও মৃৎ শিল্পের প্রাধান্য দেখা যায় বেশী এবং বাদ্যযন্ত্র দোতরা, মুখা বাঁশী উল্লেখযোগ্য বিক্রয়যোগ্য উপকরণ।

এই মেলার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে W.W. Hunter সাহেবের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য— "The only fair in the year is the Gadadhar Mela, held on a certain day in the month of Chaitra at a place on the right bank of the Kaljani river, about eleven miles from Cooch Behar town. It continues for three days."[১৫] গদাধর মেলা যে তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের একমাত্র মেলা তা হান্টার সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্য থেকেই প্রতীয়মান হয়। হান্টার সাহেব তাঁর বিবরণে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মধ্যে কৃষিপণ্যের বিপননের কথাও বলেছেন।

দরিয়া বলাই স্নান মেলা ঃ

জেলার অন্যতম শতবর্ষ অতিক্রান্ত প্রাচীন স্নান মেলা হল তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলাখানা মৌজার ঘোগারকুঠি গ্রামের গদাধর নদীর দরিয়া বলরামের অষ্টমী স্নান মেলা। "তৎকালীন

কোচবিহার রাজ্যের নাজিরদেব শান্তনারায়ণ তুফানগঞ্জ মহকুমার নাককাটি গাছ গ্রামে যন্ডেশ্বর শিবমন্দির সংস্কারের সময়ই গদাধর নদীর তীরে পানিশালা গ্রাম থেকে পশ্চিমমুখী বর্তমান ঘোগারকুঠি গ্রামে চিলাখানা মৌজায় "দরিয়া বলাই ঠাকুর (ঈশ্বর দরিয়া বলরাম) প্রতিষ্ঠা করেন।"[১৪] "১৮৬৫ সনের তৎকালীন কোচবিহারের গোসয়ারা খরচের বরাদ্দে স্থাপিত দেবালয়সমূহের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ চিলাখানা মোকামে প্রতিষ্ঠা করেন ঈশ্বর দরিয়া বলরাম।"[১৫] উক্ত বলরাম ঠাকুর বর্তমানে যে স্থানে শায়িত আছেন তাকে সবাই বলরাম ধাম বলেন।

দরিয়া কথার অর্থ নদী। আর বলাই অর্থে বোঝায় বলরাম। "মতান্তরে যাঁরা প্রাচীন মানসিকতার অধিকারী তাঁরা অধিষ্ঠান ক্ষেত্রটিকে দরিয়াবালাই ধাম আর বিগ্রহকে দরিয়া-বালাই অর্থাৎ গদাধর নদীতটে অবস্থিত কোন অনিষ্টকারী, কিংবা অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী দেবতা বলে মনে করেন। এই বিগ্রহ বলরামের নয়। দরিয়াবলাই নামে কোন লোক দেবতার।"[১৬]

হলধর বলরাম উত্তরবঙ্গের কৃষিব দেবতা হিসেবে সম্মানিত। কৃষি কর্মের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত লক্ষণীয় বিষয় হল উত্তরবঙ্গ তথা আসাম বিস্তৃত কামতাপুরের সুপ্রাচীন কৃষ্টি অনার্য কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত যা আর্য কৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অনার্য ভাষাগোষ্ঠী উদ্ভূত দরিয়া শব্দটির সঙ্গে কৃষির অর্থ দেবতা বলরামের সংযুক্তি বিশেষ তাৎপর্যবাহী বলে মনে হয়। এক কথায় নদীর তীরে বলরাম। এই বলরাম ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমী তিথিতে লক্ষাধিক মানুষের সমাগমে অনুষ্ঠিত হয় উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম স্নান মেলা। কোচবিহারবাসীর কাছে এই মেলা ছোট অষ্টমী স্নান নামে পরিচিত। এখানে যথারীতি পাঁঠা, পায়রা, লবণ, হাঁসের ডিম উৎসর্গ করেন গদাধরের পুণ্য সলিলে। দরিয়া বলাই গ্রামের এই স্নান মেলা উপলক্ষে গদাধরের পশ্চিম প্রান্তে দরিয়া বলরাম ধামে বলরাম পূজিত হন।

দরিয়া বলরামের উৎপত্তি সম্পর্কে এতদঞ্চলে একটি লোকশ্রুতিও প্রচলিত আছে যা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য এই দুটি স্নান মেলায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, আসামের ধুবরী ও গোয়ালপাড়া অঞ্চল থেকে ছুটে আসেন বহু শোকাহত মানুষ উক্ত পুণ্য তিথিতে। যার মূল লক্ষ্য স্নান শেষে গদাধরের পবিত্র বারির স্পর্শ লাভ। জেলার জনসাধারণের বিশ্বাস পাপবোধের গ্লানি ও জ্বালা গদাধর নদীতে অবগাহনের মধ্য দিয়ে ধুয়ে মুছে যায়। বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে গঙ্গার তট থেকে শতাধিক যোজন দূরবর্তী স্থানে গঙ্গা নাম উচ্চারণ করলে তিন পুরুষের পুঞ্জিভূত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। এই লোকায়ত বিশ্বাসই প্রতি বছর অশোকাষ্টমী তিথিতে পথের ক্লান্তি ভুলিয়ে হাজার হাজার পুণ্যার্থীকে এনে হাজির করে জেলার কালজানি ও গদাধর নদীর চরে। কোচবিহার জেলায় অনুষ্ঠিত চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমী তিথির স্নান মেলাগুলির মধ্যে প্রাচীনতার বিচারে নাটাবাড়ি ১ নং অঞ্চলের পানিশালা গ্রামে গদাধর

কালজানি স্নান মেলার পরেই ঘোগারকুঠির 'দরিয়াবলাই'-এর স্নান মেলার স্থান। তুফানগঞ্জ মহকুমার স্থানীয় মানুষ স্বর্গীয় যোগেন ঈশোর এই দরিয়া বলরামকে অবতার মনে করে একটি কবিতা লেখেন ঃ

"গদাধর নদী তীরে মূর্তি উঠিল
আসন ভাঙ্গে না নদী;
নারায়ণ পূজা নিত্য চলিছে
কেহ নাহি জানে আদি।"[১৭]

এই স্নান মেলা উপলক্ষে উক্ত গ্রামের গদাধর নদীর পশ্চিম প্রান্তের বলরাম ধামের পূর্ব-পশ্চিমে শায়িত হলধর বলরাম মূর্তির পূজার পাশাপাশি পূর্ব প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয় জেলার অন্যতম প্রাচীন বাসন্তী পূজা। এই পূজার আয়োজন চলে দশমী তিথি পর্যন্ত। স্নান মেলার অনুষঙ্গে দরিয়া বলরাম শুরু থেকে থাকলেও বাসন্তী পূজার প্রচলন অনেক পরের ঘটনা। পূর্বে মেলার স্থিতিকাল ছিল একদিন। বর্তমানে এই বাসন্তী পূজার অনুষঙ্গে মেলার স্থিতিকাল তিনদিন। এই মেলার একটি প্রাচীন ঐতিহ্য হল— লোকশিল্পীদের কালী বেশে 'মুখোশ নৃত্য' এবং 'ঘোড়ানাচ'। এছাড়াও দোতরা ও কুষাণ পালার ঐতিহ্য আজও বর্তমান। বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাঁশ ও কাঠের গৃহস্থালীর সরঞ্জাম, লোকশিল্পীদের তৈরী বিভিন্ন পুতুল, মৃৎশিল্পীদের হাড়ি, কলসী, মাটির পুতুল ও কৃষিকাজের যাবতীয় সরঞ্জাম।

শুধু কোচবিহারই নয় উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, লোকশিল্পী, লোকবিশ্বাস, লোকধর্ম এবং লোকদেবতা এ সবকিছুরই এক মিলনতীর্থ তুফানগঞ্জ মহকুমার দরিয়া বলাইয়ের স্নান মেলা।

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাগরুর হাট গ্রামের যে স্থানে বাযডাক নদী উত্তর দিকে মোড় নিয়েছে, সেখানে অনুষ্ঠিত হয় ভাতখাওয়া অষ্টমী স্নান মেলা। স্থানীয় মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস কমবেশী ভাত খেয়ে অষ্টমী স্নান মেলায় যেতে হয়।

এই মহকুমার আয়রাণী চিতলিয়া গ্রামে চন্ডী ঠাকুরের মন্দির সংলগ্ন একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে দোল পূর্ণিমার বারো দিনের মাথায় বারুণীর স্নান মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলার উল্লেখযোগ্য এই প্রাচীন স্নান মেলা ব্যতীত মেখলীগঞ্জ মহকুমার ফুলকাডাবরী গ্রামে প্রতি বছর চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমী তিথিতে শানিয়াজান নদীর তীরে একটি স্নান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মানুষের কাছে শকুনিয়া ছিলান (স্নান মেলা) মেলা নামে পরিচিত। উক্ত মহকুমার জামালদহ গ্রামে সুটুঙ্গা নদী যেখানে উত্তরবাহিনী হয়েছে সেই স্থানে প্রতি বছর ফাল্গুনী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি থেকে দুই পক্ষ কাল ধরে অনুষ্ঠিত হয় বারুণী স্নান ও মেলা। মেলাটি ষাট বছরের প্রাচীন।

গিরীধারী স্নান মেলা ঃ

মাথাভাঙ্গা মহকুমার শীতলকুচি বন্দরের তিন কিলোমিটার পূর্বে গিরীধারী নদীর তীরে প্রতি বছর চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের স্নান মেলা। এই মেলার আরাধ্য দেবতা মহামায়ার পাটে পাঁঠা ও পায়রা উৎসর্গ করেন ভক্তগণ। এটি জেলার অন্যতম প্রাচীন মেলা। এই মেলা সম্পর্কে লোকায়ত বিশ্বাস হল ভক্তগণ মনস্কামনা করলে তা পূর্ণ হয়। সিতাই ব্লকের চামটা গ্রামে কৈ-মারী বি.এস.এফ. হেড কোয়ার্টারের সোজা দক্ষিণ দিকে মালদা নদীর ঘাটই একদিন 'সতীর ঘাট' নামে পরিচিত ছিল এবং উক্ত ঘাটটি ছিল কৈ-মারী গ্রামের অন্তর্গত। বর্তমানে ঘাটটি নদীগর্ভে বিলীন হলেও শীতলকুচি ব্লকের স্নান মেলাকে অনেকে সতীর মেলা নামে বিশ্বাস করেন। শীতলকুচি ব্লকের মহিষমারী গ্রামেও চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে ধরলা নদীতে বারুণী স্নান ও মেলা উপলক্ষে বহু পুণ্যার্থীর সমাগম হয়।

কলকদেবীর স্নান মেলা ঃ

এই জেলার উল্লেখযোগ্য স্নান মেলাগুলির অন্যতম মাথাভাঙ্গা মহকুমার মানসাই-সুটুঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে দেবী বাসন্তীর লোকায়ত মূর্তি 'কলকদেবীর' পূজা উপলক্ষে এক স্নান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মাথাভাঙ্গা মহকুমার পৌর এলাকা সংলগ্ন পচাগড় অঞ্চলে ভেরভেরি মানাবাড়ি মৌজায় মানসাই-সুটুঙ্গা নদীর মিলন স্থলে প্রতিবছর একদিনের জন্য পুণ্যার্থীদের পুণ্যস্নানের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। প্রতি বছর চৈত্র মাসের বাসন্তী অষ্টমীর দিন পুণ্যলোভাতুর লক্ষাধিক মানুষ ছুটে আসেন এই গ্রামে। পঞ্জিকার তিথি মেনে স্নান তর্পণ সেরে সবাই পূজা দেন অন্নপূর্ণা-কলকদেবীর থানে। শহর সংলগ্ন বলে গ্রামীণ এই স্নান মেলায় আধুনিকতার ছোঁয়া দেখা যায়। মেলায় বিক্রয়যোগ্য পণ্য সামগ্রীর মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় ও আধুনিক জিনিসপত্রের সঙ্গে বাঁশ ও বেতের আসবাবপত্র ধামা, কুলো, চালুনের সঙ্গে মৃৎশিল্প ও দারুশিল্পের সামগ্রী উল্লেখযোগ্য। সিংহবাহনা দ্বিভুজা কলকদেবী এখানে মহামায়া জ্ঞানেও পূজিতা হন। পাঁঠা ও পায়রা বলির পাশাপাশি অনেকে উৎসর্গীকৃত পায়রা আকাশে উড়িয়ে দেন।

এছাড়াও মাথাভাঙ্গা মহকুমার বোচাগাড়ি উত্তরবাহিনী ধরলা নদীতে অশোকাষ্টমী স্নান ও মহামায়া পূজা উপলক্ষে একদিনের বিশাল মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

কালীঘাটের স্নান মেলা ঃ

কোচবিহার জেলাশহরের ছয় কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে তোর্ষা নদীর পাড়ে অশোকাষ্টমী স্নান উপলক্ষ্যে একদিনের একটি মেলা বসে। তোর্ষা নদীর এই ঘাট একদিন বর্ষিঞ্চু কালীঘাট নামে পবিচিত ছিল। এই মেলাগুলি ছাড়াও পাঁচটি মহকুমার তিস্তা. তোর্ষা, রায়ডাক, গদাধর, কালজানি, সঙ্কোশ প্রভৃতি নদী সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে চৈত্র মাসের এই তিথিতে শতাধিক স্নান মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

অশোকাষ্টমী তিথি উপলক্ষ্যে একদিন বিশাল মেলা বসত হলদিবাড়ী শহরের উত্তর প্রান্তে। কোচবিহার রাজ সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী এই মেলার সূচনা হয় ১৮৮৩ খ্রীঃ। বর্তমানে এই মেলা অস্তিত্বহীন। মেলার বিলুপ্তি ঘটলেও হলদিবাড়ীর মানুষ হাসপাতালের দক্ষিণ পার্শ্বের বিশাল মাঠকে এখনও মেলার মাঠ বলেই জানেন।

হুজুর সাহেবের মেলা ঃ

জেলার হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত সংস্কৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলদিবাড়ী ব্লকের হুজুর সাহেবের মেলা। হুজুরের মাজার-শরিফে প্রতি বছর পাঁচ ও ছয়-ই ফাল্গুন থেকে অনুষ্ঠিত হয় হুজুরের মেলা। হজরত মৌলনা সাহসুফী এক্রামুল হক অর্থাৎ হুজুরের সমাধির দিনকে স্মরণ উপলক্ষ্যেই মেলার আয়োজন। যদিও এটি মুসলিম সম্প্রদায়ের ইসালে সাওয়াব নামে একটি ধর্মসভা, তা সত্ত্বেও উক্ত পবিত্র দিনে লক্ষ লোকের সমাবেশে ধর্মসভাই মেলার রূপ পরিগ্রহ করে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে হুজুর সাহেব সমগ্র উত্তরবঙ্গেই বিশেষ করে মুসলিম সমাজের পরিত্রাতা হিসেবে পরিচিত। ইসালে সাওয়াব উপলক্ষ্যে তাই হলদিবাড়ীর এই মাজার-শরিফে প্রতি বছর ছুটে আসেন সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মানুষগণ। পঞ্চাশ বছর পূর্বে হুজুরের সমাধিকে কেন্দ্র করে যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় তাই উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে আজ হুজুরের মেলা নামে পরিচিত। বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও বর্তমানে মুসলিম ভক্তগণের সঙ্গে ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ এই মেলায় এসে হুজুরের মাজার-দরগায় চাদর, ধূপকাঠি, নকুলদানা ও মুরগি মানত করে উৎসর্গ করেন। মেলায় উল্লেখযোগ্য বিক্রয়যোগ্য পণ্য হল ধর্মগ্রন্থ, চাদর, রুমাল, লোহার ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি। মেলার বৈশিষ্ট্য হল খাদ্যবস্তু, গৃহস্থালির উপকরণ ও উৎসর্গের উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত সকল প্রকার বিনোদন নিষিদ্ধ। বর্তমানে মেলার মূল দায়িত্বে থাকেন হুজুরের নাতি খোন্দকার আবদুল হামিদ (খোকা হুজুর)।

মহরমের মেলা ঃ

কোচবিহার জেলা সদরের তিন কিলোমিটার দক্ষিণে গুদাম মহারাণীগঞ্জ গ্রামে প্রতি বছর মহরম উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের এক তাৎক্ষণিক মেলা। এই মেলার মূল আকর্ষণ— জেলা সদর, ঘুঘুমারী, হরিণচড়া গ্রামের মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের তাজিয়া, লোকবাদ্য সহযোগে শোভাযাত্রা ও লাঠি খেলা। স্থানীয় তাজিয়া শিল্পী গাটু মিঞার মতে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ তোর্ষাপীরের ভক্ত ছিলেন। তাঁরই প্রদত্ত সাত বিঘা জমির উপর এখানে তোর্ষাপীরের সমাধির উপর মাজার-শরিফের প্রতিষ্ঠা হলেও মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমল থেকেই এই মেলার সূচনা হয়। এই মাজার-শরিফে তোর্ষাপীরের সমাধি ছাড়াও পাগলাপীর, সত্যপীর, খোয়াজপীরের ঢিবি আছে। মহরম উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একদিনের এই তাৎক্ষণিক মেলায় হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ত্রিকোণ লালনিশান, বাতাসা, খই, নকুলদানা উৎসর্গ করেন। মহরম উপলক্ষ্যে দিনহাটা ও হলদিবাড়ী শহরেও পড়ন্ত বিকেলে লাঠিখেলা সহ প্রতি বছর এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য মেলা ঃ

রাধাচক্রের মেলা ঃ

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাককাটিগাছ অঞ্চলের কামাতফুলবাড়ী গ্রামের রাধাচক্র মেলাটি খুবই অর্বাচীন। ১৯৭২ সনে এই মেলার সূচনা। মেলার আরাধ্য দেবতা শিব ও পার্বতীকে দোলায় চড়িয়ে চক্রাকারে হাত দিয়ে ঘোরান হয়। সমগ্র উত্তরবঙ্গে মেলার এরূপ আঙ্গিক আর নেই। পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র ও জালিয়া কৈবর্ত্য সম্প্রদায় স্থানান্তরিত হয়ে এখানে এই মেলার সূচনা করেন। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবারকে তিথি ধরে রাধা, কৃষ্ণ এবং শিব-পার্বতীকে কাঠের তৈরী চক্রের মত নাগরদোলায় বসিয়ে মেলা উপলক্ষে পূজার প্রচলন। এই মেলার বৈশিষ্ট্য নমঃশূদ্র, ঝালোমালো সম্প্রদায়ের সঙের খেলা।

চড়ক মেলা ঃ

চৈত্রের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিনে শিব পূজাকে কেন্দ্র করে চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে জেলার প্রায় সবকয়টি মহকুমার গ্রামাঞ্চলেই একদিনের চড়কের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সদরের হলণ্ডের কুঠি, তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্দরাণ ফুলবাড়ী, মেখলিগঞ্জ মহকুমার দেবীরডাঙা, মাথাভাঙ্গা মহকুমার গিলাডাঙা ও চেঙ্গারখাতা খাগরিবাড়ী, দিনহাটা মহকুমার গোসানীমারী, জেলা সদরের ভেটাগুড়ি ও রুইয়ের কুঠি গ্রামের চড়কের মেলাগুলি প্রাচীন। এই মেলার বড় আকর্ষণ, বাণফোঁড়, আগুন ঝাঁপ, কাটা ঝাঁপ, বড়শি ফোঁড়ানো জাতীয় ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ। সংশ্লিষ্ট গ্রামের দেববংশী, সন্ন্যাসী কর্তৃক এগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়।

কাঠাম মেলা ঃ

কোচবিহার জেলার লোকসংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন কাঠাম মেলা। এই উপলক্ষ্যে চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যায় কালী, মাসান, শিব-পার্বতী, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান ইত্যাদির বাঁশ, কাঠ ও রঙিন কাগজের কাঠাম তৈরী করে এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি সেজে শহর সংলগ্ন যে কোন রাস্তার তেমাথায় দেববংশীগণ পায়রা বলি দিয়ে প্রথমে কাঠাম পূজার সূচনা করেন, তারপর দেব-দেবী ও এই কাঠাম গরুরগাড়ী ও ভ্যান রিক্সায় চাপিয়ে লোকবাদ্য সহযোগে শহর পরিক্রমা করেন। পরের দিন পয়লা বৈশাখ বিকেলে সংশ্লিষ্ট গ্রামের মেলা প্রাঙ্গণের অন্নপূর্ণা ও শিব-পার্বতীর মন্দির সংলগ্ন স্থানে সমস্ত কাঠাম ও মূর্তি হাজির করে যেখানে প্রদর্শন করানো হয়, সেখানেই এক বৈকালিক মেলার সূচনা হয়। জেলার একমাত্র মেখলিগঞ্জ মহকুমায় এইরূপ কাঠাম মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মহকুমার দেবীরডাঙা, নালারটারি ও নিজতরফ গ্রামের কাঠাম মেলা খুবই প্রাচীন। স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় এই মেলার মূল উদ্যোগী।

সতীর মেলা ঃ

জেলায় অনুষ্ঠিত মেলাগুলির সিংহ ভাগই ধর্মীয় অনুষঙ্গে দেখা গেলেও বিশেষ ঘটনা বা স্থান মাহাত্ম্যের গুণেও কিছু কিছু মেলার মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। এরূপ একটি মেলা হল—

সতীর মেলা। সতী মাহাত্ম্যকে স্মরণ করে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার মানতানি ও ঝিঙাপুনি গ্রামের সংযোগ স্থলে, বর্তমান বারকোদালী ১ নং অঞ্চলের কাশিয়াবাড়ি হাটের দুই মাইল উত্তরে। প্রতি বছর দোল পূর্ণিমার বারো দিন পর বারুণী তিথিতে উক্ত অঞ্চলের জানকীর ছড়ার পাশে অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনের সতীর মেলা। উক্ত গ্রামের প্রচলিত লোকশ্রুতি, স্বামীর মৃত্যুতে জনৈক সতী নারী এখানে সহমরণে যান। দাহকর্মের পর চিতার চার ধারে চারটি খুটির বাঁশ পরবর্তীতে নতুন করে বেঁচে ওঠে এবং কালক্রমে বাঁশের থোপ সৃষ্টি হয়। সেই বাঁশের থোপকেই গ্রামের মানুষ সতীর প্রতীক বলে মনে করেন। সেই থোপের বাঁশ কেউ কাটেন না। এই লোকায়ত বিশ্বাসে ভর করেই গ্রামের মানুষ এখানে প্রতিষ্ঠা করেন সতীমায়ের মূর্তি। ১৫/৩/৯৯ তারিখে এক ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখা যায় ছড়ার পাশেই বাঁশের থোপ সংলগ্ন পশ্চিমমুখী টিনের চালাঘরই সতী মায়ের মন্দির। মন্দিরে দন্ডায়মান সধবা নারীর বেশে মায়ের মূর্তি, হাতে বরাভয়। উক্ত গ্রামের জীবন সরকার ভানুকুমারী ২ নং অঞ্চলের উপপ্রধান, অসমীয়া ব্রাহ্মণ পূজারী সুরেন্দ্র শর্মার (নলবাড়ি) মতে প্রথমে পূজা শুরু হলেও মেলা শুরু হয় পরে। বর্তমানে মেলা চলে দুদিন। গ্রামবাসীর মতে হিন্দু-মুসলিম সবাই এই সতী মায়ের কাছে উক্ত পবিত্র দিনে জানকীর ছড়ায় স্নান করে মানত করেন। পূজার মূল উপকরণ ফুল, বেল, বাতাসা হলেও অনেকে মানত করে পায়রা উৎসর্গ করেন। মেলা অনুষ্ঠিত হয় তিন বিঘা জমিতে।

লোকউৎসব ঃ

কোচবিহার জেলায় প্রচলিত লোকউৎসব বলতে আমরা বুঝি সে সকল উৎসবকে যা শাস্ত্রীয় অনুশাসনের চেয়ে সমষ্টিগতভাবে লোকাচার, লোকধর্ম, লোক-পুরোহিত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। লোকজীবনের সংহতি ও সংস্কৃতির মিলিত প্রবাহে আজও এই উৎসবগুলি এক মৌলিক ঐক্য-ভাবনা ও প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে এতদঞ্চলে, সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে কোচবিহারের লোকউৎসবগুলিকে লোকজীবনের মিলন-তীর্থ বলা সমীচীন। "প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন ও একাকী— কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া বৃহৎ।"[১৮]

এই জেলায় প্রচলিত এবং উল্লেখযোগ্য প্রাচীন লোকউৎসবগুলি নিম্নরূপ ঃ

দোল সোয়ারী ঃ

নামের দিক থেকে পার্থক্য যতই থাকুক দোল উৎসবের আঙ্গিক পরিচয় সারা ভারতে এক ও অভিন্ন। নতুন শস্যের প্রত্যাশা, বসন্তের মদন উৎসব এবং নববর্ষের আবাহন সব কিছু মিলেই দোলযাত্রার তাৎপর্যকে করেছে মহিমান্বিত। ধর্মীয় ভাবনা সরিয়ে রেখে সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে একে বসন্ত ঋতুর উৎসব বলাই শ্রেয়। এই দোলকে কেন্দ্র করেই

দোলের পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় অনুষঙ্গের বাইরে কোচবিহারে স্থানীয় জনগোষ্ঠী প্রায় দুশ বছর ধরে এক লোকউৎসব পালন করে আসছেন— যার নাম 'দোল সোয়ারী'।

"কোচবিহারের তৃতীয় মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ কর্তৃক তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ ও সদরে মদনমোহন গিরিধারীলাল গোপীবল্লভ মন্দির বা স্টেট ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই উৎসবের সূচনা হলেও পরবর্তীকালে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সোয়ারী উৎসব জেলার সকল মহকুমার দেবত্র ট্রাস্ট পরিচালিত মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে।"[১৯]

দোল উৎসবের মূল আরাধ্য দেবতা হলেন রাধা ও কৃষ্ণ। কিন্তু কোচবিহারের পরিপ্রেক্ষিতে এর একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। মহাপুরুষ শঙ্করদেব প্রবর্তিত একশরণ নাম ধর্মের প্রভাবে জেলা সদর ও মহকুমাগুলিতে বিশেষ করে স্থানীয় অধিকারী ও ভকত সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত এই সোয়ারী উৎসবে রাধা বিহীন কৃষ্ণই গোপীবল্লভ বা মদনমোহন মূর্তিতে পূজিত হন। "প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় জেলার রাজবংশী সম্প্রদায় সোয়ারী উৎসবের সূচনা করলেও পরবর্তীতে স্থানীয় রাভা সম্প্রদায়ও পূজার প্রতি ভক্তিভাব প্রদর্শন করেন।"[২০] সোয়ারী উৎসবে স্থানীয় অধিকারী ও বৈরাগীগণই পৌরোহিত্য করেন।

এই উৎসবের মূল স্থান দেবত্র ঠাকুরবাড়ী সংলগ্ন উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্র বা কোন প্রান্তর। দুধ, কলা, চিনি, খই এবং একটি গামছা ও আবির নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে জেলার দেবত্র পরিচালিত সকল মন্দির সংলগ্ন উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক এক মেলাও অনুষ্ঠিত হয়। এটাই জেলার লোকউৎসব দোল সোয়ারী।

আসামে দোল যাত্রার প্রথম দিনটিকে বলা হয় 'গোন্ধ'। সেদিন সন্ধ্যায় কালিয়াঠাকুর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তুত হন তাঁর স্ত্রী খুনুচার (গুন্ডিচার) বাড়ী যাবার জন্য। এটি অনেকটা পুরীর রথযাত্রার জগন্নাথের মাসীর বাড়ী গুন্ডিচায় যাবার মত। দোল যাত্রার চতুর্থ দিন হল দোল উৎসবের শেষ দিন। ঐ দিনটি আসামে 'সুয়েরী' নামে পরিচিত। এই সুয়েরীই কোচবিহারে সোয়ারী নামে খ্যাত। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সওয়ার থেকেই এই সোয়ারী কথাটি এসেছে। অর্থাৎ কারও কাঁধে সওয়ার হয়ে যাবার পদ্ধতি। ঐ দিন খুনুচার বাড়ী থেকে কালিয়াঠাকুর বা কৃষ্ণকে লক্ষ্মী মায়ের ঘরে ফেরার কথা। ঠাকুরকে তাঁর ভক্তরা বিচিত্র রঙের আবির মাখিয়ে চৌদোলায় চাপিয়ে নিয়ে আসেন। সেই সময় আসামের অপর একটি বৈষ্ণব কেন্দ্র 'বারাদি' থেকে বিরাট এক ভক্তের দল এসে যোগ দেয় এবং অনেকেই চৌদোলা বহন করেন। কীর্তন ঘর বা সত্রের সামনে সমবেত ভক্তবৃন্দের শঙ্খ ঘন্টা খোল ও করতালের ধ্বনিতে আকাশ কলমুখর হয়ে ওঠে। তারপর ভক্তবৃন্দ এক শোভাযাত্রা সহকারে ঠাকুরকে বহন করে নিয়ে যায় কনসরিয়া নামক এক নির্জন স্থানে এবং সেখানে সৃষ্টি হয় এক তাৎক্ষণিক জনসমাগম বা মেলা।

কোচবিহারের মদনমোহনও সোয়ারীর দিন যেমন মূল মন্দির থেকে কিছুদূরে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন যেখানে ভক্তগণ ভক্তিভরে আবির, খই, বাতাসা নিবেদন করেন। জেলার উল্লেখযোগ্য সোয়ারী উৎসবের স্থানগুলি হল— তুফানগঞ্জ মহকুমার ষন্ডেশ্বর, দামেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণ, ভুচুংমারি বলরাম আবাস, দোলগোবিন্দ ধাম, ছালাপাক গ্রামের বারুণী স্নান মেলা প্রাঙ্গণ, দিনহাটা মহকুমার গোবরছড়া, কুর্শার হাট, কিসমতদশ গ্রামের বলরামের পাট (একশত বছরের প্রাচীন), জেলা সদরের মদনমোহন বাড়ী ছাড়াও বড়াইবাড়ী, পসারীর হাট, চাউডাঙ্গা, কালজানীর পথে কলেরপাড় গ্রাম, বৈকুণ্ঠপুর ও কুঠিয়া পাড়া এবং হলং-এর কুঠি গ্রাম।

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাককাটিগাছ ষন্ডেশ্বর শিবমন্দিরের উত্তর পার্শ্বস্থ খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয় প্রায় দুশ বছরের প্রাচীন দোল সোয়ারী উৎসব। উভয় ক্ষেত্রেই মদনমোহনের চৌদোলা সোয়ারীর সঙ্গে বাহক হিসেবে থাকেন সংশ্লিষ্ট মন্দিরের দেবশর্মা উপাধিধারী ব্রাহ্মণ, মন্দিরের দেউরী ও স্থানীয় ভক্তগণ এবং পুলিশ প্রশাসন। ঐ দিন উক্ত মদনমোহনের জমায়েতে প্রায় সব জায়গাতেই এক তাৎক্ষণিক সোয়ারী মেলা অনুষ্ঠিত হয় পড়ন্ত বিকেলে। কোচবিহারের সোয়ারীর, বিশেষ করে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার সোয়ারী উৎসবের সাদৃশ্য চোখে পড়ে বেশী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সমগ্র বাংলায় এমনকি পূর্ববঙ্গেও মদনমোহনের দোল উৎসবের দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকলেও কোচবিহার জেলার অনুরূপ দোল সোয়ারী উৎসব বাংলাদেশ বা দক্ষিণবঙ্গের কোথাও অনুষ্ঠিত হবার কথা শোনা যায় না।

জেলার এই লোকউৎসবের ক্ষেত্রানুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় কোচবিহার জেলা সদরের মদনমোহন বাড়ীকে কেন্দ্র করে জেলার পাঁচটি মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত 'দোল সোয়ারী' হল গোপীবল্লভ মদনমোহন ষন্ডেশ্বর, কান্তেশ্বর শিবের মিলন উৎসব। উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্যবাহী এই প্রাচীন উৎসবে অংশগ্রহণকারী দেবতাগণ হলেন বানেশ্বর মন্দিরের চলন্ত বানেশ্বর শিব, তুফানগঞ্জ মহকুমার নাককাটিগাছ অঞ্চলের ষন্ডেশ্বর শিব, বারকোদালী গ্রামের দামেশ্বর শিব ও দোলগোবিন্দ ধামের মদনমোহন। দোল পূর্ণিমার পূজা ও ভোগের পর চৌদোলে চার সঙ্গীর (বাহক) সওয়ার হয়ে স্থানীয় লোকবাদ্য ও পুলিশ প্রশাসন সহ প্রথমে জেলার গুঞ্জবাড়ী ডাঙর আয়ী ঠাকুরবাড়ীতে জমায়েত হন। এর কিছুক্ষণ পর পুনরায় এই বিগ্রহের সওয়ারী সদর মদনমোহন বাড়ী এলে সদর মদনমোহনকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় রাসমেলা ময়দানে সন্ধ্যার মুহূর্তে হাজির হন। সেখানে সমাগত ভক্তগণ খই, বাতাসা, আবির দিয়ে ঠাকুর প্রণাম করেন। এরপর মদনমোহন বাড়ীতে ফিরে এসে দেড় দিন থাকার পর পুনরায় ভক্তগণের কাঁধে সওয়ার হয়ে নিজ নিজ মন্দিরে ফিরে যান সংশ্লিষ্ট দেবতাগণ, পুনরায় সেখানে পূজা ও ভোগ হয়। পরদিন সংশ্লিষ্ট গ্রামের দেব-দেউল সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয় দোল সোয়ারী উৎসব। জেলার প্রাচীন ও লোকায়ত সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী এই উৎসব জেলার মানুষকে দোল উৎসবের প্রথাগত অনুষ্ঠান

থেকে এক ভিন্ন স্বাদের উপহার দেয়। দোলকে কেন্দ্র করে জেলার লোকায়ত সংস্কৃতির এই উৎসব আজও একই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

এই উৎসবের একটি প্রথাগত নিয়ম সম্পর্কে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় ১৪/৩/৯৮ তারিখের এক সাক্ষাৎকারে তুফানগঞ্জ ষণ্ডেশ্বর শিব মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত কৃষ্ণকান্ত দেবশর্মা এবং দেউরী রবীন্দ্রনাথ বর্মন জানান, "প্রথম সোয়ারীতে আমন্ত্রিত হন বারকোদালীর বড় মহাদেবের কাছে ষণ্ডেশ্বর বা ছোট মহাদেব এবং দোলগোবিন্দের মদনমোহন। দোলের অষ্টম দিনে দোলগোবিন্দের অতিথি হন বিভিন্ন দেব-দেবী।"[২১]

মদনমোহনের এই মিলন মেলায় শুধুমাত্র দেবত্র পরিচালিত মন্দিরের দেবতাগণই হাজির হন না, সংশ্লিষ্ট গ্রামের তাৎক্ষণিক মেলায় হাজির হন গ্রামের পারিবারিক মদনমোহনও। এই প্রসঙ্গে বলা যায় সংশ্লিষ্ট এই মিলন মেলায় সেই সময় গ্রামের শিশুরা ও রাধাকৃষ্ণের বাঁধানো বা কাগজের ফটো নিয়ে মদনমোহনের বা চৌদোলের পাশাপাশি বসে পড়ে। বড় মদনমোহনের পাশাপাশি শিশুদের এই মদনমোহনও খই, বাতাসা ও পয়সা পান। দোলকে কেন্দ্র করে এই লোকায়ত উৎসবে কোন পশু পাখি বলির নিয়ম নেই। কোন কোন গ্রামে বিশেষ করে জেলা সদরের মাঘপালা গ্রামের হরিমন্দির প্রাঙ্গণে দেখা যায় সোয়ারী উৎসবের পূর্বে "বুড়ির ঘর" পোড়ানো হয়। নাককাটিগাছ গ্রামের দোল সোয়ারী উৎসবে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক মদনমোহন নিয়ে হাজির হন কুলেন অধিকারী, বুধু চক্রবর্তী ও রাধেশ্যাম অধিকারী।

জেলার দিনহাটা মহকুমার গোবরারছড়া গ্রামের সোয়ারী উৎসব প্রাচীন ঐতিহ্যের দাবি করে। আবার শালমারা গ্রামের দোল ও দোলসোয়ারী উপলক্ষ্যে ভুঁই মাটি খেলা একটি প্রাচীন লোকাচার। জেলার উল্লেখযোগ্য প্রাচীনতম সোয়ারী উৎসবের স্থানটি হল— ডাওয়াগুড়ি অঞ্চলের খাপাইডাঙ্গা গ্রামের উত্তর পার্শ্বের বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম। কোচবিহারের তৃতীয় রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠদেবের বিগ্রহকে কেন্দ্র করেই এই উৎসবের সুচনা। এখনও গ্রামের দামোদর-পন্থী বৈষ্ণবগণ সোয়ারী উৎসবে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মদনমোহনের সওয়ার হওয়া কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের একটি দোল কেন্দ্রিক স্থানীয় লোকাচার। দোল পূর্ণিমার তৃতীয়াতে অনুষ্ঠিত হয় মহকুমার নাককাটিগাছ ও জেলা সদরের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে "ধুম-সোয়ারী"।[২২] পঞ্চম দোলের দিন অনুষ্ঠিত হয় "পঞ্চম সোয়ারী"। এই সোয়ারীর সাড়ম্বর অনুষ্ঠান দেখা যায় বারকোদালী গ্রামে। সপ্তম দোলে সোয়ারী অনুষ্ঠিত হয় দোলগোবিন্দের ধামে। বানেশ্বর শিব মন্দিরের বর্তমান সওয়ার দ্বিজেন সিংহ ও উপেন রায় ১৫/৩/৯৮ ইং তারিখের এক সাক্ষাৎকারে জানান "পূর্বে দোলসোয়ারী মেলা বা উৎসব প্রাঙ্গণে কুষান গানের আয়োজন ছিল অপরিহার্য।"

মদনকাম / বাঁশপূজার মেলা ঃ

প্রতি বছর চৈত্র মাসে মদন চতুর্দশী তিথিতে বা মদনভুঞ্জি তিথিতে কোচবিহারের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বাঁশতোলা, বাঁশজাগানো, মদনকাম, কামদেব ও বাঁশপূজা নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দোল পূর্ণিমার ত্রয়োদশী থেকে পরবর্তী পূর্ণিমার ত্রয়োদশীর মধ্যে বাঁশে কাপড় জড়ানো হয়, চতুর্দশী এবং মদনভুঞ্জি তিথিতে হয় হোম। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে এই মদনকাম বা কামদেব পূজা অনুষ্ঠিত হলেও বাঁশকে নিয়ে প্রাচীন লৌকিক ধর্মীয় সংস্কৃতি-নির্ভর এরূপ অনুষ্ঠান কোচবিহার জেলায় এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। আবার জেলার মধ্যে কোচবিহার সদর ও তুফানগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের এই পূজা ও অনুষ্ঠান যে ভাবে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় তাকে আদিম লোকায়ত জীবনের কৃষ্টি ও বিশ্বাসের প্রতিফলন বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থে জানা যায়, হোলি এবং চৈত্র মাসে 'কাম মহোৎসব' নামক অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির নাচ-গান হত। 'কালবিবেক' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'কাম মহোৎসবে' নানা প্রকার যৌন অঙ্গভঙ্গি এবং জুগুপ্সিতোক্তি করলে কাম দেবতা তৃপ্ত হন এবং তার ফলস্বরূপ গ্রামবাসীগণ ধনে জনে সম্পদ লাভ করেন।

আবার পৌরাণিক শাস্ত্র গ্রন্থে রতির স্বামী হিসেবে যে কামদেবের কথা শোনা যায় তাঁরও এক নাম মদন। যদিও এখানে মদন এবং কামদেব অভিন্ন ব্যক্তি। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী এই মদনকেই শিব ভস্ম করেছিলেন। মদন বা কামদেবকে ভস্মকারী শিবই স্বয়ং 'মদনকাম'রূপে একাধিক গ্রামে পূজিত হন। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় এই মদনকামকে শিবজ্ঞানেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পূজা করেন এবং এই পূজায় পূর্ণাঙ্গ বংশদন্ডকে শিবলিঙ্গ বলে শ্রদ্ধাভক্তি ও মান্য করেন।

W.W. Hunter সাহেব তাঁর Statistical Account of Bengal গ্রন্থের দশম খন্ডে কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজের মদনকাম বা কামদেব পূজার কথা উল্লেখ করেছেন—"Every year, on the fourteenth day of the moon in the month of Baisakh (March) the Rajbansis worship Madankamdeo, the god of love."[২৩]

"উত্তর কামরূপের কোন কোন অংশে ভঠেলির বিকল্প রূপে 'বাইবয়া' অর্থাৎ 'বাঁশ বিয়ে' নামে ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ নিজেদের মধ্যে উৎসব করে থাকেন।"[২৪] ভঠেলির অর্থ অবকাশ। আকাশচুম্বী বাঁশের ধ্বজাই যার প্রতীক। মহাভারতেও বৃষ্টি কামনায় ইন্দ্রধ্বজা স্থাপনের উল্লেখ আছে। ভগবান কৃষ্ণ এই পূজাকে গোবর্ধন পূজায় পরিণত করেন। কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই পূজা বা উৎসব বাঁশপূজা বা মদনকাম নামে প্রচলিত। জেলার লোকউৎসবের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন এবং কৃষিভিত্তিক সভ্যতার (Fertility

cult) অনুষঙ্গ হিসেবে এই পূজা ও উৎসবের ঐতিহ্য জেলার সব মহকুমায় না থাকলেও বিশেষ করে জেলা সদরের বৈকুণ্ঠপুর, বানেশ্বর, খোলটা, বাঁশদহনতি বাড়ী, তুফানগঞ্জ মহকুমার বারকোদালী, ভাস্তিজেলাস, অন্দরাণফুলবাড়ী, বিলসী গ্রামে, দিনহাটা মহকুমার খলিসা গোসানীমারী, সিঙ্গিমারী, মদনকুড়া, বড়ডাঙ্গা, নাগরের বাড়ী, রুইয়ের কুঠি ও বড় শাকদল চন্দন চৌরা গ্রামে চৈত্র মাসের মদন ত্রয়োদশী তিথিতে কোথাও মদনকাম, কামদেব, মদনদেব প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এই বাঁশপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনেক গ্রামে এই পূজা বা উৎসব ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ভাবেও অনুষ্ঠিত হয়। জেলার সিতাই ব্লকের ব্রহ্মোত্তর চাত্রা ও গাবুয়া গ্রামে মদন চতুর্দশীর বাঁশপূজায় পাঁঠা, পায়রা বলি দেওয়া হয় এবং এই উপলক্ষ্যে তিন থেকে চার দিনের একটি মেলাও অনুষ্ঠিত হয়। মাথাভাঙ্গা মহকুমার পাটছড়া, গোপালপুর, উনিশবিঘা, বাঘমারা, শুকান দিঘী গ্রামে মদন চতুর্দশী তিথিতে কামদেবের পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

তুফানগঞ্জ মহকুমার বারকোদালী ১ নং অঞ্চলের অন্তর্গত বারকোদালী দামেশ্বর ধাম সংলগ্ন ভারেয়া গ্রামের মদনকাম বা বাঁশপূজা ও তার উৎসবের লৌকিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জেলার অন্যান্য গ্রামাঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী মদনকাম বা কামদেব দলের মাগন সংগ্রহ, গান ও নৃত্য সম্বলিত উৎসব আজও সমান তালে অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বারকোদালী গ্রামের চৈত্র মাসের মদনকাম পূজার নৃত্যে দেখা যায় কামদেবের ভক্তাগণ গাছের ডাল দিয়ে তৈরী কৃত্রিম পুরুষাঙ্গ দিয়ে এবং ঘোড়া বানিয়ে ঢাক, কড়কা ও সানাই-এর গগণভেদী বাজনার তালে তালে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির নৃত্য পরিবেশন করেন বাঁশপূজার মূল অনুষ্ঠানের দিন। সম্পূর্ণ পুরুষ নিয়ন্ত্রিত নৃত্য ও গীতের এই লোকউৎসবে মেয়েরা দর্শক হিসেবেও উপস্থিত থাকেন না। মদনকাম প্রকৃতপক্ষে শিব ও তার অনুষঙ্গী হিসেবে কোচবিহারে বেশী মান্য। জেলার ধর্মপ্রাণ রাজবংশী সমাজের মানুষের দীর্ঘ দিনের লালিত ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী মদনকামের দুটি রূপ দেখা যায়, যার একটি 'মদনকাম' অন্যটি 'বুড়া মদনকাম' ঠাকুর।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় এই মদনকাম দেবতার প্রচলন আছে। সেখানেও অনেক জায়গায় বাঁশকে মদনকামের প্রতীক এবং শিবলিঙ্গ হিসেবে মান্য করা হয়। অর্থাৎ মদনকাম এখানে শিবেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অবিভক্ত বাংলাদেশের রঙপুর এবং পূর্বদিনাজপুর জেলাতেও এই দেবতা পূজিত হন। কোন কোন ক্ষেত্রে এঁকে 'মদনকুমার'ও বলা হয়। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গিতে এই দেবতার পূজা ও Fertility cult-এর বা কৃষি সভ্যতার প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

জেলার মদনকাম বা বাঁশপূজাকে আমরা আদিম বৃক্ষপূজার বর্তমান রূপও বলতে পারি। সমাজবিজ্ঞানী J. G. Frazer-এর মতে বৃক্ষই বৃষ্টি ও সূর্যালোকের উৎস— "(Trees or treespirits are belived to give rain and sunshine.)"।[২৫]

এই পূজার মূল উপকরণগুলি হল ভাঙ্গের নাড়ু, চালের গুড়া, দুধ, চিনি, ফলমূল, পান ও সুপারী ইত্যাদির চৌদ্দখোল নৈবেদ্য; এছাড়াও থাকে চালনবাতি, ঘট, ধূপ, দীপ ইত্যাদি। এই উপলক্ষে হোম বা যজ্ঞ করা হয়। স্থানীয় অধিকারী ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করলেও বারকোদালী গ্রামের মারেয়ার বাড়ীর মূল পূজায় পৌরোহিত্য করেন আসমীয়া দেবশর্মা উপাধিধারী ব্রাহ্মণ।

যৌথভাবে মদনকামের দল বাঁশপূজা করলেও অনেকেই মানত করে বাড়ীতে বাঁশের গায়ে লাল কাপড় জড়িয়ে উঠোনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পুঁতে রেখে পূজা দেন। এ ব্যাপারে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল কোচবিহারের বারকোদালী গ্রামে অনেকে গান মানত করেন। এই ক্ষেত্রে মানতকারী বাঁশ সিজ্জন, নাড়ু খাওয়া ও বাঁশের জন্মকথা নিয়ে গান করেন। গানের ভাষা ও মদনকামের ভক্তাগণের পোশাক অশোভন থাকায় মেয়েরা এই গান শুনতেও যান না। উক্ত গ্রামে এক ক্ষেত্র-সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই— প্রত্যেকেই বাড়ীর বাঁশ স্নান করানোর জন্য নদীর ঘাটে নিয়ে যান এবং সেখানে বিশেষ করে বারকোদালী গ্রামে মরা রায়ডাক নদীর জলে প্রথমে বারকোদালী দামেশ্বর শিবের বাঁশ স্নান করানো হয় তারপর অন্য গ্রামবাসীদের বাঁশ স্নান করানোর পর সমস্ত বাঁশ একটি জায়গায় জড়ো হয়। দামেশ্বর বা বড় মহাদেব ধামের বাঁশকে বলা হয় সরকারী বাঁশ এবং গ্রামবাসীদের পারিবারিক বাঁশের নাম 'হম্‌কা বাঁশ'। যেমন— জামদারী বা ডাকুয়ার বাঁশ। কোন কোন বাঁশকে আট-দশজন লোক কাঁধে নিয়ে দৌড়ায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বাঁশগুলি ৫০-৬০ হাত লম্বা হয়। রায়ডাকের জলে বাঁশ স্নান করানোর পর শুরু হয় বাঁশ দৌড় প্রতিযোগিতা। সবচেয়ে লম্বা বাঁশ নিয়ে দ্রুত যারা বাঁশের থলার (মেলা) স্থলে পৌছান তাঁদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে গ্রামীণ মেয়েরা এই মেলার আনন্দ উপভোগ করেন। নদীর ঘাট থেকে বাঁশ নিয়ে বাহকগণ মেলার স্থলে মদনমোহনের সামনে পৌছানোর পর শুরু হয় স্থানীয় লোকবাদ্যের গগনভেদী আওয়াজের সঙ্গে মদনকামের দলের উদ্দাম নৃত্য।

কোচবিহারে বাঁশের প্রতীকে পুরুষ দেবতার পূজায় প্রকৃতপক্ষে আদিম বৃক্ষোপাসনা, যৌন প্রতীক অর্চনা, অশুভ শক্তির প্রতিরোধ এবং মানতের মাধ্যমে পেটব্যথা, জ্বর, নাকে মুখে রক্ত ওঠার মত দুরারোগ্য ব্যাধি দূর করার মধ্যেও এক অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস প্রতিভাত হয়। আর্থ-সামাজিক বিচারে বাঁশের প্রয়োজনীয়তাকে ছাপিয়ে এক আদিম জাগ্রত বিশ্বাস পরিস্ফুট হয় এই মদনকাম বা বাঁশপূজায়। সমগ্র উত্তরবঙ্গের জনজীবনে বাঁশের বিশাল ভূমিকা থাকলেও ধর্মীয় অনুষঙ্গে বাঁশকেন্দ্রিক এমন লৌকিক উৎসব কোচবিহার জেলা সদরের কয়েকটি গ্রাম এবং তুফানগঞ্জের বারকোদালী গ্রামের মত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। কোচবিহারের লোকজীবনের ধর্মীয় বিশ্বাসে, দৈনন্দিন জীবনে, আচার ও সংস্কারের সঙ্গে বাঁশ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে "উত্তরবঙ্গের মদনকাম বা বাঁশপূজা হোলির আদিমতম রূপ"। এই পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর গান। মদনকামের ভক্তাগণ মদনভুঞ্জি তিথির সাত-আট

দিন আগে থেকেই গান গেয়ে বিভিন্ন কসরৎ দেখিয়ে মাগন তুলতে শুরু করেন। এ সময় এঁরা থাকেন প্রায় উলঙ্গ অবস্থায়, কোমরে শামুকের খোলের মালা, মাথায় সুপারির খোলের টুপি, গায়ে থাকে ছেঁড়া জামা বা মাছধরার জাল, মুখে থাকে কালির প্রসাধন এবং বাড়ী বাড়ী খেলা দেখানোর সময় এঁরা উঠোনে জল ঢেলে কাদা করে বিভিন্ন ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তাদের মুখে থাকে জাগের গান। মদনকামের ভক্তাগণ বাঁশ খেলার এই ব্রতের শুরু থেকেই বাঁশের থলা পর্যন্ত মদনকামের দল নিজ নিজ বাড়ীতে থাকেন না, আহার ও রাত্রিযাপন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মারেয়া কিংবা কোন ভক্তের বাড়ীতে করেন। বাঁশ খেলার ক্রীড়াকৌশল, গান ও তাৎক্ষণিক অভিনয়ের ব্যাপারে যিনি এই দলের পরিচালক তাঁকে বলা হয় দোয়ারী। এই পূজার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে গান যা অনেক সময় রাত জেগেও গাওয়া হয় তাকে বলা হয় 'জাগের গান'। পুরুষাঙ্গের প্রতীক এই বাঁশপূজার মূল অনুষঙ্গই হল কামনা জাগরণ বা কামোদ্দীপক গান, যার জন্য একে বলা হয় জাগের গান বা জাগ গান।

'কোচবিহারের প্রাচীন কথা' গ্রন্থে কোচবিহারের জনৈক লেখক ফয়েজউদ্দীন আহমেদ ১৩২৯ সনের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যার 'পরিচারিকা' পত্রিকায় 'সেকালের পল্লীসমাজ' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন "চৈত্র মাসে এই মদনকাম দেবের পূজা হইয়া থাকে। যেমনি— দেবতা, পূজাও তেমনি— অদ্ভুত ও অশ্লীল। এই উৎসবের কয়েক দিবস কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ সকলেই নেংটি পড়িয়া গায়ে কালি মাখিয়া পুরানো বস্তা, কন্থা প্রভৃতি কোমরে বাঁধিয়া অশ্লীল অশ্রাব্য গানে দশদিক মুখরিত করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়।" এই প্রবন্ধে অন্য একটি জায়গায় তিনি লিখেছেন "এখানে হিন্দুদিগের মধ্যে মদন পূজায় বড় ধুম, মুসলমানের শয়তান এই 'মদন' প্রায় একই স্বভাব বিশিষ্ট। উভয়ই মানুষকে অসৎ কর্মে প্রবৃত্তি দেয়, সাধারণের ইহাই বিশ্বাস। শয়তান মুসলিম ঘৃণিত। শিক্ষিত হিন্দুগণও মদনকে ঘৃণা করেন। কিন্তু কোচবিহারবাসী হিন্দুগণ মদনের বড়ই ভক্ত।"[২৬]

ড. চারু সান্যালের মতে "কৃষিজীবী রাজবংশী সমাজ ধানকাটার পালা শেষ হওয়ার পর বাঁশ জাগাও অনুষ্ঠান পালন করেন। তাঁর মতে যে সাতটি দেবতার নামে তিনি পূজিত হন তাঁরা হলেন শালসিড়ি, মহারাজা, গেরাম, সন্ন্যাসী, তিস্তাবুড়ি, বিষহরি, কালী মাদারপীর।"[২৭] অপর পক্ষে ড. গিরিজাশঙ্কর রায় তাঁর 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা পার্বণ' গ্রন্থে পাঁচ রকম দেবতার নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা বাঁশের প্রতীকে পূজিত হন। যেমন— "সন্ন্যাসী, কালী, জগন্নাথ, বলরাম ও মাদারপীর।"[২৮] জলপাইগুড়ি জেলায় পূজিত হন বাঁশের প্রতীকে সাতজন দেবতা। অন্যদিকে কোচবিহারে পূজিত হন পাঁচজন দেবতা। এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে আমরা দেখতে পাই— শস্য উৎপাদনের পরে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের অন্তরালে লুকিয়ে আছে উর্বরতাকেন্দ্রিক কর্মধারা। এই ধরনের কামদেব বা মদনকামদেবের পূজা

"মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে দেবতার প্রতীক বাঁশগাছের বদলে শালগাছ।"[২২]

বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি তথা কোচবিহারের সংস্কৃতির অঙ্গনে মদনকাম ও বাঁশপূজার মত লোকউৎসব কোচবিহারের প্রাচীন ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আদিম বৃক্ষপূজা কালের বিবর্তনে যে লোকউৎসবের রূপ পরিগ্রহ করেছে তা শুধু বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করে না। নির্দিষ্ট গ্রামভিত্তিক এই উৎসবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের যোগদানের ফলে এক সার্বজনীন রূপ লাভ করে। লোকউৎসব শুধুমাত্র লোকমনে আনন্দ দানই করে না, পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে সকল মানুষকে।

গমীরা বা গাজন ঃ

সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের একটি লোকায়ত স্থানীয় উৎসব শিবকেন্দ্রিক গমীরা বা গাজন। উত্তরবঙ্গের হিন্দু বৌদ্ধ প্রভাব পুষ্ট এই অনুষ্ঠান জেলার বিভিন্ন মহকুমায় কোথাও শিবের গাজন, আদ্যের গাজন, নালের গাজন, ধর্মের গাজন, গমীরা খেলা, চড়ক খেলা ইত্যাদি খেলা নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এটি লোকায়ত কৃষিজীবী সমাজের বর্ষাবোধন অনুষ্ঠান। তন্ত্রসাধনা এই উৎসবের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পূর্ববঙ্গীয় জেলে, কৈবর্ত্য ও নমঃশূদ্র হিন্দু সম্প্রদায় এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোগী হলেও আজ স্থানীয় রাজবংশী ও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মেলবন্ধনে এক মিশ্র লোকায়ত সংস্কৃতির রূপ লাভ করেছে কোচবিহারের চড়ক বা গমীরা খেলা। তাই কোথাও শিবকেন্দ্রিক এই গাজন বা চড়ক পূজার লোকাচারে তন্ত্রসাধনায় আমরা একাধারে দেখতে পাই নমঃশূদ্র ও নমঃদাস সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী রাজবংশী দেউসী বা দেববংশী এবং অসমীয়া শর্মা উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য। জেলার চড়ক বা গাজন উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং প্রাচীন রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নিজস্ব কৃষ্টিকে ধরে রেখেছেন জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিকারপুর, গিলাডাঙ্গা, চেঙ্গারখাতাখাগরিবাড়ী, মেখলীগঞ্জ মহকুমার নিজতরফ, দেবীর ডাঙ্গা, নালারটারী ও বানিয়ারটারী গ্রামের চড়কের ঐতিহ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, যা জেলার অন্যান্য মহকুমায় অনুপস্থিত। বৃক্ষপূজা, বলিপ্রকরণ, পূজা পদ্ধতি, সন্ন্যাসী বা দেববংশীদের সংযম ও বাণফোঁর, আগুন ঝাঁপ, খাড়ার উপর পিঠ দিয়ে শুয়ে বুকে ছামগাইন (উদখুল) রেখে চিড়া ভুকানো (বানানো) প্রভৃতি আদিম কৃষিজীবী মানুষের যাদুবিদ্যামূলক সংস্কার আজও বহমান জেলার এই লৌকিক উৎসবে।

অধিক শস্য উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষায়, অধিক ফলনের প্রার্থনায়, জেলার লোকায়ত জনগোষ্ঠী এই অনুষ্ঠান করলেও আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব এতে বেশী দেখা যায়। যেমন— বাণমারা, বর্শি ফোড়ানো, কাউকে মৃত সাজিয়ে চিতায় দাহ করা, জিহ্বা ফোঁড়ানোর মত নৃশংস ভৌতিক কান্ডগুলি এখনও দেখা যায়। পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং জেলার

অনেক মহকুমায় এই অনুষ্ঠানকে চড়কের গাজন বললেও স্থানীয় রাজবংশী সমাজের কাছে এটি গমীরা খেলা নামে পরিচিত। ধর্মীয় অনুষঙ্গে এই উৎসব পালিত হলেও গমীরা খেলা বা চড়ক খেলা অর্থাৎ এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে খেলা শব্দটি যুক্ত হওয়ায় এক সার্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক উৎসব বলে একে গণ্য করা যায়। যার ফলে সকল ধর্মের বিশ্বাসী মানুষই এই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করেন। জেলার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গাজন উৎসব উপলক্ষে চড়কের অনুষ্ঠান এখনও বর্তমান।

পঞ্জিকা মতে বছরের শেষদিন মহাবিষুব বা চৈত্র সংক্রান্তিতে জেলার প্রায় সব গ্রামেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হলেও সাধারণত মাথাভাঙ্গার গিলাডাঙ্গা, শিকারপুর ও চেঙ্গারখাতাখাগরিবাড়ীর রাজবংশী সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রামেই এই উৎসবের প্রাধান্য চোখে পড়ে বেশী। উক্ত গ্রামের চড়কের পূজা, পদ্ধতি, প্রকরণ, পৌরোহিত্য, গাজন-সন্ন্যাসী ও দেববংশীদের পরিচালনায় চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকালে চড়কের নির্বাচিত বৃক্ষপূজা থেকে শুরু করে চড়কের গাছ প্রোথিত হওয়া পর্যন্ত দেববংশীর নিজস্ব ভাষায় মন্ত্রপাঠ ও একাধিক পায়রা বলি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই উৎসবটি স্থানীয় রাজবংশী সমাজের নিজস্ব সম্পদ।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে পূজা ও গমীরা খেলার উৎসবের সমাপ্তি পর্যন্ত দেববংশীকে নিরামিষ ভোজন করতে হয় এবং পূজা সমাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত নিজস্ব বাড়ীর কোন স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন না। নিরামিষ আহার যেমন অবশ্য কর্তব্য, অনেকে আবার দই চিড়া ব্যতীত কিছু খান না। ১৪০৫ সনের ৩১শে চৈত্র সংক্রান্তির দিন চেঙ্গারখাতাখাগরিবাড়ী গ্রামের গমীরা খেলার ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখা যায় দেববংশী মান্ডা রায়ের নেতৃত্বে পূজার বিভিন্ন পদ্ধতি ও লোকাচার। তিন পুরুষ ধরে মান্ডা রায় এতদঞ্চলে দেববংশীর কাজ করেন। বর্তমানে ৭৫ বছরের সুঠাম দেহ নিয়ে সারি সারি রাম দায়ের উপর পিঠ দিয়ে শুয়ে বুকে ছামগাইন (উদখুল) চাপিয়ে দেন এবং অন্যেরা চিড়া ভুকান (বানান)। বাণমারা, আগুনঝাঁপ, মৃতদেহ সাজিয়ে চিতায় তোলা, পিঠে বর্শি ফোঁড়ানো এবং বর্শি ফুঁড়িয়ে চড়কে ঘোরান প্রভৃতি সব কিছুর নিয়ন্ত্রক মান্ডা রায় নিজে এবং তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদা রায়। ইনিই জেলার চড়কের একমাত্র মহিলা দেববংশী।

গম্ভীর আকৃতির শিব থেকে শিবকেন্দ্রিক পূজা, মালদহের গম্ভীরা বা আদ্যের গম্ভীরা উৎসবও ঐ সময় থেকে হয়ে থাকে। জেলার মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জ মহকুমার গ্রামগুলির চড়ক বা গাজনের উৎসবের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বৃক্ষ পূজা বা চড়কের গাছ পূজা এবং পর্বত ভাঙা পূজা। দেববংশী মান্ডা রায়ের মতে শিমূলগাছই এই পূজায় শ্রেষ্ঠ হলেও বর্তমানে সহজলভ্য না হওয়ায় শিশুগাছকেই চড়ক বানানো হয়। এই উৎসবের সময় পাঁচ-সাত দিন দেববংশী দোয়ারীর নেতৃত্বে গমীরা খেলার দল বিভিন্ন গ্রামে ও মারেয়ার বাড়ীতে খেলা দেখান

ও রাত্রি যাপন করেন। চড়কের মূল অনুষ্ঠানের দিন সকালে দলের কোন ব্যক্তিকে মৃতবৎ সাজিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে মাগন তোলার পর উক্ত ব্যক্তিকে শ্মশানে চিতায় মন্ত্রপূত ভরের মাধ্যমে দাহ করা হয়। যদিও ব্যক্তিটি চোখের সামনে দাহ হচ্ছে বলে মনে হলেও পরবর্তীতে সশরীরে জ্যান্ত মানুষটি উঠে পড়েন। এর পর শুরু হয় দেববংশীর পৌরোহিত্যে চড়কের জন্য নির্বাচিত বৃক্ষপূজা। বৃক্ষপূজা সমাপনান্তে উক্ত গাছটি কেটে চড়ক খেলার নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে চড়কের ঘূর্ণনের উপযুক্ত করে তোলা হয়। এভাবেই প্রতি বছর চড়কের জন্য নতুন গাছ ব্যবহার করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় জেলার দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, জেলা সদরের বিভিন্ন গ্রামে পূর্ববঙ্গীয় জেলে, কৈবর্ত্য ও নমঃদাস সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত চড়কের অনুষ্ঠানে বলি, বৃক্ষপূজা ও প্রতি বছর নতুন গাছ ব্যবহারের প্রথা নেই। এই ক্ষেত্রে চড়কের গাছকে অনুষ্ঠানের পর কোন নির্দিষ্ট জলাশয়ে বা পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়। শুধুমাত্র চড়কের দিন সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে ঢাক, ঢোল ও বাজনা সহ আনুষ্ঠানিক ভাবে চড়কের গাছকে তুলে নির্দিষ্ট স্থানে আনা হয়।

চেঙ্গারখাতাখাগরিবাড়ীর দেববংশী মান্ডা রায়ের কথায় জানা যায় উক্ত গ্রামে চড়কের উৎসবের পর গাছটি কোন মারেয়ার (পৃষ্ঠপোষক) বহির্বাড়ীতে গেড়ে (পুঁতে) রাখা হয়। আবার কোনও কোনও গ্রামে পুকুর বা নদীর জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। এতদঞ্চলে চড়কের অনুষ্ঠানে দেববংশীর দলে দোয়ারী সহ ১৫/১৬ জন সুঠাম দেহের মাঝবয়সী ব্যক্তি থাকেন যাদের বলা হয় গমীরা খেলার ভক্তা। এই ভাবে পূজা পদ্ধতিতে দেখা যায় চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন পর্যন্ত দেববংশীর পৌরোহিত্যে শিব ঠাকুর পূজিত হন। অনুষ্ঠানের নবম দিনের শেষ ভাগে দেববংশী তাঁর দলের দুজন ব্যক্তিকে গ্রামের যে কোন বাড়ীর লাউগাছ থেকে একটি লাউ চুরি করে আনার জন্য পাঠান। ভক্তা দুজন লাউ চুরি করে এনে দেববংশীর হাতে দেন এবং চুরি করা ঐ লাউটিকে বলা হয় মানিক। আবার পাশাপাশি একটি বাঁশও চুরি করে আনতে বলেন। এই ঘটনাকে স্থানীয় গ্রামবাসীরা বলেন 'মানিক চোর'। চড়কের সঙ্গে এই মানিক সম্পর্ক থাকায় এতদঞ্চলের অনেকে এ সময় লাউ বিক্রি করেন না। নবমীর দিন সন্ধ্যার সময় দেববংশী তাঁর দলের আর একজন ভক্তকে মন্ত্র বলে বাণ মেরে শ্মশানে চালান দেন। এ সময় পূজাপ্রাঙ্গণে শুরু হয় উদ্দাম ঢাকঢোলের বাজনা। শ্মশানে যাকে চালান করা হয় তাঁর সঙ্গে দুজন সাহসী ব্যক্তিকে মশাল হাতে প্রেরণ করা হয়। এই ব্যক্তিকে শ্মশান থেকে কাঁচা বাঁশ বা অন্য কোনও চিহ্ন এনে দেখাতে হয়। "শ্মশানে যদি কোন জিনিস না পাওয়া যায় তবে চালান দেওয়া ব্যক্তি বাঁশ ঝাড় থেকে একটি কাঁচা বাঁশ তুলে এনে পূজার স্থানে এসে হাজির হন এবং আসামাত্রই ব্যক্তিটি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং ঐ অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে থাকেন। ঐদিন রাতে তাকে ঘুমোতে দেওয়া হয় না। স্থানীয় লোক বিশ্বাস করেন যদি তিনি ঘুমিয়ে পড়েন তবে তিনদিনের মধ্যে তার অবধারিত মৃত্যু।"[৬০] তাই কখনো বাজনা বা শারীরিক অত্যাচারের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তিটিকে জাগিয়ে রাখা হয়।

ঐ অবস্থায় তাঁকে বলা হয় 'শ্মশান' বা 'মশান'। তাঁর জ্ঞান ফেরানোর জন্য দেববংশী ঐ রাতে নানাবিধ ভূতপ্রেতের পূজা করেন এবং তাদের তুষ্টি বিধানের জন্য পাঁচজোড়া পায়রা বলি দেন। এভাবে শ্মশান নামক ব্যক্তির জ্ঞান ফেরে। এখানে এই পূজাকে বলা হয় শ্মশান পূজা। মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জ মহকুমার গমীরা বা চড়ক উৎসবের এটি অন্যতম অনুষঙ্গ।

মেখলিগঞ্জ মহকুমার নালারটারী গ্রামের মারেয়া চেতা বর্মণের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং দেববংশী পুলকচান বর্মনের নেতৃত্বে পর্বতভাঙ্গা বা কালী পূজায় উপস্থিত থেকে আমরা দেখতে পাই, "আগের দিনের চুরি করা বাঁশ, লাউ ও একটি কলাগাছ সাময়িকভাবে শিবঠাকুরের পাটের সামনে নির্দিষ্ট একটি স্থানে ধূপ, ধুনা, কলা ও বাতাসার মাধ্যমে পুরোহিত দেববংশী, মানতকারী মারেয়া ও ভক্তার দল ভক্তি নিবেদনের মাধ্যমে পর্বতভাঙ্গা কালী পূজা করেন।"[৩১]

চড়কের গাছ পোঁতায়, আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক প্রথায় যে ভৌতিক বা যাদুবিদ্যার কৌশল আমরা দেখতে পাই তা বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পরিণত শাল বা গর্জন বৃক্ষের কান্ডপূজা যেমন আদিম যাদুবিশ্বাসের কথা মনে করিয়ে দেয়, তেমনি এই বৃক্ষ বা কান্ডটি অনেকক্ষেত্রে যখন দীর্ঘদিন পুকুর বা নদীর জলে ডুবিয়ে রাখা, আবার জল থেকে এই গাছকে চৈত্রসংক্রান্তির দিন তুলে তেল ও কদলী মেখে চড়কের ঘূর্ণনের উপযুক্ত মসৃন করাকে 'গাছজাগানো' বলা হয়। এই কর্মকান্ডের জন্যই গাজন শব্দের উৎপত্তি বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। বৃক্ষ এখানে শিবের প্রতীক এবং পার্বতী এখানে ধরিত্রী। "চড়কের গাছ পোঁতানো ব্যাপারটি উর্বরতা ও কৃষিকাজের ব্যঞ্জনা বহন করে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এটি যৌন প্রতীকী কর্মধারার সংস্কৃতিও বলা যায়।"[৩২]

কোচবিহারের দেববংশী ও সন্ন্যাসীদেব প্রচলিত বিশ্বাস বাণফোঁড়ের ব্যক্তিগণ কখনই হাঁপানি, যক্ষা ও বাত প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হন না। নৃশংস এই কসরতের পরও সুস্থ থাকার কারণ হল শিব বা মহাদেবের অপার মহিমা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে আমরা এই আদিম বীভৎসতার নিদর্শনগুলি যেভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, কোচবিহারের লোকায়ত জীবনে দীর্ঘদিন লালিত সংস্কার, বিশ্বাস, এই সব বীভৎস প্রথার পালন এক ধরনের অলৌকিক শক্তির অধিকারী করে তোলে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস এই সম্প্রদায়ের দেববংশীগণ দেবতার অংশ এবং তাঁদের ধ্যানজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শক্তি দেবদেবীর আরাধনার ব্যাপারেও যথেষ্ট শক্তিশালী। এব্যাপারে W.W. Hunter সাহেবের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— "The pani koch posses no sort of learning; but among them are they are neighbours of the manner in which the gods are to be appeased."[৩৩]

জেলার চড়ক ও গমীরা খেলার বাণফোঁড়ের মত নৃশংস লোকাচারের প্রসঙ্গে বলতে হয় "মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক ১৮৭১ সালে স্টেট কাউন্সিলের আইন বলে পিঠে বর্শি

ফুঁড়িয়ে চড়কে ঘোরানোর মত নৃশংস প্রথা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিছুদিন তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যে এই প্রথা বন্ধ থাকলেও পুনরায় এই প্রথা চালু হয়। অর্থাৎ লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের কাছে রাজার নির্দেশ হার মানে।"[৩৪]

চড়ক পূজার সন্ন্যাসী, পুরোহিত ও দেববংশীগণ আজও অনেকে গ্রামে জলচলের বাইরে থাকেন। "সামাজিক জনতত্ত্বের দৃষ্টিতে বিচার করলে ধর্ম ও চড়ক বা গমীরা পূজা উভয়েই আদিম কোন সমাজের ভূতবাদ-পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এছাড়াও বাণফোঁড়, দৈহিক যন্ত্রণাভোগ বা রক্তপাতের উদ্দেশ্যে যে সব অনুষ্ঠান চড়ক পূজার সঙ্গে জড়িত তার মূলেও আছে আদিম কোন সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি।"[৩৫]

বারমাসের তের পার্বণের সর্বশেষ পার্বণের উল্লেখযোগ্য বৎসরান্তের চৈত্র সংক্রান্তির এই উৎসবটির সামাজিক ধ্যান-ধারণার একটি সদর্থক দিকও আছে। অর্থাৎ সম্বৎসরের ঐ একটি মাত্র দিনে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের প্রতি সম্ভ্রান্ত মানুষের সম্মান প্রদর্শন দেখা যায়। জেলার পাঁচটি মহকুমার নিবিড় ক্ষেত্রানুসন্ধানে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি যে সকল মেলা ও লোকউৎসবেই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের সমাগম ঘটে। ধর্মীয় অনুষঙ্গে অনুষ্ঠিত হলেও সম্বৎসরে অনুষ্ঠিত জেলার সবগুলি মেলা ও লোকউৎসব লোকসংস্কৃতির এক ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী। এক অর্থে বলা যায় মেলাগুলিও লোকউৎসব। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও লোকশিক্ষার বাহন। এমনকি ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রত্যক্ষ করা যায় মেলা ও লোকউৎসবে। মেলা ও লোকউৎসবগুলি যে লোকজীবনের মিলন ক্ষেত্র এবং বহুজনের মিলন তীর্থ তার পরিপূর্ণ লোকায়ত রূপ আমরা দেখতে পাই জেলার পাঁচটি মহকুমা ও একটি ব্লকের একাধিক গ্রামের বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত মেলা ও লোকউৎসবগুলির মধ্যে। একে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির এক বহমান প্রতিচ্ছবি বললে অত্যুক্তি হয় না।

তথ্য সূত্র

১। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার : গন্ধহবি অধিকারী, গ্রাম - বিলসী (গোষ্ঠপূজা প্রাঙ্গণ), তাং - ০৯/১১/৯৭ ইং।

২। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার : দেববংশী পুলকচান বর্মন, গ্রাম - বানিয়ারটারি (মাটিয়াখেলার প্রাঙ্গণ), মেখলিগঞ্জ, তাং - ১৩/০৪/৯৯ ইং।

৩। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার : ফজলুল হক, হলদিবাড়ি, ২৮/০৪/৯৯ ইং।

৪। প্রতি বছর দোল পূর্ণিমার পরের পূর্ণিমার দিনকেই কোচবিহারে মদনভূজি, রাসপূর্ণিমা, মদন-পূর্ণিমা বলা হয় :

৫। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার : পানিয়া বর্মন, মদনকামের দলের দোয়ারী, বাঁশপূজার মেলাপ্রাঙ্গণ, গ্রাম - ভাড়েয়া, বারকোদালী ১নং অঞ্চল, তুফানগঞ্জ, তাং - ১২/০৪/৯৮ ইং।

৬। বাঙালীর খেলাধূলা : শঙ্কর সেনগুপ্ত, পৃ - ২০৮ (১৯৭৬)।

৭। সাক্ষাৎকার ও ক্ষেত্রানুসন্ধান : পুষ্পনারায়ণ ভকত, গ্রাম - শালবাড়ি (অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ, জন্মাষ্টমী তিথি), তাং - ২৬/০৮/৯৮ ইং।

৮। বাঙালীর খেলাধূলা : শঙ্কর সেনগুপ্ত, পৃ - ১০৯ (১৯৭৬)।

৯। কোচবিহারের মেলা : চারুচন্দ্র রায়, মধুপর্ণী, কোচবিহার জেলা বিশেষ সংখ্যা, পৃ - ৩৪৪ (১৩৯৫), সম্পাদক : অজিতেশ ভট্টাচার্য, সংখ্যা সম্পাদক : আনন্দগোপাল ঘোষ।

১০। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার : দীবেন্দ্রনাথ বর্মন, চামটা গ্রাম, সিতাই, তাং ০৪/০৪/৯৯ ইং।

১১। Administrative Report Cooch Behar, 1892-93.

১২। শতবর্ষে পা দিল তুফানগঞ্জ দোল মেলা : স্বপনকুমার রায়, দৈনিক বসুমতী, ১৪ই মার্চ, (১৯৯২)।

১৩। Statistical Account of Bengal, V.(X), W.W. Hunter, P - 308, Reprint (1974)

১৪। কোচবিহারের ইতিহাস : খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ - ১৮৫ (১৮৩৫), কোচবিহার স্টেট।

১৫। Cooch Behar State its Land Revenue Settlement, H N. Choudhury, P-700 (1903)

১৬। জীবন ও সংস্কৃতি, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ-৬৩, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘ, কোচবিহার, সম্পাদক- ড. দিগ্বিজয় দে সরকার (১৯৮৮)।

১৭। লেখক : প্রয়াত যোগেন ঈশোর, কৃতজ্ঞতা স্বীকার — শ্রী শিশির ঈশোর ও নীলিমা ঈশোব, তুফানগঞ্জ, তাং - ০২/০১/২০০০।

১৮। রচনাবলী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃ-৩৯৩, বিশ্বভারতী (১৯৬৭)।

১৯। তুফানগঞ্জ মহকুমা শতবর্ষের প্রেক্ষাপটে পুরাকীর্তি, দেব-দেউল, পূজা-পার্বণ ও মেলা : দিলীপ কুমার দে, তুফানগঞ্জ মহকুমা শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদক — অমরেন্দ্র বসাক, ১৪ই জুন, ১৯৯২।

২০। Rabhas of West Bengal : Amal Kumar Das, Manish Kr Raha. Page-136 (1967)

২১। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার : কৃষ্ণকান্ত দেবশর্মা (পুরোহিত-বণেশ্বর শিবমন্দির), রবীন্দ্রনাথ বর্মন, দ্বিজেন সিং - চলন্ত বানেশ্বর শিবের বাহক। স্থান - কোচবিহার মদনমোহনবাড়ী, তাং - ১৬/০৩/৯৮ ইং।

২২। ধূমসোয়ারী : ফাল্গুনী পূর্ণিমার তৃতীয় দিনে সোয়ারী উৎসবে ধূমধারাক্কা কান্ড ঘটত বলে ঐদিনের সোয়ারী উৎসবকে বলা হয় ধূমসোয়ারী।

২৩। Statistical Account of Bengal · W.W. Hunter, Page-378, Volume X, Reprint (1974)

২৪। আসামের লোকসংস্কৃতি : যোগেশ দাস, পৃ-৮৫, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া (১৯৮৩)।

২৫। The Golden Bough, J.G. Frazer, P-185 (1974).

২৬। সেকালের পল্লীসমাজ : ফয়েজউদ্দীন আহমেদ, কোচবিহারের প্রাচীন কথা : সম্পাদক - বিশ্বনাথ দাস, পৃ-৩৯ (১৩৯৮)।

২৭। Rajbansis of North Beagal - Dr Charu Ch Sanyal, P - 138 (1965).

২৮। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ, ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, পৃ-৩১ (১৯৭১)।

২৯। জাগগান, সুখবিলাস বর্মন, পৃ-১১ (১৯৯৭)।

৩০। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, (১ম খণ্ড) ঃ সম্পাদক - অশোক মিত্র, পৃ-১৯২ (১৯৬৯)।

৩১। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার ঃ চেতা বর্মন - মারেয়া, পুলকচান বর্মন - দেববংশী, বানিয়ারটারী গ্রাম, মেখলীগঞ্জ, তাং - ৩১ শে চৈত্র, ১৪০৫।

৩২। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ, ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, পৃ-৪১ (১৯৭১)।

৩৩। Statistical Account of Bengal W W Hunter Page - 335 Vol X. Reprint (1974)

৩৪। Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement Harendra Narayan Choudhury, Page-305 (1902)

৩৫। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), ড. নীহাররঞ্জন রায়, পৃ-৪৮৫ (১৪০০)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লোকবিশ্বাস - সংস্কার, লোকাচার, লোকপুরাণ

ভূমিকা ঃ

লোকসংস্কৃতির বহু শাখার অন্যতম লোকবিশ্বাস, সংস্কার ও লোকাচার। মানুষের দুর্বল মানসিকতা, অনিশ্চয়তার আশঙ্কা, শুভ-অশুভ বোধ থেকেই লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের উদ্ভব। ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী তাঁর বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ গ্রন্থে বলেছেন— "লোকবিশ্বাস ও সংস্কার হল এক ধরনের প্রত্যয়।" সুসংহত কোন জনসমষ্টি যে বিশেষ আচার-আচরণ ও লোকাচারকে কর্তব্য-অকর্তব্য বলে বিবেচনা করেন, যার সঙ্গে শুভাশুভ বোধ জড়িত, তাই হল লোকবিশ্বাস। লোকবিশ্বাস বলতে বোঝায় সেই সব আচার-আচরণ কার্যকলাপকে যেগুলি পালনীয় বা বর্জনীয় বলে সংহত জনসমষ্টি শুধু বিশ্বাসই করেন না, প্রতি দিনের ব্যবহারিক জীবনেও মেনে চলেন। এই অর্থে লোকবিশ্বাসকে আমরা মানুষের একটি পরম্পরাগত নির্দিষ্ট ধ্যান-ধারণাও বলতে পারি। যেমন— কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজে প্রচলিত একটি লোকবিশ্বাস হল শিশুকে কোন রোগে আক্রমণ করলে 'যখাযখি'-র পূজা দিতে হয়। বিয়ের পূর্বে নব-দম্পতির মঙ্গল কামনায় ষাইটল বিষহরি বা মারাই পূজা দিতে হয়। কোচবিহারে বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয়দের বিশ্বাস, মেয়ের শ্বশুর বা শাশুড়ী কেউ মারা গেলে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে মেয়ে-জামাই ও পুত্র-কন্যাদের জন্য নতুন কাপড় কিনে দিতে হয়। এই কাপড় পরেই পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আধুনিক শিক্ষিত মানুষের একটি ধারণা লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত শুধু নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষ। কিন্তু শহুরে শিক্ষিত মানুষও কম-বেশী লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের বশবর্তী।

অনেক কুসংস্কারও এখানে সংস্কার বলে প্রচলিত। আপাত দৃষ্টিতে যে গুলির পক্ষে বাস্তব গ্রাহ্য কোন যুক্তি নেই এমন অনেক সংস্কার প্রচলিত আছে এখানে।

জেলার পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় সংগৃহীত লোকবিশ্বাস ও সংস্কারগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (১) লৌকিক দেবদেবী বিষয়ক, (২) কৃষি বিষয়ক, (৩) জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ বিষয়ক, (৪) লৌকিক চিকিৎসা বিষয়ক এবং (৫) অন্যান্য।

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার জেলার প্রায় সকল গ্রামেই কত প্রকট ভাবে প্রচলিত তা আমরা দেখেছি বিভিন্ন ক্ষেত্র-সমীক্ষায়। আজও জেলার প্রায় সকল গ্রামেই তাবিজ, কবচ, জলপড়া, ঝাড়ফুঁক, লোকদেবতার নামে পশু-পাখি মানত, ভোগুরিয়ার প্রভাব, সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসায় ওঝার প্রভাব। হারানো প্রাপ্তি সন্ধানে আজও অনেক গ্রামে অজ্ঞ গ্রামবাসীরা আশ্রয় নেন বাটি চালানের। "অনেক নৃবিজ্ঞানীগণ যাদুবিদ্যা ও তুকতাককে মনোবিশ্লেষণের পদ্ধতি দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে কুসংস্কার বিশ্বাসের অনেক কিছুর পেছনে এই প্রক্ষেপণের কায়দা-কানুন জড়িত রয়েছে, তাঁদের মতে দূরের বা গোষ্ঠী বহির্ভূত কোন মানুষের বা অবাঞ্ছিত কোন লোককে তুকতাক বা বশীভূত করার ভেতর সামাজিক লাঞ্ছনা পাওয়া থেকে যে নির্দয় অনুভূতির জন্ম, যেমন নাকি অপরকে আঘাত করার বাসনা, হিংসা, তুকতাক, ঘৃণা, ইন্দ্রজাল আসলে একধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।"[১]

লৌকিক দেবদেবী সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ঃ

নিশাঠাকুর সম্পর্কে রাজবংশী সম্প্রদায়ের ধারণা এই যে এই দেবতা অসন্তুষ্ট থাকলে শিশুগণ রাত্রে ঘুমাতে পারে না এবং বাবা-মার বিরক্তি উৎপাদন করে সর্বদা কান্নাকাটি করে। আক্রান্ত শিশু সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকে এবং খেতে দিলে সম্পূর্ণ খেতে পারে না। কোন শিশু এমন আচরণ করলে তাকে 'নিশা পাওয়া' বা 'নিশা লাগা' বলা হয় এবং এই ঘটনার পর নিশাঠাকুরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য পাটকাঠির মাথায় ইচ্‌লা (চিংড়ি) মাছ বেঁধে আগুনে পোড়ানোর নিয়ম আছে।

অস্বাভাবিক অবস্থায় কোন কুমারী মেয়ের মৃত্যু হলে সে পৈরী (উপদেবী পরী) এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হলে সে পেত্তানীতে রূপান্তরিত হয়। পৈরী এবং পেত্তানী এই দুই দেবতার আক্রমণ একই রকম। তারা উভয়েই বাড়ীর নিকটবর্তী কলাবাগান, বাঁশবাগান ও শেওড়া গাছে অধিষ্ঠান করেন বলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস।

কোচবিহার জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ষাইটল দেবী বিষহরির কৃপায় সন্তানবতী হয়েছিলেন। সেই সন্তান দুটির বিয়ের সময় দেবী বিষহরির পূজা দিতে ভুলে যান, ফলে অধিবাসের সময় তাঁদের মৃত্যু হয়। পরবর্তী কালে তাঁরা বিষহরির আশীর্বাদে বেঁচে ওঠেন। তাই রাজবংশী সমাজে ছেলে-মেয়েদের বিয়ের সময় ষাইটল বিষহরির পূজার প্রচলন আছে।

একজন পুরোহিত ছিল। সে পূজা করলে স্বয়ং ভগবান এসে পূজা গ্রহণ করতেন। দেশের রাজা তা শুনে পুরোহিত মহাশয়কে ডেকে পাঠালেন। অনেক মন্ত্র আওড়াবার পর সেদিন ভগবান এলেন, যাবার সময় বলে গেলেন রোজ পূজা গ্রহণ করতে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্য তিনি বললেন পূজার পর শাঁখ বাজাতে। শাঁখের শব্দ শুনে স্বর্গ থেকেই তিনি পূজা গ্রহণ করতে পারবেন। এই ঘটনা থেকে শাঁখ বাজান প্রথার প্রচলন হয় বলে স্থানীয় মানুষ বিশ্বাস করেন।

কৃষি- সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ঃ

কৃষি-নির্ভর লোকজীবন প্রকৃত অর্থেই এতদঞ্চলে প্রকৃতি-নির্ভর। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা ও শিল-বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের কৃষিজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই অতিবৃষ্টি ও বন্যার তোপে নদীর ভাঙন আটকাতে নিরক্ষর, সহজ, সরল গ্রামবাসীগণ বুড়াঠাকুরের পূজা দেন। অনাবৃষ্টির হাত থেকে ক্ষেত ও শস্য রক্ষার জন্য গান গেয়ে বৃষ্টি নামান।

কৃষি-নির্ভর জনজীবনে এখানে এক প্রচলিত বিশ্বাস হল পিতা ও পিতামহ যিনি কোন দিন বৃক্ষ রোপণ করেন নি বা যিনি কোন দিন ফসল আবাদ করেন নি তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় মালভোগ কলাগাছ রোপণ করেন। আবার যে পরিবারে পূর্বপুরুষরা শাক আলু বা কেশর আলু বোনেন নি তাঁদের কেউ তা বুনলে পরবর্তী বংশধরগণ রোগ-ভোগে আক্রান্ত হন। এ ধরনের লোকবিশ্বাসে হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদ নেই।

সব্জী ক্ষেতে কোন হাঁড়ি-কলসীর মূর্তি তৈরী করে রাখলে বা কাকতাড়ুয়া রাখলে কারও নজর লাগে না এবং ফলন বেশী হয়। অর্থাৎ প্রতিবেশীর কুদৃষ্টি থেকে ক্ষেতের ফসল রক্ষার জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা হয়।

এতদঞ্চলের রাভাগণ কচ্ছপের খোলে করে যে কোন শস্য বা বীজ ক্ষেতে ফেললে ফসলের ফলন বাড়ে বলে বিশ্বাস করেন।

মাঠে ফসল কাটার সময় ধান বা পাট যাই হোক না কেন দুই-একটি গাছ ক্ষেতে রাখতে হয়। এতে লোকবিশ্বাস হল আগামী বছর ক্ষেতে ফসল বেশী হবে।

এতদঞ্চলের কৃষিজীবী রাভাগণ অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে নয়া খাওয়ার 'চকোত' দিয়ে থানসিড়ি পূজা দেন। তাঁদের বিশ্বাস এতে পারিবারিক সমৃদ্ধি ঘটে।

আম, কাঁঠাল কিংবা পেঁপে জাতীয় কোন ফল গাছে প্রথম ফল ধরলে গাছে ঝাঁটা, ছেঁড়া জুতো প্রভৃতি মালার আকারে পরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ এতে কারো কুদৃষ্টি পড়ে না এবং প্রচুর ফলন হয়।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে শিলাবৃষ্টি হওয়ার সময় উঠোনে কাঠের পিড়ি ছুঁড়ে দিতে হয়। লোকবিশ্বাস এতে শিলাবৃষ্টি ও ঝড় থেমে যায়। সর্ষে ছিটিয়ে দিলেও অনুরূপ ফল হয় বলে বিশ্বাস।

লোকচিকিৎসা-বিষয়ক লোকবিশ্বাস ঃ

উত্তরবঙ্গের লোকায়ত গ্রামীণ জীবনে আক্রান্ত রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে আজও এক অখন্ড বিশ্বাস দেখা যায় ওঝা, কবিরাজ ও ভোন্ডরিয়ার প্রতি।

কোচবিহারের লোকজীবনে লোকবিশ্বাস ও সংস্কার-নির্ভর লোকচিকিৎসার মাধ্যমগুলি হল— (ক) খোঁকি দেখা বা কাঠি দেখা, (খ) ভোঙর ডাঙানো ও মাসান পূজা, (গ) ভর ওঠানো বা ভরে পড়া, (ঘ) কান্দির জল, (ঙ) সাপে কাটা ও বসন্ত রোগের ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির মাধ্যমে।

খোঁকি দেখা বা কাঠি দেখা ঃ

কোচবিহারের লোকায়ত চিকিৎসা পদ্ধতির অন্যতম মাধ্যম হল 'খোঁকি দেখা' বা 'কাঠি দেখা'। খোঁকি অর্থে এখানে বোঝানো হচ্ছে কাঠিকে। অর্থাৎ দুটি বা তিনটি কাঠি হাতে নিয়ে রোগগ্রস্ত রোগীর মানত অনুযায়ী পূজার পূর্বে রোগের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য রোজা বা ওঝা নিজে পরীক্ষা করেন। এর মাধ্যমে ওঝা নিশ্চিত হতে পারেন যে রোগী কোন অপদেবতা কর্তৃক আক্রান্ত নাকি অন্য কোন রোগে আক্রান্ত। এভাবে রোগ নির্ণয়ের পর ওঝা বা রোজা বা কোন কোন ক্ষেত্রে ভোঙরিয়া ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করেন। এরূপ ভাবে ওঝার নির্দেশেই আক্রান্ত কোন শিশু রোগী এলে যখা-যখির এবং বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে শারীরিক বা মানসিক কোন উপসর্গ সৃষ্টি হলে মাসান কালী বা অন্য কোন অপদেবতাকে কি ধরনের মানতের সাহায্যে পূজা করা হবে তা বলে দেন।

ভোঙর ডাঙানো ও মাসান পূজার মাধ্যমে রোগ নির্নয় ঃ

ভর থেকেই ভোমর বা ভোঙর কথাটি এসেছে এবং ভরগ্রস্ত অবস্থায় ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, লোকবাদ্য ঢাকের সাহায্যে এবং বিভিন্ন গাছপালার মাধ্যমে লোকচিকিৎসার আয়োজনই কোচবিহারে ভোঙর ডাঙানো নামে পরিচিত। এরূপ চিকিৎসা পদ্ধতিতে ওঝা বা রোজা স্থান ভেদে ভোঙরিয়া গাছপালা বা বিভিন্ন জড়িবুটি ও বিভিন্ন ঔষধ প্রকরণ, অপদেবতা ও ভূত প্রেতের অশরীরী আত্মার আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। অনেক সময় ভরগ্রস্ত অবস্থায় ভোঙরিয়া বা ওঝাগণ রোগগ্রস্ত মানুষের নিরাময়ের উপায় এবং সমাগত মানুষের বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের উত্তর দেন।

ভর ওঠানো/ভরে পড়া ঃ

কোচবিহারে অন্যতম লোকচিকিৎসা পদ্ধতি হল ভর ওঠানো বা ভরে পড়া। এই পদ্ধতিতে ভরে পড়া বা ভরগ্রস্ত ব্যক্তি পূজা বা অনুষ্ঠানের শেষে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে যেমন রোগের চিকিৎসা করেন তেমনি পারিবারিক শুভ-অশুভ সংকেতের কথা বলেন। এতদঞ্চলে প্রচলিত বিশ্বাস, কোন ব্যক্তির শরীরে কোন দেবতা বা অপদেবতা অধিষ্ঠিত হলে সেই ব্যক্তির মধ্যে যে অস্বাভাবিক কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায় তাকেই বলে ভর হওয়া। কোচবিহারের অনেক মহিলা কালী সাধিকা যেমন ভরে পড়েন এবং ভরগ্রস্ত অবস্থায় বিভিন্ন অলৌকিক কথাবার্তা বলেন। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ওঝা, রোজা, দেওধা, দেউরী বা ভোঙরিয়াগণ ভরগ্রস্ত হয়ে রোগী ঝাড়ান এবং অনুসন্ধিৎসু ও অসহায় মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

কান্দির জল ঃ

স্থানীয় রাজবংশী সমাজে লোকবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অপর এক চিকিৎসা পদ্ধতি হল 'কান্দির জল' ছিটানো। চৈত্র সংক্রান্তির দিন উক্ত রাতে একটি মাটির পাত্রে ভাত রেখে তাতে জল দেওয়া হয় ও পাত্রটি রাখা হয় তুলসীমঞ্চের পাশে। পরপর দুই দিন দুই রাত্রি ঐ ভাতের পাত্রের জল পাল্টানো হয়। তিনদিন পার হয়ে যাওয়ার পর চতুর্থ দিন পাত্রটি বাড়ীর পূর্ব দিকের বা উত্তরের বড় ঘরের 'থানসিড়ি' ঠাকুরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়, এই জলকেই বলা হয় কান্দির জল। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অগাধ বিশ্বাস— বজ্রাহত মানুষের চোখে-মুখে 'কান্দির জল' ছিটিয়ে দিলে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এখনও এতদঞ্চলের মানুষ বিশ্বাস করেন বজ্রাহত মানুষকে লোকে স্পর্শ করলে তৎক্ষণাৎ সে মারা যায়। তাই তাকে স্পর্শ করার পূর্বেই তার চোখে-মুখে কান্দির জল ছিটিয়ে দিলে সে পুনরায় বেঁচে উঠবে। লৌকিক এই চিকিৎসার প্রচলন কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও নিম্ন আসামের বহু গ্রামে এখনও প্রচলিত আছে।

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ বিষয়ক লোকবিশ্বাস ঃ

জেলার প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস বিবাহিতা রমণীদের গর্ভকালীন সময়ে সাত ও আট মাস সময়ের ব্যবধানে আত্মীয়-স্বজনদের তাঁদের আদরযত্ন করে খাওয়াতে হয়। একে সাধ খাওয়ানো বলে।

মুকুন্দরাম তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করেছেন—

"নয় মাসে নিদয়ার সাধ দেয় ব্যাধ
নিদয়া ভাবিয়া কহে প্রভুরে বিষাদ।"[২]

এতদঞ্চলে নবজাতকের হাতে লোহার বালা পরানোর লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। নবজাতকের হাতে লোহার বালা পরালে ভূত-প্রেত নবজাতককে আক্রমণ করতে পারে না।

এতদঞ্চলে প্রচলিত একটি লোকবিশ্বাস হল যখা-যখি নামক অপদেবতার কু-দৃষ্টি। যে সকল স্ত্রীলোক মৃত সন্তান প্রসব করেন বা যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার অল্প কিছুদিন পর মারা যায় সেই সমস্ত পরিবারের পিতৃমহোদয়গণ মনে করেন সন্তানকে সত্বর বিয়ে দিলে আর মরবে না। "এই লোকবিশ্বাস ও সংস্কার কোচবিহারে একদিন, দুই-তিন মাস বা দুই তিন বছরের বালক-বালিকার বিয়ে অর্থাৎ বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। এই বিয়েকে বলে গা ছুঁয়া করা।"[৩]

যদিও সময়ের বিবর্তনে শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশের ফলে 'গা ছুঁয়া' করা বা বাল্যবিবাহের মত প্রাচীন প্রথা বর্তমানে প্রচলিত নেই।

কোচবিহারের পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে কন্যার বিয়ের পর কন্যার পিতা-মাতা নির্দিষ্ট সময়ের (এক বছর) আগে কন্যার বাড়িতে কিছু খান না। খেলে মূল্য দিতে হয়।

জন্মবারে যেমন বিয়ে হয় না তেমনি জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়ে হয় না। হলে বর-কন্যার মনোমালিন্য হয়।

এতদঞ্চলে বসবাসকারী বাংলাদেশের (পাবনা জেলার) লোকদের একটি বিশ্বাস হল বিয়ের দিন শাশুড়িকে একটি টাকা (Coin) দিয়ে মা বলে ডাক দিতে হয়, তা না হলে শাশুড়ি-বউ সম্পর্ক মধুর হয় না।

জেলার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের অপর একটি লোকবিশ্বাস হল বিয়ের দিন বৃষ্টি হলে নবদম্পতি সুখে থাকে।

কলাগাছকে স্বর্গীয় বৃক্ষ হিসেবে কল্পতরু বলে মনে করা হয় এখানে। এই বৃক্ষের নিকট যা কামনা করা যায় তাই পাওয়া যায়। কলাগাছ ধরিত্রী দেবীর প্রতীক।

বাঁশ কাটা সম্পর্কেও এতদঞ্চলে লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে— 'মঙ্গলে না মারি গাটি, শনি বারে না কাটি মাটি।' শনি ও মঙ্গলবার যথাক্রমে বাঁশ কাটা যায় না, ঘরের কোন কাজও করা যায় না।

অন্যান্য লোকবিশ্বাস ঃ

কোচবিহারের প্রায় সকল গ্রামেই প্রচলিত একটি লোকবিশ্বাস হল— শনি ও মঙ্গ লবার কোন শেওড়া গাছের তলা দিয়ে যাওয়া নিষেধ। কারণ শেওড়া গাছই মাসান ও অপদেবতার আশ্রয় স্থল।

সংখ্যাবাচক কিছু চিহ্ন শুভ অশুভের প্রতীক হয়ে আছে। তাই অনেক ক্ষেত্রে বিজোড় সংখ্যা শুভ বলে মানা হয়। গৃহপালিত পশু— গরু, ছাগল, মহিষ কিংবা স্থাবর সম্পত্তি জমির ক্ষেত্রেও আমরা শূন্য অঙ্কে অর্থ প্রদান না করে এক টাকা বেশী দেওয়ার রেওয়াজ প্রত্যক্ষ করি এতদঞ্চলে। সাত ও পাঁচ সংখ্যা দুটি শুভ কাজের প্রতীক।

মুসলিমদের সকল শুভকাজের মধ্যে ৭৮৬ নম্বর ব্যবহার করা হয়।

আবার দিনরাত্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেও বিভিন্ন প্রহর সম্পর্কে মানুষের মধ্যে এমন কিছু মজ্জাগত সংস্কার আছে যা প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। যেমন— সাত সকাল বা ভর দুপুরে কাউকে কোন কিছু দান করা নিষেধ। বিশেষ করে দুপুরে স্নানের পর। এক কথায় বারবেলায় কোন শুভ কাজ নিষেধ।

ক্ষতিকারক বিভিন্ন পশু-পাখি বা প্রাণী সম্পর্কেও এতদঞ্চলে বিধি নিষেধ হল তাদের নাম সরাসরি এতদঞ্চলে উচ্চারণ করা হয় না। ভিন্ন শব্দ দ্বারা পরোক্ষভাবে তাদের বোঝানো হয়। যেমন— (১) বাঘকে বলা হয় 'বুড়ার বেটা', (২) রাতে সাপকে বলা হয় 'পোকা' বা

'লতা', (৩) বসন্ত রোগ দেখা দিলে বলা হয় 'মায়ের দয়া', (৪) মৃতবৎসার সন্তানের নাম রাখা হয়— পচা, কানা, পাগলা ইত্যাদি।

কোন মনুষ্যেতর প্রাণী, জড়বস্তু বা উদ্ভিদ প্রভৃতির সঙ্গে সমাজজীবনের প্রতীকধর্মী যে সম্বন্ধ আজও বর্তমান তাদেরকে আমরা 'টোটেম' বলতে পারি। 'টোটেম' হচ্ছে কুল প্রতীক। এদের নিয়ে সামাজিক জীবনে নানা বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত। কোচবিহারের রাভা, রাজবংশী, মেচ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আজও অনেক টোটেম বা কুল প্রতীকের প্রতি এমন গভীর বিশ্বাস আছে যে তারা তাঁদের রক্ষক এবং শুভকর্মের প্রতীক। আজও প্রায় সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একই টোটেমভুক্ত পরিবারের বিবাহ নিষিদ্ধ।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও নিম্ন আসামের রাভাগণ তাঁদের গোত্রকে বলেন 'হুসুক'। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমগোত্রে যেমন বিবাহ হয় না তেমনি 'কচ্ছপ' ও 'মেজিপ্রাণ' গোত্রের রাভাগণ কচ্ছপ খেতে পারেন না। রাভা সম্প্রদায়ের মধ্যে অপর এক গোত্র 'প্রেমেরাই'। এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত রাভাগণ দই খেতে পারেন না। এতদঞ্চলের রাভাগণ বিশ্বাস করেন সমগোত্র বা 'হুসুকে' বিবাহ করলে পূর্ব পুরুষগণ রুষ্ট হবেন।

কোচবিহারে রাজবংশী ও রাভা সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও টোটেমের প্রতীক স্বরূপ উল্কি প্রথা প্রচলিত।

বিশ্বাসের সঙ্গে বহু কুসংস্কার বা 'ট্যাবু' আচ্ছন্ন করে রেখেছে কোচবিহারের লোকমানসকে। যদিও সময়ের বিবর্তনে আজ অনেক কুসংস্কার বিলুপ্তির পথে যা যুক্তিবাদী লোকমন সকল ক্ষেত্রে মানতে চান না। তবুও কিছু লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কার এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। যেমন— (১) কোন স্ত্রীলোক কোন রোগীকে ঔষধ সেবন করাতে পারেন না, কারণ তাতে কোন ফল হয় না; (২) অনেক পরিবারে পিতাও পুত্র-কন্যাকে ঔষধ সেবন করান না; (৩) রবি ও বৃহস্পতিবার বাঁশ কাটলে বাঁশ ঝাড় নষ্ট হয়ে যায়; (৪) বাড়ীর পূর্ব দিকে বাঁশ বন, কাঁঠালগাছ, উত্তর দিকে জিগনি গাছ, উত্তর ও পূর্ব দিকে তেঁতুল গাছ এবং পশ্চিম দিকে তাল গাছ থাকলে গৃহস্থের বাড়ীতে রোগ-ভোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে; (৫) স্থানীয় বারুজীবীগণ বিশ্বাস করেন পানের বরজ সবসময় বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম দিকে থাকা শ্রেয়; (৬) মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ীর বহু গ্রামের মানুষ সোমবার ধান রোপন করলে এবং বুধবার মেয়ের বিয়ে দিলে অঘটন ঘটতে পারে বলে বিশ্বাস করেন; (৭) কাকের ডাক শুনে কোথাও যাত্রা করতে নেই, বিশেষ করে কোন শুভ কাজে; লোকায়ত বিশ্বাস কাক অশুভ শক্তির প্রতীক; (৮) রাত্রিবেলা লবণকে লবণ বলতে নেই, এমন কি এক বাড়ির লবণ আর এক বাড়িতে দেওয়া-নেওয়া হলে সংসারে অশান্তি আসে; (৯) চুণকে রাত্রে চুণ না বলে দই বলতে হয়, কারণ রাত্রিতে চুণ বললে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস; (১০) সন্ধ্যেবেলা বিশেষ করে শনি ও মঙ্গলবার কোন মেয়েকে

এলোচুলে বাইরে বেরুতে নেই; (১১) লোকবিশ্বাস হল কালোবিড়াল ডান দিকে গেলে ভালো, অপর পক্ষে বাম দিকে গেলে অশুভ লক্ষণ; (১২) রাত্রিবেলা সুই বা সূচ কিনতে দোকানে 'বিন্দি' বলতে হয়, সুই বলে কিনলে ক্রেতার বাড়িতে ঝগড়া-ঝাটির আশঙ্কা থাকে; (১৩) বৈশাখ মাসে ঘরের চালের উপর লাউগাছ রাখতে নেই, রাখলে লক্ষ্মী চলে যায়; (১৪) কারুর কাছ থেকে রুমাল নিতে নেই, কাউকে দিতেও নেই, কারণ রুমাল দেওয়া-নেওয়া হলে উভয়ের সম্প্রীতি নষ্ট হয়; (১৫) রাত্রি বেলা সাপকে বলা হয় লতা বা দড়ি।

কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে নিরক্ষর মহিলাদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস ও সংস্কার বেশী দেখা যায়।

লোকাচার

ভূমিকা ঃ

গ্রামীণ লোকায়ত সমাজের নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর গভীর আত্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে কখনো ব্যক্তিগতভাবে বা পারিবারিকভাবে, কখনো সমষ্টিগতভাবে পারিবারিক বা সামাজিক মঙ্গলকামনায় কিংবা কোন পার্থিব কামনায় প্রচলিত কোন ঐতিহ্য অনুযায়ী লোকায়ত দেব-দেবী, অশুভ শক্তি, অপদেবতা প্রভৃতিকে সন্তুষ্টি বিধানে কিংবা কোন অলৌকিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে অশুভ শক্তির বিনাশ সাধনে আচার পালনই লোকাচার। এরূপ লোকাচার বা সংস্কারমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেয়েদের ভূমিকাই বেশী থাকে।

কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজের গোছরপানা, বিষুয়াপার্বণ, পূর্ববঙ্গের ঢাকা, মৈমনসিংহ, টাঙ্গাইল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে গারু-সংক্রান্তি বা গার্সী ব্রত, চৈত্র সংক্রান্তির দিন শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ছাতু খাওয়া বা পরদিন নষ্ট বা বাসী খাবার খাওয়ার মত প্রভৃতি লোকাচার দেখা যায়।

ধানকে কেন্দ্র করে একাধিক লোকাচারমূলক অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে কোচবিহারে। এক কথায় বলা যায় জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ জীবন চক্রের এই তিনটি পর্যায়েই এতদঞ্চলে মানুষের জীবনে লোকাচারের প্রভাব অপরিসীম।

নামকরণ ও ভাতছোঁয়া (অন্নপ্রাশন) অনুষ্ঠান ঃ

নবজাতকের মস্তক মুন্ডনের পর নামকরণ হয় আর জন্মের দিন, ক্ষণ, মাস, ঋতু অনুযায়ী সন্তানের নামকরণ হয়ে থাকে। যদি কোন সন্তানের সোমবারে জন্ম হয় সে ক্ষেত্রে সন্তানের নাম হয় সমারু, মঙ্গলবারে জন্ম হলে নাম হয় মঙ্গালু, বুধবারে হলে বুধারু, বৃহস্পতিবারে জন্ম হলে নাম হয় বিষাদু, শুক্রবারে হলে নাম হয় শুকারু। আবার কার্তিক মাসে জন্ম হলে নাম হয় কাতিরাম, ফাল্গুন মাসে জন্ম হলে নাম হয় ফাগুনা (ফাগুনা বর্মন, তুফানগঞ্জ ১নং

অন্দরানফুলবাড়ী অঞ্চল)। "নামকরণ সম্পর্কে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রবাদ হল— "ঠগে নষ্ট করে গাঁও, আর বাপ মা নষ্ট করে ছাওয়ার নাঁও।"[৪]

এই নামকরণের বৈচিত্র্য মেয়েদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন— চৈত্র মাসে কোন মেয়ের জন্ম হলে তার নাম হয় চৈতি, সোমবারে জন্ম হলে নাম হয় সমারী ইত্যাদি। এমনি করে সন্তানের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ৭, ৯ কিংবা ১১ মাসে সন্তানের প্রথম মুখেভাতের অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'ভাতছোঁয়া' অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে স্থানীয় মানুষের লোকাচার হল একটি জলপূর্ণ ঘটের মধ্যে সিঁদুরের দ্বারা একটি মূর্তি এঁকে তার উপর আম্রপল্লব ও সুপারী গাছের পাতা দিয়ে রাখা হয়। একটি চালুনের উপর পাঁচটি ছোট মাটির প্রদীপ দেওয়া হয়। এই চালুনবাতির সামনেই সন্তানকে এনে মুখে ভাত দেওয়া হয়। সাধারণত মাতামহী প্রথমে ভাতের গ্রাসটি সন্তানের মুখে তুলে দেন। এসময় অনেক পরিবারে বিয়ের মত গান গাওয়ার রেওয়াজ আছে।

ছুঁয়াকাটা নবুদ অনুষ্ঠান ঃ

লোকাচারমূলক এই অনুষ্ঠানে দেখা যায় অনুষ্ঠানের দিন বান্দের বৈদ্য (গুণিন) বাড়ীতে আসেন। এই বান্দের বৈদ্য হলেন যিনি নবজাতকের জন্মের মুহূর্তে 'জাতকবচ' দেন। ইনি একাধারে তন্ত্র-মন্ত্রের অধিকারী। শিশুর জন্মের তিনদিন পূর্ণ হওয়ার পর এক কামানি দেওয়ার পর এক মাস পূর্ণ হলে দুই কামানি দেওয়া হয়। স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা ক্ষত্রিয় তাঁদের তেরো দিন অথবা ত্রিশ দিনের মাথায় এই ছুঁয়াকাটা নবুদ হয়। সন্তান গর্ভস্থ হওয়ার পর থেকেই এ সকল ক্ষেত্রে ওঝার কেরামতি শুরু হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম 'জাতকবচ' দেন ওঝা বা গুণিন। এই জাতকবচ একটি সুতোয় তৈরী। এঁর এটি মন্ত্রপুত করে হাতে বেঁধে দেওয়া হয়। এর পর বাবা-মা নিশ্চিন্ত হন যে শিশুর আর কোন ভয় নেই। সর্বশেষে বৈরাগী ও বোষ্টম দ্বারা বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও অধিকারী সম্প্রদায়ের নির্দেশ অনুযায়ী রাশিমাত্রিক দেবদেবীর পূজা পালন করা হয়। বৈরাগী কর্তৃক নবুদ না দেওয়া পর্যন্ত সন্তান মাতা-পিতা কেউ অশৌচমুক্ত হন না বা হতে পারেন না।

চূড়াকরণ ঃ

সন্তানের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাতছোঁয়া বা অন্নপ্রাশনের পর ছয়, বারো ও আঠারো মাস পূর্ণ হলে ছেলে মেয়ে উভয়ক্ষেত্রে যে আনুষ্ঠানিক ভাবে মস্তক মুন্ডনের প্রথা প্রচলিত, তাকে বলা হয় চূড়াকরণ। বাড়ীর বাইরে কোন স্থানকে মনোনীত করে তার চারপাশে নিশান গেড়ে এবং একটি চরকা সেখানে স্থাপন করা হয়। বুড়ি মা নামক দেবতার আশীর্বাদে চুল গজায় বলে কর্তিত চুলগুলি সে দেবতার নিকট নিয়ে যায় অথবা মাটিতে পুঁতে রাখে।

হিন্দু প্রণালী অনুসারে বিবাহের কিঞ্চিৎ পূর্বেই চূড়াকরণ হয়। এই কাজে প্রথমে অধিকারী চাল ও পাকা কলা দেবতার নামে উৎসর্গ করেন। পরে নাপিত কানের লতি কোন গাছের কাঁটা অথবা রূপা বা লোহা দিয়ে তৈরী কাটার সাহায্যে ছেদন করে।

W.W. Hunter সাহেব তাঁর 'Statistical Account of Bengal' গ্রন্থে স্থানীয় সম্প্রদায়ের এই লোকাচারের কথা উল্লেখ করেছেন— "The rite of Chura-Karna is to all intents and purpose, a formal profession of faith or entry into Hinduism and must be undergone by every child, male or female at sometime before marriage"[৫]

মৃত্যুজনিত লোকাচার ঃ

বারো মাসে তেরো পার্বণের মত কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লোকাচারের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। এই সমাজে মৃত্যু কেন্দ্রিক লোকাচারগুলি বৈদিক আচার-নির্ভর হলেও বেশীর ভাগই লোকাচার ও লোকবিশ্বাসে সমৃদ্ধ। বাড়ীর তুলসী মঞ্চের সম্মুখে মৃতদেহের মুখে চরণামৃত ও তুলসীপাতা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর শবযাত্রা শুরু হয় এবং শ্মশানে অধিকারী ব্রাহ্মণ কর্তৃক জ্ঞায়েস্তা নিজে হাতে প্রথম হবিষ্যান্ন রান্না করে তাৎক্ষণিক তুলসী মঞ্চে নিবেদন করার পর দাহ কাজ শুরু হয়। এটাই মৃতের উদ্দেশ্যে প্রথম পিন্ডদান। দাহ কাজের সময় যে উল্লেখযোগ্য লোকাচার রাজবংশী সমাজে পালন করা হয় তা হল 'দহন ভাঙা'। যদিও মৃতের মুখাগ্নির দায়িত্ব প্রথমে মৃত ব্যক্তির বড় ছেলের উপরেই বর্তায় এবং মুখাগ্নির সময় যিনি এক নিঃশ্বাসে এক কলসী জল ব্যবহার করেন, তিনি সাধারণত ভাগনা ও ভাইস্তা। কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের দাহ কর্মে যিনি মুখাগ্নি করেন তাকে বলা হয় 'মুখানলি' এবং দাহকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে জল দিয়ে যিনি সাহায্য করেন তাকে বলা হয় 'জ্ঞায়েস্তা'। মুখানলি বা মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি চিতাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে অগ্নি সংযোগ করেন এবং জ্ঞায়েস্তা কলসীর জল সহ মুখাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে চিতা প্রদক্ষিণ করেন ও জল ছিটিয়ে যান। দাহকর্মের শেষে অনুষ্ঠিত হয় 'দহন ভাঙা'র লোকাচার। "এই অনুষ্ঠানে দেখা যায় মুখানলিকে নদীতে ডুবে থাকতে হয়। আর জ্ঞায়েস্তাকে পূর্বের জলপূর্ণ কলসীটিকে ডুবন্ত মুখাগ্নিকারীর মাথার উপর এক আঘাতে ভেঙে দিতে হয়। জল থেকে মাথা তুলে মুখাগ্নিকারীকে কোন গাছের দিকে বা জঙ্গলের দিকে তাকাতে হয়। কোন মানুষের দিকে বা জীবজন্তুর দিকে তাকান নিষেধ। কারণ প্রচলিত ধারণা হল যে মুখানলি জল থেকে মাথা তুলে যাকে প্রথম দেখবে সে মারী খাবে।"[৬]

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অনুষঙ্গ হিসেবে সবশেষের লোকাচার হল পসাড় ভাঙ্গা অনুষ্ঠান, অর্থাৎ মুখানলি বা মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর কলাগাছের ঢোঙ্গায় (খোল) কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব হাতে তৈরী একঢোঙ্গা কাঠিয়া ধূপ মাথায় নিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মূল কেন্দ্রের চারদিকে সাতপাক ঘুরবে, সঙ্গে থাকবে ভাই, ভাইস্তা ও পরবর্তী বংশধরেরা। এসময় চলবে সমবেতভাবে মনঃশিক্ষা, তুক্ষা ও দেহতত্ত্বের গান। তুফানগঞ্জ মহকুমার মারুগঞ্জ অঞ্চলের মরাডাঙ্গা গ্রামে শরৎচন্দ্র রায় এক সাক্ষাৎকারে জানান, গানের শেষে কলার ঢোঙ্গাসহ কাঠিয়া ধূপকাটি একসঙ্গে উল্টিয়ে রেখে মাটিতে গড়াগড়ি দেয় এবং এ সময় অনেকে কান্নাকাটি করে। এরপরেই তাঁরা মাছভাত খান। যাকে বলা হয় মৎস্যমুখী।

অস্থি বিসর্জন ঃ

কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী ও আদিবাসী সমাজের লোকায়ত বিশ্বাস ফাল্গুন-চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমী তিথিতে গদাধর, কালজানি নদীতে অস্থি ক্ষেপণ পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পবিত্র এবং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কারণ কোচবিহারের মানুষের বিশ্বাস গদাধর, কালজানির জল উক্ত তিথিতে গঙ্গার চেয়েও পবিত্র। উক্ত দিন স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ পুনরায় মাথা ন্যাড়া করে অস্থি বিসর্জন পূর্বক স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্রে দই ও আটিয়া কলা সহযোগে চিড়া খান। এই চিড়া খাওয়ার লোকাচার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী। জেলার শুধুমাত্র গদাধর নদীতেই নয় উক্ত অষ্টমী তিথিতে গদাধর, কালজানি, শানিয়াজান, মানসাই, শুটুঙ্গা প্রভৃতি নদীর ধারে স্নান মেলা উপলক্ষে পরলোকগত পরমাত্মীয়দের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দুধ, কলা, তিল ইত্যাদি দিয়ে পিন্ডদান করেন জেলার রাজবংশী রাভা ও অন্যান্য উপজাতিগণ। এ ব্যাপারে তর্পণ করান অধিকারী বামুনগণ। অনেকে শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে জল্পেশ ধামে গিয়েও পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে থাকেন।

"পূর্বে এই সম্প্রদায়ের (রাজবংশী) মধ্যে মৃতদেহ দাহ না করে সমাধি দেওয়া হত। অনেকটা যোগী, নাথ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত। এ ছাড়াও অপর এক লোকবিশ্বাস কাজ করত, যার জন্য মৃতদেহ বাড়ীর পেছন দিকের বেড়া ভেঙে নিয়ে যাওয়া হত এবং তিনদিন পরে ভাঙা বেড়া জুড়ে দেওয়া হত যাতে মৃত আত্মা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত এক লোকশ্রুতি আছে, জলপাইগুড়ি জেলার রঙধামালির হাটটি নাকি পূর্বে রাজবংশীদের সমাধি প্রাঙ্গণ ছিল।"[৭]

এই সমাধি প্রথা আজও রাজবংশী অধিকারী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু তিন বছরের কম কোন শিশুর মৃত্যু হলে সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই সমাধি প্রথা প্রচলিত। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থে লিখেছেন — "গর্ভবতী সধবা নারীর মৃত্যু হলে স্বামী পেট কেটে সন্তানটি বার করে তাকে সমাধি দেন এবং মাতাকে দাহ করেন। কোন কোন অঞ্চলে গর্ভবতীর শব সমাধিস্থ করে সেখানে একটি কলাগাছ রোপণ করা হয়। ঐ গাছ মৃত ব্যক্তির জীবনের প্রতীক।"[৮]

কোচবিহারের স্থানীয় মুসলিম সমাজে আপনজনের বিয়োগে মৃত্যুর তিন দিনের মাথায় কমপক্ষে দুই-তিনজন ভিক্ষুককে পেট ভরে আহার করানোর মত লোকাচার পালন করা হয়।

বিয়ের লোকাচার ঃ

জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ এই তিনটি ঘটনা মানুষের জীবনের অপরিহার্য বিষয়। এর মধ্যে বিয়েকে কেন্দ্র করে শাস্ত্র বহির্ভূত এমন কতকগুলি লোকাচার বা রীতিনীতি আছে যা

শুধুমাত্র বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয় লোকসমাজের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। রাজবংশী সমাজের বিবাহ-কেন্দ্রিক নিয়ম নীতি ও আচারগুলি সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে হয়। একটি বৈদিক বা শাস্ত্র-নির্ভর, অপরটি অশাস্ত্রীয় লৌকিক আচার-নির্ভর, যা সৃষ্টির মূলে মেয়েদের ভূমিকাই বেশী। যার জন্য এদের স্ত্রী আচার বলা হয়। সর্বোপরি বলা যায় দীর্ঘ দিনের লালিত সংস্কার ও আমোদ প্রিয়তাই এগুলির উৎস।

জেলায় এই সম্প্রদায়ের বিয়েতে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য লোকাচারগুলি নিম্নরূপ—

(ক) পানকাটা অনুষ্ঠান; (খ) জপ ছেঁড়া অনুষ্ঠান; (গ) নারদের ভার নেওয়া (ভার খোওয়া); (ঘ) অধিবাস; (ঙ) ষোল মাতৃকা পূজা; (চ) খৈ তোলা; (ছ) খেলা ও গীত।

পানকাটা অনুষ্ঠান ঃ

বিয়ে উপলক্ষে এই সমাজে প্রথম লোকাচার হল পানকাটা অনুষ্ঠান। এটি বিয়ের প্রথম আনুষ্ঠানিক মাঙ্গলিক কর্মকান্ড। এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয় হল গুয়া-পান বা পান- সুপারী খাওয়ার মাধ্যমে বিয়ের দাবি-দাওয়া ও বিভিন্ন আনুষঙ্গিক চুক্তির আলোচনা। পূর্ববঙ্গীয়দের মত এই সমাজে পূর্বে বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের জন্য কোন আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। পানকাটা অনুষ্ঠানের মূল কথাবার্তা ঘটকের মাধ্যমে হত সাধারণত নৈশভোজের পর। পান ও সুপারী নিয়ে কোচবিহারের বৈবাহিক সম্পর্ক কেন্দ্র করে অপর অনুসঙ্গ হল সুবচনী ঠাকুরকে গুয়া-পান দেওয়া। যদিও শুধুমাত্র বিয়ের ক্ষেত্রেই নয়, কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের মানুষ যে কোন শুভ কাজেই সুবচনীকে গুয়া-পান দিয়ে থাকেন।

জপ (জব) ছিঁড়ে দেওয়া অনুষ্ঠান ঃ

এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয়ই হল পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পর বিয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। অর্থাৎ বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হওয়ার পর বাড়ীর বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বাড়ীর সবার সম্মুখে বিয়ের দিন তারিখ ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিতা রমণীগণ কন্যার বিয়ের ক্ষেত্রে তিনবার জোকার (উলু) এবং পুত্রের বিয়ের ক্ষেত্রে চারবার জোকার দেন। এই দিন অনেকক্ষেত্রে বরের পক্ষ থেকে বয়ঃজ্যেষ্ঠ কোন ব্যক্তি টাকা ও এক জোড়া গুয়া পান কন্যার হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই বিয়ের প্রথম লোকাচার। পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে এরূপ লোকাচার পালিত হয় পাটিপত্রের মাধ্যমে। অর্থাৎ শীতল পাটিতে বসে বিয়ের যাবতীয় কথাবার্তা পাকা হবার পর বিয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। সেক্ষেত্রে কাঁচা টাকার সিঁদুরের ছাপ ও কাচা হলুদের ফোঁটা দিয়ে চুক্তিবদ্ধ কথাগুলো পূর্বে পাটিতে বসে লেখা হত বলেই এর নাম ছিল পাটিপত্র। এক্ষেত্রেও দুই রকম 'জোকার' প্রচলিত।

নারদের ভার নেওয়া (ভার খাওয়া) ঃ

কোচবিহারে রাজবংশী সমাজের বিয়েকে কেন্দ্র করে যে একাধিক লোকাচার প্রচলিত আছে তারই অন্যতম 'নারদের ভার নেওয়া' নামক লোকাচারটি। এই লোকাচারটি বিয়ের দিন

পালিত হয়। বর যখন বিয়ে করার জন্য বরযাত্রী সহ কন্যার বাড়ী অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন তখন বরের ভাগ্নে অথবা ভাই বিভিন্ন উপকরণে নির্মিত এক ভার নিয়ে বরের সহযাত্রী হয়ে যান। এই ভার বলতে একটি বাঁকের দুই দিকের এক দিকে থাকবে এক ঝুঁকি ষোলটিয়া কাঁচা মনুয়া কলা, মাছ, এক ঘটি দই, দুটি মাছ, সিঁদুরের ফোঁটাসহ (পুঁটি / রুই), ভারের অপর দিকে থাকবে বাঁশের তৈরী গোলাকার এক ঝুড়ির মধ্যে চাল, সিঁদুরের পাতা ও পান-সুপারী। এটি পূর্ববঙ্গীয়দের বিয়েতে তত্ত্ব পাঠানোরই প্রাচীন রূপ। এই ভার নিয়ে যাত্রার মূল নিয়ম হল বরের বাড়ীর উঠানের তুলসীমঞ্চ থেকে যাত্রা শুরু করে কন্যার বাড়ীর তুলসীমঞ্চে গিয়ে রাখা হয়।

কোচবিহারের সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মামা আয়ান ঘোষের বিয়েতে নারদের নির্দেশে এই সকল উপকরণ ভারে করে নিয়ে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। কোচবিহারের লোকজীবনে প্রাচীন লৌকিক আচারমূলক এই প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজও বৈবাহিক অনুষ্ঠানে এই লোকাচার দেখা যায়। তুফানগঞ্জ মহকুমার বালাঘাট গ্রামের শ্রী টীকেন্দ্রনাথ বর্মন এক সাক্ষাৎকারে পৌবাণিক এই প্রথাটির কথা জানান।

শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ মেনে বৈবাহিক অনুষ্ঠানের দই, চাল, মাছ, পান প্রভৃতির খরচ যোগান দেওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই নিয়ম রক্ষার্থে সামান্য কিছু জিনিসের ভার সাজিয়ে নিয়ে যেতে হয় ভাগ্নেকে। পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নারদের নির্দেশে মামার বিয়েতে ভার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে এই লোকাচারটি 'নারদের ভার নেওয়া' নামে পরিচিত।

অধিবাস ঃ

বিয়ের আগের দিনকেই বলা হয় অধিবাস। এদিন পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষই পরিষ্কার করে স্নান করে পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে বাড়ীর তুলসীমঞ্চের সামনে বসবে। একটি মাটি বা পিতলের ঘটে আমের পল্লব, একজোড়া পান-সুপারী, হলুদ কাপড় দিয়ে মুড়ে তুলসীমঞ্চে কন্যার সামনে রাখবে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের অধিকারী বামুন এসে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক মাথায় তুলসী পাতা দিয়ে ঘটের জল ছিটিয়ে দেন। ঈশ্বরের কাছে বর ও কন্যাব মঙ্গল কামনা করেন নূতন জীবনের শুভ সূচনায়।

স্থানীয় মুসলিম বিয়েতে গায়ে হলুদ ঃ

কোচবিহারে স্থানীয় মুসলিম সমাজে বিয়ের আগের দিন বর অথবা কনে উভয় পক্ষেই পাত্র-পাত্রীর গায়ে হলুদের লোকাচার প্রতিপালিত হয়। গায়ে হলুদের মত লোকাচার-মূলক অনুষ্ঠানে এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস শরীরের কোন অংশেই যেন হলুদ বাদ না যায়। এতে পাত্র-পাত্রীর অমঙ্গ ল হতে পারে। গত ১৫/৮/২০০০ তারিখে তুফানগঞ্জ মহকুমার পানিশালা গ্রামের ইয়াসিন আলি এক সাক্ষাৎকারে জানান— "গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের দিন বর ও কন্যার উভয়ের বাড়ীতে অভিনয়ের মাধ্যমে ধোপা, নাপিত ইত্যাদি সেজে সারারাত ধরে নাচ ও গানের প্রচলন আছে।"

বিয়ের দিন ষোলমাতৃকা পূজা ঃ

কোচবিহার ও নিম্নআসামের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ পুত্রের বিয়ের ক্ষেত্রে বংশগত ও পারিবারিক ভাবে প্রচলিত দেবদেবীর পূজা করেন। এই সমাজের বিয়ের অপর বৈশিষ্ট্যমূলক লোকাচার হল ষোলমাতৃকা পূজা। এ ছাড়াও আছে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান। এইরূপ লোকাচারমূলক অনুষ্ঠানে যে উপকরণগুলি লাগে তা হল এক ঝুকি ষোলটিয়া মনুয়া কলা, ষোলটা করে কুলের পাতা, হলুদের টুকরো, আদার টুকরো, কাঁচা সুপারীর টুকরো, পান, দুর্বা, তুলসীপাতা, ফুল, বেলপাতা ইত্যাদি এছাড়াও দরকার দুধ, দই, ঘি, মধু ও চিনি।

রাজবংশী সমাজে বিয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে বৈরাতিগণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিয়ের দিন বিয়ের গীত ও কড়িখেলা, চালখেলা ও আংটি খেলার মত লোকাচার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

খৈ তোলা ঃ

এটি বিয়ের রাত্রিতে হোম বা যজ্ঞের শেষে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের মূল লোকাচার হল মেয়ের ছোট ভাই বেতের ধামা থেকে খই তুলে নিয়ে বর ও কন্যার মাথায় ছিটিয়ে দেন। ছোট ভাই এভাবে খৈ ছিটানোর পর তাকে গামছা উপহার দেওয়া হয়।

বিয়ের গীত বা গান ও খেলা ঃ

কোচবিহারের গ্রামীণ পরিবারে বিয়ের আসরে বিয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে গান গাওয়ার রীতি দীর্ঘদিনের। নর-নারীর মধ্যে নূতন জীবনের সম্পর্কের সৃষ্টিতে এই গান অনেক ব্যথা বেদনায় ভরপুর। আবাল্য পিতৃ-মাতৃ স্নেহে পালিত কন্যা যখন চিরতরে সম্পর্ক ছেদ করে নূতন জীবনে প্রবেশ করে তখন বাড়ীর বয়স্কা নারীগণ বিরহ্ বেদনায় কাতর হয়ে বিয়ের গান গায়, চোখের জলে ভাসায়। জেলায় বিয়ে উপলক্ষে এই গীত বা গানকে হিন্দু সমাজে বিয়ের গান বললেও মুসলিম সমাজে একে বলা হয় বিয়ের গীত বা সাদির গীত। বৈবাহিক অনুষ্ঠানে খেলার মত অন্যতম আচার এই বিয়ের গীত। কোচবিহারের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ ও অন্যান্য হিন্দু সমাজের ব্যবহারিক জীবনের কোথাও কোথাও রামসীতা, কোথাও বা রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির রূপকের আড়ালে বিয়ের গীতগুলি এতদঞ্চলে জীবন্ত হয়ে ওঠে। বিয়ের পাকা-দেখা, জলভরা, অধিবাস, দধিমঙ্গল, বরবরণ, বধূবরণ প্রভৃতি পর্যায়ে এই গান গাওয়া হয়।

মুসলিম সমাজে বিয়ের দিন পাত্রের গায়ে হলুদের সময় গানের প্রাধান্য বেশী দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় স্থানীয় মুসলিম পরিবারে বিয়ের দিন এয়ো স্ত্রীরা সিঁথিতে সিঁদুর দেন। জেলায় বিবাহ কেন্দ্রিক অন্যান্য লোকাচারের মত অবশ্য পালনীয় লোকাচার হল বিয়ের গীত।

বিয়ের অপর উল্লেখযোগ্য লোকাচার হল কনের সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া। কোচবিহারের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের বিয়েতে কনের কপালে সিঁদুর দেওয়ার লোকাচারটি অনুষ্ঠিত হয় বিয়ের পর দিন সকালে কনের বাড়ীতে কিংবা কনে শ্বশুর বাড়ী যাবার পর স্নানের পর। এখানে বর তাঁর হাতের আংটিতে সিঁদুর নিয়ে কনের সিঁথিতে দিয়ে দেয়। আর পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে বিশেষ করে ঢাকার অধিবাসীগণ এই লোকাচারটি পালন করেন বাসী বিয়ের শেষে ছাতনা তলায়। সেক্ষেত্রে বর তাঁর দর্পণে সিঁদুর নিয়ে কনের সিঁথিতে দিয়ে দেন। আবার মৈমনসিং, টাঙ্গাইল অঞ্চলে বিয়ের পর দিন বাসী বিছানায় বর দর্পণের মাধ্যমে কনের কপালে সিঁদুর দেন।

বৈবাহিক পবিত্র অনুষ্ঠানে এই লালরঙ, হলুদ রঙ, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি প্রাচীন ট্যাবু সংক্রান্ত এবং আচার সংক্রান্ত প্রভাব বলে মনে হয়। অনেক ক্ষেত্রে লোকবিশ্বাস হল এই বিধি নিষেধ সংক্রান্ত ট্যাবুগুলির অবমাননা বর-কন্যা উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গলজনক।

মিতর ধরা ঃ

কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজে আত্মীয়তার বন্ধন শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্কে নির্ধারিত হয় না। এখানে ধর্মীয় সামাজিক ও লৌকিক বিশ্বাসে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক লোকাচারের মাধ্যমে দুটি পূর্ব পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে আত্মীয়তার মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়। যে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মিত্রতা, বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তা সৃষ্টি হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'মিতর ধরা', 'পানিছিটা' অনুষ্ঠান। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোন প্রবীণ নারী বা পুরুষকে দীর্ঘদিনের পরিচয় ও সান্নিধ্যের ফলে 'ধর্ম পিতা' ও 'ধর্ম মাতা' ডেকে অনেকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন।

জেলার পাঁচটি মহকুমা— দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, মেখলীগঞ্জ, জেলা সদর ও হলদিবাড়ী থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রথা পালন করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে ধনী, গরিব বা সম্প্রদায়গত কোন বিভেদ থাকে না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীর মধ্যেও সখীত্বের বন্ধন সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ "যার সাথে মজে মন সেই তার আপন জন।"

রাজবংশী সমাজে বিয়ের পাত্রী সম্প্রদানের পর যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে 'মিতর ধরা' অনুষ্ঠান হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ছেলের বা পাত্রের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি পুরোহিতের নির্দেশে মিতরধরা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। বিগত ২৩শে মাঘ (১৪০৬ বাংলা) শুক্রবার তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী বড়চৌকি গ্রামে পাত্র তারিণীকান্ত সরকার ও মিনতি সরকারের (পাত্রী) বিয়েতে পাত্র তারিণীকান্ত সরকারের বন্ধু তপন দেবনাথই মিতর হয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। অনুষ্ঠানের নির্ঘন্টে একটি জলপূর্ণ আম্রপল্লব সহ কলসী হাতে নিয়ে পাত্রের বন্ধু পাত্রের হাতে তুলে দেন। অনেক সময় দুজনেই কলসীটি হাতে নিয়ে ধরে থাকা অবস্থায় ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করেন। মাঙ্গলিক মন্ত্র উচ্চারণের পর নূতন মিত্র নিজ হাতে পাত্রটি রেখে দেন। এভাবেই রাজবংশী সমাজের

বৈবাহিক অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ এই প্রথার মাধ্যমে শুধু বরবধূই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন না, তাঁদের বন্ধুস্থানীয়রাও আত্মীয়তায় আবদ্ধ হন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই মিতর বা মিত্রই প্রথম নববধূকে যৌতুক প্রদান করেন। তারপর পরিবারের সবাই নবদম্পতিকে যৌতুক বা আশীর্বাদ দেন।

পূর্ববঙ্গে 'কোলজামাই' এবং পশ্চিমবঙ্গে 'মিতবর' নামান্তরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীন কোচবিহার বলতে একদিন যে ভৌগোলিক সীমায় ছিল রঙপুর, কোচবিহার, গোয়ালপাড়া, জলপাইগুড়ি কিংবা কামরূপ বা কামতাপুর এবং যার জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য গরিষ্ঠ অংশই হল রাজবংশী জনগোষ্ঠী। তাঁদের বৈবাহিক সংস্কার, লোকাচার আজও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি রাজবংশী সমাজে দশকর্ম পদ্ধতি সম্পূর্ণই কামরূপের পূর্ব সংস্কারের অনুসারী। এরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মীয়তা সৃষ্টির পর মিত্র দুই পরিবারের মধ্যে যেমন বৈবাহিক সম্পর্ক হয় না তেমনি একে অপরের মৃতের অশৌচ পালন করেন। এক মিত্রের কন্যা বা পুত্র অপর মিত্র ও তাঁর স্ত্রীকে তাওই (তাহই), মাওই (মাহই) বলে সম্বোধন করেন। দুই পরিবারের প্রবীণদের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকারে একে অপরকে হাঁটু গেড়ে প্রণাম বিনিময় করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুজনের নাম এক হলে উভয়ে উভয়কে মিতা বলে সম্বোধন করার রীতি আছে যা আজ শহরাঞ্চলের উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মধ্যেও দেখা যায়। যদিও এই ক্ষেত্রে কোন অনুষ্ঠান হয় না। জেলার কোন কোন গ্রামাঞ্চলে মিতরের পিতামাতাগণ পরস্পরকে 'সোঙ্‌রা', 'সুঙ্‌রী' বলেও সম্বোধন করেন। মিতর বা মিতা শব্দ দুটিই সংস্কৃত গর্ভজাত 'মিত্র' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

পানি ছিঁটা অনুষ্ঠান ঃ

বাংলার সীমান্তবর্তী জেলা কোচবিহার ও পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামের মধ্যে জনবিন্যাসের ভিন্নতা থাকলেও কোচবিহার ও আসামেব হিন্দু বাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি এর বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্যও লক্ষ্য করা যায়। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এতদঞ্চলের রাজবংশী হিন্দু সমাজের বৈবাহিক অনুষ্ঠানের অন্যতম লোকাচার "পানি ছিঁটা" নামক অনুষ্ঠান। বিয়েকে কেন্দ্র করে অনাত্মীয় পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টিতে পানি ছিঁটা বাবা ও মা অর্থাৎ বর ও কনের মাথায় জল ছিঁটিয়ে বাবা ও মার মত গুরুজনের সম্মানীয় ও আত্মীয়তা সৃষ্টির প্রথা শুধুমাত্র কোচবিহারেই নয় সমগ্র আসাম ও উত্তরবঙ্গের স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পানি ছিঁটা বাবা ও মা হওয়ার প্রথা দীর্ঘদিনের। বয়স্ক পুরুষ বর-কনের মাথায় জল ছিঁটালে তিনি হন বাবা বা বাপ আর বয়স্কা মহিলা জল ছিঁটালে তাঁর সঙ্গে পাত্র-পাত্রীর সম্পর্ক হবে মায়ের। রাজবংশী সমাজের বৈবাহিক অনুষ্ঠানের লোকাচারের অন্যতম 'মিতর ধরা' অনুষ্ঠানের পরই এই পানি ছিঁটা কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরূপ পবিত্র আত্মীয়তা সৃষ্টির কাজের জন্য বয়স্ক পুরুষ বা মহিলা আগেই নির্বাচিত করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন

নিকট আত্মীয়কে এরূপ কাজের জন্য রাজী করানো হয়। বিয়ের দিন তাঁরা উভয়েই নিরামিষ খান। কোচবিহার ও আসামের এরূপ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শর্মা উপাধিধারী অসমীয়া ব্রাহ্মণগণ।

ক্ষেত্র-সমীক্ষায় গত ১৪০৬ সনের ১৩ই মাঘ, শুক্রবার নাটাবাড়ী অঞ্চলের বড়চৌকি গ্রামে পাত্র তারিণীকান্ত সরকার ও পাত্রী মিনতি সরকারের বিয়ের আসরে এরূপ পানি ছিঁটা অনুষ্ঠানে পুরোহিত ছিলেন কালীকান্ত দেব শর্মা আর পানি ছিঁটা বাবার ভূমিকায় ছিলেন নীলকুমার বর্মন, মায়ের ভূমিকায় ছিলেন অঞ্জলি বর্মা। এই অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ কর্তৃক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পানি ছিঁটা বাবা ও মা বর ও কনের মাথায় বিয়ে উপলক্ষ্যে রক্ষিত পবিত্র জল আম্রপল্লব দ্বারা উভয়ের মাথায় ছিঁটিয়ে দেন। এর পর বর কন্যা উভয়েই এই বাবা ও মাকে প্রণাম করেন। বিনিময়ে পানি ছিঁটা বাবা-মা বর-কনেকে কোন উপহার সামগ্রী দিয়ে আশীর্বাদ করেন। এই পানি ছিঁটা প্রথা বা লোকাচার সম্পূর্ণ-ই আঞ্চলিক। আত্মীয়তার বন্ধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি উপলক্ষ্য মাত্র।

আত্মীয়তা বন্ধনের এই লোকাচারটি কোচবিহারের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। বাংলার অন্যত্র, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের সয়লা উৎসব, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের 'সখা হালা' ও 'ভাদাভাদি' প্রভৃতি আত্মীয়তার অনুষ্ঠান হলেও বৈবাহিক অনুষ্ঠানে 'পানি ছিঁটা' বাবা-মার অনুষ্ঠান একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করলে কোচবিহার ও নিম্ন আসামের এই লোকাচারটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

সখা হালা ঃ

কোচবিহারের 'সখা হালা' আর দক্ষিণবঙ্গের 'সয়লা', এ শুধু নাম ও আঙ্গিকে পার্থক্য। কিন্তু এ দুটোরই মূল উদ্দেশ্য বন্ধুত্ব স্থাপন। সখা বা সই পাতানোর যে অনুষ্ঠানকে সখা হালা বলা হয় তাতে দেখা যায় বন্ধুত্ব বা সখা হালায় আগ্রহী ও ইচ্ছুক যুবকের পিতা অপর যুবকের অভিভাবকের কাছে সখা হালা করার জন্য বিয়ের মত ঘটক বা কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠান। উভয় পক্ষের সম্মতির পর পঞ্জিকা অনুযায়ী শুভদিন দেখে অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করেন। মূল অনুষ্ঠানের দিন প্রথম কিশোরটি বা যুবকটি তাঁর আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে দই, কলা, মিষ্টি, নতুন বস্ত্র নিয়ে গরুর গাড়ি কিংবা রিক্সা অথবা অন্য কোন যানবাহনে উপস্থিত হয় বাড়ীর তুলসী তলায়। নবাগত কিশোরকে সবাই সাদর আমন্ত্রণ করে বাড়ীতে নিয়ে যান এবং এই সময় রাজবংশী সমাজের সকল গৃহদেবতার পূজা দেওয়া হয়। নবাগত যুবকদ্বয় স্নান করে নতুন বস্ত্র পরে পাটি বা আসনে পাশাপাশি বসেন। রাজবংশী পুরোহিত দেবদেবীর নিকট অর্ঘ্য সহ নতুন আত্মীয়তার দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার শেষে যুবকদ্বয় পুরোহিত ও বাড়ীর গুরুজনদের প্রণাম করেন। নতুন সম্পর্কে আবদ্ধ এই যুবকগণ তাঁদের উভয়ের পিতামাতাদের

সেদিন থেকেই তাহই ও মাহই বলে সম্বোধন করেন। কোন কোন জায়গায় সামর্থে কুলালে বিয়ের মত স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্য উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

কোচবিহারের এই উৎসবে দক্ষিণবঙ্গের সয়লা উৎসবের মত কোন জাতের বিচার করা হয় না। বন্ধুত্ব স্থাপনের এই উৎসব উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের উদারতা ও সামাজিক নৈতিকতা বোধের পরিচায়ক বলা যায়। লোকসংস্কৃতিবিদ বিনয় ঘোষের মতে "বাংলাদেশের উচ্চ সমাজেও সই পাতানো, মিতা পাতানো কিছুদিন আগেও প্রচলিত ছিল। মেয়ের সঙ্গে মেয়ের, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্ব পাতানো চলত এবং এই বন্ধুত্বের মধ্যে কোন জাতিবিচার ছিল না। ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের সঙ্গে মাহিষ্য, পৌন্ড্রক্ষত্রিয় ও অন্যান্য যে কোন বর্ণের লোকের সঙ্গে সচ্ছন্দে বন্ধুত্ব পাতানো চলত।"[৯] এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মীয়তা স্থাপন রক্তের সম্পর্কের চেয়েও আপন হয়ে উঠত।

ভাদাভাদি ঃ

কোচবিহারের স্থানীয় সমাজের দীর্ঘ দিনের প্রচলিত বন্ধুত্ব স্থাপনের অপর একটি অনুষ্ঠান হল "ভাদাভাদি"। অবিভক্ত বাংলার রঙপুরের রাজবংশীদের মধ্যেও এই অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। ভাদাভাদি অনুষ্ঠান মূলত জলপাইগুড়ি জেলাতেই বেশী প্রচলিত। ভাদাভাদি অনুষ্ঠানে দেখা যায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের উত্তর বা পূর্ব দিকের ঘরের থানছিরি গৃহদেবতার বেদীর সামনে একটুখানি জায়গায় চাষের মত মাটি খুঁড়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হত। সেখানে বারো রকমের শস্যর বীজ বপন করা হয়। বীজ বপনের পর থেকে চারা ওঠাবার সময় পর্যন্ত এক মাস সময়কালের মধ্যে যে কোন একদিন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এটি সম্পূর্ণ মেয়েদের অনুষ্ঠান। যে দুজন বালিকার মধ্যে সই পাতানো হবে তাঁদের যে কোন একজনের বাড়ীতে সই পাতানোর দিন আসার সময় সঙ্গে দই, মিষ্টি, কলা ও নতুন বস্ত্র আনতে হবে। পূজার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের উপোস থাকতে হয়। পূজার দিন অধিকারী ব্রাহ্মণ বাড়ীর তুলসী তলায় পূজার অর্ঘ্য সহ পূজা সমাপন করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন স্থানীয় নিজস্ব বাজনা বাজানো হয়। পূজার সময় কিশোরীদ্বয় নতুন কাপড় পরে পাশাপাশি আসনে বসেন এবং দুজনের হাতে দেওয়া হয় "তীর ধনুক"। ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায় তাঁর 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ ও দেবদেবী' নামক গবেষণা গ্রন্থে বলেছেন, "পূজার সময় কিশোরীদ্বয়ের মুখে যে ছড়া বা কথার উল্লেখ করা হয় তা হলো— 'স্বআমির মনত যদি খটা দি, তে এই তীর দিয়া তোর হাতত হানিম'।[১০] ডঃ রায়ের মতে পূজারীর নির্দেশে দুই বালিকাকে এই কথাগুলি বলতে হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন দুই কিশোরী স্থানীয় বাজনা বা বাদ্য সহ পুকুর বা নদীর জলে ডুব দিয়ে উঠেই পরস্পর পরস্পরকে পান-সুপারী (গুয়া) বিনিময় করেন। ধর্ম ঠাকুর ও অন্যান্য লোকদেবতাকে সাক্ষী মেনে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বকে দৃঢ় করার শপথ নেন। মুখে বলেন— "ধর্ম ঠাকুর আর এই ঠেগার সগাকে সাক্ষী মানিয়া হামেরা সই পাতাছি। হামার এই দুই ঝনকার

মিল কুন দিন ভাঙ্গিবার না হয়। সইত্য, সইত্য তিন সইত্য।"[১১] বাড়ীতে ফিরে দুজনে একসঙ্গে চিড়া, দই, কলা আহারের মাধ্যমে উপবাস ভঙ্গ করেন। এরপর থেকেই নতুন আত্মীয়ের মত পরস্পর পরস্পরের বাড়ী যাতায়াত করেন।

কোচবিহারের লোকায়ত জীবনের বেশীর ভাগ অনুষ্ঠানই দৈবনির্ভর এবং কোন লোকদেবতার প্রতি ভক্তি ও মনস্কামনায় মানত কিংবা রোগ-ভোগ মুক্তির ও অধিক ফলনের আশায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা কিংবা গ্রাম ও পারিবারিক মঙ্গল কামনায় নিবেদিত হয় সেই দিক থেকে বন্ধুত্ব, সখী, সখা, মিতর ধরা, সখাহালা, ভাদাভাদি অনুষ্ঠানগুলি এক বিরল ব্যতিক্রম। এখানে মানুষ মানুষকে আপন করার আকুল আবেদন প্রকাশ করেন। গ্রাম বাংলার লোকায়ত জীবনে যে লোকাচার ও উৎসব আমাদের সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করার জন্য বিশাল ভূমিকা নিয়েছে লোকসংস্কৃতির এই উজ্জ্বল নিদর্শনগুলি তার দৃষ্টান্ত।

কৃষি-সংক্রান্ত লোকাচার ঃ

কোচবিহারের লোকজীবন প্রধানত ও মুখ্যত কৃষিনির্ভর। প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিকাজ উত্তরবঙ্গের অনেক জেলার মতই এখানেও জীবন ও জীবিকার অন্যতম উপায় হিসেবে চলে আসছে। নাগরিক সভ্যতা শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটলেও কোচবিহারের বৃহত্তম রাজবংশী, রাভা ও স্থানীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনে কৃষিকাজের প্রাধান্য আজও সমান ভাবে অক্ষুন্ন আছে। এই কৃষিকে কেন্দ্র করে এই জেলার লোকায়ত কৃষি সমাজ যে সংস্কৃতিকে লালন করে আসছে অর্থাৎ ভূমির উর্বরতা শক্তি (Fertility cult)-তে বিশ্বাসী সহজ সরল নিরক্ষর গ্রামীণ কৃষককুল আজও ঋতু পরিক্রমায় শস্য উৎপাদনে বিভিন্ন লোকাচারে আস্থাশীল।

গোছরপানা ঃ

কৃষি কাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার বর্তমানে দেখা দিলেও উৎপাদন বৃদ্ধি, শস্য সংরক্ষণ ও ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি এক কথায় কৃষিকাজ ও কৃষিজ পণ্যের মঙ্গল কামনায় আজও বহু লোকাচার জেলার সকল মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দেখা যায়। তারই অন্যতম হল 'গোছরপানা' অনুষ্ঠান। গোছরপানা/গোছরপুঁইয়া/গচিবোনা/রোয়াগাড়া/বীজবপন/ ধান্যরোপণ— যে নামেই অভিহিত করি না কেন এই অনুষ্ঠানটি কোচবিহারের কৃষি সমাজে কৃষি-সংক্রান্ত একটি পবিত্র কর্তব্য। এই জেলায় সম্বৎসরে প্রায় "২৭ রকম আউস ধান এবং ৭৬ রকমের আমন ধান"[১২] উৎপন্ন হলেও স্থানীয় কৃষক সমাজের মধ্যে হৈমন্তিক বা আমন ধানের ক্ষেত্রেই এই আনুষ্ঠানিক লোকাচারের প্রাধান্য বেশী।

কোচবিহার জেলার অনেক মহকুমার গ্রামাঞ্চলে এই দেবতাহীন কৃষি-সংক্রান্ত আচার বা কৃত্যটিকে গচিবোনাও বলা হয়। অনেক লোকদেবতার পুজার সঙ্গে এই লোকাচারের একটি

মিল দেখা যায় তা হল ছোট বা চারা কলাগাছের ব্যবহার। সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় গোছরপানা কখনই লক্ষ্মী পূজা নয়। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর "Rajbansis of North Bengal" গ্রন্থে রাজবংশী সমাজের এই লোকাচারকে "মা ধত্তির অর্থাৎ মা ধরিত্রি দেবীর পূজা"[১৬] বলেছেন। বিশেষ করে এই হৈমন্তিক বা আমন ধান রোপণের সঙ্গে প্রকৃতির অকৃপণ দান বৃষ্টি বা বারিধারার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক অর্থাৎ পুরোটাই বর্ষার প্রকতি-নির্ভর। আমাদের মনে রাখা উচিত প্রকৃতি তার নতুন জীবন লাভ করে। এই সময়েই অর্থাৎ জলে স্থলে সর্বত্রই গাছপালার এক বিরাট সমারোহ হয় যা কৃষিকাজের সহায়ক পশু সমাজের খাদ্যের যোগানে সহায়তা করে। আবার এরই সঙ্গে আশঙ্কাও থাকে অতি বৃষ্টিপাতের ফলে ভয়ঙ্করী বন্যার মাধ্যমে কৃষকের সর্বস্বান্ত হওয়ার। অর্থাৎ সারা বছরে জীবন ধারণের যে প্রাণশক্তি এই ধান প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে তাকে আগলে রাখাই তাঁদের একান্ত সামাজিক কর্তব্য। এই ক্ষেত্রে তাঁদের লোকাচার বিশ্বাস ও আন্তরিকতা যার ফলে ফলন অধিক হয় তার মূল্য আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের কৃত্রিম সারের চেয়ে অনেক বেশী।

এই লোকাচারের রীতিনীতি ঃ

আমন ধান চাষের সময় প্রথম রোয়াগাড়ার দিন যে জমিতে রোয়াগাড়া হবে সেই জমির পশ্চিম কোণে ছোট কলাগাছ, মানকচু কিংবা কালো কচুর আস্ত গাছ, অঞ্চলভেদে একটি কাঁকড়া হাত পা ভেঙে কাদার মধ্যে রাখা হয়। কলাগাছ ও কচুর পাতায় সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয় কোথাও সাতটি, কোথাও পাঁচটি। তার সঙ্গে থাকে ধান ও দূর্বা। আবার কোন কোন গ্রামে এই লোকাচারের উপকরণ হিসেবে দেওয়া হয় দুধ, দই, ঘি, মধু ও চিনি। ধূপ জ্বালিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে কৃষক নিজেই প্রণাম করে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠানে কোন পুরোহিত যেমন নেই তেমনি নেই কোন মন্ত্র। স্বাভাবিক ভাবে পঞ্জিকা অনুযায়ী ধান্য রোপণের দিন দেখেই এই কৃত্য সম্পন্ন হয় বেশী। আবার স্থানীয় কৃষক সমাজে রথযাত্রার দিনটিকেই রোয়াগাড়ার দিন বলে মনে করা হয়। তবে জেলার হলদিবাড়ী বা মাথাভাঙ্গা অঞ্চলে যেমন কাঁকড়াব ব্যবহার দেখা যায় তেমনি তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্দরান- ফুলবাড়ী, নাটাবাড়ী অঞ্চলে কাঁকড়ার ব্যবহার দেখা যায় না। যেমন নাটাবাড়ীর কোন কোন অঞ্চলে এই অনুষ্ঠানে কচু ও কলাগাছের পাশাপাশি একগুচ্ছ পাটকাঠিও গেড়ে দেওয়া হয়। গায়ে সিঁদুরের পাশাপাশি কাজলও মাখা হয়। গাছের গোড়ায় অনেকে দুধও ঢেলে দেন। পাঁচটি কলাপাতায় কাজল ও সাতটি কলাপাতায় সিঁদুর লাগানো হয়। এভাবেই গোছরপানা লোকাচার সেরে ধানের চারা রোপণের সূচনা করা হয়।

পুরুলিয়া জেলায় এরূপ একটি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে যাকে বলে 'বীজপূজা'। অনুষ্ঠানটি হয় প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের তের তারিখে। এই বীজপূজা পুরুলিয়ায় 'রহিন পূজা' নামেও পরিচিত। মূলত কৃষি কাজের সঙ্গেই এই পূজার যোগ। উক্ত দিনটিতে কৃষকগণ বীজপূজা করে থাকেন। অর্থাৎ বীজপূজার কাজের সূচনা হয় ঐ দিনটিতে। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পৃথিবীতে রহিনী (রোহিনী) নক্ষত্রের প্রভাব সর্বাধিক হয়। তাই এই সময়ে বীজ বপন করলে

সেই বীজতলার শস্যে নাকি কোন রোগ আক্রমণ করতে পারে না এবং উক্ত দিনে বীজবপন করলে শস্য উৎপন্ন হয় প্রচুর এবং বীজ হয় পুষ্ট। এটি এক অর্থে 'গোছরপানা'র পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান।

গোছরপানা অনুষ্ঠানের কলাগাছ, কচুগাছ, পাট ও কাঁকড়া ব্যবহার তাৎপর্য পূর্ণ।

আউশ (বিত্রি) ধান রোপণের সূচনায় 'মুঠি নেওয়া' অনুষ্ঠান ঃ

হৈমন্তিক বা আমন ধানের চারা রোপণের আনুষ্ঠানিক লোকাচারের মত জেলার হলদিবাড়ী, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ মহকুমার গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় কৃষকগণ আর একটি বহু উৎপাদিত ধানের সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য পূজা বা অনুষ্ঠান করে থাকেন। আমন ধানের সময়কাল যেমন ভরা বর্ষা অর্থাৎ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র কিন্তু আউশ ধানের ক্ষেত্রে সময়টি এর বিপরীত অর্থাৎ বৃষ্টিহীন খরা প্রকৃতির ফাল্গুন-চৈত্র মাস। অর্থাৎ রাজবংশী কৃষক রমণীরা যখন ফসলের জন্য বৃষ্টি কামনায় বৃষ্টির দেবতা হুদুমের কাছে আকুল আবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানকে তখন বলা হয় 'মুঠি নেওয়া'। শুকনো জমির ঢেলা ভেঙ্গে কৃষকগণ যখন তাঁদের জমি তৈরী করেন উক্ত সময় পঞ্জিকা অনুযায়ী শুভদিন দেখে এই মুঠি নেওয়া অনুষ্ঠান করে থাকেন। এটিও গচিবোনা বা গোছরপানা অনুষ্ঠানের মত নারী বর্জিত পুরুষের অনুষ্ঠান। এখানে কোন গাছ গাড়তে হয় না। অনুষ্ঠানের প্রসাদও গোছরপানার চেয়ে কিছুটা কম।

পূজার রীতি ও উপকরণ ঃ

দুই ডেলি (ধামা) ধান, একটি লাউ, কিছু টক কুল যাকে স্থানীয় ভাষায় বলে ব্যারি, সিঁদুর, সরষের তেল, দুটো পুঁটি মাছ, পাওয়া না গেলে শুটকি মাছ, একটি ভাঙা শাখার টুকরো ইত্যাদি দিয়ে প্রথমে বাড়ীর তুলসী মঞ্চের সামনে গোবর দিয়ে লেপে ডেলি দুটি সাজানো হয়। শুধুমাত্র প্রণাম করেই এর আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। এখানেও কোন পুরোহিত বা মন্ত্র নেই। এরপর বাঁকুয়া দিয়ে ভাড় তৈরী করে ক্ষেতে নিয়ে যায়, সঙ্গে থাকে এক ঘটি জল। কৃষক প্রথমেই স্নান করে নেন এবং হাল শুদ্ধ দুটি গরুর পা ধুয়ে দেন ক্ষেতের মধ্যে দাঁড় করিয়ে। এরপর গরু দুটোর শিং-এ তেল মেখে সিঁদুর মাখা হয়। বাতাসা ও ধূপ দিয়ে এখানেও প্রণাম করে কৃষক পূজার কাজ সমাপ্ত করেন। এ ক্ষেত্রেও গোছরপানার মত বা হাতে তিন মুঠি ধান ক্ষেতে ছিটানোর পর প্রসাদ বিতরণ করা হয় উপস্থিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে। এরপরই শুরু হয় ধানের যথারীতি বীজ ছিটানো। অঞ্চলভেদে অনেকে আবার বিশেষ করে তুফানগঞ্জ মহকুমার বিলসী, মুগাভোগ অঞ্চলে দেখা যায় অনেকে প্রথম তিন মুঠি ধান ছোট ছেলেদের দিয়েও ছিটিয়ে থাকেন। এতদঞ্চলে প্রচলিত বিশ্বাস ভূমিলক্ষ্মী নারী দেবতা বলে এবং লক্ষ্মীর জন্ম দেবতার বাম অঙ্গ থেকে বলে প্রথম তিনমুঠি ধান বাঁ হাতে ছিটানো হয়। বর্তমানে আউশ বা বিত্রি ধানের চাষ কমে যাওয়ায় সে স্থান দখল করেছে উচ্চফলনশীল বোরো ধান। এই বোরো ধানের সঙ্গে লোকায়ত

এই অনুষ্ঠান ততটা সম্পর্কিত নয়। তাই গোছরপানার লোকাচার সর্বত্র সমান ভাবে প্রচলিত থাকলেও আউশ ধানের ক্ষেত্রে মুঠি নেওয়া অনুষ্ঠান আজ আর আগের মত হয় না।

ধানের আগ নেওয়া অনুষ্ঠান এবং নবান্ন অনুষ্ঠান ঃ

গোছরপানা বা গচিবোনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধানের যে চারা বোনা হল তা পাকার পর কাটার সময়ও এক অনুষ্ঠান করে ধানকে বরণ করার পর ঘরে নেওয়া হয় আনুষ্ঠানিক ভাবে। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'আগ নেওয়া'। অগ্রহায়ণ মাসে পঞ্জিকার দিন দেখে যে দিন ধান কাটা হবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেই দিনকে নির্ধারণ করা হয় ১লা অগ্রহায়ণ থেকে। স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় একে 'নবান্ন' বা 'আগ' নেওয়া অনুষ্ঠান বলেন। শুরুতে যেমন ছিল নারী বর্জিত পুরুষের অনুষ্ঠান সমাপ্তিতে এখানে আমরা দেখি পুরুষ বর্জিত নারীর অনুষ্ঠান। ৯/১২/৯৭ ইং ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সনে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্দরাণফুলবাড়ী গ্রামের সুরেন বর্মনের ধান ক্ষেতের এই অনুষ্ঠানের সংগৃহীত তথ্য হল— ধান ক্ষেতের এক কোণে দুটি ধানের গোছা সুতো দিয়ে বেঁধে গাদা ফুলের মালা পরানো হয়। তিনজন সধবা ক্ষেতিলক্ষ্মী ধানকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করে প্রণাম করেন। এখানেও পূজক বা কোন মন্ত্র নেই। ডান হাত দিয়ে ধানের গুছিটি ধরে বা হাতে কাস্তে দিয়ে প্রথম ধান কাটা হয়। প্রকৃত পক্ষে এদিন থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ধান কাটার সূচনা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস এই আগ নেওয়া অর্থাৎ ধানগাছ থেকে ধানের অগ্রভাগ কেটে নেওয়ার পূর্বে ধান কাটা অশুভ।

এ ছাড়াও কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহের যে কোন একটি দিনে 'ধানের ফুল আনা' নামক একটি লোকাচার অনুষ্ঠিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনই রাজবংশীরা 'নয়া খই' পালন করে থাকেন। 'ধানের ফুল আনা' এবং 'নয়া খই' নামক কৃত্য দুটি পালিত না হলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন নূতন ধানের ভাত গ্রহণ করেন না তেমনি নূতন ধান বা চাউল বিক্রয় করতেও পারেন না।"[১৪]

উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার একাধিক গ্রামে এই অনুষ্ঠানের নাম 'আকলাই নেওয়া'। বাংলা দেশের রঙপুর জেলায় এই অনুষ্ঠানকে যেমন বলা হয় 'আগ নেওয়া', পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামে একে বলা হয় 'আগলওয়া'।

কোচবিহারে ১লা অগ্রহায়ণের ধান কাটার আনুষ্ঠানিক লোকাচারে সধবা রমণীগণ ক্ষেতে পূজার আনুষ্ঠানিকতার পর ধানকাটার সময় উলুধ্বনিসহ নিম্নোক্ত ছড়াটি বলেন—

"কলার পাতে বান্দি ধান
কাটি উঠাচুঁ ঘরে।
ভরিয়া অহ মাগে ভোলা
ভরিয়া অহ গোলা ঘরে।"[১৫]

পূর্বে ঘরে ঘরে এই অনুষ্ঠান ও আনুষঙ্গিক উৎসব হত। অবিভক্ত বাংলায় এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করা এবং হৈমন্তিক (হেমতি/আমন) ধানের প্রথম ফসল দেবতা অগ্নি, পশু, পাখী বিশেষ করে কাক, ব্রাহ্মণ, আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীদের সঙ্গে গৃহকর্তা নতুন অন্নগ্রহণ করেন। এটি সম্পূর্ণ গ্রামীণ কৃষক সমাজের অনুষ্ঠান হলেও শহরাঞ্চলে এখনও নতুন অন্নের ভোগ ঠাকুরবাড়ীতে দেওয়ার লোকবিশ্বাসের ধারা আজও অক্ষুন্ন আছে।

মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে 'করম' পূজার লোকাচার ও পূজার অনুষ্ঠানের সঙ্গে এতদঞ্চলের আমন ধানের আগ নেওয়া অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য আছে।

ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজা উপলক্ষ্যে লোকাচার ঃ

এই লোকাচারমূলক অনুষ্ঠানে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ ও সদরের কয়েকটি গ্রামে আমরা দেখতে পাই ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজার দিন সন্ধ্যায় কলাগাছের খোলকে টুকরো করে প্রদীপের মত বানিয়ে পাটকাঠির মাথায় গুঁজে দিয়ে ধানক্ষেতে, বহির্বাড়িতে পুঁতে দেওয়া হয়। এরপর ঐ খোলে সলিতায় সরষে তেল দিয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই লোকাচার শুধু ধানক্ষেতেই পালিত হয় না, গৃহস্থ বাড়ীর দরজা, বাস্তুঠাকুরের থান, গোয়ালঘরের আশপাশ প্রভৃতি স্থানেও এরূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তুফানগঞ্জ মহকুমার বারকোদালী ও বালাঘাট গ্রামে অনেকে কলার খোলেব প্রদীপের বদলে কাঠালের পাতায় প্রদীপ তৈরী করে জ্বালান। স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এই দিন কলারখোল দিয়ে ঘেরা চালুন বাতি দিয়ে আকাশ প্রদীপ দেন। কোচবিহারের পূর্ববঙ্গীয় মানুষজন আশ্বিন সংক্রান্তিতে এভাবে কলার খোলে সলতে দিয়ে বাড়ীর সর্বত্র প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন।

ধানকে সাধ দেওয়া / হোন্দা খাওয়ানো ঃ

কোচবিহার জেলার কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচারমূলক অন্যতম অনুষ্ঠান হল ধানকে সাধ দেওয়া বা হোন্দা খাওয়ানো অনুষ্ঠান। সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী কোচবিহারের কৃষিজীবী সম্প্রদায় গর্ভবতী নারীর মত ফলবতী শস্যের গাছকেও সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানের মত লোকাচার পালন করে থাকেন। কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের আরও বিশ্বাস ফলবতী বৃক্ষ বা শস্য ভরা ক্ষেত গর্ভবতী নারীর মতই অভিন্ন জীবনী শক্তিতে ভরপুর। তাই তাঁরা ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনায় যেমন গর্ভবতী নারীকে সাধভক্ষণ করান তেমনি উন্নত মানের ভালো ফসলের কামনা করে কৃষিজীবী সম্প্রদায় শস্য-সম্ভবা ধানের ক্ষেতকেও সাধ দেন। কোচবিহারে বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয় বিশেষ করে টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসীগণ এই অনুষ্ঠানকে 'ধানকে হোন্দা খাওয়ানো' বলেন। বাংলাদেশে এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে প্রাণবন্ত রূপ দেখা যায়। ধান উভয়বঙ্গেরই প্রধান ফসল। তাই ধানকে কেন্দ্র করে এই লোকাচারের জীবন্তরূপ কোচবিহারের সকল গ্রামেই কৃষিজীবী মানুষ এর সঙ্গে জড়িত। কোচবিহারের দেওচড়াই অঞ্চলের অনেক গ্রামে স্থানীয় মুসলিম কৃষকগণও

এরূপ লোকাচার পালন করেন। আশ্বিন সংক্রান্তি এই লোকাচারের মূল সময়। এক ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে তুফানগঞ্জ মহকুমার ছাটরামপুর গ্রামের কৃষিজীবী যুবক জানান, "আশ্বিনের শেষ দিন অর্থাৎ ধান গাছে শিষ আসার পর অর্থাৎ ভাদ্র ও আশ্বিন পেরিয়ে কার্তিক মাসই ধান গাছের গর্ভধারণের সময়। আমগাছের পাতা ও হুন্দা গাছের পাতা আগুনে পুড়িয়ে তার কালোরঙের ছাইকে সরষের তেল মেখে আমপাতায় লাগিয়ে পাটকাঠির মাথায় বেঁধে দিয়ে ধান ক্ষেতের চারদিকে পুঁতে দিয়ে ছড়া বলতে হয়।"

আশ্বিন সংক্রান্তির হোন্দা খাওয়ানোর এই অনুষ্ঠানে পাটকাঠির মাথায় তৈলাক্ত পাতা গেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে কৃষিজীবী যুবকরাই মূল দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে "আশ্বিন সংক্রান্তিতে মেয়েরা ধান ক্ষেতে গিয়ে পূজা দেন। এদিন ধান ক্ষেতে একটি মানকচু, রাই সরষা, আউশ ধানের আতপ চাল, ঘি, মধু ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে পূর্ণ গর্ভা ধানকে সাধ দেয়। এ সময় তাঁরা যে ছড়া বলেন তা হল—

ভাদ্র গেল আশ্বিন আইল কার্তিক দেয় সাড়া
অঘ্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে দেখরে আমন ছড়া।"[১৬]

ধানকে সাধ দেওয়ার ঐ দিনটিকে গারু সংক্রান্তি ব্রত বা গার্সী ব্রত নামক লোকাচারে পালন করেন কোচবিহারে বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয়গণ; বিশেষ করে ঢাকা, মৈমনসিংহ, টাঙ্গাইল অঞ্চলের অধিবাসীগণ। এই একই সময়ে স্থানীয় বারুজীবী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সন্ধ্যাবাতি দিয়ে বাড়ির চার সীমানায় দাঁড়িয়ে বাড়ির ছেলেরা বলেন—

"ধানরে ধান হোন্দা খা
বাড়ীর ধারে সান্দা
ধান্দা করে আন্ধার
ধানরে ধান হোন্দা খা
নাও নাই ধরি নাই আসিব কিসে
ধানরে ধান হোন্দা খা
সকলের ধান আউল ঝাউল
আমার ধান শুদ্ধ চাউল
ধানরে ধান হোন্দা খা।"[১৭]

ধানের ক্ষেতকে খুশি রেখে অধিক ফলন পাবার আশায় ও পোকামাকড়ের হাত থেকে ধানগাছকে রক্ষা করাই এই ধরনের অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। "ইন্দোনেশিয়ার শিষ সম্ভবা ধানগাছ সম্পর্কে এরূপ ধারণা ও আচারের চল আছে। কারণ ঐ সময়কার ধানগুচ্ছ গর্ভিনী নারী সদৃশা। তাই পুষ্টিকর খাদ্য ধানকে খেতে দেওয়া হয়।"[১৮]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে "আশ্বিনের সংক্রান্তিতে কৃষক গৃহস্থগণ আমপাতায় সুগন্ধী মশলা মেখে ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে তা পাটকাঠির মাথায় করে গুঁজে দিয়ে আসে।"[১৯]

ভোগী দেওয়া ঃ

কোচবিহার জেলার সবকটি গ্রামের স্থানীয় সম্প্রদায়ের কৃষিজীবী পরিবারগুলিতে কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে ধানকে হোন্দা খাওয়ার মতই একটি লোকাচার পালন করতে দেখা যায়। উক্ত দিন সন্ধ্যা বেলা ধান ক্ষেত, বাগান, রাস্তা, সবজি ক্ষেত, গোয়াল ঘর, রান্না ঘর সর্বত্র একরূপ কৃত্রিম ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে ফসল ও গৃহস্থ বাড়ীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে ছড়া বলা হয়। কার্তিক সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যায় ঘি মাখানো পাটের সলতাকে পাটকাঠির মাথায় পেচিয়ে দিয়ে অনেকটা মশালের মত প্রদীপ জ্বালিয়ে যাকে ভোগী বলা হয় উক্ত স্থানে দেওয়া হয়। সে সময় গ্রামের যুবক যুবতীগণ সবাই ভালো ফসলের কামনায় যে ছড়াটি কাটেন সেটি হল—

১। "সগারে ধান টনা মনা
হামার ধান কাইঞ্চারে সোনা।

২। সগারে ধান হিত্তি হুত্তি
হামার ধান ঘরের ভিত্তি।"[২০]

কোচবিহার জেলার অনেক গ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায়ের কৃষকগণ এই ছড়া বলার প্রশস্ত সময় হিসেবে সূর্য ডোবার মুহূর্তকে অর্থাৎ ঠিক গোধূলি লগ্নকে বেছে নেন।

গাংবেড়া ঃ

জেলায় প্রচলিত লোকাচারের অন্যতম গাংবেড়া। পৌষপার্বণের আগের দিন ভোরবেলায় উঠে বাড়ির উঠোনের ঘরকে বন্দনা করা বা ঘেরার লোকাচারের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা এতদঞ্চলের একটি প্রাচীন আচারমূলক কৃষ্টি। স্থানীয় রাজবংশী পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই গাংবেড়া নিয়ে চলে প্রতিযোগিতামূলক আনন্দ উপভোগ। উক্ত লোকাচারের দিন ভোরে উঠে গোবর দিয়ে ঘরের বাইরে ছাইনচা বা ডোয়া এক নিশ্বাসে বা একদমে ঘিরে ফেলা হল এই লোকাচারের বৈশিষ্ট্য। স্থানীয় লোকবিশ্বাস এক নিশ্বাসেই ঘর ঘিরে ফেলা বা গন্ডী দিয়ে চিহ্নিত করার তাৎপর্য হল, যে ব্যক্তি এই আচার পালন করবেন তাঁর বাড়িতে কোন চোর সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকতে পারবে না। বনবাসী লক্ষ্মণ যেমন করে দাদার অবর্তমানে সীতার ঘরের চারদিকে বেড় দিয়ে গিয়েছিলেন সেই ঘটনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজও কোচবিহারের অনেক গ্রামে গাংবেড়া লোকাচার পালিত হয়।

গরু চুমানি ঃ

দ্বীপান্বিতা কালী পূজার পর দিন স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাড়ীর বয়স্কা রমণীগণ রাখাল বালক ও গৃহপালিত গরুকে সকোলবেলা স্নান করিয়ে মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়ে বরণ করেন।

এই দিন গরুকে প্রত্যুষে স্নান করিয়ে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা ও শিং-এ তেল মেখে দেওয়া হয়। একে বলা হয় 'গরু চুমানি'। এই দিন যে রাখাল বালক গরুর পরিচর্যা করে তাকেও নূতন জামাকাপড় দেওয়া হয়।

অনেক গ্রামে মুসলিম কৃষকগণ গরুকে প্রতিপদের চাঁদ দেখান। গরু চুমানির মত লোকাচার পালন কোচবিহার জেলার চেয়ে জলপাইগুড়ি জেলাতে বেশী দেখা যায়।

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির যুগে ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার নামক যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে যেমন হালের গরু পোষার আর্থিক সঙ্গতি অনেক কৃষক হারিয়ে ফেলেছেন তেমনি হালের গরু পোষার ঝুঁকি নিতেও এখন আর কেউ রাজী নন। এই পরিস্থিতিতে গরুকেন্দ্রিক লোকাচার আজ বিলুপ্তির পথে। গরুকেন্দ্রিক কার্তিক আমাবস্যার এই লোকাচার সম্পর্কে শঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন— "গোহাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং নানাপ্রকার আলপনা আঁকা হয়। মাটির প্রদীপ, ফুলের মালা, সরিষার তেল, কাঁচা হলুদ, সিঁদুর, ধান, সরিষা, মুগ, দূর্বা প্রভৃতি পিতলের থালায় করে গোহালে নিয়ে যাওয়া হয়। গরুর শিং-এ তেল হলুদ লাগিয়ে গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হয়।"[১১]

বাঁকুড়া বীরভূম জেলার 'আখান যাত্রা' নামক লোকাচারের সঙ্গে কোচবিহার জলপাইগুড়ি জেলার গরু চুমানির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ডঃ ওয়াকিল আহমেদ তাঁর 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন— "বাংলাদেশের কৃষকগণ ফাল্গুন মাসের শেষদিন গো-ফাল্গুনি নামক লোকাচার পালন করেন। যার মূল উদ্দেশ্য গরুর রোগ ব্যাধি দূর করা।" প্রসঙ্গত বলা যায় কোচবিহারের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষুব সংক্রান্তির দিন গবাদিপশুর পরিচর্যার প্রথা দীর্ঘ দিন ধরে প্রচলিত।

আল্লা ভূল্লা/মশাল খেলা ঃ

এটি কোচবিহার জেলার লোকায়ত জীবনের আনুষ্ঠানিক লোকপ্রিয় খেলার অন্যতম। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজে কালী পূজার রাতে আবার কোথাও কার্তিক সংক্রান্তির দিন রাতে অনুষ্ঠিত হয়। জেলার প্রায় সবকটি মহকুমার গ্রামীণ বালক যুবকদের মধ্যে একগাছি পাঠকাঠি বেঁধে তার মাথায় আগুন দিয়ে রাস্তার ধারে বা খোলা মাঠে বা বাড়ির চারপাশে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়। এতদঞ্চলে বসবাসকারী টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ ও বগুরা জেলার মানুষদের মধ্যে কার্তিক সংক্রান্তির রাতে এই মশাল খেলার রেওয়াজ আছে। ছন ও পাটকাঠি দিয়ে একটি পুত্তলিকা তৈরী করে আগুন লাগিয়ে বালকগণ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও আনন্দ উপভোগ করে। এ ব্যাপারে লোকায়ত বিশ্বাস এই যে ছনের (খড়) ঘরের তিনকোণা থেকে মুঠি মুঠি ছন নিয়ে পুত্তলিকা তৈরী করা এবং এককোণা বাকি রাখা দরকার। কারণ তাঁদের বিশ্বাস এই কোণা দিয়েই নাকি সমস্ত শুভ জিনিস ঘরে আসবে। এই আল্লা ভূল্লা খেলার মূল উদ্দেশ্য হল

অমঙ্গলকে দূর করে মঙ্গলকে আহ্বান করা। কলেরা-মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করা। এছাড়াও কার্তিকের শেষে অগ্রহায়ণের নতুন শস্যকে আহ্বান করা হয়। জেলার এই আল্লা ভূল্লা বা মশাল খেলার বৈশিষ্ট্য হল এই খেলায় হিন্দু মুসলিম কোন ভেদাভেদ নেই। বালকবৃদ্ধ সবাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করেন। কোচবিহার জেলার বহু গ্রামে আল্লা ভূল্লার মশাল খেলায় যে ছড়াটি গাওয়া হয় তা হল—

"আল্লা আসে ভূল্লা যায়
বোচার কান মশায় খায়।"

ডঃ ওয়াকিল আহমেদের মতে বাংলা দেশে আমাবস্যার রাতে অনুষ্ঠিত এরূপ মশাল খেলাকে 'আলোডালো' খেলা বলা হয়। কোথাও কোথাও একে ভুত খেদানো বলা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় এই মশাল খেলার সময় যে ছড়াটি গাওয়া হয় সেটি হল —

"আলোরে ডালোরে
পোকাড়ে মাকড়রে
দূর হ! দূর হ!"[২২]

"পোকামাকড়ের ধ্বংস এবং অধিক ফসল কামনা করে পূর্ববঙ্গে আজও ক্ষেতের মাঝে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। যখন কীটনাশক ঔষধ ছিল না অথচ কীটের উৎপাত ছিল তখন এভাবেই মানুষ ফসল রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। আলোয় আকৃষ্ট হয়ে কীটপতঙ্গ পুড়ে মরে এটা মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা।"[২৩]

পূর্ববঙ্গের মত কোচবিহারের এই 'আলোডালো' লোকাচার লোকায়ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে হলেও এর সঙ্গে যে বাস্তব অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ ঘটেছে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

ভোগ্না দেওয়া ঃ

কৃষি-সংক্রান্ত লোকাচারে সর্বজন পরিচিত এক নিদর্শন বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যাকে বলা হয় 'ভোগ্না দেওয়া'। ফসলের জমি শাক-সবজী, লাউ-কুমড়া ক্ষেতে বিশেষ করে জাংলায় বেড়ে ওঠা গাছ ও তার ফলনকে পোকামাকড় জীবজন্তু এবং মানুষের কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষিজীবী গৃহস্থ মানুষরা এখানে 'ভগ্না' দেন। স্থানীয় রাজবংশী সমাজে একে 'ভোগ্না' দেওয়া বলা হয়।

সংস্কৃত 'ভগ' শব্দ আঞ্চলিক উচ্চারণে 'ভগ্না' হতে পারে। বাংলা ভাষায় ফাঁকি বা প্রতারণা অর্থে সম্ভবত হিন্দি 'ভগল' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মুর্শিদাবাদে শব্দটি ধোঁকা, ধাপ্পা, মিছা ইত্যাদি অর্থে প্রচলিত আছে। যেমন ভোগা দেওয়া বা 'ভোগা কথা'।

'ভোগ্না দেওয়া' প্রকৃতপক্ষে কোন অনুষ্ঠান নয়, এটি আদিম শস্য-সংক্রান্ত যাদুবিদ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই আজও বহির্বাড়ীর লাউ-কুমড়োর মাচা, ক্ষেতের ফসল ধান ও গমের জমিতে, কোথাও ক্ষেতের মাঝখানে, কোথাও আবার এক কোণে খড়কুটো দিয়ে তৈরী করে কোথাও মানুষের মূর্তি কিংবা চুণ-কালি মাখানো হাড়ি, কোথাও বা ছেঁড়া জামাকাপড় পরিয়ে এক ভৌতিক প্রতিকৃতি রেখে দেওয়া হয়। এর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাই এর মূল লক্ষ্য।

কৃষি-সংক্রান্ত লোকাচারে রাভা সম্প্রদায় ঃ

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রাভা উপজাতি সম্প্রদায় কোচবিহার জেলার বৃহত্তম উপজাতি শাখা। এই সম্প্রদায়ের দশটি শাখার অন্যতম বনবাসী রাভা ও কৃষিজীবী রাভা। কৃষি নির্ভর এই সম্প্রদায় প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন ঋতুতে পালন করেন বিভিন্ন পার্বণ ও লোকাচার। কৃষি এঁদের মূল জীবিকা। কৃষিকে কেন্দ্র করেই রাভা সম্প্রদায়ের মূল উৎসবগুলি আলোড়িত হয়। ঋতুপরিক্রমায় কৃষিকাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে এঁদের উৎসবের বিভিন্ন আঙ্গিকেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠই কৃষিকাজ শুরুর প্রশস্ত সময়। তুফানগঞ্জ মহকুমার ছাটরামপুর গ্রামের নৈচান রাভা ও বাঁশরাজা গ্রামের জ্যোতিষ রাভা, বারোকোদালী গ্রামের ধনঞ্জয় রাভার মতে নতুন ফসলকে ও কৃষিকর্মের সূচনায় "বায়খো" তাঁদের প্রধান উৎসব। নৃত্যগীত-সমৃদ্ধ সৃজনধর্মী লোকাচারে ভরপুর রাভাদের এই অনুষ্ঠান।

রাভাদের মাম্বোকায় ও বায়খো রাজবংশীদের মুঠিনেওয়া ও গোছরপানা সবই ফার্টালিটি কাল্ট (Fertility Cult) উর্বরা শক্তির জন্য কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান। রাজবংশী, রাভা, মেচ প্রভৃতি আদিবাসী উপজাতি সমাজের জীবন ও জীবিকার উপায় পদ্ধতি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা। জীবিকার উপকরণ, আচার ব্যবহার, লোকাচার বিশ্বাস এসব নিয়েই কোচবিহারের লোকায়ত সংস্কৃতি আবর্তিত। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও সমাজের গতি ও ভারসাম্য, সমাজ পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করতে সাহায্য করবে জেলার লোকসংস্কৃতির এই দুর্লভ আঙ্গিকগুলি।

বিশেষ বিশেষ ফলমূল সম্পর্কে যে সকল ট্যাবু এখনও কোচবিহারের স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় এমনকি এখানকার ক্ষেতিলক্ষ্মী, ভূমিলক্ষ্মী, নয়াখাওয়া নামক যে উৎসব ও ব্রতগুলি রাজবংশী রমণীরা এখনও ভক্তিভরে পালন করেন, সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিচার করলে বলতে হয় এগুলি আদিম অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এগুলির বেশীরভাগই কৃষি ও গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী। স্থানীয় গ্রাম্যজীবনের একাধিক লোকাচারমূলক অনুষ্ঠান ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধানগাছ, ধান, দূর্বা, কলা, হলুদ, পান, সুপারী, সিঁদুর, কলাগাছ, প্রভৃতি লোকায়ত জীবনের বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে। এগুলি সবই অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। পূর্ববঙ্গ,

দক্ষিণবঙ্গ, তথা কোচবিহারে বৈবাহিক অনুষ্ঠানে পান ও পানের খিলি, গাত্র হরিদ্রা, গুটি ও কড়ি খেলা, ধান ও কড়ি দিয়ে খেলার মাধ্যমে স্ত্রী-আচার সবই আদিম অশাস্ত্রীয় বৈদিক, অস্মার্ত, অব্রাহ্মণ্য অপৌরাণিক অনুষ্ঠান ছাড়া কিছু নয়। এগুলি সবই কৃষি-সভ্যতা ও কৃষি-সংস্কৃতির আদিম অনুষঙ্গ।

জেলায় বিভিন্ন গ্রামে পৌষ ও মাঘ মাসে ধানকাটার পূর্বে 'ধানকাটার আগনেওয়া', ধানের শিষ শুদ্ধ ঘটে স্থাপন করে লক্ষ্মী পূজার যে প্রাচীন প্রথা অধুনা বাংলাদেশ ও কোচবিহারে আজও ঘরে ঘরে রাজবংশী রমণীরা পালন করেন তা আদিবাসী ওঁরাও, মুন্ডাদের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। "পিতৃ পুরুষের পূজা প্রচলন এখনও সাঁওতাল, শবর, মুন্ডা, ভূমিহোর ও খেরিয়া, রাভাদের মধ্যেও ভক্তিভরে পালিত হয়। আর্য পূর্ব আদিম নরগোষ্ঠির চবক বা গমীরা পূজাও হল এরূপ এক আদিম কৃষ্টির সমন্বিত রূপ। আর্য পূর্ব আদিম নবগোষ্ঠীর চড়ক বা গমীরা পূজাও হল এরূপ এক আদিম কৃষ্টির সমন্বিত রূপ।"[২৪]

কোচবিহারের রাভা সমাজ নবান্ন বা নখোয়া উৎসবের দিন গো-সেবাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। নতুন চালের ভাত প্রথমে গোয়ালের গাই-বাছুরকে দেওয়া হয়। এরপর একমুঠো কাঁচা ধান মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গরু-বাছুরকে সে দিন নতুন চালের ভাত খাওয়ানো এই লোকাচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যাত্রাপূজা (দশমীর লোকাচার) ঃ

কোচবিহারে বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলের অধিবাসীগণ বিজয়া দশমীর দিন জোড়া পুটিমাছ, সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে ধান-দূর্বা সহ কলার মাইজ পাতায় ঘরে তোলেন, যাকে বলা হয় "যাত্রাপূজা"। সেদিন অনেকে দই ভক্ষণ করেন। দই এতদঞ্চলে যাত্রার শুভ প্রতীক। আবার ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী ও যশোর জেলার মানুষগণ এখনও এতদঞ্চলে প্রাচীন প্রথা ও লোকাচারের বশবর্তী হয়ে দশমীর দিন পর্যন্ত ইলিশ মাছ খান। তারপর কয়েক মাস বিরতির পর শ্রীপঞ্চমীর সরস্বতী পূজার দিন জোড়া ইলিশের গায়ে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে রান্নাঘরে তোলেন। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে আমরা দেখেছি দুর্মূল্যের বাজারে অনেকে জোড়া ইলিশের বদলে একটি ইলিশ মাছের সঙ্গে একটি বেগুন দিয়ে ঘরে তোলেন।

জেলার তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, মেখলীগঞ্জ, দিনহাটা মহকুমা ও হলদিবাড়ী ব্লকের একাধিক গ্রামে ক্ষেত্রানুসন্ধানে দেখেছি কোচবিহারের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ শারদীয় দুর্গাপূজার সময় কচু এবং মানকচু খান না। দীর্ঘ দিনের লালিত বিশ্বাস ও সংস্কারে একাধিক লোকাচারও পালন করেন। মেখলীগঞ্জ মহকুমার নিজতরফ গ্রাম ও জেলা সদরের মাঘপালা গ্রামের মানুষ এই লোকাচারের প্রতি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাসী। দশমী তিথির যাত্রাপূজার সময় মানকচুর ডগায় কাজল পেরে গৃহের যাবতীয় সরঞ্জাম এবং কৃষি যন্ত্রপাতির গায়ে সিঁদুর ও কাজলের ফোঁটা

দেন। এই প্রসঙ্গে মানকচুর ডগা ব্যবহার এবং কচু ও মানকচু কাটা ও খাওয়ায় নিষেধ আছে। কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের মত রঙপুরেও মানকচুর সঙ্গে চালকুমড়ো খাওয়া নিষেধ। কোচবিহারের টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের পূর্ববঙ্গীয়গণ দশমীর তিনদিন পর মানকচুর পাতায় একটি যাত্রা কৌটা বসিয়ে একটি মানগাছ, হলুদ গাছ, পান, চিনি, জল, দূর্বা সহ ঢাক, কাশী ও শঙ্খ দিয়ে পূজা করে ঘরে তোলার লোকাচার পালন করেন। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল অঞ্চলের হিন্দু রমণীগণের এরূপ একটি লোকাচারের কাহিনী শোনান তুফানগঞ্জ মহকুমার পৌর এলাকার ৮নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মায়ারানী বসাক। তাঁর কথায় "শিব ঠাকুরের অমতে তিন দিনের জন্য দুর্গার বাপের বাড়ীতে আসার পর দশমীর দিন পুনরায় শ্বশুর বাড়ীতে গেলে শিব প্রথমে দেবী দুর্গাকে ঘরে নেন নি। অনুপায় দুর্গা তিনদিন মানগাছ ও হলুদগাছের নীচে থাকার পর প্রতিবেশী মহিলাগণ নিজেরা শাশুড়ী হয়ে দেবীকে ঘরে নেন।" এই দেবী দুর্গাকে ঘরে নেওয়া এতদঞ্চলে লক্ষ্মীকে ঘরে তোলা বলে মনে করা হয়। এই লক্ষ্মী শস্যদেবীর প্রতীক। কোচবিহারে প্রচলিত দেবী দুর্গার অপর এক কাহিনীতে পাওয়া যায়, সেখানেও তিনদিন অসুস্থতার কারণে বিলম্বিত হয়ে বাড়ীতে পৌছান। যদিও সে ক্ষেত্রে তাঁর নাম ছিল "ভান্ডানী"।

এছাড়াও এতদঞ্চলে দুর্গা পূজার অষ্টমী তিথিতে পূর্ববঙ্গীয়দের আমিষ গ্রহণের প্রথা আছে। পশ্চিমবঙ্গে এদিন নিরামিষ গ্রহণ এবং নবমীর দিন আমিষ গ্রহণের প্রথা আছে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত কোচবিহারেও বিজয়া দশমীর দিন সিঁদুর খেলা, সধবা রমণীগণ দুর্গাকে সিঁদুর পরিয়ে পরস্পর পরস্পরকে সিঁদুর পরানোর লোকাচার পালন করেন।

লোকায়ত পার্বণ উপলক্ষে লোকাচার

তেরাবেরা ঃ

ভাদ্র মাসের তেরো তারিখে এতদঞ্চলে পূর্ববঙ্গের টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মানুষের একটি সামাজিক পার্বণ হল তেরাবেরা। তেরো তারিখ থেকেই এই 'তেরা' শব্দটির উদ্ভব বলে মনে করা হয়। বাঙালীর বার মাসের তেরো পার্বণের মধ্যে এটা অন্যতম। ভাদ্র মাসের তেরো তারিখে অন্যান্য স্ত্রী আচার বাদ দিলে অবশ্য পালনীয় আচারগুলিতে দেখা যায় ঘরের দরজার সম্মুখে একটি পাকা তাল শিকার মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই তাল শুভযাত্রা, গৃহবাসীর সবার মঙ্গল কামনায় উক্ত পবিত্র দিনে ঝোলানো হয়। এবং ঐ দিন তালের রসপান (তালের বড়া) শারীরিক শ্রী বৃদ্ধি ও সুস্থ জীবন কামনায় সবার অবশ্য কর্তব্য। এ ছাড়াও তেরো রকমের শাক সেদিন সবাই খাবেন। পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশাগত ভিটে-ছাড়া ও ছিন্নমূল মানুষগুলো সব হারালেও আচার সংস্কার পার্বণ এবং তাঁদের লোকবিশ্বাস হারান নি। কালের বিবর্তনে এই আচার বা পার্বণের প্রতি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লালিত বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই শহুরে সংস্কৃতির প্রভাবে দেশজ প্রাচীন এই আচারগুলির প্রতি

নিস্পৃহ হলেও প্রাচীন নিষ্ঠাবান পরিবারগুলি এখনো সমাজ ও পরিবারের মঙ্গল কামনায় লৌকিক সংস্কৃতির প্রাচীন এই বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হন নি।

নষ্টচন্দ্র ঃ

নষ্টচন্দ্র ভাদ্র মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থীর চন্দ্র। এই চন্দ্রের দর্শন নিষিদ্ধ। দর্শন করলে মিথ্যা অপবাদের পাত্র হতে হয় এরূপ মতবাদ প্রচলিত আছে। নষ্টচন্দ্রের কিরণ দর্শনের ফলেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি অপহরণের মিথ্যা অপযশের বেদনায় পীড়িত হতে হয়েছিল, পুরাণে এরূপ আভাস পাওয়া যায়। পুরাণের কাহিনী অনুসারে চন্দ্র এই দিন গুরুপত্নীর উপর বলাৎকার করে পাপভাগী হন। তাই তাঁর দর্শনেও পাপ হয়। পশ্চিম ভারতে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে এই দিন গণেশ চতুর্থী। এতদুপলক্ষে ঘরে ঘরে গণেশের যে পূজা হয় তাতে একবার গণেশের আহার বেশী হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি সন্ধ্যাবেলা হেলে দুলে রাস্তা দিয়ে অস্বাভাবিক ভাবে যেতে থাকেন, তাতে চন্দ্র আকাশ থেকে তাঁর অবস্থান দেখে হেসে ফেলেন। এতে গণেশ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন যে একদিন কেউই তাঁর মুখ দর্শন করবে না। মিথিলায় কিন্তু এদিন সন্ধ্যায় সাড়ম্বরে চন্দ্রের পূজা করা হয়। বাংলাদেশে এই দিন রাত্রিতে চুরির উৎসব অনুষ্ঠিত হত। তরুণ সম্প্রদায় চুরির আনন্দে মেতে উঠে প্রতিবেশীদের গৃহ থেকে টুকিটাকি জিনিসপত্র ও ফলমূল চুরি করত। গৃহস্থেরা এজন্য সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতেন। ৫০-৬০ বৎসর পূর্বেও এতদঞ্চলের গ্রামে গ্রামে এই কৌতুক প্রচলিত ছিল। এখনও কোথাও কোথাও ভূত চতুর্দশী, কালীপূজা, শিবরাত্রি ও চৈত্র-সংক্রান্তির রাত্রিতে চুরি ও নানা ভাবে গৃহস্থকে উত্যক্ত করার প্রথা দেখা যায়।

উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার জগদ্দল গ্রামের চৈত্র-সংক্রান্তির আগের দিন গম্ভীরা পূজা উপলক্ষে "মধ্যরাতে চুরির অনুষ্ঠান হয়। বহু গৃহস্থের বাড়ি থেকে সিদ্ধি, কলাসহ কলাগাছ, ঢেকি, বাঁশ, এলান ফল, ঘরের চালের খড় চুরি করে এনে নৃত্যবিদ্‌রা নাচতে থাকে। এটাও বাংলার নষ্টচন্দ্রের মত একটি লৌকিক অনুষ্ঠান।"[২৫]

"ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি যাকে বলা হয় জিতা অষ্টমী বা জিতুয়া। ঐদিন বাঁকুড়া জেলায় নষ্টচন্দ্র নামক লৌকিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী মেয়েরাও এই দিন পাড়া প্রতিবেশীর গৃহে গিয়ে কলা-মূলা চুরি করে খেয়ে থাকেন। চুরির পর আমোদ করে গান গাওয়া হয়।"[২৬]

ভেড়ার ঘর ছোবা ঃ

কোচবিহারে রাজবংশী সমাজে দোল বা দোলসোয়ারী একটি প্রাসঙ্গিক লোকাচার। এই অনুষ্ঠানকে 'ভেড়ার ঘর ছোবা' বা 'ভেড়ার ঘর পোড়া'র অনুষ্ঠান বলা হয়। পূর্ববঙ্গীয়গণ দোল পূর্ণিমায় দিন অনুষ্ঠিত এই লোকাচারকে 'বুড়ির ঘর' পোড়ানো বলে। এই ভেড়ার ঘর পোড়ানো উপলক্ষে দোল পূর্ণিমার আগের দিন থেকে অষ্টম দিন পর্যন্ত অর্থাৎ সোয়ারীর দিন

পর্যন্ত বিভিন্ন লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠানে মেতে থাকেন। এই অনুষ্ঠানটি সাধারণত দোল পূর্ণিমার আগের দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। একটি ছোট্ট অস্থায়ী ছনের ঘর তৈরী করা হয়। এই ছোট ঘরে জেলার অনেক গ্রামে প্রথমে মদনমোহনও পূজিত হন। দই, চিড়া, আটিয়া কলা ও ধুপ-ধুনা দিয়ে অসমীয়া ব্রাহ্মণগণ পূজা করার পর উদ্যোগীদের পক্ষ থেকে একজন লোককে ভেড়া কল্পনা করে ঐ ঘরে প্রবেশ করানো হয়। লোকটি ঘরে ঢুকে পূজার নৈবেদ্য খেতে আরম্ভ করলে সঙ্গে সঙ্গে বাকিরা ঐ ঘরে আগুন লাগিয়ে দেন। ভেড়া কল্পিত লোকটি আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন।

গৃহনির্মাণে লোকাচার ঃ

কোচবিহার জেলায় শুধু স্থানীয় আদিবাসী সমাজেই নয় এতদঞ্চলের পূর্ববঙ্গাগত ঢাকা, ময়মনসিংহ, বগুরা ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী একটি লোকায়ত সংস্কার হল গৃহনির্মাণের পূর্বে ভূমির সংস্কার সাধন, ভূমিলক্ষ্মী কিংবা বাস্তু দেবতার সন্তুষ্টি উপলক্ষে ভিত্তিপূজা, খুঁটিপূজা ও বাস্তুপূজার লোকাচার। এই পূজার সময় পাকাবাড়ীর ক্ষেত্রে সিমেন্ট বালি দিয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন আনুষ্ঠানিক ভাবে করা হয় এবং কাঁচা বাড়ীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে কাঠ, বাঁশ দিয়ে টিনের চালযুক্ত ঘর তৈরীর সময় ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের খুঁটিতে লালকাপড়, আমের পল্লবে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে একটি পেতলের ঘট ও একটি তীর ধনুক বেঁধে দেন। এভাবেই গৃহনির্মাণের শুভ সূচনা করা হয়। খুঁটি বা ভিত্তি- প্রস্তরের শুভদিন ধার্য করা হয় পুরোহিতের নির্দেশে। লোকাচারমূলক এই অনুষ্ঠান স্বাভাবিকভাবে হয় সকালের দিকে। পুরোহিতের উপস্থিতিতেই ভিত বা খুঁটি গাড়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে এই খুঁটিকে বলা হয় "ঐশান" এবং খুঁটি প্রোথিত করাকে বলা হয় "ঐশানগাড়া"। বাস্তু বাড়ি ও নূতন ক্রয় করা বাস্তু জমির উপর অশুভ প্রাকৃতিক শক্তির কু-প্রভাব দূর করার জন্য খুঁটির ডগায় অনেকে বিশেষ করে পাকা বাড়ির ক্ষেত্রে নির্মীয়মান গৃহের যে কোন একটি অংশে ভাঙ্গা ঝুড়ি, ছেঁড়া চট, ঝাঁটা, কালি মাখানো হাড়ি ইত্যাদি বেঁধে দেন। অনেকে গৃহ নির্মাণের পূর্বে জমি ক্রয়ের অব্যবহিত পরেই উক্ত জমিতে সরিষা ছিটিয়ে দেন। উক্ত জমিতে একবার হাল দিয়ে সরিষা ছিটানোর মাধ্যমে পরিত্যক্ত জমির ভূত-প্রেত তাড়ানোর প্রথা বা লোকবিশ্বাস আজও সমান ভাবে প্রচলিত এতদঞ্চলে। এ ব্যাপারে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, গ্রাম্য কিংবা শহরে মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই।

কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ে গৃহনির্মাণ বা বাস্তু জমি নির্বাচনে এক স্বতন্ত্র লোকাচারের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যা এতদঞ্চলে প্রচলিত একটি ছড়ায় দেখা যায়—

"পূবে হাঁস
পশ্চিমে বাঁশ।
উত্তরে গুয়া
দক্ষিণে ধুয়া।"[২৭]

অর্থাৎ তাঁদের লোকায়ত বিশ্বাস মতে বাড়ির পূর্ব দিকে পুকুরের অবস্থান হবে। পশ্চিমে থাকবে বাঁশ বাগান। উত্তর দিকে থাকবে গুয়া অর্থাৎ সুপারী বাগান এবং দক্ষিণ দিক থাকবে ফাঁকা। এই দক্ষিণ দিক ফাঁকা রাখে শীতল স্নিগ্ধ দক্ষিণা হাওয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে। উত্তর ও পশ্চিম দিকে সুপারী ও বাঁশ বাগান রাখার কারণ হল কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ থেকে গৃহস্থ বাড়ীকে রক্ষা করা। পূর্ব দিকের পুকুর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ফাঁকা জমিতে তাঁরা চাষাবাদ করে। আর বাড়ীটি হয় দক্ষিণ দুয়ারী।

পূর্ববঙ্গীয় প্রভাব অনুযায়ী কোচবিহারের প্রায় সকল মানুষই শুভ দিনে গৃহ প্রবেশের দিন সন্ধ্যায় নূতন গৃহে তিননাথের কীর্তন দেন। বিশ্বাস এই যে এই কীর্তনের ধুয়ায় নূতন স্থানের নূতন গৃহের উপর কোন অশুভ শক্তির প্রভাব পড়তে পারে না।

পুরুষানুক্রমে আজন্ম লালিত কৃষিপূর্ব আদিম সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতি ও লৌকিক আচার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজও বিলুপ্ত হয় নি কোচবিহারের লোকজীবনের এই লোকাচারমূলক অনুষ্ঠান। জেলার লোকসংস্কৃতির পরিমন্ডল সৃষ্টিতে এই ধরনের আনুষ্ঠানিকতা এক বিশাল ভূমিকা পালন করে।

লোকপুরাণ

ভূমিকা ঃ

লোকপুরাণ কথাটির ইংরেজী অর্থ মিথ (myth) এবং এর সংজ্ঞা সম্পর্কেও বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা যায়।

উইলিয়াম বাসকম (William Bascom) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী লোকপুরাণ "Myths are pros narrations which, in the society in which they told are considered to be truthful accounts what happended in the remote past."

সমাজবিজ্ঞানী Wach-এর মতে লোকপুরাণ হল ধর্মোপলব্ধির প্রথম মননশীল বিশ্লেষণ এবং এতে আছে আদিম মানবসমাজের এক বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা, যাঁরা জগতের সৃষ্টিকে ধর্মোপলব্ধির সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে পান। সেই অর্থে আমরা বলতে পারি ধর্মবোধ থেকে লোকপুরাণের উদ্ভব। আবার লোকপুরাণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি অলৌকিক চরিত্রের ক্রীড়ার পরিণামে অনেক বাস্তব কাহিনী। অন্য অর্থে বলা যায় লোকপুরাণ হল সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ। অর্থাৎ সৃষ্টি রহস্যের উদ্দেশ্যেই যে লোকপুরাণের উদ্ভব এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যায়িত হয় সমাজ বিজ্ঞানীর লোকপুরাণ সম্পর্কিত সংজ্ঞায়। লোকপুরাণ সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণ করে আমরা অনুধাবন করতে পারি এতে আছে বিস্ময়বোধ এবং বৈচিত্র্য, সৃষ্টি- রহস্য ভেদের আকাঙ্ক্ষা ও লোকাচার।

সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষ যখন ছিল বুদ্ধির বিচারে অপরিণত সে সময় তাঁদের সৃষ্ট একাধিক কাহিনীকেই লোকপুরাণ বলা হত। এই কাহিনীর পটভূমিতে থাকে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। সে ক্ষেত্রে লোকপুরাণের নায়ক বা মূল নিয়ামক হল অলৌকিক দেবদেবীগণ। তাই লোকপুরাণের মধ্যে মানুষের মনের রহস্য মিশ্রিত অপরূপ রূপের সন্ধান পাওয়া যায় বেশী। কাহিনীগুলি সম্পূর্ণই অবাস্তব কল্পনাশ্রিত। "যে জনগোষ্ঠী যত প্রাচীন ও পুরানো মূল্যবোধস্থিত তাঁদের লোকপুরাণের সন্ধান তত বেশী পাওয়া যায়। পৃথিবীর সমস্ত ঐতিহ্যমন্ডিত জনগোষ্ঠীতেই অসংখ্য লোকপুরাণ রয়েছে। পৃথিবীর পাঁচটি মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি. . . . . এদের উৎস লোকপুরাণ।"[২৮]

প্রকৃত অর্থে বলতে গেলে লোকপুরাণ বা মিথগুলিকে বলা যায় মানুষের আদিমতম সাহিত্যিক নিদর্শন। সেই অর্থে কোচবিহারে প্রচলিত বহু লোকপুরাণকেই এতদঞ্চলে আদিম সাহিত্যিক নিদর্শন বলা সমীচীন বলে মনে হয়। এতদঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ-নির্ভর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সহজাত সংস্কার ও তাঁদের ধর্মবিশ্বাস এবং দৈব-নির্ভরতার সঙ্গে মিশে আছে এতদঞ্চলের লোকপুরাণ। অনেকক্ষেত্রে অলৌকিক কাহিনী বা বিশ্বাস লোকপুরাণের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতদঞ্চলে লোকপুরাণের প্রেক্ষাপটে যাই থাকুক না কেন কোচবিহারের লোকমানসের আন্তরিক বাস্তব অনুভূতিগুলি প্রতিফলিত হয়েছে লোকসংস্কৃতির এই শাখায়। আপাত দৃষ্টিতে এতদঞ্চলের প্রচলিত লোকপুরাণ বা পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে অবাস্তব, অলৌকিক মনে হলেও এরই ভিতরে লুকিয়ে আছে লোকজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, লোকবিশ্বাস, লোকাচার ও সংস্কার। কোচবিহারের লোকপুরাণ মূলত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিষয়ক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক, দেবদেবীর উদ্ভব সম্পর্কিত মানুষ ও জীবজন্তু সম্পর্কিত। এছাড়াও প্রাকৃতিক সংগঠন, হেতুসন্ধান, পশুপাখির আচার-আচরণ ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত লোকপুরাণ রয়েছে।

জল ও বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি সম্পর্কিত নিম্ন আসাম ও কোচবিহারে প্রচলিত লোকপুরাণ ঃ

জলের জন্ম ঃ

আদিতে জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নিজেকে বৃদ্ধি করার বাসনায় জল নিজেকে নিজে এমন ভীষণভাবে আলোড়িত করল যে সেই আলোড়নের ফলে একটি সোনার ডিমের উদ্ভব হল। সেই ডিম থেকে বেড়িয়ে এলেন প্রজাপতি। কিন্তু তাঁর দাঁড়াবার মত ঠাঁই না থাকায় তাঁর মুখ থেকে একটি শব্দ নিঃসৃত হল 'ভূ'। এই ভূ শব্দ থেকে সৃষ্টি হল পৃথিবী। অতঃপর প্রজাপতি বললেন 'ভূবঃ' — সৃষ্টি হল বায়ুমন্ডল। তারপর তিনি বললেন 'সুবর' এবং সেই শব্দ থেকে জন্ম নিল আকাশ। দেবতারা সৃষ্ট হলেন তাঁর মুখ থেকে। তিনিই সৃষ্টি করলেন দিন, যা থেকে এল আলো। তিনিই সৃষ্টি করলেন রাত্রি, যা থেকে এল অন্ধকার।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেছেন, জল হল সকল বস্তুর উৎস। জল থেকে জন্ম নিল সত্য, সত্য থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে প্রজাপতি এবং প্রজাপতি থেকে সর্বদেবতা। মনুস্মৃতির মতে আদিতে ছিল কেবলমাত্র গভীর অন্ধকার, স্রষ্টা সৃষ্টি করলেন জল এবং সেই জলে তাঁর বীজ স্থাপন করলেন। সেই বীজ পরিণত হল স্বর্ণ অন্ডে। সেই অন্ড থেকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা জন্মগ্রহণ করলেন ব্রহ্মা রূপে। ব্রহ্মাই সমগ্র বিশ্বের জন্মদাতা। তিনি সেই ডিম্বকে দুভাগে ভাগ করে স্বর্গ ও মর্ত্যের সৃষ্টি করলেন। হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে প্রায় সকল লোকই এই সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন। অসমীয়া বৈষ্ণবদের পবিত্রতম গ্রন্থ শ্রী শঙ্করদেব বিরচিত 'কীর্তন'-এর সূত্রপাতে যে কয়েকটি ছত্র আছে তাতে গ্রামবাসী সাধারণ অসমীয়াদের সৃষ্টি বিষয়ক ধারণা সুন্দর রূপে প্রতিফলিত—

"প্রথমে প্রণামো ব্রহ্মা রূপী সনাতন
সর্ব অবতারের কারণ নারায়ণ।।
তয়ু নাভি-কমলত ব্রহ্মা ভৈলা জাত।
যুগে যুগে অবতার ধরা অসংখ্যাত।।
মৎস্যরূপে অবতার ভৈলা প্রথমত।
উদ্ধারিলা চারিবেদ প্রলয়-জলত।।"

এখানে সেই প্রথম প্রলয় পয়োধি জলের কথা, ব্রহ্মার ও শাশ্বত সনাতন সৃষ্টিকর্তার কথা বলা হয়েছে।

আসামের সরল মানুষের কয়েকটি সরল বিশ্বাস পরীক্ষা করে দেখা যাক। একটি কাছাড়ি কাহিনীতে বলা হয়েছে— পৃথিবীতে প্রথমে বিরাজ করছিল গভীর এক নিস্তব্ধতা। সেই বিরাট নিস্তব্ধতা থেকে উদ্ভূত হল একটি পুরুষ, একটি নারী। তাদের মিলনে নারী হল গর্ভবতী। যথা সময়ে সে ডিম পাড়ল সাতটি। প্রথম ছয়টি ডিম থেকে জন্ম নিল রাজা, মানুষেরা ও দেবতারা। সপ্তম ডিম থেকে বেরিয়ে এল বীভৎস সব ভূত-প্রেত। বোড়ো গোষ্ঠীর কাছাড়িদের ধারণা, তাদের পূর্ব পুরুষরা এসেছিল সেই প্রথম ছয়টি ডিম থেকে এবং সপ্তমটির সন্তান হল আধি-ব্যাধি-মহামারীর অপদেবতারা।

(সংগ্রহ ঃ আসামের লোক সংস্কৃতি, যোগেশ দাস, পৃ ঃ ২৩-২৪)

কোচবিহারের লোকপুরাণে পাখি মোর চৌদ্দপুত
(বউ পাখির 'মোর চৌদ্দপুত' বলে ডাকার কারণ) ঃ

পাখিটার নাম হৈল্ 'বউ পাখি'। আর এ দ্যাশের মানসি কয় 'চৌদ্দপুত'।

এই পাখিটা হৈল একনা গাইরস্তের বউ। কিন্তুক ভাল গাইরস্তের মনুষ হৈলে কি হইবে, উএার নিয়াম আচার ভাল্ আছিলেক না। একদিন খরা বারে উএায় ছ্যাকা পাড়া দিচে। ছ্যাকা

পাড়ি কাপড় চোপড় ধুবার বাদে নদী গেইচে। নদী হাতে ঘুরি আসি দ্যাখে উঞার চৌদ্দটা ড্যাক-ড্যাকা পুত ছাওয়া মরিয়া আচে। উঞায় তখন হোল্‌লাই-সোল্‌লাই কান্দন জুড়িল্‌। ইদিয়া গাইরস্ত বাড়ি আসি দ্যাখে চৌদ্দটা পুত ছাওয়া মরি পড়ি আচে। উঞায় বউয়োক পুছ করে 'ক্যা এমন দশা হইল'। শ্যাষোত উঞায় সোয়ামিক্‌ সউগ কাতায় কয়। গাইরস্ত দেখিল ইঞার নিয়াম আচারের ঠিক নাই। কইল আজি থাকি তুই পাখি পয়াল হয়্যা র-অ যায়া। যেই এই কাতা কইল অমনে বউটা এক্‌না চক্‌রাবক্‌রা পাখি হয়্যা উড়ি গেইল। আর ঝ্যালা মানসির কামলা কিস্যান ধানবাড়িত ব্যাদা দেয় স্যালা গাছের আগালে আগালে 'মোর চৌদ্দপুত' 'মোর চৌদ্দপুত' কয়্যা-কয়্যা ড্যাকায় আর উড়ি ব্যাড়ায়। ব্যাদার হৈল চৌদ্দটা দার। তাকে দেখি উঞার চৌদ্দপুতের কথা মনোত পড়ে।

(কথক ঃ দেবী বর্মন, গ্রাম - চেনাকাটা, মাথাভাঙ্গা, তাং - ১৮/১/১৯৯৮)

বামনের বাশুয়া (চাতক পাখির জন্ম কথা/
অভিশপ্ত বালকের চাতক পাখি হওয়ার কথা) ঃ

পাখিটিকে বাংলায় চাতক পাখি বলা হয়। ইংরেজীতে বলা হয় স্কাই লার্ক। আর কোচবিহারে এই পাখিকে 'বামনের বাশুয়া' বলা হয়।

বামনের কোন ছাওয়া ছিল না। বামনের আছিলু এক্‌না মাউরিয়া চ্যাংরা। উঞার কাঙ্‌ নাই দেখিয়া আটকুড়া বামন উঞার গরু-বাছুর দেখিবার জইন্যে উঞাক বাড়িত ঠাঞি দিল। তাতে বামনও মনোত সুখ পাইল, চ্যাংরারও এক্‌না ঠাঞি হৈল। একে গরমকাল তাতে চৈত্‌ মাসি গরম। চ্যাংরা গরু চরেবার যায়্যা নিন্দোত্‌ পড়িচে গাছের ছ্যাঞাত। ইদিয়া ব্যালা বিতি যায়। গরুক জল পানি না দিয়া মনের আলসিতে উঞায় গাছের ছ্যাঞাত বসি নিন টোপে। বামন দিশা পাইবে ভাবিয়া উঞায় নদীর বগলের কাদো মাটি আনিয়া গরুলার ঠ্যাঞোত সোত্তে সোত্তে দেয়। এই ঢক করিয়া এক দিন দুই দিন করিয়া বামন সাঞোত করি গরুলার চুষি চুষি জল খাওয়া দেখিয়া আচানক বামন ঠাওর পাইল। একদিন বাইর‍্যা যাওয়ার অলে বিড়িয়া বাইর‍্যা না যায়্যা গরুর বাথানের বগলোত যায়্যা ছুপি রয়া দেখে চ্যাংরা কি করে। দ্যাখে, চ্যাংরা গরুক জল না দিয়া গাছের ছ্যাঞাত জিরায় আর নদীর কাদো মাটি আনিয়া গরুর ঠ্যাঞোত ন্যাটপ্যাটে দেয়। বামন বাড়ি ঘুরি আসিয়া হায় হায় করে। সইন্দা কালে গরু বাছুর সেউতি থুইয়া পাছোত চ্যাংরাক বগলোত ড্যাকায় আর দুপুরার সউগ কথালায় কয়। চ্যাংরার মাথা হ্যাট হৈল। বামন চ্যাংরাক শাও দিল— "যা আজি থাকি তুই পাখি হয়্যা র-অ যায়া। "বামন যেই এই কথা কোনা কৈল চ্যাংরাও এক্‌না পাখি হয়্যা উড়ি যায়া গাছের ঠাইলোত পড়িল। আর এমন পাখি হৈল নদী-নালার জলোত উঞার তিস্যা মেটে না। উঞায় আকাশের জল খায়। আর তিস্যা নাগিলে জিউ

ফাটি ড্যাকায় দেওয়ার ভিতি চায়্যা— 'ফুটিক জল, ফুটিক জল' কয়্যা আর বামনের অভিশাপে উএায় পাখি হৈচে সেই জইন্যে উএার নাম হৈল 'বামুনের বাশুয়া।'

(কথক ঃ কমলেশ সরকার, কদমতলা, নাটাবাড়ী, তুফানগঞ্জ, তাং - ৭/৭/১৯৯৮)

ফিঙে পাখি

(ফিঙে পাখির রাজা হওয়ার কাহিনী) ঃ

তি পুরাণী দিনের কাথা। দ্যাশে দ্যাশে রাজা হয়্যা রাজ্যের পরজাপালিক পালন করে। তে বোনের পঙ্খিলা কয়— "আমারও তো বোন, ঝাড়, পাহাড়, জঙ্গল আচে। পঙ্খি পয়াল আচে, কিন্তুক আমার তো রাইজ্য থাকিলেও রাজা নাই। দ্যাশে-বইদ্যাশে পঙ্খি-পয়াল কি রাজা ছাড়ায় রইবে।" তে সউগ পঙ্খিলায় একদিন একেটে গোটো হয়্যা মিটিং বসাইল— "আমারও রাজা নাগিবে।" সগায়লা যায়্যা উপনীত হৈল ধর্মরাজের ঠাঞি। ধর্মরাজ কয়— "ভালে কাথা।" তে রাজা এলা কাক্ করা যায় ? চিন্তাত্ পড়িল। ধর্মরাজ একদিন এক পাহাড়ের এক গাবারোত সগাকে গোটো করি কয়— "আজি তোমার রাজা ঠিক হৈবে।" আর এক গাবারোত বড় এক্না তচোলাত জ্বাল হবার নাইগচে ত্যাল। ত্যাল যুঁইয়ের আচত বক্ বকায়। নাই রাজ্যের পঙ্খিলা বসি আচে বগা, কাউয়্যা, শাড়ো, ময়না, টিয়া, বুলবুলি, হারগিলা আরও কত নাকান পাখি। উমারে মইধ্যোত শকুন, হারগিলা কয়— "মুই রাজা হইম্।" আরও বড় বড় নানান দ্যাশের পঙ্খি আসিচে। উমার কাঁও কাঁও কয়— "মুই রাজা হৈম্।" ধর্মরাজা কইল— "রাজা হৈবে তো একজন। সগায় তো আর রাজা হবার পাইবে না। যার সগারে চাইতে সাহস আর শক্তি বুদ্ধি বেশী তায় হৈবে রাজা।" হারগিলা কয়— "মোর তো দেহাত কম জোর নোএায় ?" শকুন কয়— "মুই কিতায় কম ?" ইদিয়া আরও আরও বড় পঙ্খিলার মুখোত্ও এই একে কাথা। শ্যালা ধর্মরাজা কয়— "ঠিক আচে, যায় আগোত এই গরম ত্যালের তচলাত ডুবিয়া উঠি আসির পাইবেন তায় হৈবেন রাজা।" শকুন মনে মনে ধেন্দেলায় গরম ত্যালোত ক্যাঙ করি ডুবি আইসা যায়। একবার আগায় একবার পাচায়। হারগিলা কয়— "মরণ হয় হৈবে তাও ডুবিম্, যে হউক, সে হউক।" কিন্তুক তচলার ত্যালের বগোল যায়া ঘুরি আইসে আর মনে মনে সাত-পাঁচ ধান্দে খালি দকর সকর করে।

কিন্তু ছোট ছোট পঙ্খিলার মইধ্যোত ঝেচু (ফিঙে) খুবে চাল্লাক। উএায় কয়— "দ্যাশের জইন্যে, পঙ্খি পয়ালের জইন্যে, ঝদি মোর মরণ হয় হৈবে, তাও খিএাতি তো রইবে।" উএায় গচের আগাল থাকি পঙ্খিলার দশা দ্যাখে আর ধর্মরাজের উপ্রা ভস্যা করি ছুঁই দিয়া আসিয়া ত্যালোত এক ডুব দিয়া ভুচুৎত করি উঠিল্। ধর্মরাজা শিঙা ফোঁকাইল— "আজি হৈতে ঝেচু (ফিঙে) হইলেক পঙ্খির রাজা।"

(কথক ঃ শশীমোহন বর্মন, শিকারপুর, মাথাভাঙ্গা, ১৪/৭/৯৯ ইং)

ডোমনা পাখি (বুলবুলি), হাতি আর ছ্যাদা (সজারু) ঃ

একেদিন ছ্যাদা নদীত্ জল খাবার নাইম্চে। ইদিয়া হাতিও ভাটি পাকে জল খাবার নাইম্চে। ডোমনা নদীর পারোত্ গাছের ডালোত্ বসিয়া ফল-পাকুর খাবার ধইরচে। হাতি কয়— "ডোমনা, দ্যাখেক তো, উ জাগাত্ কায় জল খাবার ধইরচে। জল ক্যানে এমন ঘোলোন্চা। উয়াক যায়া কবু যে হাতি মহারাজ জল খাবার ধইরচে। তুই জল ঘোলোনচা না করিস।" ডোমনা ছ্যাদার অটি গেইল। যায়া কয়— "রে ছ্যাদা, তুই কি উজান পাকে গাও ধুবার নাগ্চিস? উদি যে ভাটি পাকে হাতি মহারাজ জল খাবার নাইম্চে। হাতি মহারাজ মোকে পাটে দিল, তোর একনা হুস নাই?" ডোমনার কথা শুনিয়া ছ্যাদা কুত পাড়িয়া হাসে আর কয়— "থো তোর হাতি মহারাজের কথা। উএায় কজ্যোকন বনের রাজা, দেখি উএার একনা চিন্ ধরি আয়। তবে সেনে মুই বোজং।" ছ্যাদার কথা শুনি ডোমনা একেবারে পচ্ করি হাতির আটি গেইল। যায়া হাতি মহারাজোক কয়— "মহারাজ, ওটা ছ্যাদা, গাও ধুবার নাইগচে। তোমার নাম মুই যায়া কলুং, তা উএায় কথালা গাওতে নাগাইল না। উএায় আরও কয়, দেখি তোমার মহারাজের অটি যায়া একনা চিন্ ধরি আয়, তবে সেনে মুই বোজং উএায় কত জোকো।" হাতি রাগোতে কারাৎ করিয়া একনা চেকরোন দিল্। চিক্রিয়া কয়— "মোর গার একনা লোমা ছিড়ি নিয়া যায়া উএাক দিনি তো।" ডোমনা হাতির পিটি পাকের কয়খান লোমা ছিড়ি নিয়া গেইল। যেয়া দেখে ছ্যাদা স্যালাও গাও ধুবার ধইরচে। কয়— "নে ধরেক। তুই তাও উটিস নাই। এই দ্যাখ হাতি মহারাজের লোমা।" ছ্যাদা লোমা গুটি নিয়া হাসে আর কয়— "এই কাতা। উএায় তোমার মহারাজ! তা এলা মোর একনা গার লোমা নিয়া যা তো। দ্যাখোং উএায় সইজ্য করুক।" এই কাতা কয়া ছ্যাদা গাও ঝারিল। তাতে উএার একনা কাটা খসি পড়িল। কয়— "এ্যা ধরেক, ইয়াক নিয়া যায়া তোর মহারাজার গাওত নাগে দিবু, দ্যাখোং স্যালা কি করে।" ছ্যাদার কাটা ধরি ডোমনা গেইল। দ্যাখে হাতি মহারাজ রাগোতে ভোমা হয়্যা আচে। ডোমনাক দেখিয়া কয়— "রে ডোমনা, কি কইল ছ্যাদা?" "এত বড়ি কাথা কয় মহারাজ। ফির উএায় উএার একনা লোমা ছিড়ি দিচে। কইল দেখি ইয়ার গুতা হাতি মহারাজ যদি টান সবার পাইলেক তবে সেনে বোজং।" কথা শুনিয়া হাতি তো রাগে টং। কয়— "দিস না ক্যানে নাগেয়া পাছ পাকে।" স্যালায় স্যালায় ডোমনাও না ক্যানে আর সবুর না করিয়া ছ্যাদার কাটা দিয়া হাতির পাছ পাকে টিকাত নাগে দিল। ছ্যাদার কাটা বিন্দাইতে কালে হাতি চেক্রে আর দৌড়ায়, চেক্রে আর দৌড়ায়। আর মনে মনে কয় যার গার লোমার ছাল এই ঢক, না জানি তায় বা কত বড়। এই কাথা মনে করে আর নেটু তুলি দৌড়ায়। হাতির এই ঢক চেকরোন আর দৌড়া দেখিয়া ডোমনার হাসি আর থামে না। হাইস্তে হাইস্তে ডোমনার প্যাট ফাটি গেইল, অক্ত বিড়াইল। আর স্যালা থাকি ডোমনা পাখির প্যাট কোনা নাল।

(কথক ঃ কমলেশ সরকার, কদমতলা, নাটাবাড়ী, তুফানগঞ্জ, তাং-৪/৪/২০০০ ইং)

কোচবিহারের লোকপুরাণে নদী ঃ

আলাইকুমারী (আলাইকুড়ি) ঃ

রাজা আসিচে হাওয়া খাবার পুরানী আওয়াস। তে রাজার তো মেলা রাণী, দাসী, বাদী। একদিন ভোর সাকালে রাজা হাওয়া খাবার বসি হাওয়া খায়। আর কুমারী কইন্যালা ফুল বাগানোত্ ফুল ছেড়ে। তে রাজকুমারী আলাইও সখির সুদায় ফুল বাগানোত্ ঘুরি বেড়েবার নাগিচে। রাজা তো জানে না ওই কুমারী কইন্যা রাজকুমারী আর তারে পুত্রী। রাজার মনোত নাগিচে। আলাইয়ের সুন্দর যৈবনবতী তনু দেখিয়া রাজা কামোত্ অস্থির হৈল। আর দাসীর আগত কু-প্রস্তাব দিল কামবাসনা পুরিবার আশে। দাসী তো কোনয় কবার না পায়। জিবাত কামড় দিল্। ইদিয়া দাসীর কাছত্ রাজার বিতান্ত শুনিয়া কুমারী আলাই আচামত আর সরমোত্ মরিয়া গেইল্। নিজের ঘরোত গেইল। পঞ্চটা সোনা দেওয়ারী সাজাইল। সোনার চাইলন্ বাতি সাজেয়া কাটারী দিয়া নিজের জোড়া স্তন দুইটা কাটিয়া আনিয়া রাজার আগোত দিল্। কুমারীর হেন দৃশ্য দেখিয়া রাজার মাথা হ্যাট হৈল। রাজাও দুঃখোত্ ডুবি গেইল্। ইদিয়া রাজকুমারী সোনার চাইলন বাতি •"থাত ধরি যায়া ডুবিল্, কাইন্টাত একনা নদী আছিল, তারে অগইম জলোত্। কালোতে সেই নদী কুনার নাম হৈল 'আলাইকুমারী'।

(কথক ঃ অচিন্ত্য ঠাকুর (চক্রবর্তী), পূজারী বানেশ্বর মন্দির, তাং - ৫/৮/৯৮ ইং)

বংতী নদী ঃ

পুরাণী কালোত্ এই দ্যাশোত বানাসুর নামে একজন রাজা আছিলেন। তা বানাসুর একছাকে ধেয়ানোত বসিল। বানাসুর তপ করে। মহাদেব বানাসুরের তপোত তুষ্ট হয়্যা দরশন দিল্। বানাসুরোক মহাদেব কয়— "ক্যা বানাসুর, এমন তপ করিস?" বানাসুর কয়— "মুই চাঙ মোর রাজধানীত কাশীধাম করিম। কাশী যায়্যা তীর্থ করা তো খুবে দুর হয়।" মহাদেব বানাসুরোক কয়— "ঠিকে আচে, তে হইলে তুই একনা কামাইকর। ঝেদি এক রাইতোতে কাশী থাকি শিবলিঙ্গ আনি তোর রাজধানীত থাপনা করির পাইস তে হইলে কাশী এইটে হৈবে।" বানাসুর সত্য করিল্। কাশী থাকি শিবলিঙ্গ ধরি নিজ রাজ্য বুলিয়া যাত্রা করিল। রাতি আর বেশী নাই, তিন পর রাতি। ঘাটা হাঁটিতে হাঁটিতে বানেশ্বর আসিয়া উএাক খুবে প্রচ্ছাব ধরিল। কিন্তুক শিবলিঙ্গ তো আর মাটিত থুবার পায় না, ফির লিঙ্গ মাথাত ধরি প্রচ্ছাবও করির পায় না। ইদিয়া ধর্মঠাকুর একনা বামন ঠাকুরের ব্যাশ ধরিয়া আচে গাছের ছ্যাএাত। আন্দারোত মানসির ভাজ পায়া বানাসুর বামন ঠাকুরের বগোল চাপি কয়— "কায় তোমরা?" বামন কয়— "মুই তীর্থ যাইম।" বানাসুর কয়— "ঠিক আচে, তে মোর শিবলিঙ্গ কুনা খোনাক ধর, মুই খোনাক বায়রা যাঙ্।" বামন কয়— "কথা হইল ব্যালা উটিলে কালে কিন্তুক মুই এইটে রবার পাইম না।" "ঠিক আচে" কয়া অল্প খোনাক আগেয়া বানাসুর বসিলেক প্রচ্ছাব করিবার।

কিন্তুক রাতি পোয়ে যায় উঞার প্রচ্ছাব আর ফুরায় না। প্রচ্ছাব করিতে করিতে রাতি চাইর পর গেইল, সাকাল হৈল। বামন ঠাকুর মাথার লিঙ্গ কুনা মাটিত থুইয়া বেদরিশন হৈল। বিষ্ণু ঠাকুরের মায়াত ঝ্যালা বানার প্রচ্ছাব হৈল স্যালা রাতি পোয়ে গেইচে, ব্যালা নাল ডিকডিকা হয়া উঠির ধরিচে। বানা ত্যাঞও ধেন্দেলায় এলাও বেলা তো ভাল্মতো ওটে নাই। আসিয়া গচের তলোত্ দ্যাখে বামন ঠাকুর মাটিত লিঙ্গ থুইয়্যা বেদরিশন হইচে। স্যালা বানাসুর লিঙ্গ মাথাত তুলিবার জইন্যে হাত বাড়াইল। কিন্তুক লিঙ্গ এমন কটকটা হয়্যা মাটিত বসি গেইচে আর ওটে না। বানার দেহার গোটায় জোর দিয়া হয় সেনে তুলিবার চায়, পায় আর না। শ্যাষোত বানা রাগোতে উঞার কুড়াল খান দিয়া ঝ্যালা শিবলিঙ্গোত চোটাইবে স্যালায় আধানারী আধা পুরুষরূপ ধরি ভগবান শিব বানাসুরের সামিনে খাড়া হৈল। বানাসুর দন্ডবত্ হৈল। ওদি যে উঞায় এক পর রাতি ধরি মুতিচে তারে ধারাত সৃষ্টি হৈল বংতী নদী।

(কথক ঃ প্রকাশ ঝাঁ,তত্ত্বাবধায়ক, বানেশ্বর শিব মন্দির, বানেশ্বর তাং-৫/৮/৯৮ ইং)

কোচবিহারের লোকপুরাণে দেবদেবী ও কিংবদন্তী ঃ

মাধাইখালের কালী ঃ

দিনহাটা মহকুমার বামনহাট অঞ্চলের পাথরসোন গ্রামে এই ভদ্রকালীর আবির্ভাব সম্পর্কে যে লোককাহিনী সমগ্র উত্তরবঙ্গে প্রচলিত তা হল নিম্নরূপ—

বহু দিন পূর্বে এক শাঁখারী এই গ্রামে ঘুবে ঘুরে শাঁখা বিক্রি করতে করতে ক্লান্ত হয়। বর্তমান মন্দিরের স্থানে লাল পেড়ে শাড়ি পরিহিতা মেয়ে এই শাঁখারীকে ডেকে ডেকে বলছে— "এই শাঁখারী, আমাকে শাঁখা দাও।" শাঁখারী প্রতি উত্তরে মেয়েটিকে বলেছে "যদি পয়সা দিতে পার, তবেই শাঁখা দিব।" এরূপ কথোপকথনের পর শাঁখারী মেয়েটিকে শাঁখা পরিয়ে দেন। মেয়েটি হাতে শাঁখা পরার পর শাঁখারীকে বলেন, "তাঁর বাবা শরৎচন্দ্র বর্মন, তাঁর কাছে গেলেই তিনি এই শাঁখার দাম দিয়ে দেবেন।" মেয়েটি আরও বলেন "শরৎচন্দ্র বর্মনের বাড়ি বামনহাট বাজার সংলগ্ন স্থানে।" শাঁখারী বাজারে গিয়ে অনেক খোঁজা-খুঁজির পর শরৎচন্দ্র বর্মনের সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর কাছে শাঁখার দাম চাইলে শ্রীবর্মন অবাক হয়ে বলেন— "আমার তো কোনো মেয়ে নেই!" বিস্মিত, অভিভূত শ্রীবর্মন কালক্ষয় না করে শাঁখারীকে শাঁখার দাম দিয়ে দেন। বালিকার ছদ্মবেশে মাধাইখালের ভদ্রকালী আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

(কথক ঃ শ্রী শরৎচন্দ্র নাথ বর্মন, মাধাইখালের পূজা কমিটির সম্পাদক এবং
শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বর্মন - পূজা কমিটির সভাপতি। তাং - ৩/৪/৯৯ ইং)

শাঁখা কেনার ছলনায় বালিকার ছদ্মবেশে এই কালীর উৎপত্তির ইতিহাস কতটা সত্য তার বিচারে না গিয়েও আমরা একথা বলতে পারি মাধাইখালের এই কালীমেলায় এখনও পর্যন্ত

যে বিশাল সংখ্যক শাঁখার দোকানের সমাবেশ ঘটে তা শুধু কোচবিহার জেলায় নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গেও ব্যতিক্রম। বালিকা মেয়ের ছদ্মবেশে কালী ঠাকুরাণীর শাঁখা কেনার লোকশ্রুতি বা লোকপুরাণ বা কিংবদন্তী যাই বলি না কেন কোচবিহারের লোকায়ত মন এই কাহিনীকে মর্যাদা দিয়ে এখনও মাধাইখালের কালী মেলায় ভদ্রকালীকে প্রণাম করে হাজার হাজার বিবাহিতা রমণী শাঁখা পরেন এবং ইহকালের পুণ্য অর্জন করেন। দেবী কর্তৃক শাঁখা পরার এরূপ কাহিনী বর্ধমান জেলার ক্ষীর গ্রামের জুগাদ্যা দেবী সম্পর্কেও বহুল প্রচলিত।

কোচবিহারে কালীর একটি লোকায়ত রূপ পূজিত হয়, যার নাম 'শাখাতী দেবী'। জেলা সদরের রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও মুসলিম অধ্যুষিত মরিচবাড়ী গ্রামে শাখাতী দেবীর পাটে প্রতি বছর দীপান্বিতার অমাবস্যায় শাখাতী দেবীর বার্ষিক পূজার আয়োজন হয়।

মনসা বা বিষহরি সম্পর্কিত লোকপুরাণ ঃ

মনসা বা বিষহরির অলৌকিক মাহাত্ম্য নিয়ে কোচবিহারের লোকজীবনে যে জনপ্রিয় লোককাহিনী প্রচলিত তা হল, মা মনসার লীলাখেলায় চাঁদ সদাগরের সাত পুত্রকে দংশনের মাধ্যমে জীবন নাশ করেন। চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষিন্দর সর্পদংশনে মারা যাবার পর বেহুলা যখন স্বামীর মৃতদেহকে ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে নদীপথে বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে ইন্দ্রপুরীর দিকে এগিয়ে চলেছেন সে সময় বিশাল এক বোয়াল মাছ লক্ষিন্দরের একটি 'ঠ্যাং' (পা) খুবলে খেয়ে ফেলে। ঐ অবস্থায় বেহুলা স্বামীকে নিয়ে ইন্দ্রপুরীতে পৌছানোর পর মহাদেব মনসাকে ডেকে এরূপ নৃশংস ভাবে দংশনের কারণ জানতে চান। লক্ষিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর নদীতে জাল ফেলে নিষ্ঠুর বোয়াল মাছটিকে ধরে তার পেট কেটে পা বেড় করে অলৌকিক মন্ত্রবলে লক্ষিন্দরের দেহে জুড়ে দেন। এভাবে মহাদেবের নির্দেশে পুনরায় লক্ষিন্দর পুনর্জীবন লাভ করেন। মনসাও বেহুলার শ্বশুর চাঁদ সদাগরকে দিয়ে পূজা আদায় করার জন্য জেদ ধরেন। যদিও চাঁদ সদাগর শেষ পর্যন্ত পূজা করতে বাধ্য হন, কিন্তু তিনি পূজা করেন বাঁ হাত দিয়ে। সমগ্র কোচবিহার জেলায় মনসা বা বিষহরি সম্পর্কিত এই লৌকিক কাহিনীটি প্রচলিত।

(কথক ঃ শ্রী বিপিনচন্দ্র রায়, কোচবিহার দেবত্র ট্রাষ্ট অফিসের প্রবীণ কর্মী, তাং ২৫/৮/৯৯ ইং)

জেলায় প্রচলিত লোকধর্মের ঐতিহ্যবাহী এই লোকপুরাণকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বোয়াল মাছ কর্তৃক লক্ষীন্দরের হাড় খাওয়ার দরুণ মনসার নাম হয় 'হাড়হাড্ডি মনসা'। এই হাড়হাড্ডি মনসার পূজা আজও অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহার সদর মদনমোহন বাড়ীতে প্রতি বছর শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন।

এছাড়াও কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় সাইটন বিষহরি বা সাইটন ব্রতের প্রচলিত এক কাহিনীতে দেবী মনসার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মনসা যখন সাইটনের পুত্রদের

হত্যা করে পুনরায় তাঁদের জীবিত করে দেন তখন চাঁদ সদাগরের কাহিনী তাঁর মনে পড়ে যায়। মনসামঙ্গল কাব্যের মতই এখানে পূজা না পেলে সাইটন অসন্তুষ্ট হন এবং পূজা পাওয়া মাত্র মৃত পুত্রদের বাঁচিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় 'মনসামঙ্গল' কাব্যের মধ্যে দেবী মনসার যে হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ যে উগ্র মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায় সাইটন বিষহরির কাহিনীতে ততটা পাওয়া যায় না। এখানে মনসার মনোক্ষুন্ন ও অভিমানী হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। তা হল 'বন্ধ্যা' সাইটনকে পুত্রবর দেওয়ার সময় দেবী মনসা শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন যে পুত্রদের বিবাহে সাইটন বিষহরি বা মনসা পূজা করবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজের সময় তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে ভুলে গিয়েছিলেন। কোন কারণ ছাড়াই যিনি চাঁদ সদাগরের সাত পুত্রের প্রাণ নাশ করতে পারেন এখানে কারণ থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি সাইটনের দুই পুত্রের প্রাণ হরণ করবেন না। "দেবী সাইটন তাঁর পুত্রদের বিবাহ দান কালে মনসাকে পূজা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই অধিবাসের দিন তাঁর দুই পুত্র লব ও কুশ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। এই জন্য এখনও পর্যন্ত কোচবিহারে ও জলপাইগুড়ির রাজবংশী সমাজে বিয়ের পূর্বে মনসার পাঁচালী গান গাইবার প্রথা আছে।"

[সংগ্রহ ঃ প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক,
পৃ-৩৭২ (১৯৭৭) ২য় খন্ড।]

কোচবিহারের দেবী দুর্গা এবং নরনারায়ণের স্বপ্নদর্শন ঃ

কোচবিহারের মহারাজা বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ উত্তরবঙ্গে সর্বপ্রথম দশভুজা দুর্গা মূর্তি পূজার প্রচলন করেন। এই প্রসঙ্গে প্রচলিত কিংবদন্তী হল— "মহারাজা নরনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ স্বীয় ক্ষমতায় গর্বিত হয়ে এবং সিংহাসন লাভের দুরাকাঙ্ক্ষায় প্ররোচিত হয়ে রাজসভার মধ্যে প্রবেশ করে নরনারায়ণকে হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু রাজসভায় তিনি উপস্থিত হয়ে দেখতে পান স্বয়ং ভগবতী দশবাহু দ্বারা বেষ্টন করে রাজাকে সুরক্ষিত রেখেছেন। রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজ এই দৃশ্য দেখে চমকিত, বিস্মিত, লজ্জিত ও ভীত হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই অলৌকিক ঘটনা মহারাজা নরনারায়ণের মনে এক ভিন্নধর্মী ভাবের সৃষ্টি করে। তিনি মনে করেন শুক্লধ্বজ চক্রান্তকারী হলেও তাঁর তুলনায় অধিকতর ভাগ্যবান। তাই শুক্লধ্বজ দেবী ভগবতীর দর্শন পেয়েছেন। নিজের ভাগ্যে দেবীর দর্শন না ঘটায় নরনারায়ণ মনের দুঃখে অন্নজল ছেড়ে লোকালয়ের বাইরে নির্জনে বাস করতে থাকেন। এভাবে দুই রাত্রি কেটে গেলে মহারাজা স্বপ্নে দেবীর দর্শন পান। তিনি দেবীর সেই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি গড়িয়ে রাজবাড়ীতে পূজার প্রচলন করেন।

(সংগ্রহ ঃ রাজোপাখ্যান, জয়নাথ মুন্সী, সম্পাদনা - বিশ্বনাথ দাস, পৃ-২৩, ১৯৮৫)

আজও লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক বিহীন সেই দুর্গা মূর্তি কোচবিহার দেবী বাড়ীতে বড়দেবী নামে পূজিত হয়ে আসছে। এই বড়দেবীর দুই পাশে আছে জয়া এবং বিজয়া।

এই দেবীর দুটি চোখ জগন্নাথ দেবের চোখের মত কিছুটা গোলাকার ও উজ্জ্বল। এখানে দেবীর বাহন শুভ্রবর্ণের সিংহ ও সবুজ বর্ণের বাঘ।

কোচবিহারে দেবী দুর্গার লৌকিকরূপ ভান্ডানি দেবীর পূজা সম্পর্কিত প্রচলিত কিংবদন্তী ঃ

দেবী ভান্ডানি সম্পর্কে কোচবিহারে তিনটি কিংবদন্তী আছে—

১) প্রাচীন কালে এক সময় নহুশ নামে জনৈক রাজা রাজপ্রাসাদে শারদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন সম্পন্ন করে শিকারে বেরিয়ে পড়েন। শিকারের আনন্দে রাজা দুর্গাপূজার কথা বিস্মৃত হন। দীর্ঘক্ষণ রাজার কোন খোঁজ না পাওয়ায় যথারীতি দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। কিন্তু রাজার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ না করে দেবী মর্ত্যভূমি ছেড়ে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। সে সময় দেবী চতুর্ভুজা রূপে বাঘের পিঠে আরোহণ করে বহু সন্ধানের পর বনের মধ্যেই অতর্কিতে রাজা নহুশের সামনে আবির্ভূত হন এবং পুষ্পাঞ্জলি প্রার্থনা করেন। রাজা বনের মধ্যেই বনফুল সংগ্রহ করে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন। এই পুষ্পাঞ্জলিতে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে প্রফুল্ল চিত্তে রাজাকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিতা হন। এই পূজাই উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ে ভান্ডানি দেবীর পূজা হিসেবে প্রচলিত হয়।

(কথক ঃ উপেন শর্মা, পিতা— চন্ডীচরণ শর্মা, ভান্ডানী পূজার পুরোহিত,
গ্রাম— নিজতরফ, মেখলীগঞ্জ, তাং - ১৪/১০/৯৭ ইং)

২) কোচবিহারের রাজবাড়ীতে শারদীয়ার পর বিজয়া দশমী তিথিতে দেবী মর্ত্যভূমি ত্যাগ করে কৈলাস যাত্রা শুরু করেন। এই যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন মালপত্রের তত্ত্বাবধায়ক ভান্ডারনী। তিনি নিজতরফ গ্রামে যাত্রাপথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতার কারণ বশত দেবী দুর্গাকে আরও তিনদিন ঐ গ্রামে থাকতে হয়। দেবীর স্বপ্নাদেশে গ্রামবাসীগণ উক্ত তিনদিন পুনরায় দেবীর পূজা করেন। দেবীর সঙ্গী ভান্ডারনীকে উপলক্ষ করে এই ঘটনা ঘটায় দেবী দুর্গার পরবর্তী এই পূজা ভান্ডারনী নামে প্রচলিত। আজও জেলার মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা মহকুমা ও হলদিবাড়ী ব্লকে এই পূজার প্রচলন আছে।

(কথক ঃ বিপিন্দ্রনাথ বর্মা, গ্রাম - নিজতরফ, মেখলীগঞ্জ,
১৩/১০/৯৭ ইং, পূজা কমিটির সদস্য)

৩) দেবীর এই পূজা সম্পর্কে অপর এক কিংবদন্তী হল দেবী দুর্গার ভান্ডানী নামে এক বোন ছিলেন। শারদীয়া পূজার শেষে দশমী তিথিতে দেবী দুর্গার মর্ত্য ত্যাগ করার সময় তাঁর বোন ভান্ডানি দেবী দুর্গার পূজার সংবাদ পেয়ে নিজে পূজা না পাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। মর্ত্যে তাঁর পূজা প্রার্থনা করেন। তাঁর দুঃখে সমব্যথী হয়ে-দেবী দুর্গা তাঁকে একাদশী তিথিতে

আবির্ভূত হতে বলেন। এই ভাবে একাদশী থেকে তিনদিন ব্যাপী শারদীয় উৎসবের ন্যায় ভান্ডানি পূজার প্রচলন হয় কোচবিহারে।

(কথক ঃ মুরারিমোহন সিংহ সরকার, মেখলীগঞ্জ শহর, তাং - ১৪/১০/৯৭ ইং)

কোচবিহারের রাজবংশের প্রতি কামরূপের কামাখ্যা দেবীর কথা (এতদঞ্চলে সুপ্রাচীন ও প্রসিদ্ধ লোকশ্রুতি বালোকপুরাণ) ঃ

"কেন্দু কলাই নামে জনৈক পূজারী ব্রাহ্মণের সহায়তায় মহারাজা নরনারায়ণ অন্তরালে থেকে নৃত্যপরায়ণা মৃন্ময়ী কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করলে অন্তর্যামিনী দেবী ভীষণ ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্টা হয়ে এক চপেটাঘাতে পূজারীর মস্তক ছিন্ন ভিন্ন করে মহারাজাকে এই বলে অভিশাপ দেন যে এরপর থেকে কোচবিহার রাজবংশের কেউ কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করলে রাজবংশ লুপ্ত হয়ে যাবে।"

কোচবিহার রাজ পরিবারের সদস্যগণ আজও কামাখ্যা মন্দির অতিক্রম করবার সময় নীলাচল পাহাড়ে কিছুক্ষণ শরীর আবৃত করে রাখেন। এছাড়াও কোচবিহারের রাজাগণের পক্ষে কামাখ্যা দর্শন নিষিদ্ধ হবার যে কারণ এতদঞ্চলে প্রচলিত ঠিক এরূপ কারণে কোচবিহারের রাজপরিবারের সদস্যগণের প্রাচীন কামতাপুরের গোসানীমারী কামতেশ্বরী দেবী দর্শনও নিষিদ্ধ আছে।

কামাখ্যা দেবী সম্পর্কে প্রচলিত অপর জনশ্রুতি ঃ

মহারাজা নরনারায়ণ কামাখ্যা দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রেমভিক্ষা চেয়েছিলেন। দেবীর শর্ত ছিল যে এক রাত্রির মধ্যেই একটি প্রকান্ড জলাশয় এবং পর্বতের চূড়া পর্যন্ত তাঁর সোপান নির্মাণ করে দিতে হবে। মহারাজা নরনারায়ণ তাঁর আরম্ভ করা কাজ সমাপ্ত করার পূর্বেই মোরগ ডেকে ওঠে, ফলে রাজার আশা ভঙ্গ হয়। তথাপি জনৈক পুরোহিতের সহায়তায় দেবীর নৃত্যকালে মন্দিরের ছিদ্র দিয়ে রাজা দেবী দর্শন করলে উপরোক্ত ঘটনা ঘটে।

(সংগ্রহ ঃ কোচবিহারের ইতিহাস, খান চৌধুরী আমানতুল্লা,
পৃ - ১২৭-২৮ / ১৯৩৬, কোচবিহার স্টেট)

রাজা ভগদত্ত সম্পর্কিত কিংবদন্তী ঃ

শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে প্রাক্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্য নরক রাজাকে প্রদান করেন। তিনি নরককে কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামাখ্যার মন্দিরের রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। নরক কৈলাশপতি মহাদেবের প্রতি অন্যায় আচরণ করাতে কৃষ্ণ তাঁকে সংহার করে তাঁর পুত্র ভগদত্তকে কামাখ্যা দেবীর দ্বারপাল হিসেবে নিযুক্ত করেন। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগদত্ত কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেন এবং অর্জুন কর্তৃক নিহত হন। ভগদত্ত নিহত হবার পর তাঁর হাতের কবচ উক্ত

যুদ্ধক্ষেত্রেই লোকচক্ষুর আড়ালে পতিত হয়। রাজা চক্রধ্বজ স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সেই কবচ এনে কামতাপুর নগরে মন্দির তৈরী করে সেই কবচকে স্থাপন করেন। এই মন্দিরই বর্তমান গোসানী দেবী কামতেশ্বর মন্দির। আবার গোসানীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ আছে "স্ফটিক কুড়া নামক একটি পুকুরের ধারে একটি শিমূল গাছের নীচে ঐ কবচ নিহিত ছিল। রাজা কান্তেশ্বর জনৈক মধুজালির সাহায্যে তাঁকে উদ্ধার করেন। মধুজালির এই কৃতিত্বের জন্য মহারাজ তাঁকে মৈথিল ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত করে ফুল তোলা দেউরী নামক উপাধি প্রদান করেন।" সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই মন্দিরের পূজারীগণ মৈথিলী ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় মন্দিরের বর্তমান পূজারী মৈথিলী ব্রাহ্মণ শ্রী রূপনারায়ণ ঠাকুর, গোত্র সাবর্ণ।

(সংগ্রহ ঃ কোচবিহারের ইতিহাস, খান চৌধুরী আমানতুল্লা,
পৃ-৪১, সন - ১৯৩৬, কোচবিহার স্টেট)

সোনারায়ের জন্ম কথা ঃ

দক্ষিণবঙ্গ তথা সুন্দরবন অঞ্চলের দক্ষিণ রায়, রূপা রায়, বনবিবির মত সোনারায় ঠাকুর উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলায় ব্যাঘ্র দেবতা হিসাবে পূজিত হন। কোচবিহারের রাখাল বালকগণ ব্যাঘ্র ভীতি দূর করার উদ্দেশ্যে ব্যাঘ্র দেবতা সোনারায়ের পূজা-অর্চনার মধ্যেই বিভিন্ন গানের মাধ্যমেও এর কাহিনী ব্যক্ত করেন।

মোগলের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হিন্দুসমাজ যখন তাঁদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ভুলে যাচ্ছিলেন, জাতি ও ধর্মভ্রষ্ট হয়ে বিপথে পরিচালিত হচ্ছিলেন তেমনি সময়ে আবির্ভাব ঘটে সোনারায় বা ধর্ম ঠাকুরের। উত্তরবঙ্গের সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু সমাজের কাছে তিনি নতুন পথের দিশারী। তাই এতদঞ্চলের বিশেষ করে তাঁর জন্মকাহিনী সম্পর্কে প্রচলিত বাঘের দেবতা সোনারায় বাঘের পিঠে চড়ে মহিষের দুধ পান করেন, এটাই তাঁর রীতি। হিংস্র ব্যাঘ্রও সোনারায়ের কাছে হার মেনে যায়। এই ঘটনাই উত্তরবঙ্গের মানুষকে ভীতিহীন ও সাহসী করে তোলে। কোন এক গোয়ালার স্ত্রী দই নিয়ে হাট ও বাজারে প্রতিদিন যান বিক্রির উদ্দেশ্যে। কিন্তু ধর্মভীরু হিন্দু সম্প্রদায় অজুহাত তোলেন গোয়ালার স্ত্রী নিঃসন্তান, তাই তাঁর দুধ কিনে খাওয়া যাবে না। শুধু তাই নয় যে নদী বা পুকুরে গোয়ালার স্ত্রী স্নান করতে যান সেই নদী বা পুকুরে কোন দুগ্ধবতী গাভীকে জল ছোঁয়ানো যাবে না। প্রাচীন বাংলাদেশের আচারনিষ্ঠ হিন্দুগণ একদিন কঠোরভাবে এই নিয়ম পালন করতেন। এমন কি এই সংস্কারের আওতা থেকে বনের পশু-পাখীরাও বাদ পড়ত না। সন্তানহীন বন্ধ্যা নারীর প্রতি লোকায়ত সংস্কার আজও আছে। বিভিন্ন ভাবে সামাজিক বয়কট ও মানসিক অত্যাচারের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে পুত্র লাভের আশায় একদিন গোয়ালিনী জলে নামলেন এবং হাঁটু জলে নেমে তিনি পাঁচবার ডুব দিলেন। স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরে তিনি নদী থেকে উপরে উঠলেন তারপর কলার পাতা কেটে এনে চাল ও চিনি ইত্যাদি দ্বারা দেবতার অর্ঘ্য প্রস্তুত করলেন এবং ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে পুত্রের জন্য আকুল আবেদন জানালেন।

নারীত্বের চরম বিকাশ পুত্র। পত্র ও পুষ্পের দ্বারা দেবতার নৈবেদ্য জীবনের বহিঃ-প্রকাশ। মনের মন্দিরে চিত্তরসের নিত্যভূমিতে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্য দেবসাধনার চরম পরিণতি। সেই মনের মন্দিরে যাঁকে পূজা করেছেন তিনিই সত্য ও শিবের মূর্তি ধারণ করে মৃন্ময়ী দেবতা চিন্ময়ী রূপে তাঁকে বর দিয়েছেন এবং চিরলাঞ্ছিতা নারীকে বর দিয়ে তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ করেছেন। শ্বেত মক্ষিকা রূপে গোয়ালিনীর অন্তরে দেবতার প্রকাশ ঘটেছে।

মা শিশুকে গর্ভে ধারণ করে অনেক কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করেন। পঞ্চম মাসে নবজাতককে অভ্যর্থনা করবার জন্যও মা নূতন সাজে সজ্জিত হয়ে উঠলেন। সাত মাসের সময় গোয়ালিনীকে সাধ ভক্ষণ করানো হল। দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হলে সেই ইঙ্গিত ধর্মরাজ সোনারায় ঠাকুর রূপে জন্ম গ্রহণ করলেন।

খান চৌধুরী আমানতুল্লা 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে সোনারায় সম্পর্কিত আধুনিক এক কিংবদন্তী হল কোচবিহারের প্রাচীন প্রবাদ— সোনারায় ছিলেন প্রাচীন কামতারাজ্যের ধর্ম সংস্কারক। তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে এসে ঘোড়াঘাটে অবতরণ করেন। তাঁর সঙ্গী ছিল একটি দুঃসাহসী বাঘ। একদিন সোনারায় বাঘটিকে জঙ্গলে রেখে বাড়ী বাড়ী হরিনাম বিতরণে যায়। এ সময় একজন শক্তিশালী মোগল সোনারায় ঠাকুরকে বন্দী করে রাখেন। কয়েকদিন বন্দী থেকে শেষে খেয়ে গায়ে শক্তি সৃষ্টি করে শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসেন এবং সেই মোগলকে স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে জানান—

> "যদিরে মোগলের ছাইলা না দিবি ছাড়িয়া,
> জন বাচ্চা মারিম তোর গনিয়া গনিয়া।
> হাতি শালের হাতি মারিম ঘোড়া শালের ঘোড়া
> এচিয়া বেচিয়া মারিম ভালো ভালো পাহোরা।"

(সংগ্রহ ঃ রাজবংশী সংস্কৃতিতে সোনারায় পূজা। গৌরীমোহন রায়, 'যাত্রা'-কোচরাজবংশী ক্ষত্রিয় কৃষ্টির মুখপত্র, ধুবরী, আসাম, ১৯৯৩, পৃঃ ১৬৩-৬৪)

কান্তেশ্বর রাজা সম্পর্কিত কিংবদন্তী ঃ

প্রথমে শ্রীবৎস রাজা কামরূপ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। পরে ভগদত্তের রাজ্য আরম্ভ হয়। ভগদত্তের বংশ বিলুপ্ত হলে কামরূপের নিকটস্থ জামবাড়ী গ্রামে মহাদেবের বরে কান্তেশ্বর নামক একটি বালক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম অঙ্গনা, পিতা ভক্তিশ্বর। দরিদ্রের সন্তান কান্তেশ্বর প্রথম জীবনে এক ব্রাহ্মণের গরুর রাখাল ছিলেন। কিন্তু কর্তব্যকর্মে তাঁর অনুরাগ ছিল না। এক সময় তাঁর ব্রাহ্মণ প্রভু সেই উদাসীন ভৃত্যের সন্ধানে গিয়ে দেখতে পান যে এক বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করে নিদ্রিত কান্তেশ্বরকে ছায়া দান করছে। এটি যে রাজলক্ষণ তা বুঝতে পেরে ব্রাহ্মণ তখন থেকে কান্তেশ্বরকে আদর যত্ন করতে থাকেন এবং কান্তেশ্বর ভবিষ্যতে রাজা হলে

তাঁকে রাজগুরু করবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। রাজা হবার পূর্বে কান্তেশ্বর দেবী চন্ডী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিলেন যে তাঁর বাড়ীর নিকটবর্তী 'কাজলী কুড়া' নামক জলায়য়ের তীরে গমন করে জল থেকে যে সকল দ্রব্য উঠে আসবে তা স্পর্শ করতে, কিন্তু তিনি আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে সমর্থ হন নি। পরন্তু জল থেকে উঠে আসা মকর কুম্ভিরাদি জলজন্তু দেখে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তাঁর হস্ত শেষপর্যন্ত একটি সর্পের পুচ্ছদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল এবং সেই কারণে তাঁর রাজত্ব একপুরুষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর মহিষী বনমালার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকার অপরাধে কান্তেশ্বর মন্ত্রীপুত্র মনোহরকে বধ করে তাঁর পিতা শশীপাত্রকে সেই নিহত পুত্রের মাংস ভক্ষণ করিয়েছিলেন। রাজার এই অন্যায় আচরণের প্রতিফল মানসে মন্ত্রী দিল্লীর মোগলের শরণাপন্ন হন এবং তাদের সাহায্যে কান্তেশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। কিন্তু পরে চন্ডীর কৃপায় রাজা কাজলী কুড়া নামক জলাশয়ে স্নানকালে অন্তর্হিত হন।

এই কিংবদন্তীর রাজা কান্তেশ্বর কর্তৃক গোসানী দেবীর প্রতিষ্ঠা বলে দেবীর নাম হয়েছে কান্তেশ্বরী দেবী।

ভানুমতী শিলা সম্পর্কিত কিংবদন্তী ঃ

মহাপুরুষ শঙ্করদেবের ভক্তশিষ্য হরিহর আতা তিনটি শর্ত সাপেক্ষে ভানুমতীকে বিয়ে করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ভানুমতী শর্ত ভঙ্গ করায় স্বামী হরিহর আতার অভিশাপে পাথর হয়ে যায় এবং হরিহর প্রতিদিন যখন পেটিমরা বিলে (চেপটি বিল) স্নান করতে যান তখনই পাষাণী ভানুমতী এগিয়ে আসত তাঁর পায়ের কাছে। একদিন এই পাথর হরিহর আতার পা ধরে বলে— "আমার কি গতি হবে এখন"। তখন তিনি আশীর্বাদ করলেন 'ভকতে তোমার সেবা করবে'। এভাবেই একদিন অন্যান্য ভক্তের চোখে পড়ায় তাঁরা ধরে সে পাথরকে নাকারখানা সত্রে প্রতিষ্ঠা করেন। নাকারখানা সত্র থেকেই মাধপুর সত্র হয়ে বর্তমানে মাধপুর হরিপুর সত্রের গর্ভগৃহে স্থানান্তরিত হয়। তুফানগঞ্জ মহকুমার একমাত্র বৃহৎ সত্র যার ভক্তগণ নিয়ম নিষ্ঠায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকেন। আজ মহকুমার সকল সম্প্রদায়ের মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই সত্রটি।

(কথক ঃ পুষ্পনারায়ণ ভকত, শালবাড়ী, তাং - ১১/২/২০০১ ইং)

তিস্তার কিংবদন্তী ঃ

W.W. Hunter সাহেব তাঁর 'A Statistical Account of Bengal' গ্রন্থে কালিকাপুরাণ বর্ণিত (Kali Purana) — তিস্তার উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন "শিব পত্নী পার্বতী এমন একজন অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন যাঁর মূল অপরাধ ছিল তাঁকে পূজা ও সমীহ না করে শুধুমাত্র তাঁর স্বামী মহাদেবকে পূজা করা। মহাদৈত্য ঐ অসুর পার্বতীর সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় তৃষ্ণার্ত হয়ে জল প্রার্থনা করেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক শিবের কাছে। ফলস্বরূপ শিব দেবী

পার্বতীর বক্ষস্থল থেকে তিনটি ধারায় এই নদীর সৃষ্টি করেন। যা আজও তৃষ্ণা, ত্রিস্রোতা নাম হয়ে তিস্তানামে প্রবহমান।"

বারো মাসের তের পার্বণে যেমন, তেমনি প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি মুহূর্তেই আর্থ সামাজিক পরিবেশ প্রকৃতির মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই মানুষ সংস্কার ও বিশ্বাসে আবদ্ধ। আপাত দৃষ্টিতে এগুলিকে অবৈজ্ঞানিক, যুক্তিহীন, অর্থহীন, কুসংস্কার বলে উপেক্ষা করলেও এদের কার্যকরী ভূমিকার গুরুত্বকে আমরা কখনও অস্বীকার করতে পারি না। যার কারণ এর পেছনে আছে দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যবাহী পরম্পরাগত অভিজ্ঞতা।

ঐতিহ্যগত, প্রথাগত বা বংশানুক্রমিক ভাবে আজও জেলার প্রায় সকল গ্রামেই অনেক প্রথা ও লোকবিশ্বাস বদ্ধমূল। যে কারণে ধানের চারা বা বীজবোনা থেকে ধান কাটার শেষপর্ব পর্যন্ত লোকবিশ্বাসজনিত অনেক লোকাচার ও প্রথা পালন করেন অনেকে। অতি বৃষ্টি, খরা, বন্যা, সর্প দংশনের ভয়, হাতি ও বাঘের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য এতদঞ্চলে লোকবিশ্বাসে অনেক গান, কথা ও সংস্কার প্রচলিত। লোকবিশ্বাসে ভর করেই এতদঞ্চলের মানুষ মনে করেন তিস্তা, তোর্ষা, রায়ডাক, কালজানি, গদাধরের জল গঙ্গার মত পবিত্র। ওঝা, ভোংরিয়ার তাবিজ কবজে আজও এখানে মানুষ নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়।

পূর্বে একটা সময় ছিল যখন অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার ও অজ্ঞতাই ছিল লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের মূলে কিন্তু বর্তমান ভোগবাদী সমাজে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন। স্বাভাবিক ভাবেই আশা আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে সংস্কার অভিমুখী করে তুলেছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সকল সময়ই মানুষের প্রাপ্তির সম্ভাবনার চেয়ে প্রত্যাশার বিস্তার বেশী। তাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ চেতনে অবচেতনে নিজের ধ্যানজ্ঞানকে উপেক্ষা করে শিক্ষিত যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও ভাগ্যনির্ভর হয়ে পড়েছে। যার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ আমরা দেখতে পাই প্রায় প্রত্যেকেই প্রথাগত বা বংশানুক্রমিক লোকাচারের ভয়ে কমবেশী লোকবিশ্বাস ও সংস্কারনির্ভর।

কোচবিহারের কৃষিনির্ভর লোকজীবনের যে সকল ট্যাবু, লোকবিশ্বাস ও লোকাচার বিশেষ করে স্থানীয় আদিবাসী সমাজের মধ্যে দেখা যায় তার সিংহ ভাগই কৃষিকেন্দ্রিক। কৃষি কাজের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ বৈশাখ থেকে চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত, ধানের চারা বোনা, তোলা পর্যন্ত অর্থাৎ ক্ষেতের লক্ষ্মীকে গৃহে স্থান দেওয়া পর্যন্ত এতদঞ্চলের স্থানীয় সম্প্রদায়ের রমণীগণ পালন করেন একাধিক লোকাচার। সমগ্র উত্তরবঙ্গের মত নদীমাতৃক কোচবিহার যেমন শস্য শ্যামলা যা স্থানীয় কৃষক কুলেরই আনুকূল্যে সমৃদ্ধ। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান, নদীর অবস্থান, নিবিড় বনানী, উন্মুক্ত নদীপ্রান্তর, সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত করে লোকজীবনের অনেক লোকাচার।

তিস্তা, তোর্ষা রায়ডাক, কালজানির পবিত্র বারিধারায় কোচবিহারের মৃত্তিকা আজও উর্বর। ধর্মীয় সামাজিক জীবনে যে আচার অনুষ্ঠানগুলি আমরা লক্ষ্য করি তাকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

লোকধর্মে বিশ্বাসী এতদঞ্চলের লোকজীবন, লোকাচার পালনে সকল সময় শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই এখানকার লোকজীবনে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-আচরণ নিজেদের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বাস, সংস্কার, টোটেম, ট্যাবু তাই এতদঞ্চলের লোকজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। আদিম জাতির ধর্মে যেমন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন স্থান ছিল না যার প্রমাণ সকল লোকাচারই তাই সমষ্টিগত বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এক কথায় কোচবিহারের লোকজীবনের সকল লোকাচারে প্রতিফলিত হয় এক সার্বজনীন মানসিক বৃত্তি।

শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্করহিত ও কৃষিনির্ভর সমাজজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হলেও সর্বত্রই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও যৌথ পরিবারের বন্ধন শিথিল হওয়ার দরুণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সকল লোকাচার আজও পূর্বের মত শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতায় পালিত হয় না।

এতদঞ্চলে বহুল প্রচলিত এমন অনেক লোকবিশ্বাস, সংস্কার বা লোকাচার আছে যেগুলিকে লোকনীতি (Mores) বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ বিশ্বাস ও সংস্কারগুলো মানা না মানার সঙ্গে ব্যক্তিসমাজ বা গোষ্ঠীজীবনের ভালোমন্দ মঙ্গল-অমঙ্গল এবং ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন জড়িত থাকে।

তথ্য সূত্র

১। বাংলার লোকসংস্কার ও বিশ্বাস প্রসঙ্গে— ডঃ সমীরকুমার ঘোষ, পৃ-২২১ (পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত)।

২। চন্ডীমঙ্গল কাব্য, নিদয়ার গর্ভ অধ্যায়, পৃ-৫, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

৩। সেকালের পল্লী সমাজ— ফয়েজ উদ্দীন আহমেদ (কোচবিহারের প্রাচীন কথা, সম্পাদনা — বিশ্বনাথ দাস, পৃ-৪২)।

৪। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত— ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ-১০ (১৯৭৭)।

৫। Statistical Account of Bengal - W.W. Hunter, Vol -10. Page -372 Reprint (1974)

৬। কোচবিহারের লোকাচার— ধর্মনারায়ণ বর্মা, পৃ ৩৩২, মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ১৩৯৫)।

৭। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত— ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ-২৫৩ (১৯৭৭)।

৮। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত— ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ-২১৪ (১৯৭৭)।

৯। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ, পৃ-৭১৮, ৭১৯।

১০। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ— ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়, পৃ-১২৮, (১৯৭০)।

১১। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা পার্বণ— ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়, পৃ-২০৩-৪, (১৯৮৭)।

১২। Statistical Account of Bengal W W Hunter, P-379-8, Reprint (1974)

১৩। Rajbanshis of North Bengal– Dr. Charu Ch. Sanyal, P.-139.

১৪। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ— ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়, পৃ-১১৭ (১৯৯৯)।

১৫। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার— কুন্তলা অধিকারী, নিরোবালা বর্মন, সরোজিনী বর্মন, গ্রাম- অন্দরান ফুলবাড়ী, ১নং অঞ্চল, ১লা অগ্রহায়ণ, (১৪০৫)।

১৬। বাংলার লোকসংস্কৃতি— ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, পৃ-২৪৪, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, (১৯৭৪)।

১৭। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার— সুমতি দত্ত (বারুজীবী), পেশা-গৃহস্থ, দেশ-বাংলাদেশ, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ আবির পাড়া, সেরেজ দীঘা গ্রাম, বর্তমান তুফানগঞ্জ শহর নিবাসী, তাং-১৭/১০/৯৭ ইং।

১৮। বাংলার লোকসংস্কৃতি— ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ-২৪৫, (১৯৭৪)।

১৯। বাংলার লোকসংস্কৃতি — আশুতোষ ভট্টাচার্য, (২য় খন্ড) , পৃ-৬৪৮, (১৯৭৩)।

২০। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার— হলেশ্বর বর্মন, পেশা - কৃষিকাজ, গ্রাম - খরখরিয়া, মেখলিগঞ্জ, তাং - ২৬/৭/২০০০ ইং।

২১। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি— শঙ্কর সেনগুপ্ত, পৃ-৩৭৮, (১৯৭২)।

২২। বাংলার লোকসংস্কৃতি— ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ-২৫০, (১৯৭৪)।

২৩। বাংলার লোকসংস্কৃতি— ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ-২৫১, (১৯৭৪)।

২৪। বাঙালীর ইতিহাস— ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, লেখক সমবায় সমিতি, কলিকাতা, (১৩৭৪)।

২৫। লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা— প্রদ্যোত ঘোষ, পৃ-২৭ (১৯৮২)।

২৬। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত— ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ-১০৪, (১৯৭৭)।

২৭। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার— মিনতি বর্মা, গ্রাম- বালাঘাট, তুফানগঞ্জ, তাং - ২৯/৭/২০০০।

২৮। বাংলার ব্রত পার্বণ— ডঃ শিলা বসাক, পৃ-৫৮ (১৯৯৮)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লোকশিল্প

ভূমিকা ঃ

শুধু উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারই নয়, যে কোন দেশের বিশেষ করে কৃষি-নির্ভর জনবলে সমৃদ্ধ ও স্বল্প আয় বিশিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প তথা লোকশিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ও বেকার সমস্যার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে এরূপ ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ও প্রাধান্য স্বনির্ভর কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। আদিম যুগে বিশেষ করে যখন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয় নি তখন থেকেই মানুষ শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করেছে। কোচবিহারের লোকায়ত ক্ষুদ্র-শিল্প বেশ প্রাচীন, ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। ইংরেজ আমলে বাংলার প্রাচীন তাঁতশিল্প যেমন সারা ভারতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল তেমনি উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের তাঁতশিল্পও আজ সেই ঐতিহ্য মেনে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পের একাধিপত্য ছিল নবদ্বীপ, নদীয়া ও বিষ্ণুপুরের অধীন। আজ এই শিল্পের বিস্তার পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঘটেছে। কোচবিহার জেলা সদরের পুন্ডীবাড়ী ও তুফানগঞ্জ মহকুমার কামাতফুলবাড়ি গ্রামের হস্ত চালিত তাঁত শিল্প আজ বাংলার প্রাচীন কুটিরশিল্পের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসকার অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনই প্রথম গভীর অনুরাগের সঙ্গে বাংলার এই ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ লোকশিল্পের পরিচয় শিক্ষিত সমাজের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন।"[১] জেলার লোকশিল্পীদের প্রত্যেকেরই শিল্পকর্মগুলি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত এবং পরম্পরাগত ঐতিহ্য অনুগামী এখানে লোকশিল্পের সঙ্গে সমাজ, সংস্কার, বিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা মিলেমিশে একাকার। প্রসঙ্গত বলা যায় লোকশিল্পীর চেয়েও শিল্পবস্তুটি মুখ্য। জেলার পাঁচটি মহকুমার (জেলা সদর, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা ও হলদিবাড়ী ব্লক) নিবিড় ক্ষেত্রানুসন্ধানে আমরা দেখতে পাই বাঁশ, কাঠ, বেত, শোলা, মাটি, পাটি, পাট ও তাঁত শিল্পের উপর নির্ভর করে অসংখ্য লোকশিল্পী লোকচক্ষুর আড়ালে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে বংশপরম্পরায় নিজেদের পূর্বপুরুষ প্রদত্ত শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখে বাংলা তথা ভারতের সুনাম বাড়িয়ে যাচ্ছেন। কোচবিহারের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কিছু লোকশিল্পের কথাই আলোচিত হয়েছে এই লোকশিল্প পরিচ্ছেদে।

পাটিশিল্প ঃ

কোচবিহারের লোকশিল্প তথা কুটীর শিল্পের অন্যতম এই পাটিশিল্প। এই শিল্পের ব্যবহারিক প্রাধান্য ছিল একদিন মূলত বাংলাতেই। কিন্তু আজ পাটিশিল্পীদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা,

দক্ষতা ও নৈপুণ্য পাটির গুণগত মান ও অভিনব সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে পাটিশিল্প আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে। পাটিশিল্পীগণ শুধুমাত্র তাঁদের জীবন-জীবিকার জন্যই নয়, লোকশিল্পের এই আঙ্গিকটির বিকাশ ঘটাতেও বিভিন্ন ভাবে যুক্ত। অন্যান্য ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের সঙ্গে পাটিশিল্প আজ অনেক উৎকর্ষ লাভ করেছে। কোচবিহারের এই শিল্পের সমৃদ্ধি ও প্রসার ঘটাতে পাটি শিল্পী সম্প্রদায়ের যে সকল শিল্পী তাঁদের শৈল্পিক নৈপুণ্যতায়, কারুকার্য গঠনে, দক্ষতায়, সৌন্দর্যবোধ প্রয়োগ করতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ হল কোচবিহার জেলা সদরের ঘুঘুমারী নিবাসী শ্রী নারায়ণচন্দ্র দে ও ধলুয়াবাড়ী নিবাসী শ্রীমতী টগর রাণী দে। উভয়েই আজ নিজস্ব শিল্পকর্মের উৎকর্ষ বিচারে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত।

কোচবিহার জেলায় অন্যান্য কুটিরশিল্পের পাশাপাশি এই পাটিশিল্প আজ শিল্পকর্ম ও বিপণনের ক্ষেত্রে সবার উপরে। এই জেলায় প্রায় তিন হাজার পরিবার ও পনেরো হাজার মানুষ এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। বাঁশ, শোলা, পাট ইত্যাদি কারুশিল্পের মত এখানেও ছোট, বড়, নারী, পুরুষ সকলেই এই কাজে সিদ্ধ হস্ত। কোচবিহার জেলার বিশেষ করে ঘুঘুমারী, ধলুয়াবাড়ী ও তুফানগঞ্জ মহকুমার ধনমতিয়া গ্রামের মেয়েরা এই শিল্পকে তাঁদের জীবিকার একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কোচবিহারের পাটিশিল্প মূলত মাইগ্রেটেড লোকশিল্প। "অবিভক্ত বাংলার টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা অঞ্চলের বেতিয়ার সম্প্রদায়ের পাটিশিল্প মূলত মাইগ্রেটেড লোকশিল্প। পূর্ববঙ্গীয়গণই বংশানুক্রমিকভাবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।"[২] সেই সুবাদে বলা যায় দেশ ভাগ হবার পর থেকে এই শিল্প এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। কোচবিহারের গ্রামীণ অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে এই পাটিশিল্প। দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার এই সম্প্রদায়ের মানুষ বেশীর ভাগ এসে হাজির হন ঘুঘুমারী, হরিণচড়া, তুফানগঞ্জ মহকুমার ধনমতিয়া গ্রামে। নিবিড় ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে এবং কোচবিহার জেলার গ্রামভিত্তিক বেতকর, পাটিকর, পাইটাল ও পাটিশিল্পীদের উপর ১৫/১০/৯৫ ইং থেকে ১/১১/৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়কালে এক পারিবারিক সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই "জেলার উক্ত সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষগণ ঘুঘুমারী, ঘেঘীর ঘাট, পুষুনার ডাঙ্গা, গাঙালেরকুঠী, হাওয়ার গাড়ী, বাইশগুড়ি, বালাসী, দেওচড়াই, ঘোগারকুঠী, ধনমতিয়া, তুফানগঞ্জ, পানিগ্রাম, বারকোদালী প্রভৃতি গ্রামে এই শিল্পের অবস্থান।"[৩]

পাটি তৈরীর মূল উপকরণই হল পাটিগাছ। এক অর্থে এটি কৃষিভিত্তিক লোকশিল্প। গাছ থেকেই এই গাছের জন্ম। গোড়া তুলে এই গাছ লাগানো হয়। মূল চারাগাছ পাওয়া যায় ধলুয়াবাড়ী, প্রেমেরডাঙা, আমবাড়ী ও দেওচড়াই গ্রামে। সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে চারাগাছ লাগানো হয়। দোঁয়াশ বা এঁটেল মাটি এই চারাগাছের উপযুক্ত জমি। গাছ সাধারণত দশ-বারো ফুট লম্বা হয়। অনেক ক্ষেত্রে চার-পাঁচ ইঞ্চি মোটা (পরিধি) হয়। গাছের রঙ সবুজ, ফুলের রঙ

সাদা। ঘুঘুমারী গ্রাম নিবাসী প্রবীণ পাটিশিল্পী নারায়ণচন্দ্র দে পাটিগাছ সম্পর্কে একটি প্রচলিত ছড়ায় বলেন— "কৃষ্ণ বরণ গাছ তার রাধিকা বরণ ফুল, মধ্যের শাঁস ফেলে দিয়ে বাকল তার মূল।"

সাধারণত পাটিবেত থেকেই শীতলপাটি তৈরী হয়। পাটি যত নরম হবে পাটির গুণগত মানও তত বৃদ্ধি পাবে। জমি থেকে ব্যবহারযোগ্য পাটিগাছগুলি প্রথমে কেটে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। এর পর আঁশগুলো ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে ফালি করা হয়। একটি গাছে তিনটি ফালি বের করা হয়। প্রথমের ফালিটি দিয়ে তৈরী হয় শীতলপাটি। এই বেতের ফালিগুলিকে এক দিনের মধ্যে শুকিয়ে ভাতের ফেনের মধ্যে ৪০-৫০ মিনিট ফুটিয়ে জলে ধুয়ে আবার শুকিয়ে নিলে একেবারে সাদা রূপ নেয়। এর পর এই পাটিগাছের ছালটি শীতল পাটি তৈরীর উপযোগী হয়ে ওঠে। নীচের অংশ দিয়ে কম দামের পাটি তৈরী হয়।

উন্নত কারিগরি পদ্ধতিতে পাটিশিল্পে নানারূপ চিত্র, লতা-পাতা, ফুল ও বিচিত্র কারুকার্য সৃষ্টি হচ্ছে। কোচবিহারের ঘুঘুমারী গ্রামের নারায়ণচন্দ্র দে আবিষ্কার করেন এরূপ এক রঙিন কারুকার্যমন্ডিত পাটি যার নাম 'কমলকোষ পাটি'। এ পাটির বৈশিষ্ট্য হল রঙিন কাপড়, বেড কভার ও গরদের কাপড়ের মত যে কোন লতাপাতা ফুল, পশুপাখীর ছবি বুননের মাধ্যমে তৈরী করা। তাঁরই সূক্ষ্ম বুদ্ধি, অধ্যবসায়, দক্ষতা এবং সৌন্দর্যবোধকে প্রয়োগ করে কারিগরি কলাকৌশলকে আরও আশ্চর্যমন্ডিত করে তুলেছেন তাঁর আবিষ্কৃত 'কমলকোষ' পাটিতে। জেলার ঘুঘুমারী, ধলুয়াবাড়ী অঞ্চলের অনেক দক্ষ পাটিশিল্পী এই কমলকোষ পাটিতে মানচিত্র, বাড়ীঘর, মন্দির, মসজিদ, গীর্জার প্রতিচ্ছবি অনায়াসে নিখুঁত বুননের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়া অপর শিল্পী ধলুয়াবাড়ী নিবাসী শ্রীমতী টগর রাণী দে পাটিশিল্পের নূতন শিল্পকর্মে বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে পার্স, ভ্যানিটি ব্যাগ, ঝুড়ি, স্কুলব্যাগ, পাখা, ক্যালেন্ডার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের অভিনব শিল্প সামগ্রী তৈরী করেন।

জেলার বাইশটি গ্রামে ক্ষেত্রানুসন্ধানে আমরা উপচারগত ও গুণগত মানানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যে পাটিগুলি দেখতে পাই সেগুলি মূলত চার রকম। যথা— ১) কমলকোষ পাটি, ২) শীতল পাটি, ৩) বেতের পাটি এবং ৪) বুকার পাটি। এই শীতল পাটি আবার দুই রকমের। যেমন— রাশি শীতল পাটি এবং ভুসনাই শীতল পাটি। বর্তমানে কোচবিহার জেলার প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামে তিন হাজার পরিবারে পনের হাজার মানুষ এই শিল্পকর্মে যুক্ত।

প্রাথমিক পর্যায়ে শীতল পাটি ও সাধারণ পাটি বুননের মাধ্যমে রঙিন চেক, ডোরা, বাইলাম, বাটা ও জামদানী ইত্যাদি নানা প্রকার ডিজাইন অঙ্কন করা হয়। এরূপ নকসাযুক্ত পাটি সাধারণত ২/২ সূত্রেই বুনোট করা হয়। আর কমলকোষ পাটির ক্ষেত্রে রঙিন সূতি বেতের সাহায্যে ৪/১, ১/৪ স্টার, মোটা ও চতুষ্কোণী ফরমূলায় তৈরী হয়।

হোগ্‌লা ঃ

কোচবিহারের স্বল্প প্রচলিত অথচ জনপ্রিয় লোকশিল্প হল এই হোগ্‌লা শিল্প। এতদঞ্চলে এটি পাটির বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হোগ্‌লা নামক এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ এই হোগ্‌লা শিল্পের প্রধান উপকরণ। বিছানার চাদর, সতরঞ্চি বিকল্প হিসেবে হোগলা পাটী ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ঘরের ছাদের ছাউনি, বেড়া প্রভৃতি কাজেও জেলার অনেক গ্রামেই হোগ্‌লার জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। এর বুনোট পাটির মত নক্‌সা বা Motif নয়। সরাসরি বাঁশের চাটাইয়ের মত এর বুনোট। তুফানগঞ্জ মহকুমার ধনমতিয়া গ্রাম, ঘুঘুমারী ও শুকারুর কুঠী (জেলা সদর) ও বলরামপুরে এই লোকশিল্প, লোকশিল্পী ও হোগলা নামক জলজ উদ্ভিদ দেখা যায়। পাটির বিভিন্ন নক্‌সা সমন্বিত উচ্চমান ও উচ্চদামের নিরিখে হোগ্‌লা শিল্প শহরাঞ্চলে তেমন ভাবে জনপ্রিয় হতে পারে নি। লোকশিল্পের এই আঙ্গিকটির সঙ্গে গ্রাম্য জীবনের যোগসূত্রই বেশি।

মৃৎশিল্প ঃ

লোকশিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন হল মৃৎশিল্প। কোচবিহার জেলায় এই শিল্পের সঙ্গে জীবন-জীবিকার স্বার্থে জড়িত বেশীর ভাগ মৃৎশিল্পী পূর্ববঙ্গীয় ময়মনসিংহ ও পাবনা অঞ্চলের পাল পদবীধারী মানুষগণ। দৈনন্দিন ব্যবহার্য মাটির হাঁড়ি, কলসী, থালা, বাটি, সরা, পিঠে তৈরীর সাঁজ তৈরীতে অভ্যস্ত হলেও কোচবিহার সদর, দিনহাটা মহকুমার অনেক গ্রামে আধুনিক রুচিসম্মত গৃহসজ্জার অনেক উপকরণ হিসেবে পোড়ামাটি তথা টেরাকোটার কাজ করছেন অনেকে। জেলার শিল্পদপ্তর থেকে আর্থিক আনুকূল্যেও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন অনেকে।

মাটির গুণাগুণে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কারিগরি দক্ষতা ও ক্রেতার চাহিদা। তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্দরাণ-ফুলবাড়ী গ্রামের প্রবীণ মৃৎশিল্পী 'খোকারাম পালে'র মতে মৃৎশিল্পে এঁটেল মাটি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং উপযুক্ত। কোচবিহারে মৃৎশিল্পীগণ বেশীরভাগই আসামের গোয়ালপাড়া, গৌরীপুর, তুফানগঞ্জের চিলাখানা গ্রাম থেকে মাটি সংগ্রহ করেন। কোচবিহার জেলার মৃৎশিল্পীদের নক্‌সাযুক্ত ও সাধারণ উপকরণের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি জেলার উপকরণের মিল দেখা যায়। জেলার বিভিন্ন গ্রাম্য মেলা ও হাটে-বাজারে মৃৎশিল্পজাত যে সামগ্রীগুলি সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয় সেগুলি হল বিভিন্ন আকারের মাটির ঘট, বিয়ের সরা, মালসা ও ঢাকনা, পিলসুজ, ধূপদানি, কল্‌কি, পাতিল, বিচিত্র দুর্গা ও লক্ষ্মীর সরা। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় জেলার বিভিন্ন গ্রামে আমরা দেখতে পাই একটু সম্পন্ন মৃৎশিল্পীগণ মাটির হাঁড়ি, কলসী ও ফুলের টব তৈরীতে চাকের ব্যবহার করেন। অনেকে সরাসরি হাত দিয়েই তৈরী করেন। স্থানীয় মৃৎশিল্পীগণ এঁটেল মাটির পাশাপাশি এক ধরনের কালোমাটিও ব্যবহার করেন। বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ সবাই উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন পলিমাটি, খয়ার ও খাওয়ার সোডা। তাঁরা এই উপকরণ জ্বাল করে কাঁচামাটির তৈরী বস্তু রঙ করে তারপর পোড়ান। কাঁচা উপকরণগুলি শিল্পীগণ সাধারণ ভাবে পোড়ান কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, চৈত্র মাসে। অনেকে

হাঁড়ি কলসী রঙ করার জন্য টায়ার পুড়িয়ে ধোঁয়া দিয়ে কালো রঙ করেন। মৃৎশিল্পীগণ বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি তৈরীর সময় মাটির সঙ্গে পাট, খড় কেটে মিশিয়ে দেন। কোচবিহারের মৃৎশিল্পীদের উল্লেখযোগ্য শিল্প নিদর্শন হল পোড়ামাটির অলঙ্কারযুক্ত পুতুল। যেমন— হাতি, ঘোড়া, বাচ্চাদের খেলনাবাটি, বুড়া বুড়ি প্রভৃতি সম্পূর্ণ হাতে তৈরী। শিল্পদ্রব্যগুলি বিপণনের সুযোগ একমাত্র বিভিন্ন গ্রাম্য মেলা। সকল ক্ষেত্রে শিল্পীরা কাঁচামাটির পুতুল হাতে তৈরীর পর রোদে শুকিয়ে নেন। নির্মিত দ্রব্য সরাসরি হাতেই তৈরী হোক আর চাকেই তৈরী হোক সকল ক্ষেত্রে পালিস করবার জন্য 'ব্যাও' ব্যবহার করেন। এটি দেখতে অনেকটা ছুরির মত। কোচবিহার জেলায় এই ব্যাও-এর পরিবর্তে পাতলা বাঁশের কায়েম বা বাতি ব্যবহার করেন। মৃৎশিল্পের হাঁড়ি, পাতিল, পুতুল যাই হোক না কেন সকল ক্ষেত্রেই এঁরা এক ধরনের লাল রঙ ব্যবহার করেন। লোকশিল্পের অন্যান্য আঙ্গিকের মত মৃৎশিল্পীগণও শুধুমাত্র এই কর্মের মাধ্যমে জীবন জীবিকার ভরসা না করে কৃষিকাজের সঙ্গেও যুক্ত থাকেন। বাংলাদেশের লোকধর্মের মত বাংলার পুতুল প্রতিমা শিল্পের প্রধান উৎস। ঘট, পট ও পুতুলের সীমা ছেড়ে এই মনুষ্য রূপ লাভ করার পিছনে বাংলার লোকসমাজে রূপ চেতনা ছিল সক্রিয় ও প্রখর। জেলার বিভিন্ন গ্রামে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় আমরা একাধিক লোকশিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

জেলা সদরের কালজানি গ্রামের বাসিন্দা আরতিবালা পাল, স্বামী চন্দ্রকান্ত পাল তিন পুরুষের মৃৎশিল্পী। যন্ত্র ব্যতীত সম্পূর্ণ হাতে তৈরী করেন পোড়ামাটির পুতুল, ঘট, কলসী ইত্যাদি। মেখলীগঞ্জ মহকুমার নালারটারী গ্রামের স্থানীয় প্রবীণ মৃৎশিল্পী প্রফুল্লচন্দ্র রায় চার পুরুষের বংশানুক্রমিক শিল্পী। তিনি মাটির কাজের পাশাপাশি শোলাশিল্পেও দক্ষ। মৃৎশিল্পী প্রফুল্লচন্দ্র রায় মাটির মাসান, যখাযখি, বিভিন্ন পুতুলের পাশাপাশি শোলার ফুল, মুখোশও তৈরী করেন।

মেখলীগঞ্জ মহকুমার ১৩৯ বক্‌নাবান্দা গ্রামের ফকিরচাঁদ পাল, পিতা নীলমোহন পাল, ঢাকা জেলার সিন্দলিয়ার দুর্গা ও ভাণ্ডানী মূর্তি তৈরী করেন। মাটির কাজের উপর রঙ ব্যবহারে দক্ষতা শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন গ্রাম্য মেলা বাদ দিলে ধাপরা, জামালদহ, মেখলীগঞ্জ, চ্যাংরাবান্দা প্রভৃতি অঞ্চল শিল্পীর কাজের বাজার। কোচবিহারের লোকশিল্পীরা দেবদেবী মূর্তি তৈরীতে শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানেন না। লোকধর্মের সঙ্গে বাংলার লোকশিল্পের অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে বলেই শিল্পীর কল্পনা লোকানুগ এবং স্থানীয়ভাবে প্রভাবিত।

জেলার প্রায় ১০০০ মানুষ এই মৃৎশিল্পকে জীবিকা হিসেবে ধরে রেখেছেন। বক্‌সির হাটের গাজীর কুঠী গ্রামের মৃৎশিল্পী টুলু বর্মন মাসানের মূর্তি তৈরীতে একজন দক্ষ শিল্পী। দিনহাটা মহকুমার সিতাই ব্লকের চামটা গ্রামের রাজবংশী মৃৎশিল্পী কণ্ঠেশ্বর বর্মন তাঁর শিল্পগত দক্ষতার জন্য বাংলার বাইরেও প্রশংসা লাভ করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু হল দুর্ঘটনা,

উদ্বাস্তু, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, খুন ও মৃত ব্যক্তির প্রতিমূর্তি তৈরী করা। তিনি প্রতি বছর এই ব্লকের ধূমদহপার স্নান মেলা উপলক্ষে ১৫ দিন ব্যাপী এক একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তুফানগঞ্জ মহকুমার পালপাড়া গ্রামের বংশানুক্রমিক মৃৎশিল্পী নারায়ণ চন্দ্র পাল ১লা জ্যৈষ্ঠ চাক পূজা দিয়ে কাজ শুরু করেন। কোচবিহারের মৃৎশিল্পীদের দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় এক সম্প্রদায় তাঁদের শিল্পকর্মের উপকরণে শুধু পোড়ামাটিই বেছে নেন। পূর্ববঙ্গীয় ফরিদপুর জেলার মৃৎশিল্পী বর্তমানে মারুগঞ্জ নিবাসী সুকুমার পাল এবং চিলাখান গ্রামের ধীরেন পাল, শ্রীদাম পাল বিচিত্র লক্ষ্মীর পট ও সরা তৈরীর দক্ষ শিল্পী।

১৯৯৬-৯৭ সালে জেলাস্তরে কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর আয়োজিত প্রদর্শনীতে জেলা সদরের কুমারটুলী অঞ্চলের মৃৎশিল্পী গোবিন্দ পাল পোড়ামাটির মুদ্রা তৈরী করে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

বাঁশশিল্প ঃ

আর্ট বা শিল্পকর্মের Motif বা নক্সা ইত্যাদির ব্যাপারে জেলার পাঁচটি মহকুমা অঞ্চলের কোচবিহারের স্থানীয় মানুষ বাঁশের উপর নির্ভর করেই অপূর্ব শিল্পকর্মের নিদর্শন রেখেছেন। অনেকে আবার জেলা বা রাজ্যস্তরে শিল্প দপ্তরের সৌজন্যে আয়োজিত অনেক প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছেন। যেমন জেলা সদরের পানিশালা গ্রামের জগমোহন বর্মন বাঁশের খাঁচা তৈরী করে, উক্ত গ্রামের বৃন্দাবন বর্মন ঝুড়ি তৈরী করে, নিউ কোচবিহারের বাইশগুড়ি গ্রামের প্রাণনাথ দাস বাঁশের নানা জিনিস তৈরী করে রাজ্যস্তরে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্দরাণ-ফুলবাড়ী গ্রামের নৃপেন (ঢোলা) বর্মন বাঁশের গুড়ি দিয়ে অশোকস্তম্ভ তৈরী করে রাজ্যস্তরে প্রথম পুরস্কারে ভূষিত হন। নান্দনিক সৌন্দর্য-নির্ভর বাঁশের কারুকার্য খচিত শিল্পকর্মের দক্ষ শিল্পী নৃপেন বর্মন (ঢোলা), কোচবিহার দেবীবাড়ীর তোর্ষাচরের যতীন মোদক ও দিনহাটার ভেটাগুড়ি অঞ্চলের বিশু বর্মা কোচবিহারের বাঁশের শিল্প দ্রব্যকে বাংলার শিল্প রসিক সমাজের কাছে পৌছে দিয়েছেন। বাঁশশিল্পের দক্ষ শিল্পী নৃপেন বর্মনের মতে "মাকলা বাঁশ এবং খুঁটির উপযুক্ত বড় বাঁশ শিল্প- কর্মের সবচেয়ে উপযুক্ত বাঁশ। এছাড়াও একাজে প্রয়োজন হয় আঠা, ফেবিকল, পিন, তারকাটা, বেত ও প্লাস্টিকের সুতা।" বাঁশের তৈরী বিভিন্ন শিল্প দ্রব্যগুলি হল ঝুড়ি, বাঁশের টেবিল, চেয়ার, ফুলদানি, কলমদানি, ঘট, নানা রকম ফুল ও মডেল হিসেবে অশোকস্তম্ভ। এছাড়াও মাছ ধরার নানা উপকরণ যেমন— ধেউলি, বারুণ, খলুই, জাকই, ঝোকা, থোরকো, জোলোঙ্গা ইত্যাদি।

বাঁশশিল্পের প্রধান উপকরণ হল মাকলা বাঁশ। এই বাঁশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এতে ঘুন ধরে না। শুধু লোকশিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র কোচবিহারের সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যেই লৌকিক পূজা-পার্বণ থেকে শুরু করে শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত পর্যন্ত এতদঞ্চলের বাঁশের বহু ব্যবহার আর্থসামাজিক

ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে। শিল্প- কর্মের উপযুক্ত উপরিউক্ত বাঁশ ছাড়াও যে সকল বাঁশ এতদঞ্চলে জন্মায় সেগুলি হল নলবাঁশ, ঝাড়বাঁশ ইত্যাদি।

জেলা সদরের ঘুঘুমারী গ্রামের দক্ষ তাজিয়াশিল্পী আকবর মিঞা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে বাড়ির মন্ডপ ও পূজার আলপনার কাজ করে থাকেন। তাজিয়া তৈরীর মূল উপকরণ হল বাঁশ, কাগজ, পাট ও আঠা। একটি তাজিয়ার উচ্চতা হয় সাধারণত ২৮ হাত লম্বা ও নীচে পাঁচ হাত চওড়া। সময় লাগে পঁচিশ দিন এবং সঙ্গে থাকে দুজন সহযোগী।

কোচবিহার মদনমোহন বাড়ীতে রাস উপলক্ষ্যে যে রাসমঞ্চ তৈরী হয় তার বর্তমান শিল্পী আলতাফ মিঞা। পূর্বে এই মঞ্চ তৈরী করতেন তাঁর পিতা আজিজ মিঞা এবং তারও পূর্বে আজিজ মিঞার পিতা। এখনও বংশানুক্রমিক ভাবে আলতাফ মিঞা এই কাজ করে চলেছেন। ১৫০০-২০০০ টাকার মধ্যে উপকরণ সহ চুক্তিবদ্ধ ভাবে তিনি এই রাসমঞ্চ তৈরী করেন।

১৫, ২০, ২৮, ৩০ হাত পর্যন্ত লম্বা তাজিয়া এখানে তৈরী হয়। রঙ-বেরঙের কাগজ ও বিভিন্ন চিত্রপটে তৈরী কাটা কাগজের কারুকার্য খচিত তাজিয়ার মাঝখানে লম্বা পিতলের তলোয়ারের মত একটি বস্তু থাকে, যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় পাঞ্জরা। তাজিয়া শিল্পীগণ হলেন বিহার মিঞা (শুকটাবাড়ী), আলতাফ মিঞা (ছাট গুড়িয়াহাটি, নিউ টাউন) প্রমুখ তাজিয়া শিল্পের দক্ষ সহকারী ঘুঘুমারী গ্রামের গাটু মিঞা। জেলার হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এই শিল্পীগণের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেকথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

দারু ও কারু শিল্প ঃ

জেলার লোকশিল্পের অঙ্গণে দারু ও কারু শিল্প একটি উল্লেখযোগ্য নাম। শুধু দৈনন্দিন জীবনের তাগিদেই নয় এর বাইরেও বিভিন্ন পূজা ও ধর্মীয় উৎসবে এই সব জিনিসের চাহিদা রয়েছে। লোকশিল্পের নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখা যায় কাঠের গুড়ি ও কাঠের টুকরো, বাঁশের গুড়ি ও বাঁশ, পাটজাতদ্রব্য, এ ছাড়াও কলাগাছ, পুরনো কাপড় ইত্যাদি দিয়ে ডোরা- কাটা মেখলি কিংবা কাঁথা সেলাইয়ের মধ্যে শিল্পী তাঁর শৈল্পিক ও নান্দনিক চেতনার চোখে তুচ্ছ বস্তুকেও পরিণত করেন বিভিন্ন শিল্প সামগ্রীতে। এই দারু শিল্পেরই একটি আঙ্গিক হল 'কাঠ খোদাই'।

দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া, কৃষ্ণপুর, বর্ধমানের মতো দক্ষ দারুশিল্পী এতদঞ্চলে না থাকলেও তুফানগঞ্জ মহকুমার ক্ষুদিরাম মজুমদার, বক্সির হাট গ্রামের তিলেশ্বর বর্মন, কোচবিহার সদরের কালীঘাট রোডের সুবল সূত্রধর ও নিমাই সূত্রধর, দিনহাটা মহকুমার সিতাই গ্রামের রমেশচন্দ্র বর্মন জেলা ও রাজ্যস্তরের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নিগমের দ্বারা পুরস্কৃত দারুশিল্পী। ১৯৯৬-৯৭ সালের কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প ধারার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যস্তরে ২০০১ কারুশিল্প প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে

হাতি ও গণেশের মূর্তি তৈরীর জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন ক্ষুদিরাম মজুমদার। অপরপক্ষে সিতাই ব্লকের রমেশচন্দ্র বর্মন ১৯৯৬-৯৭ সলে জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় কাঠখোদাই ক্ষুধার্থ ঈগলের মূর্তি প্রদর্শনের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ঐ একই বছরে হরিরহাটের তিলেশ্বর বর্মন কাঠের রবীন্দ্রনাথের মূর্তি তৈরী করে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। দক্ষ দারুশিল্পী ক্ষুদিরাম মজুমদারের মতে "কাঠখোদাইকৃত এই সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের জন্য গামারী, সেগুন ও কাঁঠাল কাঠই উপযুক্ত"। কাঠখোদাই শিল্পীদের তৈরী বস্তুগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাতি, হাতির পাল, গণেশের মূর্তি, ভেনাসের মূর্তি, হরিণ. বাঘ, ষাঁড়, সারস প্রভৃতি। এ ছাড়াও আছে বিভিন্ন মহাপুরুষের আবক্ষ মূর্তি।

দারু তক্ষণশিল্পের মূল যন্ত্রপাতি হল— করাত, ছোট বাটালি, হাতুড়ি, পেন্সিল, সিরিস কাগজ, অনেকক্ষেত্রে ফেবিকল আঠা। শিল্পী প্রথমে কাঠের টুকরোর উপর কল্পিত মূর্তি পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করে নেন। তারপর সেই স্কেচ অনুযায়ী ছোট বড় বিভিন্ন বাটালি দিয়ে কুঁদে কুঁদে মূর্তির অবয়ব তৈরী করেন। এ খোদাই কাজে মূর্তির বাড়তি অংশ ধরে কাজ শুরু করতে হয়। মুখ ও চোখের কাজ সবার শেষে করেন। অনেক সময় খোদাইকৃত মূর্তির স্বাভাবিক রঙ ছাড়াও কৃত্রিম রঙও ব্যবহার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ধারা জেলা ও রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতি বছর প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনী করে যেমন উৎসাহ দেওয়া হয় তেমনি পুরস্কৃতও করা হয়। কারুকার্যমন্ডিত এই শিল্পদ্রব্যের বিপণন হয় ঐ একই সময়ে।

মেখলীশিল্প ঃ

জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প তথা লোকশিল্প হল মেখলীশিল্প। মেখলীগঞ্জের স্থানীয় ভাষায় একে বলে "ঝালক"। বিগত ১৪-৪-৯৭ ইং তারিখে মেখলীগঞ্জ মহকুমার ক্ষেত্র-সমীক্ষায় এক সাক্ষাৎকারে কাশিয়াবাড়ী গ্রামের প্রধান শিল্পী মেনকা রায় ও সন্ধ্যামণি রায় জানান— 'মেখলী তৈরীর কাজে পরিবারের মেয়েদেরই ভূমিকা বেশী।' মেখলী প্রকৃতপক্ষে লাল, সাদা, কালো, হলুদ রঙের ডোরাকাটা এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য বিশিষ্ট চট বা মাদুর বিশেষ। মেখলীগঞ্জ মহকুমার নামকরণও হয়েছে মেখলী শিল্প থেকে। W.W. Hunter সাহেব তাঁর 'Statistical Account of Bengal' গ্রন্থে জেলার বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন এই লোকশিল্পের উল্লেখ করেছেন— "The Mekhli is a coars cloth made of jute and used for screens bedding etc. It takes its name from the subdivisional town of Mekhliganj where it is largely manufactured."[৪]

হান্টার সাহেব শুধুমাত্র মেখলী থেকে মেখলীগঞ্জ নামের উৎপত্তির কথাই বলেন নি, তিনি লক্ষ্য করেছেন একদিন উক্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মেখলী উৎপাদিত হত।

মেখলী বা মেখলা তৈরীর মূল উপকরণ হল এক ধরনের সুতো যা তৈরী হয় পাট, কলাগাছ ও পুরনো কাপড় থেকে। একে রঙ করে তৈরী হয় মেখলী। এটি তৈরী হয় সাধারণত তাঁতের মত যন্ত্রের সাহায্যে। এছাড়াও মেখলা তৈরীতে প্রয়োজন হয় সুপারী গাছের অংশ বিশেষ, বাঁশ ও দড়ি। তা সত্ত্বেও সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় মেখলী তৈরীর অপরিহার্য সুতা। যাকে বলা হয় "কুংকুরার সুতা"। এটি দেখতে অনেকটা পাটের গাছের মত। একদিন এতদঞ্চলের মানুষের পোষাক ছিল রঙিন মেখলা। কোচবিহারের অনেক লোকসঙ্গীতে কুংকুরার সুতার অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন— "আহারে কুংকুরা হলু লোহার গুণারে ....।"

উপরিউক্ত সকল উপকরণই মহকুমার ভোটপট্টি গ্রামের তাঁতি পাড়া থেকে মেখলী শিল্পীরা কিনে থাকেন। বর্তমানে এই সুতা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং কিছুটা উদ্যোগের অভাবজনিত কারণে কোচবিহারের প্রাচীন এই লোকশিল্প আজ বিলুপ্ত প্রায়। উক্ত মহকুমার পৌর এলাকার প্রবীণ শিক্ষক মুরারীমোহন সিংহ এক সাক্ষাৎকারে জানান "তাঁর বাড়িতে বংশানুক্রমিকভাবে মেখলী তৈরী হত সাদা, কালো, হলুদ, ডোরাকাটা রঙের সূতা দিয়ে"। মেখলীগঞ্জের মানুষ একদিন নক্সীকাঁথার অনুকরণে একে মেখলীকাঁথাও বলতেন। জেলার একমাত্র মেখলীগঞ্জ মহকুমার চার-পাঁচটি গ্রামের কিছু সংখ্যক পরিবার লোকশিল্পের এই আঙ্গিকটির সঙ্গে জড়িত থাকলেও মূলত তাঁরা কৃষিনির্ভর।

শঙ্খশিল্প ঃ

বাংলার লোকশিল্পের মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের প্রান্তবর্তী এই জেলার অবস্থান একেবারে নগণ্য নয়। লোকশিল্পের অন্যান্য উপকরণের মত শঙ্খশিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোকশিল্পীর সংখ্যা এতদঞ্চলে অন্যান্য শিল্পকর্মের তুলনায় কিছুটা কম।

ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, একমাত্র তুফানগঞ্জ মহকুমাই শঙ্খশিল্পের কেন্দ্রভূমি। জেলায় প্রচলিত শঙ্খশিল্পের যে ডিজাইন বা নক্সাগুলো শাঁখায় বেশী প্রচলিত সেগুলি হল শঙ্খলতা, কঙ্কণ, লেচুকাটা, ধানছড়া, তারপ্যাচ ও ফুলপাতা।

এতদঞ্চলের শঙ্খশিল্পীগণ শঙ্খজাতীয় কাঁচামাল থেকে শাঁখার উপর কারুকার্য- মন্ডিত কাজ করলেও এর বিপননের সঙ্গেই তাঁরা যুক্ত বেশী। প্রসঙ্গত বলা যায় এই জেলায় দক্ষ শঙ্খশিল্পীর চেয়ে শাঁখা বিক্রেতাই বেশী। যাঁরা মূলত মুর্শিদাবাদের জিৎপুর, কলকাতার মহাজনদের উপর নির্ভরশীল। হিন্দু সধবা নারীগণের হাতে শাঁখা পরানোর সময় শঙ্খশিল্পী ও বিক্রেতাগণের মধ্যে ধানদূর্বা দিয়ে সধবা নারীকে আশীর্বাদ করার প্রচলন আছে এবং সে সময় সধবা নারীর মঙ্গল কামনায় তাঁরা বলেন-– "জন্মে অস্তি সুখে থাক, তোমার শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হোক"।

শাঁখা তৈরীর যন্ত্রপাতিগুলি হল চ্যাপটা রেত করাত বা কুশ করাত, গোল রেত, চার ফাইলা রেত, একদরা নামক এক ধরনের দা, ভোমর নামক ফুটা করার যন্ত্র, দেরাল, বাটাল,

হাতুড়ি ইত্যাদি। শঙ্খ কেটে শাঁখা বের করার পর সান বাঁধানো এক ধরনের পাটায় ধূপ ও বালু দিয়ে ঘষে উপরের অংশের ছাল তুলে মসৃন করা হয়। এরপর শুরু হয় কারুকার্য। শিল্পীগণ শঙ্খ কেটে শাঁখার উপর যন্ত্রপাতি দিয়ে কারুকার্য করার পর একটি সামান্য বড় ও একটি সামান্য ছোট একই ডিজাইনের দুটি শাঁখাকে নীল সূতা দিয়ে বেঁধে জোড়া তৈরী করেন। নিয়ম মাফিক বড়টা ডান হাতে ও ছোটটা বাঁ হাতে পরানো হয়। শঙ্খশিল্পীগণ শঙ্খ ও কাটা শঙ্খ সংগ্রহ করেন কোলকাতা, ব্যারাকপুর, মুর্শিদাবাদ, বেলডাঙা ও জিৎপুর থেকে। স্থানীয় শঙ্খশিল্পীগণের মতে ১লা বৈশাখে মেঘালয়ের তুরার চরণতলা গ্রামের কালীপূজার মেলা, আসামের বিজনীর লক্ষ্মীপূজার মেলা, তুফানগঞ্জ মহকুমার বক্সীর হাটের পলীকার মেলা, দিনহাটা মহকুমার মাধাইখালের কালী মেলা ও কোচবিহার সদরের রাসমেলায় সর্বাধিক শাঁখা বিক্রী হয়। স্থানীয় লোকবিশ্বাস শনি ও মঙ্গল বার বাদে শাঁখা পরার প্রশস্ত সময় হলো বুধবার ও বৃহস্পতিবার। এতদঞ্চলে নক্সা অনুযায়ী প্রচলিত শাঁখাগুলি হল— মান্তাসা, ব্রেসলেট, চুড়ি, বালা, সোনাবাঁধানোর শাঁখা ইত্যাদি।

শোলাশিল্প ঃ

কোচবিহারের শোলাশিল্প দীর্ঘদিন কোচবিহারের রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। কোচবিহারের রাজাদের বিভিন্ন ধর্মীয় পার্বণ ও উৎসবে স্থানীয় মালাকার সম্প্রদায়ের শোলা শিল্পীগণ শোলার কাজের মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করতেন। কালের বিবর্তনে আজ আর রাজা নেই, লোকরুচিরও পরিবর্তন ঘটেছে। তা সত্ত্বেও তৎকালীন শিল্পীদের বর্তমান প্রজন্ম পূর্ব স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে প্রতিদিন নিত্য নূতন শিল্পকৌশল সৃষ্টি করে চলেছেন। জেলার চিত্রকর ও মালাকার সম্প্রদায়ের শিল্পীগণ অনেকেই শোলাশিল্পের কাজ ছেড়ে জীবন-জীবিকার তাগিদে ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। স্থানীয় রাজবংশী হিন্দু শোলাশিল্পীগণ ছাড়াও মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের অন্যতম গাটু মিঞা আজও বংশানুক্রমিক ভাবে মহরমের তাজিয়া ও হিন্দুর রাসমঞ্চ তৈরী করেন। প্রকৃতপক্ষে শোলাশিল্পের প্রচলন ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে অনেক শোলাশিল্পী জানান অনেকেই পাঁচ-ছয় পুরুষ ধরে এই কাজে নিযুক্ত। তবে এই শিল্পের জন্য যেমন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি। বাঁশ, কাঠ, পাটি ও তাঁত শিল্পীগণ যতটা সরকারি আনুকূল্য পান এঁরা ততটাই বঞ্চিত। তাই পুরুষানুক্রমিকভাবে প্রচলিত লোকশিল্পের এই আঙ্গি কটির সংরক্ষণ, বিস্তার ও বিপণনের দিকে সরকারী দৃষ্টি পড়লে আরও বেশী সংখ্যক মানুষ এই শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারবেন। জেলার অনেক লোকশিল্পের মত এটি তেমন সংগঠিত নয়। কাঁচামালের যোগান বিশেষ করে সংরক্ষিত জলাশয়ে শোলাচাষ ও বিপণন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি হলে জেলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির এই নিদর্শনটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত, রাজ্য ও জেলাস্তরের পুরস্কারে সম্মানিত দারু ও কারু শিল্পের একাধিক শিল্পী থাকলেও শোলাশিল্পীগণ আজও লোকচক্ষুর অন্তরালেই আছেন।

শোলাশিল্পের অন্যতম কাঁচামাল শোলা গাছ। সাধারণত গ্রামের বিল ও জলাশয়ে এই শোলাগাছের জন্ম হয়ে থাকে। তুফানগঞ্জ মহকুমার টাকুয়ামারী, রসিক বিল অঞ্চলের জলাশয় উৎকৃষ্ট শোলা বা জলজ উদ্ভিদের বড় উৎসভূমি। সাধারণত ভাদ্র মাসে জল থেকে শোলা তুলে শুকানো হয়। জল থেকে শোলা তুলে শুকিয়ে শিল্পকর্মের উপযোগী করা থেকে মূর্তি তৈরী করার পর্যায়ক্রম পর্যন্ত শোলার জন্ম কথা নিয়ে দিনহাটা মহকুমার শিমূলবাড়ী ও কিসমতদশ গ্রামের রাজবংশী শোলার শিল্পীগণের মধ্যে এক ধরনের গান প্রচলিত আছে। যেমন—

"এক হাঁটু জলতে তোক শোলাক কাটুনু
তোক শোলাক মুই রৌদোতে শুকানু রে— এ
তোক শোলাক মুই রৌদোতে শুকানু রে—
ভাসুরের গালি শুনিয়ো তোক সাইট মা
গরানু বৈসে সাট মাও জোড়া মন্দির
ঘরে রে বৈসে সাট মাও জোড়া
মন্দির ঘরে রে — রে।।"

(সংগ্রহ — রাণী রায়, গ্রাম ঃ কিসমৎদশ, দিনহাটা, ১০/৫/৯৮ ইং)

সময়ের বিবর্তনে লোকশিল্পের অনেক অঙ্গণে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও কোচবিহারের শোলাশিল্পীগণ আজও বলিষ্ঠ স্বতন্ত্র ও প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। লোকশিল্পের ক্ষেত্রে লোকদেবতার মূর্তি তৈরীতে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায় চরকা টাকুয়া নামক শিশু রোগ প্রতিরোধকারী দেবতার প্রতিমূর্তি তৈরীতে। শোলাশিল্পের একটি বড় আঙ্গিক হল কালীর মুখোশ তৈরী। জেলার স্থানীয় লোকশিল্পীগণ উল্লেখযোগ্য প্রাচীন রীতি ও বৈশিষ্ট্য মেনে যে বিভিন্ন উপকরণগুলি তৈরী করেন সেগুলি হল শোলার মুখোশ, কালী, বুড়া-বুড়ি ও হনুমান, শোলার ফুল, মঞ্জুষা প্রভৃতি। লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কানি বিষহরি, পদ্মা, পাঁচ চুঙ্গা ও দুই চুঙ্গা, যাইটল, যখাযখি প্রভৃতি। ঝাড়ু, কদম ফুল, বিয়ের মুকুট, অন্নপ্রাশনের মুকুট প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

ক্ষেত্র-সমীক্ষায় আমরা জেলার পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে যে সকল শোলাশিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি তারা হলেন— দিনহাটা মহকুমার সুধীরচন্দ্র মালাকার ও শচীনচন্দ্র মালাকার, ভেটাগুড়ির প্রভাতি মালাকার (জেলাস্তরের পুরস্কার প্রাপ্ত), নালারটারি গ্রামের প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যোগেশচন্দ্র রায় ও ডোকা মালী, জেলা সদরের নলিনীকান্ত রায় (খারিজা সোনারী), ননীগোপাল, ঝাপসীবাড়ী গ্রামের কানাই মালাকার ও মণীন্দ্র মালাকার। এছাড়া তুফানগঞ্জ মহকুমার রসিক বিলের শ্যামচরণ বড়ুয়া, ভান্ডি জেলাসের নলিন মালাকার (বর্মন), হরিরহাটের ইন্দ্রমোহন বর্মন, বাঁশরাজা গ্রামের ভবেন বর্মন, মানিক বর্মন, ঘোগার কুঠী গ্রামের অখিল সরকার প্রমুখ। রাসমেলায় রাসমঞ্চ তৈরীতে, পুতুল তৈরীতে, মঞ্চসজ্জায়, ঝালর প্রভৃতিতে শোলার ব্যবহার দেখা যায়।

জেলার শোলাশিল্পীগণ মূলত কৃষি-শ্রমিক। কৃষি কাজের অবসরে বছরের বিভিন্ন পূজা-পার্বণে কিংবা বিভিন্ন লোকউৎসবের সময়ই লোকশিল্পের এই উপকরণ বিক্রির প্রধান সময়। তাই মৃৎশিল্প, দারুশিল্প ও বাঁশশিল্পের মত দৈনন্দিন প্রয়োজন ভিত্তিক উপকরণের চাহিদা ভিত্তি করে জীবিকা অর্জনের এক নির্ভরযোগ্য উপায় হিসেবে শোলার শিল্পীগণ তাঁদের শিল্পকর্মকে বেছে নিতে পারেন নি। যদিও বংশানুক্রমিক ভাবে যেমন এই শিল্পের সঙ্গে সবাই যুক্ত নয় তেমনি শোলাশিল্পের ক্রম হ্রাসমান গতিকে রোধ করা যাবে না। এছাড়া দেখা যায় শোলা উৎপাদক অঞ্চলগুলি কৃষিকর্মের জন্যও ব্যবহৃত হয়। কারণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শোলার তৈরী বস্তু অপেক্ষা কৃষিকর্মে আয় বেশী।

কোচবিহারে শোলাশিল্পের ঘরানা কোচবিহারের রাজ আমল থেকেই জানা যায়। সেই সময় থেকেই বংশানুক্রমিক ভাবে আজও অনেকে এই শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত। এমনকি অনেক দক্ষ শোলাশিল্পী রাজ আমলে ভরণ-পোষণ পেতেন। বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ এই কাজে যুক্ত। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আজ পর্যন্ত শোলাশিল্পীদের উপর কোন Survey করা না হলেও ক্ষেত্র-সমীক্ষায় আমরা জানতে পারি জেলার পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে প্রায় ছ-সাত শত মানুষের জীবিকা এই লোকশিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

দক্ষিণবঙ্গে বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদের মত এই শিল্পের ব্যাপক চর্চা না থাকলেও কোচবিহার জেলায় শোলার কাজ একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকীর্তি। জেলার পাঁচটি মহকুমার সর্বত্রই এই শিল্পের প্রচলন থাকলেও তুফানগঞ্জ, দিনহাটা মহকুমার দুটি ব্লক, মাথাভাঙ্গা মহকুমার ২ নং ব্লকে এই শিল্প মূলত কেন্দ্রীভূত। বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ সাবাই কাজে পারদর্শী। তবে শিল্পকর্মের প্রচলন বা চর্চা যাই থাকুক না কেন এর বিপণন ব্যবস্থা খুবই অপর্যাপ্ত। শুধুমাত্র পূজা-পার্বণ ও লোকউৎসব মেলার সময়ই এই শিল্পীদের চাহিদা বাড়ে। জেলা সদর ও মহকুমার দশকর্ম ভান্ডার নামক দোকানগুলিই এই শিল্পদ্রব্যের বড় গ্রাহক। জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই শিল্পের প্রভাব অপরিসীম। তাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এই শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। পাশাপাশি দরকার আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। সর্বোপরি কৃত্রিম শোলা বা থার্মোকলের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শোলাশিল্প আজ সঙ্কটের সম্মুখীন।

মুখোশশিল্প ঃ

লোকায়ত শিল্পের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিল্প মুখোশশিল্প। লৌকিক সমাজ জীবন-নির্ভর কোচবিহার জেলার বিভিন্ন লোকউৎসব যেমন— মাঘ মাসে বুড়া-বুড়ির মাগন তোলার সময় কিংবা কালীর মুখোশ পরে মাগন তোলার প্রচলন আছে। কাঠের মুখোশের তুলনায় শোলার মুখোশের ব্যবহার এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী।

কোচবিহার জেলায় দিনহাটা, হলদিবাড়ী, তুফানগঞ্জ ও জেলা সদরের বানেশ্বর ও ডোডেয়ার হাট গ্রামে শোলার মুখোশশিল্পীগণের সাধারণভাবে রঙ করা সাজানো মুখোশের

কারিগরি দক্ষতার সহজ প্রকাশের পাশাপাশি মিলে মিশে থাকে শিল্পদৃষ্টি ও কর্মকুশলতা। অর্থের প্রয়োজনে অনেক মুখোশশিল্পী নিজেই গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরে মুখোশ নৃত্য পরিবেশন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কোচবিহারের শোলার মুখোশশিল্পীরা এখন জীবন ধারণের টানাপোড়েনে রুজি-রোজগারের জন্য অন্যান্য কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের কাছে অতীত গৌরব এবং রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা আজ স্বপ্নমাত্র।

কোচবিহার সদরের ডোডেয়ার হাট গ্রামের চিত্রকর সম্প্রদায়ের শিল্পীগণ বংশানুক্রমিক ভাবে বড়দেবীর কাঠাম পূজার দিন দেবীর ময়না কাঠের কাঠাম বা শিরদাঁড়ার মাথার কাপড়ের উপর রঙ করে তুলির টানে বড়দেবীর মুখোশ তৈরী করেন।

শোলার বিষহরি বা কানি বিষহরি ঠাকুরানীর শোলার বাইরের অংশ নাগ বিভূষিতা মনসা দেবীর চিত্র রঞ্জিত হয়। দেবীর ডান ও বাঁ দিকে থাকে মৎস্য শিকার-রত গোদা-গোদানী। এ ছাড়াও শিব, যোগিনী ও ধর্ম। অবশ্য প্রতিটি বিষহরির ডোলার রঞ্জিত চিত্রসমূহ একই রকম হয় না। লাল, কালো, হলুদ, সবুজ রং এ সকল লৌকিক দেবদেবীর শোলার মূর্তিতে ব্যবহৃত হয়।

ধূপকাঠি শিল্প ঃ

কোচবিহারের লোকশিল্পের এক বিরল নিদর্শন স্থানীয় উপকরণে তৈরী ধূপকাঠি। বাড়ির ছেলে-মেয়ে উভয়েই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। স্থানীয় ধূপকাঠির উপকরণ— পচা কাঠ, গোবর ও ধুনা দিয়ে মন্ড তৈরী করে ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা বাঁশের বা পাট কাঠির গায়ে মেখে শুকিয়ে গ্রামীণ হাটে বিক্রি করেন। লোকায়ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিশেষ করে মাসান লোকদেবতার পূজায় এই ধূপকাঠি একদিন অপরিহার্য ছিল। আধুনিক সুগন্ধি ধূপকাঠির দৌলতে এই ধূপকাঠি বিলুপ্তির পথে।

কোচবিহারের লোকশিল্পের বড় বৈশিষ্ট্য হল এই শিল্পীগণের বেশীর ভাগই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। যেমন বিষহরি পালার মুখাবাঁশি যিনি তৈরী করেন তিনিই অনেক ক্ষেত্রে বাঁশি বাজান। যে ভবঘুরে শিল্পী-বৈরাগী মনঃশিক্ষা ও তুক্ষার গান গেয়ে বেড়ান তিনি নিজেই আবার কাঁঠাল কাঠে তৈরী করেন সারিন্দা। এরূপ বস্তুভিত্তিক লোকশিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই শিল্পের অবলুপ্তির প্রধান কারণ একমাত্র বংশানুক্রমিক ভাবে কেউ একে ধরে রাখতে এগিয়ে না আসা। যেমন মেখলিগঞ্জের মেখলাশিল্প আজ বিলুপ্তির পথে। মেখলিগঞ্জ মহকুমার মেখলাশিল্পী মেনকা রায়ের মতে কাঁচা মালের যোগান, আর্থিক অস্বচ্ছলতা এজন্য দায়ী। গ্রামের মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ, সহজ সরল দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেই বস্তুগত লোকশিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। কৃষি সরঞ্জাম, লোকবাদ্যযন্ত্র, লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি বিভিন্ন নক্সার উজ্জ্বল নিদর্শনগুলির বিশাল সমাবেশ ঘটে বিক্রয়যোগ্য উপকরণ হিসেবে জেলার বিভিন্ন মেলা ও লোকউৎসবে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রযুক্তির যুগে বিজ্ঞাপন সর্বস্ব ভোগবাদি সমাজে লোকশিল্পের প্রাণ ও প্রাচুর্য বারে বারে হোচট্ খাচ্ছে।

যদিও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প নিগম অন্যান্য জেলার মত কোচবিহারেও লোকশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ সমন্বিত করে জেলার ঐতিহ্যপূর্ণ বিভিন্ন মেলা ও উৎসবের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন, তেমনি সরকারী তরফ থেকে দুঃস্থ লোকশিল্পীদের আর্থিক অনুদান দিয়েও সাহায্যের চেষ্টা করেন, যাতে দুঃস্থ লোকশিল্পীগণ জীবিকার সুবিধার্থে এবং জেলার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার মানসে উৎসাহ বোধ করতে পারেন।

জেলার পাঁচটি মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় আমরা লোকশিল্পের যে সন্ধান পাই তাতে দেখা যায় লোকায়ত শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষই কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ এবং কৃষি-নির্ভর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। ক্ষেত্রানুসন্ধানে সাক্ষাৎকারে লোকশিল্পীগণ আক্ষেপ করে বলেন— আর্থ সামাজিক অব্যবস্থা, কাঁচামালের অভাব, ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্পকর্মে বংশানুক্রমিক ভাবে এগিয়ে না আসার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই লোকশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছে। তা সত্ত্বেও সামাজিক দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পালনের অখন্ড বিশ্বাস নিয়ে জেলার পাটি, মৃৎ, কাঠ, শোলা, শঙ্খ শিল্পীগণ কোচবিহারের লোকশিল্পকে ধরে রেখেছেন।

বিগত ১০-১৫ বছর ব্যাপী এই জেলায় অল্প হলেও কিছুটা শিল্পের উন্নতি হয়েছে। আর্থিক সঙ্কট ও প্রতিযোগিতার বাজারে বিশেষ করে মুক্ত বাণিজ্যের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জেলার ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ তাঁত, বাঁশ, পাট, পটারী, পাটি, শোলা, শঙ্খ ও মৃৎ শিল্প মিলে জেলায় প্রায় এক লক্ষের অধিক মানুষ এর উপর নির্ভর করে জীবন-জীবিকার সুরাহা করেন। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ও সমৃদ্ধি আশানুরূপ না হলেও কুটির ও হস্তশিল্প আজ এতদঞ্চলে অনেকটা সমৃদ্ধ। কোচবিহারের শীতল পাটির খ্যাতি ও বাজার আজ বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের অনেক রাজ্যের নজর কেড়ে নিয়েছে।

বাংলার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হল যেমন উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি, তেমনি উত্তরবঙ্গের অপরিহার্য সংস্কৃতি হল কোচবিহারের সংস্কৃতি যা নিজস্ব মহিমায় বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কোচবিহারের কারুশিল্প তথা বাঁশশিল্পের উল্লেখযোগ্য অবদান অস্বীকার করা যায় না। লোকধর্ম, লৌকিক দেবদেবী, পূজা ও পালা-পার্বণ প্রভৃতিতে প্রয়োজন হয় বাঁশের তৈরী বিভিন্ন বস্তু। কোচবিহারের রাজবংশী শিল্পীগণ তাঁদের নান্দনিক চেতনায় বনের বাঁশকে রূপান্তরিত করেন বিভিন্ন শিল্প-সামগ্রীতে।

প্রাচীন কৃষি-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় নানা লোকশিল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকার স্বার্থে যে সকল দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন হত সে সব নিজেরাই বাঁশ, বেত, পাটি দিয়ে তৈরী করতেন। ফলে সেগুলোর মধ্যে শৈল্পিক মানসিকতার ছাপ ফুটে উঠত। যেমন— বাঁশের তৈরী মাছ ধরার যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈরী সামগ্রী, কাঠের বিভিন্ন লোকবাদ্য যন্ত্র ইত্যাদি কোচবিহারের লোকশিল্পের সুদৃশ্য নিদর্শন আজও দৃষ্ট হয়।

বলা বাহুল্য, জেলার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হল এই লোকশিল্পগুলি। জেলার বিভিন্ন গ্রামে বংশানুক্রমিক ভাবে এর চর্চা আজও চলেছে। লোকশিল্পীর ব্যক্তি প্রতিভা, সমষ্টিগত চেতনা, সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় এই শিল্পকর্মের মধ্যে। জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিতেও লোকশিল্পের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকাই প্রধান। বারো মাসের তেরো পার্বণের হাত ধরে ফি বছর যে উৎসব আসে তাকে নির্ভর করে বেঁচে আছে কোচবিহারের লোকশিল্প ও শিল্পীগণ।

তথ্য সূত্র

১। লোকশিল্প — ডঃ বল্যাণকুমাব গঙ্গোপাধ্যায, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোস, সম্পাদনা : বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃ-৩৯৮ (১৯৯৫)।

২। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার— নারাযণচন্দ্র দে (৭৮), প্রশিক্ষক বেণীমাধব পাটি ফ্যাক্টরী এ্যাণ্ড পাটি মেকিং ট্রেনিং সেন্টার, ঘুঘুমারী, কোচবিহার, তাং — ৫/১১/২০০০ ইং।

৩। কোচবিহার গ্রামভিত্তিক পাটিশিল্পীদেব পাবিবাবিক সমীক্ষা— ১৯৯৫ (১৫/১০/৯৫ ১/১২/৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত) সৌজন্যে : টগরবাণী দে :

৪। Statistical Account of Bengal - W W Hunter P- 397. Reprint (1974)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি ও লোকভাষা-বিভাষা

ভাষা ভাবের বাহন এবং সংস্কৃতি হল জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত পুষ্পিত বিকাশ। ভাষা ও সংস্কৃতির শেকড় প্রোথিত থাকে লোকভাষা ও লোকসংস্কৃতিতে। কোচবিহারের লোকভাষা লোকসংস্কৃতির বাহন। পশ্চিমী ধারণায় অবশ্য গ্রামের ভাষাই লোকভাষা; অর্থাৎ গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে ব্যবহৃত কথ্য ভাষাই লোকভাষা। নগর কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাষার যে স্বতন্ত্র লক্ষণকে আমরা চিহ্নিত করি সেই সাধারণ রূপটিই লোকভাষার নির্ধারক চিহ্ন। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান মৌখিক ব্যবহারে অনেক সময় লোকভাষার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন শহরের কথ্যভাষা বা অন্য ভাষাতেও দেখা যায়— যার প্রচলন সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ছিলকা ও ধাঁধাঁয়। এখন প্রশ্ন হল লৌকিক ভাষার যথার্থ রূপটি কি এবং এর সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সম্পর্কই বা কি? উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির মত লোকভাষাও এতদঞ্চলের লোকায়ত জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

একটি সংহত সমাজ ভৌগোলিক, রাজনৈতিক সীমা রেখার মধ্যে থেকে যে ভাষায় তার দিন যাপনের ইতিহাসকে বিধৃত করে তাকে সাধারণভাবে লোকভাষা বলা যেতে পারে। আবার লোকভাষার অন্তর্গত লোকায়ত ভাষাই বিভাষা। অপেক্ষাকৃত ছোট অঞ্চলের স্বল্প লোকের একান্ত ঘরোয়া ভাষা এটি। এই লোকভাষা আবার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে ব্যবহৃত হলে তাকে উপভাষা বলা হয়। একেকটি উপভাষা এলাকার লোকভাষায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও সুস্পষ্ট।

কিন্তু কোচবিহারের মহারাজাদের আমল থেকেই এই অঞ্চলে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের আনাগোনা ছিল। এই আগন্তুকরা মিলেই সৃষ্টি করেছিল তৎকালীন কোচবিহারের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এঁরা মূলত কথা বলতেন বঙ্গালী ও বরেন্দ্রী উপভাষায়। এর পর দেশ ভাগের ফল স্বরূপ শরণার্থীদের স্রোত বন্যার মতই এই অঞ্চলের জনজীবনকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। ফলে স্থানীয় উপভাষা ও নবাগত মানুষের উপভাষার মধ্যে গ্রহণ-বর্জনের পালা চলতে থাকে, তৈরী হয় আরও একটি ভাষার স্তর।

কোচবিহারে প্রচলিত উপভাষায় বাংলাভাষার প্রাচীন ও মধ্য যুগের অনেক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে। ড. নির্মল দাস 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে এই বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। ড. নির্মল দাসের গ্রন্থ থেকে কামরূপী বাংলা স্থানভেদে নতুন নতুন চেহারায় কেমন করে আত্মপ্রকাশ করে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে ঃ

(ক) মুই এত বচর হাতে তোমার লার খেজমৎ কন্নু, তোমার কোন কাতা কোন বেলাওঁ ফেলাওঁ নাই, তাতো তোমরা কোন বেলা মোক্ একনা ছাগলের বাচ্চাও দেন্ নাই যে মুঁই মোর সখির ঘর সুদা রঙ্গ তামাসা করি। (এলাকা — কোচবিহার)

(খ) এত বচ্ছর হাতে মুই তোর্ কত সেবা কন্নু, তোর্ কুন হুকুমে মুই কুন দিন লেঙ্ঘ নাই, তাঁহ তুই মোক্ কুন দিনে একটা ছাগলের বাচ্চা দিলো নাই যে মোর বন্ধুর ঘরক ধোরে মুই একদিন কনেক হাউস করোঁ। (এলাকা — জলপাইগুড়ি)

(গ) মুঁই তোর এতদিন ভরা গোদারি কন্নু, কখনও তোর কোনও হুকুম ফেলাওঁ নাই, তেঁও তুঁই কখনও একটা ছাগলের বাচ্চাও দেইশ্ নাই যে মোর সাতের গুলাক্ নিয়া আহ্লাদ করোঁ। (এলাকা — গোয়ালপাড়া)

এই জেলায় প্রচলিত 'কুষাণ' পালায় লক্ষ্য করা যায়-- এখানে কুশীলবগণ আঞ্চলিক ভাষাই ব্যবহার করেন কিন্তু 'মূল' প্রায় মান্যভাষায় কাহিনী বিবৃত করেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে—

হরিশ্চন্দ্র ঃ সইব্যা, প্রিয়া, আজি থাকি আমরা এই কাশীধামোতে থাকমু।

সইব্যা ঃ হ্যাঁ প্রভু, আমরা এই কাশীধামোতে থাকমু।

মূল ঃ ও-হো- হেনকালে বিশ্বামিত্র কোন কাজ করিল। মহা ক্রোধে হরিশ্চন্দ্রকে বলিতে লাগিল।

আবার কোচবিহারে দোত্‌রা পালায় স্থানীয় ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে বেশী। এর কারণ দোত্‌রা পালার বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের জীবন, যা পুরাণ বা ধর্ম-নির্ভর নয়। আবার উচ্চবর্গের লোকদের ভাষাভঙ্গি বেশ আবেগময় ও ভাষার গতি উর্ধ্বমুখী।

এই অঞ্চলের লোকগীতির মধ্যে আঞ্চলিক ভাষার সৌন্দর্যটিও উল্লেখ করার মত। কোচবিহারের লোকগীতির মধ্যে ভাওয়াইয়া ও চট্‌কারই প্রাধান্য। এই গানগুলিতে নরনারীর বিচিত্র সম্পর্কের আস্বাদ আমরা পাই। এর ভাষা ঠিক প্রচলিত কামরূপী বা তথাকথিত রাজবংশী ভাষাভঙ্গি থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র। এই গানের ভাষাগুলি এক ভিন্ন জগৎ তৈরী করেছে। প্রচলিত ভাষাভঙ্গি, শব্দ ও তার অর্থ যেমন সংযোগ ঘটাতে ব্যর্থ হয় তখনই মানুষ সৃষ্টি করে এক স্বপ্নের ভাষা। প্রচলিত কয়েকটি ভাওয়াইয়া গানের উদাহরণ থেকে এই সত্য প্রমাণিত হবে ঃ

১। আজি নদী না যাইয়োরে বৈদো
নদী না যাইয়োরে (বৈদো)
নদীর ঘোলা রে, ঘোলারে পানি
আজি নদীর বদলে রে বৈদো বাড়ীত ধোন গাও রে
মুই নারী তুলিয়ারে দিব পানি।
(বৈদো - বন্ধু, গাও - শরীর)

২। তোর্ষা নদীর উতাল পাতাল কারবা চলে নাও
নারীর মন মোর উতাল-পাতাল কার বা চলে নাও,
মোর বন্ধুর বাদে রে মোর কেমন করে গাও রে।।
তোর্ষা নদীর — — — — — — — —
বন্ধুয়া মোর বাণিজ গেইচে উজানিয়ার দ্যাশে
নানান জনের নানান কথা শোনঙ না কারও রাও।
(উতাল-পাতাল ঃ অস্থির, বন্ধুর বাদে ঃ বন্ধুর জন্য, বাণিজ্ ঃ বাণিজ্য)

৩। ওকি সাঙ্না মারিলু ক্যানে
ভাতের দুরখে ওরে সাঙ্না কাইনোত্ বসিনু মুই
কোন দোষেতে দুয়োর বান্দিয়া মারিলু আজি তুই।
পূবের ঘরে মারিতে মারিতে রান্দন ঘরোত আনিলু
ভাত রান্দা হাড়ি পাতিল ন্যাদেয়া ভাঙ্গিলু।।
মোক্ মারিলু ভালে করিলু ছাওয়াক মারিলু ক্যানে
ছুয়া বারুন নাগাই আজি তোর সাঙ্নার কপালে।।
(সাঙ্না ঃ বিধবা নারী পরবর্তীতে যে স্বামীকে গ্রহণ করে)

এই অঞ্চলের লোককথায় আঞ্চলিক ভাষার সৌন্দর্য শ্রোতার মনোহরণ করে। এখানেও অবলীলাক্রমে কথক নিজেই ভাষার ভান্ডার সৃষ্টি করেন. শব্দ পায় নূতন দ্যোতনা। উত্তরবঙ্গের ক্ষত্রিয় সমাজের প্রাণপুরুষ মনীষী পঞ্চানন বর্মা সংগৃহীত ও পুনর্লিখিত 'জগন্নাথী বিলাই' লোককথা থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃতি দেবার প্রলোভন এড়ানো গেল না—

"বিলাই বড় অনদিশাত পৈল। বেদেশ বেভুঞি; কোন্ঠে কি, কেছুই না জানে। চৌদিনিয়া উপাসী শরীল পেটের ভোক মাথাত উটিচে; গাওতও নাই বল। কি করে? কোটে যায় ? চাইরোদি ধান বাড়ী, মাঝে মাঝে এন্দুরের খাল। কিন্তু একে শরীল দুবলিয়া তাতে গালাত শুকটার মালা। ধানবাড়ীর ভিতর দি যায় কেমন করি? আইলের গোড়ে গোড়েও এন্দুরের খাল আছে; আইল দিয়া যাওয়াও ভাল; ভাবি চিন্তি বিলাই আইল ধরি যাবার ধরিল।।"[১]

ক্ষেত্র-সমীক্ষা করতে গিয়ে আমরা তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী ১নং অঞ্চলের অন্তর্গত চারালজানি গ্রামের প্রমোদচন্দ্র সরকারের কাছ থেকে একটি লোককথা সংগ্রহ করি। এই প্রসঙ্গে তার অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

"একদিন দুই বুড়া-বুড়ি শ্যাক আলু গাড়ে। ওদিয়া জঙ্গল থাকি শিয়ালের ঘর উলুক-ভুলুক করিয়া দেখে আর মনে মনে ধেন্দেলায়, ক্যামন করিয়া বুড়ার শ্যাক আলু খাওয়া যায়। এক দুই করিয়া শিয়ালের ঘর বগল আসিয়া কয়, হ্যাঁ বাহে। বুড়ার ব্যাটা। ওটে তোমরা কি করেন ? বুড়া-বুড়ি কয়— "শ্যাক আলু গাড়ি"। শিয়ালের ঘর ফির কয়— "শ্যাক আলু গাড়েন তা ক্যাঙ করিয়া গাড়েন।"[২]

(উলুক-ভুলুক করিয়া ঃ উঁকি ঝুঁকি মেরে, ধেন্দেলায় ঃ ফন্দি আটে, বগল আসিয়া ঃ কাছে এসে, ক্যাঙ করিয়া ঃ কেমন করে।)

বিভিন্ন লোকদেবতার পূজায় ব্যবহৃত হয় বিচিত্র লোকমন্ত্র। এই সব মন্ত্রের কখনও কখনও একাধিক অর্থ থাকে। আবার কখনও পূজক বা ব্রতীদের কামনা-বাসনার বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটে তাঁদের ভাষাভঙ্গীতে। কখনও কখনও কথকতার ভঙ্গিতে, কখনও ছড়ায়-ছিলকায় এই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। এতদঞ্চলে বৃষ্টি কামনায় যে গান গায় রমণীগণ তাতে দেখা যায়—

"হুদুম দ্যাও হুদুম দ্যাও
হাগি আচ্চি পানি দেও
হামার দ্যাশোত নাই পানি
হাগা টিক্যাত্ বারা বানি।"[৩]

ষাট পূজার ব্রতকথার মন্ত্র—

"ছুড়ি কাটারি জাগো — — — — ঝাঁকে ঝাঁকে লাগো
হাড়াইলে পাই —— — ——— মরিলে জীয়াই
দুপুরি আগুনে যেলায় স্যালায়।"[৪]

ব্রতকথার কথকের উপস্থাপনা ভঙ্গিটিও লক্ষণীয়। হুদুম দ্যাও পূজায় বসুমতীপুত্র হুদুমের জন্ম-কথা ব্রতী কথক তুলে ধরেছেন এই ভাবে ঃ

"এই নামতে বসমতি যায় ঘাটের পাড়
ঘাটের পাড় যায়্যা বইসে, গাছের তলে বসি
বসমতি এ্যাও ম্যালেয়া দিছে — যত
জালুয়া হালুয়া বসমতিক ডাঙ্গায়; স্বর্গ
থাকি ইন্দ্ররাজ চোখ ম্যালেয়া দ্যাখে

বসমতিক দেখিয়া মন গেইল গলিয়া
ইন্দ্র রাজের বীর্য পায়া হয়া গেইল বসমতির প্যাট।"[৫]

এই কথনভঙ্গি আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গির সৌকর্যকে প্রকাশ করেছে। এই ভাষা এতদঞ্চলের লোকভাষা।

এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির আর একটি ঈর্ষণীয় দিক এখানকার প্রবাদ-প্রবচন-হেঁয়ালী। এই অঞ্চলের লোকভাষায় প্রচলিত শ্লোকগুলিকে বলা হয় 'ছিলকা'।

প্রবাদ-প্রবচনের স্বর্ণখনি থেকে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। কথোপকথনে বিশেষ করে লোকনাটকে এর ব্যবহার অসাধারণ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

১) একে পাতে খাই,
তোর ক্যানে গাও দুম দুম, মোর ক্যানে নাই।
(একই সঙ্গে আছি কিন্তু তোমার কেন এত সুখ-শান্তি, আমার কেন এত অভাব।)

২) এলুয়া ফুটিল আইল বাইষ্যা
কাশিয়া ফুটিল গেইল বাইষ্যা
(এলুয়া ফুলের সমাগমে বর্ষা আসে, আর কাশ ফুল ফুটলে বর্ষা চলে যায়।)

লোকসংস্কৃতির একটি বড় অংশই অন্তঃপুরবাসিনী নারী সমাজের সৃষ্টি। আর এই নারী সমাজের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও চেতনার নিরিখে ভাষা ভিন্ন চেহারা ভিন্ন মাত্রা পায়। নারীদের ভাষার এই স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন আলোকপাত করেছেন। এই প্রসঙ্গে ড. নির্মল দাস "উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ" গ্রন্থে লিখেছেন— "এই অঞ্চলের (উত্তরবঙ্গ) নারীর ভাষার রক্ষণশীলতা শুধু উত্তরবঙ্গীয় উপভাষার সাধারণ প্রকৃতির কাছ থেকে আনুকূল্য পায় নি। এই অঞ্চলের বৃহত্তর রক্ষণশীল পরিস্থিতিও এই ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান ....। উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষাতেও তীব্রতা ও শ্বাসাঘাত লক্ষ্য করা যায়। পুরুষের বাগব্যবহারের লয় সেই তুলনায় বিলম্বিত।"

এই অঞ্চলের মেয়েরা সাধারণত দীর্ঘ বাক্যবাণ ব্যবহার করেন না। একাধিক পদকে সমাসের মত একটি পদে ঘনীভূত করেন না, যেমন— "হাসগালাভ্ডি" (হাঁসের গলার মতো গলা যে মেয়ের), "মুকুট কেশী" (যে মেয়ের চুল কোঁকড়ানো), "জোঁয়াই ভাতারী" (জামাইকে যে পতিত্বে বরণ করেছে) — এটি একটি গালি।

এই অঞ্চলের নারীদের ভাষায় উপসর্গ ও প্রত্যয়ের প্রতি পক্ষপাত রয়েছে যেমন— নিকামা —নিষ্কর্মা, নিছালটিয়া — গুরুত্বহীন, অফুলা — ফুলহীন। কোচবিহারের মেয়েরা তাঁদের

কথায় প্রবাদ-প্রবচনের প্রচুর ব্যবহার করেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবাদগুলো লোকসাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন—

(ক) নাটাই গুনে ফেটি — মাও গুণে বেটি। (চরকার গুণে সূতো আর মায়ের গুণে মেয়ে)।

(খ) শুটকি নাছাড়ে গং হলদি নাছাড়ে অং। (শুটকি মাছের গন্ধ যায় না, হলুদের রং যায় না)।

(গ) কিসৎ কি কাম করিল্ জোঁয়াই ভাতারী হইল্। (খারাপ কাজের জন্য তিরস্কার হিসেবে ব্যবহৃত)।

কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি হল এক বর্ণোজ্জ্বল জীবন চর্যা। অতীতের অনেক কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। জীবন যাত্রার পরতে পরতে লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান আমরা বহন করে চলেছি। এখানকার শিষ্টজনের মান্যভাষা এখনো হরণ করতে পারেনি জনজীবনের দৈনন্দিন মুখের ভাষাকে। জীবনের গভীর উৎস থেকে উৎসারিত এই ভাষা লোকসংস্কৃতির বাহন হয়েছে। এই স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে গরিমা দান করেছে।

জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, তেমনি লোকনাটক, লোকগীতি, লোককথা, সবই লোকায়ত ভাষায় পরিবেশিত। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাণ-সম্পদ। সর্বোপরি বলা যায় লোকসংস্কৃতির গবেষণা ও অনুসন্ধানের অন্যতম সোপান হল সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির বাহন ভাষাকে উপলব্ধি করা।

তথ্য সূত্র

১। রঙপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা : ২য় সংখ্যা, ১৩১৭ সন।

২। ক্ষেত্র-সমীক্ষা : 'লোককথা'। কথক : প্রমোদচন্দ্র সরকার, গ্রাম-চাড়ালজানি, নাটাবাড়ী, তাং ১২/০৪/২০০ ইং

৩। উত্তর বাংলার লৌকিক ব্রতকথা : সম্পাদনা - হরিশচন্দ্র পাল, পৃ-১০০, ১৯৮০।

৪। উত্তর বাংলার লৌকিক ব্রতকথা : সম্পাদনা - হরিশচন্দ্র পাল, পৃ-১০০, ১৯৮০।

৫। উত্তর বাংলার লৌকিক ব্রতকথা : সম্পাদনা - হরিশচন্দ্র পাল, পৃ-১৩০, ১৯৮০।

নবম পরিচ্ছেদ

লৌকিক খেলাধূলা

ভূমিকা ঃ

জেলায় প্রচলিত যে প্রাচীন খেলাধূলা লোকজীবনের ঐতিহ্যবাহী, বংশানুক্রমিকভাবে প্রচলিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ নয়, যা দৈনন্দিন জীবনচর্চার মাধ্যমে দীর্ঘ দিন ধরে লোকজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করে, সেই খেলাধূলাকেই আমরা আলোচ্য পরিচ্ছেদে লোকক্রীড়া বা লৌকিক খেলাধূলা নামে অভিহিত করেছি।

জেলার দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, হলদিবাড়ী (থানা), মেখলিগঞ্জ, তুফানগঞ্জ মহকুমার গ্রামীণ পরিবেশে যে লৌকিক খেলাধূলার চর্চা আজও প্রাণবন্ত তা হল— ডাংগুটি(গুলি), চেমু, হা-ডু-ডু, কবাডি, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, জলকুমির, ঠেঙ্গুহাটা, ষোলপাইতা, মোগল-পাঠান, আটঘরিয়া প্রভৃতি। এ ছাড়াও আছে বিভিন্ন লোকায়ত ও ধর্মীয় জীবনে ব্রত ও আনুষ্ঠানিক খেলাধূলা। প্রকৃতপক্ষে জৈবিক প্রয়োজন বোধ থেকেই গ্রামীণ এই খেলাগুলির রীতি ও কৌশল জেলার গ্রামবাসীগণ আয়ত্ত করেছেন। আদিম অরণ্যচারী মানুষ একদিন পশুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকত এবং শিকার ছিল তার জীবন ও জীবিকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কুস্তি ও লাঠি খেলা ছিল একসময় আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ। তিস্তা, তোর্ষা, কালজানির দেশ কোচবিহার। নদীপ্রধান এই জেলার বন্যা বা প্লাবন একটি বাৎসরিক ঘটনা। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই নদীবহুল গ্রামের মানুষ অনেকেই দুপুরের স্নান নদীতেই সারেন। আবার বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা শিখেছেন সাঁতার। এই সাঁতারকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে জলকুমির, অক্‌টুল-বক্‌টুস ও নৌকা বাইচের মত খেলা।

বাংলার লৌকিক গ্রামীণ ক্রীড়া বা খেলাধূলা সম্পর্কে আলোচিত বহু গ্রন্থ থাকলেও, এমনকি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের অজস্র নিদর্শনের উপর আলোকপাত করে গবেষণাধর্মী প্রচুর গ্রন্থ রচিত হলেও কোচবিহারের লোকক্রীড়ার উপর আলোচিত উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম ডঃ চারু সান্যাল মহাশয়ের Rajbansis of North Bengal গ্রন্থখানি, যদিও গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট এবং অনুসন্ধানের ক্ষেত্র মূলত জলপাইগুড়ি জেলা, তবুও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে প্রচলিত খেলাধূলা সম্পর্কিত আলোচনায় গ্রন্থটি যে পথিকৃৎ এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। জেলার লৌকিক সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য এই নিদর্শন লোকচক্ষুর আড়ালে

অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত বহমান। তাই এ বিষয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণে আমাদের আলোচিত গ্রন্থের তথ্যসূত্রের চেয়ে ক্ষেত্রানুসন্ধানের উপরই বেশী নির্ভর করতে হয়েছে।

ক্ষেত্রানুসন্ধানের ভিত্তিতে কোচবিহারের প্রচলিত লৌকিক খেলাধূলাকে আমরা প্রধানতঃ চারটি ভাগে ভাগ করেছি। প্রথমতঃ শ্রমসাপেক্ষ শরীরচর্চামূলক মুক্তাঙ্গণ খেলা। দ্বিতীয়তঃ গ্রামীণ ঘরোয়া খেলা। তৃতীয়তঃ জলের খেলা। চতুর্থতঃ আনুষ্ঠানিক লোকপ্রিয় ক্রীড়া (খেলাধূলা) (স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচিত)।

এই চারটি ভাগের মধ্যেই জেলার প্রত্যন্ত সকল গ্রামাঞ্চলের অজস্র লোকক্রীড়ার প্রাণস্পন্দন শোনা যায়।

জেলার পাঁচটি মহকুমার দৈনন্দিন গ্রামীণ জীবনের চলমান জীবন্ত রূপের প্রতিচ্ছবির কিছু কিছু সন্ধান পাই এই লোকক্রীড়ার মধ্যে। এক কথায় যার মাধ্যমে একাধারে ঘটে লোকায়ত সংস্কৃতি ও সুস্থ মূল্যবোধের প্রসার ও প্রকাশ। বাঙালীর খেলাধূলা বলতে আমরা যেমন বুঝি লৌকিক খেলাধূলাকে তেমনি এর অস্তিত্বের সন্ধান করি লোকসংস্কৃতির মধ্যে। কোচবিহারে প্রচলিত লৌকিক সব খেলাধূলাতেই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিজস্ব লোকাচার, রীতিনীতি, শব্দচয়ন ও উচ্চারণরীতি বিদ্যমান। কোন কোন গ্রামীণ খেলাধূলাকে ধৈর্য ও সংযম শিক্ষার উপায় বলে মনে করা হয়। যেমন আটঘরিয়া, যোলপাইতা, মোগল-পাঠান, এক্কা-দোক্কা ইত্যাদি।

আবার কোন কোন গ্রামীণ খেলায় গণিত শিক্ষার উপাদান চোখে পড়ে। এইসব খেলায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এক নিঃশ্বাসে 'দম' দিতে গিয়ে হৃৎযন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। জেলায় প্রচলিত কানামাছি নামক লৌকিক খেলায় তাই দেখা যায় ছড়া-আবৃত্তিও খেলার পাশাপাশি চলে। যেমন-- "আনি মানি জানি না/পরের ছেলে মানি না।" জেলার সর্বত্রই গ্রামীণ সর্বজনপ্রিয় খেলা হল হা-ডু-ডু, যার আধুনিক নাম কবাডি। স্থানীয় মুসলিম সমাজে সুঠামদেহী পুরুষদের মধ্যে এই খেলায় আগ্রহ অনেক বেশী দেখা যায়। তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর ও কৃষ্ণপুর গ্রাম এই হা-ডু-ডু খেলার একটি উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান। উক্ত গ্রামের গহীম মিঞা এক সময় জেলার কৃতি হা-ডু-ডু খেলোয়াড় ছিলেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ-প্রশাসনের মাধ্যমে এই লৌকিক ক্রীড়ার পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট। এই জেলার গ্রামীণ খেলাধূলার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য হল অনুশীলন-পদ্ধতি, খেলার বিষয়গুণ এবং ঋতু পর্যায়ের বিভিন্ন সময়ে খেলার সময় নির্বাচন।

জেলার এক সময়ের সেটেল্‌মেন্ট নায়েব আহেল্‌কার হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement গ্রন্থে আজ থেকে একশত বছর পূর্বে কোচবিহারে প্রচলিত কয়েকটি লৌকিক ক্রীড়ার উল্লেখ করেছেন— "Of the out-door games Footi-Chila, Nab and Kana-Kani are the chief. Among the in-door games

the following partaking of the nature of the Chess play, may be mentioned– Chawpati, Shatgharer Pakta, Khalghak, Mogal-Pathan or Sola-Paita, Chakar-Chal, Bagh-Baghini and Tepaita."[১] এর মধ্যে মুক্তাঙ্গন বা বাইরের উল্লেখযোগ্য খেলা হল— ফাটিচিলা, কানাকানি প্রভৃতি। অপরপক্ষে গ্রামীণ ঘরোয়া জনপ্রিয় খেলাগুলি হল— চৌপাটি, সাতঘরের পকেট, খালখাগ, মোগল-পাঠান, ষোলপাইতা, চোকোর চাল, বাঘ-বাঘিনী, তেপাইতা প্রভৃতি।

উক্ত বিশ্লেষণে আমরা একটি জিনিস পরিষ্কার দেখতে পাই এবং এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সে সময় কোচবিহারে মুক্তাঙ্গণ খেলাধূলার চেয়ে ঘরোয়া খেলাধূলার কদর ছিল বেশী। এর একটি কারণ উল্লেখ করা যায় তা হল— লোকক্রীড়ার উপযুক্ত যে স্থান জনবিরল মুক্তাঙ্গণ বা প্রান্তর তা বর্তমানের মত এত নিরাপদ ছিল না।

আবার দাবার অনুকরণে এখানে কিছু খেলা প্রচলিত ছিল যেগুলি আজ বিলুপ্ত প্রায়। যেমন— চৌপাটি, সাতঘরের পকেট, খালখাগ, চকোর চাল ইত্যাদি।

জেলায় প্রচলিত লৌকিক ক্রীড়ার ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে আমরা দেখতে পাই, সকল ক্ষেত্রেই নিয়মকানুন কঠোর ভাবে পালিত হয় না। কোথাও এই নিয়মকানুন যেমন কঠোর, তেমনি কোন কোন লোকক্রীড়ায় তা শিথিল। আবার কোন খেলায় নিয়মকানুনের চেয়ে ঐতিহ্যের অনুসরণ বেশী।

শরীর চর্চা মূলক মুক্তাঙ্গন ক্রীড়া ঃ

হা-ডু-ডু ঃ

লোকায়ত খেলাধূলার বিশেষজ্ঞগণের মতে হাঁটু শব্দ থেকেই হা-ডু-ডু নামের উৎপত্তি। হাঁটু > হাডু + ডু = হা-ডু-ডু। হাঁটু বা উরুর উপর হাতের তাল দিয়ে যেমন খেলোয়াড় 'ডুগ' বা দম দেয়, আবার প্রতিপক্ষের দল তার হাতে বা হাঁটুতে টান ও প্যাঁচ দিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা করে, তাকে স্থানীয় ভাষায় 'ক্যাচকি' বলে। কোচবিহারে প্রচলিত এই লোকক্রীড়ায় খেলা শুরুর আগে একটি সংস্কারমূলক উক্তি করেন খেলোয়াড়গণ। যেমন— "হা-ডু-ডু ভাই, ঠ্যাং ভাঙলে আমার দোষ নাই।" গ্রামীণ এই খেলাটির মধ্যে গ্রাম জীবনের সার্থকতার অনুসন্ধান পাওয়া যায়। হা-ডু-ডু-ই এই জেলার একমাত্র খেলা যা জেলার সর্বত্র সমান জনপ্রিয়। হা-ডু-ডু -কে প্রকৃতপক্ষে উপস্থিত বুদ্ধির চেয়েও শক্তি ও সক্ষমতার খেলাও বলা যায়।

এই খেলায় প্রতি দলে ৯ থেকে ১২ জন খেলোয়াড থাকে। খেলোয়াড় 'কাটা' বা 'মড়া' হলে প্রতিপক্ষ এক পয়েন্ট পায়। কোটের দুই দিকেই সমান সংখ্যক খেলোয়াড় আক্রমণ ও

প্রতি-আক্রমণের ভঙ্গিতে সজ্জিত থাকে। খেলার শুরুতেই এক পক্ষের যে কোন একজন মধ্যরেখা পেরিয়ে দম বন্ধ করে অপর পক্ষের কাউকে স্পর্শ করে। এই স্পর্শ করাকে কোথাও 'ডুক' বা বোল দেওয়া বলে। দম বা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা খেলোয়াড়কে বোঝাতে তাঁকে উচ্চস্বরে হা-ডু-ডু, কাবাড়ি, কপাটি, কাপাটি, টিক্‌টিক্ প্রভৃতি শব্দের যে কোন একটি উচ্চস্বরে একনাগাড়ে উচ্চারণ করতে হয়। কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই খেলায় রাক্-রাক্, রাইক্-রাইক্ এই শব্দগুলি উচ্চারিত হয়। এই ছড়াগুলির প্রয়োগ সাধারণত প্রতিপক্ষকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে করা হয়। আবার কখনও বীরত্বব্যঞ্জক ধ্বনিও উচ্চারণ করা হয়। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় ডুক দেওয়ার সময় প্রতিপক্ষের কাউকে ছুঁয়ে মধ্যরেখা পার হলে, যাকে স্পর্শ করা হয়, সে 'মড়া' হয়। সঙ্গে সঙ্গে খেলার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সে কোর্টের বাইরে যায়। আবার যদি নিজেই আটকে পড়ে, বা দম ছেড়ে দেয়, তবে সেই 'মড়া' হয় এবং যথারীতি খেলা থেকে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয় বার 'ডুক' দিতে আসবে পাল্টা দলের খেলোয়াড়। একেই পাল্টা ডুক বা পাল্টা দম বলা হয়। পাল্টা ডুক বা দমের সময় এই খেলায় দর্শকদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আবার দম দেওয়ার সময় বিপক্ষ দলের কাউকে না ছুঁয়ে বা স্পর্শ করে ফিরে এলে খেলা অমীমাংসিত থাকে। দম দিতে গিয়ে যদি কোন খেলোয়াড় কোর্টের বাইরে চলে যায় তবে সে জল্ম্যা (আংশিক মড়া) হয়। এই খেলার বৈশিষ্ট্য হল কোন দল বিপক্ষ খেলোয়াড়কে মেরে পয়েন্ট সংগ্রহ করে এবং একই সঙ্গে নিজের দলের 'মৃত' খেলোয়াড়কে জীবিত করতে পারে। যে কোন এক পক্ষের সকল খেলোয়াড় 'মৃত' হলে একটি গেম সম্পন্ন হয়।

লোকসংস্কৃতিবিদ্ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৫৪ পৃষ্ঠায় এই খেলার দম বা ডুক দেওয়ার একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন—

"আমি যাই পুবে
বাঁশ কাটি কুপে
বাঁশের নাই আগ
আমার নাম বাঘ।।"

এই খেলায় প্রতিপক্ষকে বিদ্রূপ করে বাংলাদেশে একটি ছড়ার প্রচলন আছে। যেমন—

"হা-ডু-ডু পেয়ারা পাতা
দু-গালে ছেড়া জুতা।"

ডাঃ গিরিজাশঙ্কর রায় তাঁর "প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ লোকসাহিত্য" নামক গ্রন্থের ৬৯ নং পৃষ্ঠায় কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত হা-ডু-ডু খেলার দুটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন—

১) "চিকটা মাটি বৃন্দাবন
ঘড়ি বাজে ঠন্ ঠন্।"

২) "হারে তু হারেয়া বাঘ মারে বাড়েয়া
বাঘের রক্ত হরিণের শিং তোক মারিতে কতয় দিন।"

ডাংগুলি ঃ

বাংলার গ্রামাঞ্চলের জনপ্রিয় খেলার অন্যতম এই ডাংগুলি খেলা। সমগ্র কোচবিহার জেলার গ্রামাঞ্চলেও সমান জনপ্রিয় এই খেলাটি। এক হাত পরিমাণ ঋজু গাছের শক্ত ডাল যাকে বলা হয় 'ডাং' এবং ছয় ইঞ্চির মত উক্ত ডালেরই একটি অংশ বা কাঠিকে বলা হয় 'গুলি'। এই দুটি বস্তুই এই খেলার প্রধান উপকরণ। প্রশস্ত রাস্তার তেপথী, চৌপথী, বা ফাঁকা মাঠ এই খেলার উপযুক্ত স্থান। ডাংগুলি খেলায় কোন ছড়া বলার প্রচলন নেই। তা সত্ত্বেও কোচবিহারের কোন কোন গ্রামের যুবকগণ পূর্ববঙ্গীয় প্রভাবে এই খেলায় প্রতি এক শতে এক হাত— একজন খেলোয়াড় কেনাকে বলা হয়--

"এ্যানা ব্যানা ছ্যানা
(নির্দিষ্ট ব্যাক্তি) ওমুককে নিয়ে কেনা।"

প্রকৃতপক্ষে এটি পূর্ববঙ্গীয় খেলা। কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলের এই খেলাকে তাই বলা যায়— "মাইগ্রেটেড ফোক গেম"। এই খেলায় কোন কৌশলের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র ডান হাতের শক্তিই এই খেলার প্রধান সম্পদ। খেলাটি প্রধানত দুইজনের হলেও অনেক গ্রামে দুই-তিন জনের দুটি দলে ভাগ করে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। 'ফুলবাড়ি' ও 'ঘাই চাম্পা' এই দুটি পদ্ধতিতে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ছোট গর্ত বা চৌকোণা ঘর এই খেলার একদিকের সীমানায় থাকে। ছোট্ট 'গুলি' মাটিতে না ফেলে ডান্ডার সাহায্যে যতবার স্পর্শ করা যাবে ততবার খেলার সুযোগ পাবে খেলোয়াড় ফুলবাড়ি নিয়মের খেলায়। টসে জিতে বিজয়ী দল গর্ত নেয়। গর্তের গুলি ডান্ডার আঘাতে বিপক্ষ দলের দিকে ছুঁড়ে মারলে বিপক্ষ দলের কেউ ক্রিকেট বলের মত মাটিতে পড়ার আগে গুলিটি লুফে নিলে ডান্ডাধারী ব্যক্তি দান হারাবে। তা না হলে ডান্ডাধারী খেলোয়াড় গুলি থেকে গর্তের সোজা দূরত্ব ডান্ডার সাহায্যে মাপে। এ সময় বা হাত পিঠে রেখে ডান হাতে মাপার চল আছে জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বিলসী ও শালবাড়ি গ্রামে। এই মাপ অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন নামে প্রচলিত। জেলার মেখলিগঞ্জ ও তুফানগঞ্জ মহকুমার গ্রামাঞ্চলে এই খেলায় দেখা যায় খেলোয়াড় ডাং দিয়ে গুলিকে একই সঙ্গে তিনবার স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে একশ পয়েন্ট হয়। দুইবার স্পর্শ করলে গুলি দিয়ে মেপে গর্তের কাছে আসতে হয়। একবার স্পর্শ করলে ডাং দিয়ে মেপে আসতে হয়। এভাবেই খেলোয়াড়ের কৃতিত্বের মাধ্যমে পয়েন্টের তারতম্য হয়। এই খেলায় জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় কে কত দূরে গুলি ছুঁড়তে পারে তার মাপের উপর।

বাংলাদেশে এই খেলার মাপের বিভিন্ন নামগুলি হল ঃ "রংপুরে—গাইধন, ধল্লি, চাক্কোর, চালি, পান্ডু, গেট; ময়মনসিংহে— গয়া, দুয়া, তেনা, চারা, পাঞ্চা, ভইল; রাজশাহিতে—

বাড়ি, দুড়ি, তেড়ি, চামর, চাম্পা; নোয়াখালিতে— এড়ি, দুড়ি, চাম্পা, জেক ইত্যাদি।"[২] কোচবিহারে এই মাপের নাম— "১ হলে গাইদোন, ২ হলে ডুলি, ৩ হলে চক্র, ৪ হলে চালি, ৫ হলে পান্ডা, ৬ হলে বায়েন, ৭-এ গড় ইত্যাদি।"[৩] জেলার প্রায় সকল গ্রামে এই খেলায় ৭ পর্যন্ত গোণাই লক্ষ্য এবং প্রতি ৭-কে এক ইউনিট করে ধরা হয়। অনেক সময় ৭ ফুলে এক লাল বা গজ ধরা হয়।

ঘাই চাম্পা পদ্ধতির খেলায় শুরুতে একজন খেলোয়াড় ডান্ডার সঙ্গে গুলিকে ধরে ছুঁড়ে দেয়। বিপক্ষ দল গুলি ধরতে পারলে যে ছুঁড়েছে তার হাত হারায় এবং না পারলে একজন খেলোয়াড় গুলিকে ঘরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। ঘরের ভিতর বা দাগের এক বিঘত বা টাকর (৯") দূরত্বের মধ্যে পড়লে এই খেলোয়াড়েব হাত নষ্ট হয়। বিপক্ষের খেলোয়াড়গণ যে পর্যন্ত হাত না নিতে পারে ততক্ষণ এ ভাবে খেলা চলতে থাকবে।

সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে ডাংগুলি খেলাই ক্রিকেট খেলার পূর্বসূরী। ক্রিকেট খেলার সঙ্গে এই খেলার সাদৃশ্য আছে অনেক। ক্রিকেট খেলায় যেমন বোলারের চেয়ে ব্যাটস্‌ম্যানের দায়িত্ব বেশী, ডাংগুলি খেলাতেও তেমনি ডান্ডাধারীর দায়িত্ব বেশী। এই খেলায় ডাং ও গুলি হচ্ছে ক্রিকেটের ব্যাট ও বলের প্রতীক। ডাংগুলির গর্ত হচ্ছে ক্রিকেটের পীচ। ক্রিকেটের মত এই খেলায় ডান্ডাধারী বিভিন্ন ভাবে আউট হতে পারে। সেই অর্থে ডাংগুলিকে ক্রিকেটের গ্রাম্য সংস্করণ বলা হয়।

কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী যুবকগণ সুপ্রাচীন কাল থেকেই এমনি আর-একটি খেলায় অভ্যস্ত যার নাম 'চেমু' খেলা। ডাংগুলি প্রকৃতপক্ষে জেলায় পূর্ববঙ্গীয় 'স্থানান্তরিত' খেলা। কিন্তু এই খেলা প্রচলনের পূর্ব থেকেই কোচবিহারে 'চেমু' খেলার প্রচলন ছিল। এই চেমুকে জেলায় অনেক মহকুমায় 'চেঙ্গু'ও বলা হয়। চেমু অর্থে এখানে ডাং বা লাঠিকেই বোঝায়। পরবর্তী অংশে এই চেমু স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হয়েছে।

গোল্লাছুট ঃ

কোচবিহার জেলার আঞ্চলিক ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন খেলা হল গোল্লাছুট। ছেলে ও মেয়ে উভয়েই এই খেলায় অংশ গ্রহণ করলেও ছেলেরাই বেশী এই খেলার সঙ্গে যুক্ত। নির্দিষ্ট ছক বা মুক্তাঙ্গণে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই খেলায় দল তৈরীতে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। এতদঞ্চলে এই খেলার প্রাচীন ঐতিহ্য থাকলেও "গোল্লাছুট মূলতঃ বাংলাদেশের ঢাকা ও খুলনা জেলার খেলা।"[৪] নির্দিষ্ট সীমানায় দ্রুত দৌড়ের উপর এই খেলার সাফল্য নির্ভর করে। সমান সংখ্যক দুই দলের মধ্যে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উম্মুক্ত মাঠ বা বাগানে এই খেলা চলে। গোল্লাছুট খেলায় মাঠের মাঝখানে একটি গর্ত খেলার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে

চিহ্নিত হয়। গর্ত থেকে ৪০-৫০ হাত দূরে সীমানা নির্ধারিত হয়। কেন্দ্রের গর্তে একটি কাঠি থাকে, তাকেই গোল্লা বলা হয়। এই গোল্লার কেন্দ্র থেকেই ছুটে গিয়ে কাউকে ছুঁয়ে আসাই খেলার মূল লক্ষ্য। এই জন্যই এই খেলার নাম গোল্লাছুট। অর্থাৎ গোল্লা থেকে ছুটে বেড়িয়ে আসাই এই খেলার নামকরণে প্রকাশিত হয়েছে। "এই খেলায় একজন দলপতি থাকে ও অন্যদের বলা হয় 'গোদা'।"[৫] এই খেলায় দৌড়ের কোন নির্দিষ্ট দিক নেই। এলোমেলো ভাবে ছুটে লক্ষ্য স্থানে পৌঁছাতে পারলেই হল। বিপক্ষ দল ছুঁলেই খেলোয়াড় 'মড়া' হয়। গোল্লাছুট খেলায় আত্মরক্ষার কৌশল ও আক্রমণকারী সম্পর্কে সতর্কতা ও বন্দিমুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টাই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

দাড়িয়াবান্ধা ঃ

জেলার অন্যান্য লোকপ্রিয় গ্রামীণ খেলার মত দাড়িয়াবান্ধা খেলাও জেলার প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। দাড়িয়াবান্ধা ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই খেলা। উন্মুক্ত মাঠের নির্দিষ্ট জায়গায় ঘর কেটে এই খেলা হয়। এই খেলায় কোর্টের পরিমাপ হয় সাধারণত ঃ ৮৯'১" লম্বা ও ২৩'১" চওড়া। অঞ্চলভেদে এর পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। এই খেলা সমগ্র উত্তরবঙ্গে প্রচলিত থাকলেও সমগ্র বাংলার লোকপ্রিয় খেলা।

চেমু / চেঙ্গু ঃ

কোচবিহারের লোকায়ত গ্রাম্য জীবনের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী লোকক্রীড়া 'চেমু' বা 'চেঙ্গু' খেলা। পূর্ববঙ্গীয় ডাংগুলিরই কোচবিহারের স্থানীয় সংস্করণ এই চেমু খেলা। "এই চেমু বা চেঙ্গু খেলা কোচবিহারের বিভিন্ন গ্রামে সাধারণত দুই রকম ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। একটি ডাঙ্গা বা মাটিয়া চেমু, অপরটি 'ঠকা' চেমু।"[৬] খোলা মাঠই এই খেলার প্রকৃত স্থান। ডাঙ্গা চেমু খেলায় দেখা যায় মাঠের যে কোন একটি অংশে ডিম্বাকৃতি একটি গর্ত করে তার মধ্যে চেমু বা ৫" দীঘল একটি কাঠিকে কাৎ করে রেখে পেন্টি দিয়ে ডাং মেরে পাঠালে পেন্টি দিয়ে মেপে খেলোয়াড় ঐ গর্তে হাজির হয়। দুই বার ডাং মেরে পাঠালে ৫" দীঘল চেমু দিয়ে মেপে আসতে হয়। প্রতিক্ষেত্রে পেন্টি বা চেমু দিয়ে গুণে গর্তে ফেরার সময় বা হাত পিঠে রাখতে হয়। কিংবা তিনবার ডাং মেরে পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে ৫ গুণন ২০ অর্থাৎ ১০০ পয়েন্ট হয়। এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গেই গেম। ডাঙ্গা চেমু খেলায় দেখা যায় একজন করে খেলেই পয়েন্ট তোলা হয় এবং পালা করে যে বেশী পয়েন্ট তোলে সেই জয়ী হয়। এই খেলার প্রধান উপকরণ হল একটি দেড় হাত দৈর্ঘ্যের সমান পেন্টি এবং একটি ৫" দৈর্ঘ্যের পেন্টির টুকরো যাকে বলা হয় চেমু। শুধুমাত্র ছেলেরাই এই খেলায় অভ্যস্ত। এই খেলায় বুদ্ধির চেয়ে হাতের জোরই বেশী প্রয়োজন।

অপরপক্ষে 'ঠকা চেমু' খেলার উপকরণ হচ্ছে আড়াই থেকে তিন ফুট উচ্চতার একটি বাঁশের খুটি (ঠকা) যা খেলার মাঠের মধ্যখানে প্রোথিত থাকে। আর ৫" লম্বা একটি পেন্টির অংশ এবং দেড় ফুট লম্বা একটি পেন্টি। এ খেলায় অবশ্যই দুজন খেলোয়াড় লাগে। ঠকার উপর

চেমু নামক পেন্টির টুকরোটি বসিয়ে খেলোয়াড় এক ডাং-এ সেটিকে দূরে পাঠান এবং বিপক্ষের খেলোয়াড়দের হাতেও সমান মাপের পেন্টি থাকে। তারা সেই পেন্টি দিয়ে চেমু স্পর্শ করলে খেলোয়াড় আউট হয়। আবার পেন্টি দিয়ে চেমুকে স্পর্শ না করে ডান হাতে সেই চেমু ছুঁড়ে ঠকা স্পর্শ করলেই খেলোয়াড় আউট হয়। এ জায়গায় খেলোয়াড়দের ভূমিকা অনেকটা ক্রিকেটের ব্যাটস্‌ম্যানের মত এবং আউট হওয়ার পদ্ধতিটা ক্রিকেটের স্ট্যাম্প আউটের মত হয়। আর যদি ঠকা স্পর্শ না করে প্রথম খেলোয়াড় পেন্টি দিয়ে যতবার চেমু স্পর্শ করবে তত পয়েন্ট হয়। এভাবে কুড়ি পয়েন্ট হলে মাটিতে দাগ কেটে সংকেতের মাধ্যমে এই কুড়ি পয়েন্টকে মনে রাখা হয়। কোচবিহারের চেমু খেলাই বাংলার প্রাচীন ডাংগুলি খেলার প্রাচীন বা আদিম রূপ।

বাসুদিয়া ঃ

কোচবিহারের লোকক্রীড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এতে মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরই প্রাধান্য বেশী। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর "Rajbansis of North Bengal" গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় স্থানীয় রাজবংশী সমাজে প্রচলিত শিশু-কিশোরদের এই জনপ্রিয় খেলার উল্লেখ করেছেন। এটি অনেকটা শহরে ছেলেমেয়েদের রান্নাবাটি খেলার মত। এই খেলায় দেখা যায় কয়েকটি শিশু মাটি দিয়ে কিছু একটি খাদ্যবস্তু রান্না করে কিন্তু তারা ঐ বস্তু খায় না। এরূপ রান্নাকে বলা হয় 'বাসুদিয়া'। এই বাসুদিয়া খেলার সময় শিশুরা যে গানটি করে তা হল—

"গুদু গুদু মানা পাত
জল আনতে হইল ভাত।।"

ঠেংগুহাটা ঃ

ঠেংগু শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'ঠ্যাং' অর্থে পা এবং 'হাটা' অর্থে হেঁটে যাওয়া। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হল কৃত্রিম পায়ে হেঁটে যাওয়া। বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে 'রণপা' নামে যা পরিচিত সেই রণপাই কোচবিহারে 'ঠেংগু' নামে পরিচিত। কোচবিহারের লোকক্রীড়ার ইতিহাসে ঠেংগু খেলা হল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ খেলার নিদর্শন। এই খেলায় দেখা যায় দুটি বিশেষ জাতের লম্বা বাঁশের (বড় বাঁশের) দুই বা তিন ফুট উঁচু গীটে একটি পা রাখার স্থান রেখে বাঁশটি কাটা হয় এবং এই গীট বা সম্পূর্ণ বাঁশটির উচ্চতা নির্ভর করে যিনি হাঁটবেন বা খেলবেন তাঁর উচ্চতার উপর। এই খেলার মূল উপকরণই হল উক্ত উচ্চতায় গীট যুক্ত দুটি সমান মাপের বাঁশ। বাঁশটির বেড় হবে খেলোয়াড়ের মুষ্টিবদ্ধ হাতে ধরার উপযোগী। জেলার প্রায় সকল গ্রামেই এখনো বিলুপ্তপ্রায় এই খেলায় দেখা যায় বিশেষ করে গ্রামীণ যুবকগণ ঠেংগু নামক বাঁশটির গীট যুক্ত অংশে পা রেখে দৃঢ় মুষ্টিতে দুই হাতের সাহায্যে বাঁশটি ধরে সেই বাঁশের সাহায্যে কখনও অগ্রসর হয় কখন ও পশ্চাৎপদ হয়। গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেক সময় ঠেংগুহাটা প্রতিযোগিতাও হয়। পূর্বে এই ঠেংগুর দ্বারা অনেকে খানা-খন্দ এবং জঙ্গলের

ভেতর অনেক দুর্গম স্থানে হেঁটে যাওয়ার অভ্যাস করতেন। ঠেংগু খেলার দক্ষতাই হল নিজের শরীরের ভারসাম্য সঠিক রাখা। এই খেলায় প্রথমেই কেউ অংশগ্রহণ করতে পারেন না, কারণ দুটি বংশ দন্ডের উপর নিজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কিছুদিনের অভ্যাস দরকার। বাংলার অনেক অঞ্চলে বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীনৃত্যে দেখা যায় অনেকে যোদ্ধার বেশ ধারণ করে কাঁধে কৃত্রিম ঢাল নিয়ে ঠেংগুর উপর দাঁড়িয়ে এই নাচ প্রদর্শন করেন। কোচবিহারের লোক সংস্কৃতির এই উজ্জ্বল নিদর্শন আজ অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জমান।

তোসর তোসর খেলা ঃ

জেলার প্রাচীন গ্রামীণ লোকক্রীড়ার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল "তোসর তোসর" খেলা। এটি প্রকৃতপক্ষে শিশুদেরই খেলা। এই খেলায় দেখা যায় চার পাঁচটি শিশু দুহাত বিস্তার করে বৃত্তাকারে বসে পড়বে। এদেরই একজন ঐ বৃত্তের বাইরে ঘুরে ঘুরে ছড়া বলবে এবং হাতের চেটো দিয়ে স্পর্শ করবে। যার পাশে গিয়ে ছড়াটি শেষ হবে সে-ই চোর সাব্যস্ত হবে। আর তখনই ঐ অভিযুক্ত চোর উঠে গিয়ে পূর্বের খেলোয়াড়দের মত বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে ছড়া কাটতে থাকবে। এভাবেই একাদিক্রমে ঘুরে ঘুরে খেলাও চলতে থাকবে। এটাই তোসর তোসর খেলার মূল আঙ্গিক। এমনি একটি প্রচলিত তোসর তোসর খেলার ছড়া হল—

"আদা পাদা নুন খরোদা
একনা আদা পড়ি পানু
সবারে মুখত বাটি দিনু।
যায় করিবে আও
তারে মুখত খাও।
যায় করিবে থু
তার মুখত গু।
যায় করিবে হোক্কা,
তারে মুখত পোকা।"[৬]

একই খেলায় অঞ্চল ভেদে অনেক সময় ছড়ার শব্দ চয়নে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন দিনহাটা মহকুমার শিমুলবাড়ি গ্রামে প্রচলিত এই খেলায় ছড়া হল—

"আদা পাদা লবন সাদা
যায় পাদিবে তার টিকাত ফোলা।"

হাতের পাতে খেলা ঃ

এই খেলায় মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে বেশী। এ খেলায় কয়েকজন মেয়ে একটি বৃত্তের মধ্যে হাতের চেটো ছড়িয়ে বসে থাকবে, আর একজন ছড়া কাটতে কাটতে প্রত্যেকের হাতের

তালুতে বা চেটোতে ঘুষি মারবে। ঘুষি মারা শেষ হলে যার চেটোতে কাট শব্দ উচ্চারিত হবে সে হবে পাক্কা। সে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসবে। এভাবে পাক্কা হতে হতে সর্বশেষে পাক্কা খেলোয়াড়টি চোর সাব্যস্ত হবে। অন্য খেলোয়াড়গণ চোরকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে এবং তাকে কিছু উত্তর দিতে হবে। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর "Rajbansis of North Bengal" (পৃ ৭৬) নামক গ্রন্থে এই খেলার একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন। যেমন—

'ইচন বিচন ধাউরি বিচন
তাতে আছে মঙ্গল কাটা
মঙ্গল কাটা নড়ে চড়ে
আই কুমারী ডাক পারে।
এলে রে বেলে রে
ফুল তুলিবার গেলে রে।
ফুলের মান ডালা পাত
ছিড়ি আংটি হাত কাট।।"

এই একই খেলায় তুফানগঞ্জ মহকুমার বিলসী গ্রামের মন্টু দাস যে ছড়াটি বলেন তা হল—

'ইচন বিছন ধাবরী বিছন
গরু চড়াইতে পাইলাম বিছন
এলের পাত বেলের পাত
কাট কুট তোল হাত।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় পূর্ববঙ্গীয় 'ইকির মিকির' খেলাই কোচবিহারের স্থানীয় সমাজে 'হাতের পাতে' খেলা নামে পরিচিত।

পাখি খেলা ঃ

কোচবিহার জেলার কৃষিজীবী পরিবারের যুবক-কিশোরদের একটি জনপ্রিয় খেলা হল পাখি খেলা। এ খেলার সময় সাধারণত অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস। ধান কাটার পর উন্মুক্ত ক্ষেতে কিংবা কোন মাঠে দিনের বেলায় এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত এটি দিনের খেলা হলেও অনেক সময় মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতেও চাঁদের আলোয় এই খেলায় অনেকে অভ্যস্ত। রাতের বেলায় এমন মুক্তাঙ্গণ খেলা জেলার অন্যত্র খুব বেশী দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে শেষ রাত্রি পর্যন্ত এই খেলা চলে। খেলায় প্রত্যেক দলে সাতজন করে খেলোয়াড় থাকে। এটি সম্পূর্ণই ছেলেদের খেলা। প্রথম সাতজন দুই হাত ছড়িয়ে খেলার নির্দিষ্ট স্থানে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রথমে

প্রতিরোধকারী ছয়জন খেলোয়াড় পাশাপাশি লাইনে দাঁড়ায়। সপ্তম জনকে বলা হয় পাখি বা ঘোড়া; সে-ই একমাত্র আড়াআড়ি ভাবে সব লাইনে দৌড়তে পারে। এখানে খেলার কোর্টের কোন নির্দিষ্ট মাপ নেই। অর্থাৎ অনেকটা দাড়িয়াবান্ধা খেলার মত চিহ্নিত স্থানে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় পাখিকে ছুঁয়ে ফেললে সে 'মড়া'। প্রথম সাতজন কোর্টে থাকাকালীন অপর সাতজন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। "জেলার হলদিবাড়ি ব্লকের পয়ামারী গ্রামে কিশোর-যুবকদের মধ্যে এই খেলার প্রচলন বেশী।"[৮]

গ্রামীণ ঘরোয়া খেলা ঃ

দাবা ঃ

দাবা একটি শহুরে খেলা হলেও এর প্রাচীন লৌকিক রূপ এখনও আমরা দেখতে পাই জেলার বিভিন্ন গ্রামে। গ্রীষ্মের দুপুরে ছায়া সুনিবিড় বৃক্ষতলে কিংবা কোন অলস মধ্যাহ্নে কৃষি নির্ভর যুবক কিংবা রাখালিয়া বালকগণ, মৈষাল গরুমোষ চড়ানোর ফাঁকে মধ্যাহ্নে কৃষিনির্ভর যুবক কিংবা রাখালিয়া বালকগণ, মৈষাল গরু-মোষ চড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে দাবার অনুকরণে যে খেলাগুলির সঙ্গে এখনও অভ্যস্ত তা হল— ষোলপাইতা, আটঘরিয়া এবং বাঘ-ছাগল। এই লোকায়ত খেলাগুলির সঙ্গে দাবা খেলার সাদৃশ্য রয়েছে।

ষোলপাইতা ঃ

কোচবিহার জেলার গ্রাম্য যুবকগণের অবসর বিনোদনের উল্লেখযোগ্য খেলা হল ষোলপাইতা। এ খেলা অঞ্চলভেদে 'ষোলগুটি 'নামেও পরিচিত। এ খেলায় দু-জন খেলোয়াড় মুখোমুখি বসবে। দুজনকে ঘিরেই দু-দলের পক্ষে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করার জন্য আর কয়েকজন তাঁদের ঘিরে বসবেন। ষোলপাইতা প্রকৃতই দাবা খেলার প্রাচীন রূপ। এই খেলায় তাই দাবা খেলার মত উত্তেজনা দেখা যায়। প্রত্যেকের হাতে থাকবে চার গন্ডা অথবা ষোলটি কড়ি বা তেঁতুল বীচি অথবা লাউয়ের বীচি। আড়াআড়ি ভাবে ঐ বস্তুগুলি প্রত্যেকেই ঘরে রাখার চেষ্টা করবে। এই খেলায় প্রত্যেক প্রতিযোগী তাঁর ইচ্ছেমত হাতের গুটি চাল দিতে পারে। সব গুটি কখনই এক সঙ্গে চাল দেওয়া যাবে না। দুই পক্ষের হাতে অবশ্যই দুই রকমের গুটি থকবে। কারণ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ যেন স্পষ্ট বোঝা যায়। এ খেলায় গুটি খাওয়ার নিয়ম অনেকটা 'তোসবোর' খেলার মত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক খেলোয়াড়ই চেষ্টা করে তাঁর হাতের গুটি পর পর তিনটি ঘরে সাজাতে। অপর পক্ষ অবশ্য তাঁর গুটি দিয়ে পরপর তিনটি ঘরে সাজাতে পারে তবেই সে বিপক্ষের গুটি খেতে সক্ষম হয়। কোর্টের যে কোন স্থান থেকে বিপক্ষ দলের সবগুলি গুটি খেতে পারলেই সে বিজয়ী হয়। জেলার শতাধিক বছরের প্রাচীন অন্যতম লৌকিক ক্রীড়ার নিদর্শন এই ষোলপাইতা।

জেলার সর্বত্র প্রচলিত ও সমাদৃত এই খেলার একটি ছক হল—
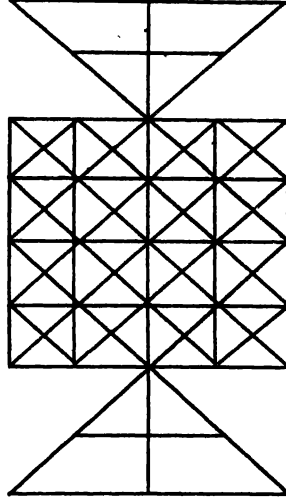
মোগল-পাঠান ঃ

কোচবিহার জেলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী খেলার মধ্যে মোগল-পাঠান খেলা অন্যতম। এই খেলা ষোল ঘুঁটি বা গুটি খেলা নামেও পরিচিত। এই খেলায় প্রতিযোগী সাধারণত দুই জন। প্রত্যেকের ষোলটি করে গুটি থাকে। প্রথমে একজন এক ঘর সামনে গুটি চাল দিয়ে খেলা শুরু করে। এরপর সুবিধামত আগেপিছে চাল দেয়। দুই পক্ষের খেলোয়াড়ই পরস্পরের ঘুঁটি মারতে পারে। এই খেলা শুরু হয় অনেকটা দাবা খেলার ঢং-এ। কেবল লাফ দিয়ে গুটি চালার সুযোগ এলে গুটি মারা পড়ে। গুটি মেরে একপক্ষের ঘর শূন্য অথবা তার চালের গতি রোধ করতে পারলে খেলার জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। এই খেলাকেই আধুনিক দাবার গ্রামীণ সংস্করণ বলা যায়। জেলার সব কটি গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ যুবকদের অবসর বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম এই খেলা। গ্রামের চন্ডী মন্ডপ, বটপাকুরের ছায়ায় বাঁধানো চাতালে কিংবা কোন যাত্রী বিশ্রামাগারের বসার আসনে, নদীর বাঁধের ধারে কিংবা কোন ব্রীজের পিলারের নির্জন কোণে দাগ কেটে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। মোগল-পাঠান ও ষোল গুটি খেলায় প্রচ্ছন্নভাবে যুদ্ধের কৌশল বা আক্রমণাত্মক ভঙ্গি থাকায়, ধৈর্য, সতর্কতা এবং কৌশলের প্রয়োজন হওয়ায় এই খেলাকে মোগল-পাঠান খেলা বলে। মোগল-পাঠানের যুদ্ধও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। যুদ্ধের শতক মোগল ও পাঠানের যুদ্ধের স্মৃতি আশ্রিত সময় থেকেই এই খেলার প্রচলন বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর "Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement" গ্রন্থে এই খেলার উল্লেখ করেছেন। শতাধিক বছর পূর্বেও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত এই খেলা

কোচবিহারের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকক্রীড়া, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কোচবিহারে মোঘল-পাঠান খেলার উৎস সম্পর্কে বলা যায় ''মহারাজা নরনারায়ণকে তৎকালীন কোচরাজ্যে পাঠানগণের সাহায্যকারী বলে অভিহিত করা হত। ১৫৮৭ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়। ১৫৭৬ খ্রীঃ পাঠানরাজ দায়ুদ খাঁর পতন হলে বঙ্গরাজ্য মোগল অধিকৃত হয়েছিল, কিন্তু ভুঁইয়া রাজারা এবং পাঠান স[illegible]গণ সহজে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি হন নি। ১৬০০ খ্রীঃ পর্যন্ত উড়িষ্যা এবং ঘোড়াঘাট প্রদেশ মোগল-পাঠান বিবাদে উচ্ছন্নপ্রায় হয়েছিল। এই বিবাদ অবলম্বনেই মোগল-পাঠান খেলার সৃষ্টি হয়েছে বলে কোচবিহারে প্রসিদ্ধি আছে।''[৯]

বাঘছাগল ঃ

জেলার অপর জনপ্রিয় বুদ্ধিমত্তা ও বিনোদনের খেলা হল বাঘছাগল খেলা। এ খেলায় এক পক্ষে কোন কোন গ্রামাঞ্চলে দুটি বাঘের প্রতীক হিসেবে দুটি বড় গুটি থাকে, অপর পক্ষে বাইশটি ছাগলের প্রতীক হিসেবে বাইশটি গুটি থাকে। আবার এই ক্ষেত্রে দুটি বাঘ বাইশটি ছাগলকে খাবে। মেখলিগঞ্জ ও মাথাভাঙ্গার গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় একটি বাঘের বিপরীতে ষোলটি ছাগল থাকবে। অর্থাৎ এখানে একটি বাঘ ষোলটি ছাগলকে খাবে। ছাগল চেষ্টা করবে বাঘের রাস্তা বন্ধ করতে। ''স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ছাগল বাঘকে ফান্দে ফালাবে।''[১০] একাদিক্রমে বাঘ যদি চারটি ছাগল খেয়ে ফেলে তখন ছাগল বাঘের পথ আটকাতে পারে না। এ খেলায় বাঘ ও ছাগলের মধ্যে কে জিতবে তা নির্ভর করে খেলোয়াড়ের উপস্থিত বুদ্ধি ও আক্রমণাত্মক কৌশলের উপর।

বাঘছাগল খেলার একটি ছক—
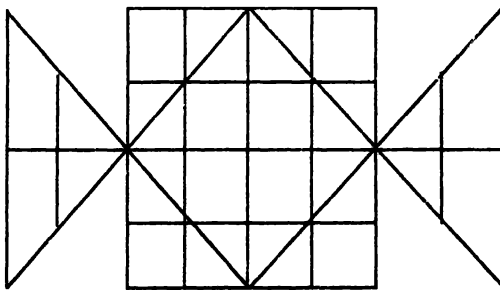
আটঘরিয়া ঃ

এ খেলার একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে দুই পক্ষের খেলোয়াড়ের দুই রকম গুটি থাকে। এক সঙ্গে দুই জনকে খেলতে হয়। খেলায় প্রতি পক্ষে চৌত্রিশটি করে গুটি থাকে। যে কেউ চাল দিয়ে খেলা শুরু করতে পারে। জেলার সর্বাধিক জনপ্রিয় ঘরে ও বাইরের কোর্ট বন্দি এই খেলায় সাধারণত গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কচুর ডগা (সাদা ও কালো), কিংবা নুড়ি পাথর। কোন

কোন গ্রামে তেঁতুল বিচি ও সুপারির প্রথম কোরক গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খেলার প্রথম পক্ষ চাল দেওয়ার পর দ্বিতীয় পক্ষ এমন ভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে চাল দেবে যাতে অপর পক্ষের একাধিক গুটি খাওয়া যায়। "এ খেলায় কোন পক্ষ ডিঙিয়ে বা টপকে একাধিক গুটি খেতে পাবে। এই ভাবে দুই পক্ষ একে অপরের গুটি খেতে খেতে যার হাতে গুটি কম থাকবে সে হেরে যাবে।"[১০] এ খেলায় মূল ছকের বা কোর্টের চারদিকে আটটি ঘর থাকার জন্য একে আটঘরিয়া খেলা বলা হয়। খেলার একটি নিয়ম হল— হাতে গুটি থাকা পর্যন্ত গুটি বসিয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে যদি খাওয়ার সুযোগ থাকে খেয়ে নেবে। আটঘরিয়া খেলা সাধারণত বাড়ির 'ডারিঘর' (বৈঠকখানা) . বটপাকুরের বাঁধানো চাতাল বা গাছের ছায়ায় অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির স্থানীয় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর কিশোর যুবকরাই অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এই খেলাকেই বেছে নেন বেশী।

আটঘরিয়া খেলার একটি ছক—
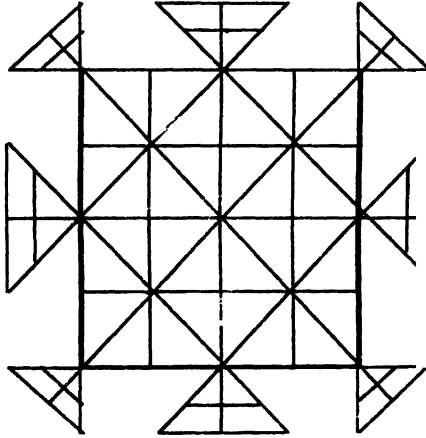
ঘু-ঘু-সই ঃ

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার গ্রামাঞ্চলের শিশুদের একটি বিনোদনমূলক খেলা হল ঘু-ঘু-সই । খেলায় শিশুগণ মুক্তাঙ্গণে গোল হয়ে বসবে। খেলার পরিচালকের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল প্রথমে সে মুঠো করে হাত দিয়ে ধরবে এবং তাকে অনুসরণ করে হাতে বুড়ো আঙ্গুল অন্যরাও সে ভাবে ধরবে। এ ভাবে সকলে ধরার পর পরিচালক ও অন্যরা গোটা শরীরটা দোলাতে থাকবে। এভাবে দোলানোর সময় শিশুরা যে ছড়াটি বলে তা হল—

"এলে ঘুঘু বেলে ঘুঘু সগল ঘুঘু চোর,
মাটিয়া ঘুঘু ডিমা পাড়ে নটর পটর।
নট করে নটুয়া ভইসের মটুয়া,

ভইসের তেলে বার বাতি জ্বলে।
জ্বলুক বাতি পুরুক তেল,
আমারটা পাকা বেল।"[১২]

এক্কা দোক্কা ঃ

কোচবিহারের সমগ্র গ্রামাঞ্চলের জনপ্রিয় মেয়েদের খেলা হল এক্কা দোক্কা। লোকসংস্কৃতিবিদ্ মহঃ আব্দুল হাই এই খেলার নাম দিয়েছেন 'সাত খোলা'। উত্তরবঙ্গের অনেক অঞ্চলের মত কোচবিহারেও অনেক গ্রামে এই নাম হল— এক্কা, দোক্কা, তেক্কা, চৌক্কা, পক্কা, লাঠি। এটিও জেলার অন্যতম স্থানান্তরিত খেলা। ভাঙা হাড়ি, কলসীর টুকরো, টালির টুকরো ইত্যাদিকে চারা, ঘুটি, চাকতি, ডিগ্গিল প্রভৃতি নামে বলা হয়। দলবদ্ধ ভাবে খেললেও প্রত্যেকের স্বার্থ ও দায়িত্ব তার নিজের। শুরুতে বাইরে থেকে একেকটি ঘরে চারা বা ডিগ্গিল ছুঁড়ে দিতে হয়। তার পর একপায়ে ভর করে ঘরের দাগ লাফ দিয়ে পেরিয়ে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ঠেলে সেই চারা বা গুটিকে বাইরে নিয়ে যেতে হয়। এটি সম্পূর্ণই মেয়েদের খেলা। অনেক গ্রামে মেয়েরা দম দেওয়ার মত কিৎ কিৎ বা কুৎ কুৎ শব্দ করে। খেলোয়াড় সতর্ক থাকেন চারা বা ডিগ্গিল ছোঁড়ার ব্যাপারে। এই খেলায় বিশ্রামের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে দুই পা একত্রে মাটিতে ফেললেই খেলোয়াড় আউট হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে চারা দাগের উপর থাকলেই আউট হয়। প্রথম খেলোয়াড় আউট হবার পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় খেলা শুরু করে। কোন খেলোয়াড় একা সব ঘর বাগে আনতে পারলেই সে জয়ী হয়। এ খেলায় শারীরিক ব্যায়াম যেমন হয় তেমনি এতে কোন ঝুঁকি নেই, প্রখর বুদ্ধি বা কৌশলের প্রয়োজন নেই। "মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীই পুরুষকে ঘর বাঁধার প্রেরণা দিয়েছে। ঘর দখল, ঘরকন্নায় নারীর সক্রিয় ভূমিকা আজও অটুট।"[১৩] এই খেলায় প্রাচীন সংস্কারের ও অভ্যাসের পরিচয় কোচবিহারের প্রায় সকল গ্রামেই দৃষ্ট হয়। "বাংলা তথা পূর্বভারতের প্রচলিত প্রধান ভূমিব্যবস্থার রূপটি আভাসে ইঙ্গিতে এক্কা দোক্কা লোকক্রীড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়।"[১৪]

কোচবিহারে প্রচলিত এক্কা দোক্কা খেলার ছকটি হল নিম্নরূপ—

৬	৬	লাঠি (ছক্কা)
৫	৫	পাক্কা
৪	৪	চৌক্কা
৩	৩	তেক্কা
২	২	দোক্কা
১	১	এক্কা

ইকির মিকির ঃ

দক্ষিণবঙ্গ ও বর্তমান বাংলাদেশের মত সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের একটি প্রচলিত এবং সর্বজন পরিচিত লৌকিক ছড়ার খেলা হল— 'ইকির মিকির'। ছোটবেলায় এই ছড়ার খেলা খেলে নি এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। শিশুমনের আনন্দ ও ঔৎসুক্যের অভিব্যক্তি ঘটে এই খেলায়। কোচবিহারে এই খেলার প্রাচীন ঐতিহ্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এটি অবিভক্ত বাংলার লৌকিক ক্রীড়া। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিনির্ভর লোকায়ত জীবনে, বিশেষ করে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রামীণ খেলায়। হিমালয়ের পার্বত্য এলাকায় ভারত ও নেপালের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মেচ নামক আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ইকির মিকির লোকক্রীড়াটি 'অচল বিচন গেলে নাই' নামে পরিচিত। এই ক্রীড়া পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ এক হলেও শুধু পার্থক্য এই যে তাঁরা খেলাটিকে লুকোচুরি খেলার শুরু হিসেবে ব্যবহার করেন। এই খেলার সাহায্যে তাঁরা চোর নির্বাচন করে একটি ছড়া বলে খেলা শুরু করেন। প্রচলিত এরূপ একটি ছড়া হল—

"অচোন বিচোন
গুমরি বিচোন
পথে লাগে চিরিং বিরিং
হাথ কাথ।"[১৫]

কোচবিহারে রাজবংশী সমাজে জনপ্রিয় এই খেলাটি 'হাতের পাতের' খেলা নামে পরিচিত। জেলার পাঁচটি মহকুমার গ্রামাঞ্চলের শিশুগণ তাই ইকির মিকির নামান্তরে হাতের পাতে খেলায় অভ্যস্ত। সেক্ষেত্রে ছড়ায় বলা হয় 'ইচোন বিচোন ধাবরি বিচোন'।

একই ছড়া কোচবিহারের হাতে পাতে খেলার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই—

'ইচন বিছন ধাবরী বিছন
গরু চড়াইতে পাইলাম বিছন
এলের পাত বেলের পাত
কাটকুট তোল হাত।" — কোচবিহার।

জলের ক্রীড়া ঃ

ওক্‌টুল-বক্‌টুল খেলা ঃ

এটি একটি মুক্তাঙ্গণ স্থলের খেলা হলেও কোচবিহারের অনেক গ্রামে এই খেলা জলেও অনুষ্ঠিত হয়। খেলার শুরুতে টস করে ওক্‌টুল বক্‌টুল কথাটি বলে খেলাটি শুরু হয়। স্থান ভেদে এই খেলাকে "ভৈল" খেলাও বলা হয়। জলের ক্ষেত্রে যিনি টসে জিতবেন তিনি বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে প্রশ্ন করবেন। যেমন— হাতের আঙ্গুল দেখিয়ে বলবেন— এটা কি? উত্তর আসবে—

আঙ্গুল। আবার প্রশ্ন আসবে— কাটলে কি বিরায় ? উত্তর আসবে— অক্ত। প্রশ্নকর্তা তখন 'মোর নাগাল ধরত' এই কথা বলে জলে ঝাঁপ দেয়। বিপক্ষ দলও তখন জলে নেমে তাকে খুঁজতে থাকে। প্রশ্নকর্তা ডুব সাঁতার দিয়ে অন্যত্র ভেসে ওঠে। এভাবেই চলে জলের মধ্যে ধরা ছোঁয়ার লুকোচুরি খেলা।

আবার যখন এই খেলা স্থলে অনুষ্ঠিত হয় তখন খেলোয়াড়গণ স্থলকে জল কল্পনা করে বাড়ির উঠোন বা খোলা মাঠে গোল হয়ে দাঁড়ায়। তারপর যিনি টসে জয়ী হন তিনি ওক্‌টুল বক্‌টুল ছড়া বলবেন। ছড়ার শেষ বাক্য যার কাছে গিয়ে থামবে তিনি হবেন চোর এবং এই চোরই খেলা শুরু করবে। এক ক্ষেত্র-সমীক্ষায় (জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার ছালাপাক গ্রামে) দেখা যায় পাঁচ, সাত, নয় জন করে এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। এ খেলায় চোর কাউকে ছুঁতে যাওয়ার সময় বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় যদি কোন কারণে দৌড়তে না পারে তবে তিনি হাঁটু গেড়ে পায়ের নীচ দিয়ে হাত দিয়ে কান ধরে বসে পড়েন। সে ক্ষেত্রে তাকে কেউ স্পর্শ করলেও সে আউট হবে না। ওক্‌টুল বক্‌টুল খেলায় উপস্থিত বুদ্ধি ও শত্রুপক্ষের আক্রমণ ও পলায়নের ভঙ্গি বেশী প্রকাশ পায়।

এই খেলার একটি প্রচলিত ছড়া হল— (যা খেলার আগে টসে নির্বাচিত খেলোয়াড় ছড়াটি বলে খেলা শুরু করেন)—

"ওক্‌টুল বক্‌টুল ফোটে
পানিয়ার ছাওয়ার দুল দুল কাপে
কাপা কাপি নিমের ঠাল
লাল লতা গোলাপ ফুল
আনতো বাপই হুকা টা
হুকাত কেনে কাই
সুটকা চোরার ভাই।"[১৬]

জলকুমির খেলা ঃ

বাঙালীর লোকজীবনে বাঘ ও কুমিরের বিড়ম্বনার কথা আজ সুবিদিত। নদীমাতৃক কোচবিহারে বনের বাঘের মতই কুমির নামক জলজন্তুটি এক সময় গ্রামবাসীদের আতঙ্কের সৃষ্টি করত। নদী পারাপারে, মৎস শিকারে, জলপথে বাণিজ্য ছাড়াও স্নান করার মত দৈনন্দিন কর্মে অনেক সময়ই বনের বাঘ ও জলের কুমিরের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এখনো জেলার সত্তর-উর্দ্ধ প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যে স্বচক্ষে বাঘ দেখার ও বাঘের গল্পের কথা মুখে মুখে ফেরে। কোচবিহারের লোকবিশ্বাস মতে স্থানীয় মানুষ বাঘকে স্ব-নামে উচ্চারণ না করে বলেন 'বুড়ার ব্যাটা'। বিশেষ করে রাত্রি বেলা অনেকেই সংস্কারবসে বাঘ নাম উচ্চারণ করেন না। আবার নদীপথ বা জল

ভূমিতে কুমিরের উপদ্রবের কথাও কম শোনা যায় না। কি ভাবে কুমির মানুষ শিকার করত তারই কৃত্রিম অভিনয় এই জলকুমির খেলায় দেখা যায়। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়েই আবিষ্কার হয়েছে এই খেলার। খেলাটির নামের মধ্যেই জলের কথা উল্লেখ থাকলেও স্থলকে জল কল্পনা করে স্থলেও এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ীর উন্মুক্ত উঠোন বা কোন মুক্তাঙ্গণই এই খেলার প্রকৃত স্থান। সেই ক্ষেত্রে বাড়ির বারান্দা বা উঠান জল ও ঘাটের কৃত্রিম পটভূমি তৈরী করে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। দলবদ্ধভাবে দশ বারোজন একত্রে এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। একজন কুমিরের ভূমিকায় থেকে অন্যদের স্নানের সময় আক্রমণ করাই এই খেলার আনন্দ। কৃত্রিম অভিনয়ে স্নান করতে নেমে অনেকে 'হাপুস হুপুস' শব্দও করে। অনেকে 'কুমির তোর জলে নেমেছি' বলে ছড়া কাটে। কুমির সুযোগ বুঝে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে সে কুমির হয়। তখন আগের কুমির ছাড়া পেয়ে ঘাটে ওঠে। জলকুমির খেলার এটাই নিয়ম। জলকুমির খেলায় ছেলে এবং মেয়ে বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরাই অংশগ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গেই বলা যায় জলকুমির খেলা স্থলে অনুষ্ঠিত হলেও নদীমাতৃক কোন কোন গ্রামে এই খেলা জলেও অনুষ্ঠিত হয়। তবে জলের খেলায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেরাই অংশগ্রহণ করে। জলে খেলার প্রথম শর্ত হল— প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই সাঁতার জানতেই হবে। এখানেও একজনকে কুমিরের ভূমিকায় সাঁতার দিয়ে স্নানার্থীদের আক্রমণই প্রধান লক্ষ্য। শরীর চর্চা বা ব্যায়ামের সুফল পাওয়া যায় একমাত্র জলে খেলাটি খেললে। অবসর বিনোদন ও আনন্দ উপভোগের চেয়েও আত্ম সচেতনতা ও আত্ম রক্ষার কৌশল রপ্ত করায় এই খেলার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নৌকা বাইচ খেলা ঃ

নদীপ্রধান কোচবিহারে একদিন প্রচন্ড জনপ্রিয় ছিল এই খেলা। যদিও এই খেলার একটি অন্যতম শর্ত ছিল সাঁতার জানা অর্থাৎ কেউ সাঁতার না জেনে এই খেলায় অংশগ্রহণ করবেন না। নদীর পাড়ে বাস করে বারো মাসের ভাবনা মাথায় নিয়ে নদী ও নৌকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়তে হয় জেলার নদী-সংলগ্ন গ্রাম ও গঞ্জের মানুষদের। বিশেষ করে রায়ডাক, কালজানি, গদাধর, তোর্ষা নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের খেলাধূলার মাধ্যমে আনন্দ দানে নৌকার ভূমিকাও কম নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রম, শক্তি, কৌশল ও সহিষ্ণুতার এই খেলা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। "তুফানগঞ্জ মহকুমার চৌকোশী বলরামপুর গ্রামে প্রতি বছর আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজার বিজয়া দশমীর পরদিন কালজানি নদীতে 'নৌকা বাইচ' উৎসব আজও অনুষ্ঠিত হয়।"[১] রায়ডাক নদীতে রথযাত্রার দিন তুফানগঞ্জ রানীরহাট বন্দরের পূর্বে একদিন এই খেলার প্রচলন ছিল। নৌকা বাইচকে এক অর্থে আনুষ্ঠানিক লোকপ্রিয় ক্রীড়াও বলা যায়। নৌকাভিত্তিক এই খেলার নাম স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে নৌকা বাইচ। পণ রেখে, বাজি ধরে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই খেলার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। নৌকার দাঁড় টানার কৌশলই এই খেলার বৈশিষ্ট্য। জেলার লুপ্তপ্রায় নৌকা বাইচ নামক এই লোকক্রীড়ায় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই অংশগ্রহণ

করেন। পূর্ববঙ্গের মত এখানেও নৌকা বাইচের সময় সারিগান করার চল আছে। মুসলিমগণ পীরের দোহাই দিয়ে অনেক সময় নৌকা চালান শুরু করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে "বাংলার রাজনীতির আকাশে ক্রমে সামন্ত যুগের অবসান হলে দাঁড় বাহিত নৌকার স্থলে বাষ্পচালিত রণতরীর আমদানি হলে পূর্বের এই প্রকার নৌকা বাহিনীর লোপ পায়। কিন্তু পূর্বের সেই আচার ও অভ্যাস নৌবাহিনী ছেড়ে জনগণের মধ্যে আশ্রয় লাভ করে নৌকা বাইচের মাধ্যমে বিরাজ করতে থাকে।"[১৮] তাই লোককবির ভাষায় আমরা বলতে পারি—

"জলে চলে ইষ্টিমার ভাই
কলে চলে রেল গাড়ী
হায় মরি কলের বাহাদুরী।"

জেলার পাঁচটি মহকুমার লোকায়ত জীবনের লৌকিক খেলাধূলার পর্যালোচনায় ও ক্ষেত্র-সমীক্ষায় কতগুলো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। যেমন— এক্কা দোক্কা, ইচন বিচন ও গোল্লাছুটের মত কিছু খেলা গণিত শিক্ষা ও ছড়া কাটার মাধ্যমে রীতিমত লোকশিক্ষার বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোচবিহার জেলায় প্রচলিত লোকক্রীড়াগুলিতে সমাজব্যবস্থার যেমন প্রতিফলন দেখা যায় তেমনি এই খেলাগুলিকে বলা যায় কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির প্রতীক। প্রচলিত লোকক্রীড়াগুলির উল্লেখযোগ্য অপর বৈশিষ্ট্য হল এখানে একই খেলা একেক অঞ্চলে যেমন— ডাংগুলি, চেমু, হা-ডু-ডু, ওক্‌টুল বক্‌টুলের একেক রূপ ও রীতিতে প্রচলিত। অঞ্চলভেদে লোকক্রীড়াগুলির ছড়ার শব্দ চয়ন ও পার্থক্য দেখা যায়। আবার নিয়মনীতিতে মাথাভাঙ্গার গোপালপুর গ্রামে চেমু বা হা-ডু-ডুর নিয়ম কানুন দিনহাটার বড় শাকদল গ্রামের কোন খেলোয়াড় মানতে রাজি নন। এক কথায় কোচবিহারের লোকক্রীড়ায় কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেই যা একাধারে লোকসংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জেলার লোকক্রীড়ার অবিচ্ছেদ্য অলঙ্কার হল এর ছড়াগুলি। যেমন— হা-ডু-ডু, ওক্‌টুল বক্‌টুল, ইচন বিচন, ডাংগুলি বা ডাভি খেলায় উচ্চারিত ছড়ার শব্দ চয়নকে আমরা আদিম সমাজের লক্ষণসম্পৃক্ত বলতে পারি। কোচবিহারে প্রচলিত লোকক্রীড়াগুলি কোন না কোন ভাবে জেলারই লোকজীবনের অভিব্যক্তি। কোচবিহারের প্রাচীন কালের প্রচলিত কিছু খেলাধূলা সম্পর্কে খান চৌধুরী আমানতউল্লা সাহেব তাঁর 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন— "প্রাচীন কালে জীবনযাত্রা নির্বাহ অপেক্ষাকৃত সুগম ছিল এবং সর্বসাধারণে লেখাপড়া বা শিক্ষার প্রতি ততটা গুরুত্ব অনুভব করতেন না। এই জন্য ছেলেদের দল সতেরো, আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত লুকোচুরি, চিলাচিলা, গুটুগুটু, হাটুক্‌ডুগ, চেঙ্গুপাইট, ভেটাপাইট, ডান্ডাপাইট, তেপাইতা এবং মোঘল-পাঠান প্রভৃতি খেলার মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করতেন।"[১৯] বর্তমানে অনেক প্রাচীন লৌকিক খেলাধূলা আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জমান।

তথ্য সূত্র

১। The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlements - Harendra Narayan Chowdhury, P-138 (1903)

২। বাংলার লোকসংস্কৃতি— ওয়াকিল আহমেদ, পৃ-৪৩১, ঢাকা বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ (১৯৭৪)।

৩। সাক্ষাৎকার ও ক্ষেত্র-সমীক্ষা— স্বপন রাভা, গ্রাম-ছাটরামপুর, তুফানগঞ্জ, তাং - ২৮/৬/৯৯ ইং।

৪। বাঙালীর খেলাধূলা— শঙ্কর সেনগুপ্ত, পৃ-৬৭ (১৯৭৬)।

৫। বাংলার লোকসংস্কৃতি— ওয়াকিল আহমেদ, পৃ-৪২৪, ঢাকা বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ (১৯৭৪)।

৬। সাক্ষাৎকার ও ক্ষেত্র-সমীক্ষা— মন্টু দাস, গ্রাম-ছালাপাক, তুফানগঞ্জ; স্বপন রাভা, গ্রাম-ছাটরামপুর, তুফানগঞ্জ, তাং ২৫/৬/৯৯ ইং।

৭। সাক্ষাৎকার— অনিল বর্মন, গ্রাম-ছালাপাক, তুফানগঞ্জ, তাং - ২৪/৬/৯৯ ইং।

৮। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার— দীনবন্ধু রায় ও জগদীশ রায়, গ্রাম-পয়ামারী, ব্লক-হলদিবাড়ী, তাং ২৫/৪/৯৮ ইং।

৯। কোচবিহারের ইতিহাস (প্রথম খন্ড)— খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ-১১৮, কোচবিহার স্টেট (১৯৩৬) পুঃ মুদ্রণ ১৯৯০ ইং।

১০। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার— মন্টু বর্মন, শ্রীদয় বর্মন, গ্রাম-বিলসী, তুফানগঞ্জ, তাং ২৫/৪/৯৯ ইং।

১১। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার— তারিণীকান্ত সরকার, গ্রাম-উত্তর অন্দরাণফুলবাড়ী, তুফানগঞ্জ, তাং ৭/৭/৯৯ ইং।

১২। প্রসঙ্গ : উত্তরবঙ্গ লোকসাহিত্য— ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, ১ম পর্ব, পৃ-৫৬ (১৩৮৮)।

১৩। বাংলার লোকসংস্কৃতি— ওয়াকিল আহমেদ, পৃ-৪৩৮, ঢাকা বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ (১৯৭৮)।

১৪। বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস— ড. অসীম দাস, পৃ-১২৬ (১৯৯১)।

১৫। বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস— ড. অসীম দাস, পৃ-১৩৬ (১৯৯১)।

১৬। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার— ধনেশ্বর বর্মন, গ্রাম-ছাট গেন্দুগুড়ি, তুফানগঞ্জ, তাং ৭/১/৯৮ ইং।

১৭। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (প্রথম খন্ড)— সম্পাদক-অশোক মিত্র, পৃ-১৬৭ (১৯৬৭)।

১৮। বাংলার লোকসাহিত্য (৩য় খন্ড)— ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ-৫৮৯ (১৯৭৩)।

১৯। কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খন্ড)— খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ-৫৮, কোচবিহার স্টেট (১৯৩৬), পুঃ মুদ্রণ ১৯৯০ ইং।

দশম পরিচ্ছেদ

বাংলার সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতিতে কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির দান

কোচবিহার জেলার লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধান, অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করছি এই জেলার লোকসংস্কৃতি-সমৃদ্ধ ঐতিহ্যপূর্ণ ভাণ্ডারটিকে। বলাবাহুল্য এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি বাংলার বৃহত্তর লোকসংস্কৃতিরই একটি অংশ। অংশ যেমন সমগ্রকে পূর্ণ করে ঠিক একই ভাবে এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির বিচিত্র ঐশ্বর্য বাংলার লোকসংস্কৃতি তথা সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

কোন অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির অনুশীলন করতে গেলে সেই অঞ্চলের বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিকাশের পশ্চাদপট আলোচনাও প্রাসঙ্গিক, কারণ জনসাধারণের লোকায়ত জীবনের সামগ্রিক কর্মকৃতি ও মানসগত প্রয়াসের ইতিহাসই লোকসংস্কৃতির ইতিহাস। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই পশ্চাদপট অনেকটাই আলোচিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের তুলনায় বাংলার লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধতর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সংক্ষেপে এর কারণ বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মিশ্র সাংস্কৃতিক মিশ্রণজনিত বৈচিত্র্য। কোচবিহার উত্তরবঙ্গের একটি জেলা। উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের বিশেষ প্রভেদ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চল কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও ছিল যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন, পাহাড় থেকে নেমে আসা অজস্র নদ-নদী এই অঞ্চলকে স্মরণাতীত কাল থেকে নিয়তই ভেঙেছে গড়েছে। গভীর জঙ্গলে ঘেরা বিচিত্র জনজাতির আবাস ছিল এই উত্তরবঙ্গ। স্বভাবতই তুলনামূলকভাবে উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অপেক্ষাকৃত ভিন্নধর্মী। আজও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটা পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও এই অতীত স্মৃতি লোকজীবনের পরতে পরতে লগ্ন হয়ে আছে।

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জনজাতির ও তফসিলী জাতির জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোচবিহারে তফসিলী জাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। কোচবিহার উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক লৌকিক ঐতিহ্য থেকে আলাদা নয়।

আমাদের আলোচনার প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কোচবিহারের একটি আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। এখানে যে জিনিসটি বলবার অপেক্ষা

রাখে তা হল— আজকের উত্তরবঙ্গের তথা কোচবিহারের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার চিরদিন সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয় নি। যুগে যুগে নূতন জাতি-উপজাতি নদীর স্রোতের মতই এই অঞ্চলের উপর দিয়েই বয়ে গেছে। সুতরাং আজকের কোচবিহারের সংস্কৃতি এই সমষ্টিরই প্রতিচ্ছবি। আমাদের আলোচনায় যে জনসমাজের মধ্য থেকে আমরা উপাদান সংগ্রহ করেছি তার একটি বড় অংশই রাজবংশী সম্প্রদায়। ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন কোচ-মেচ প্রভৃতি উপজাতি খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতকে উত্তরবঙ্গে এসে বসবাস শুরু করেন। এরা বৃহত্তর বোরো জাতিরই শাখা-প্রশাখা। পণ্ডিতরা মনে করেন যে কোচ-মেচ, পালিয়া, নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে রাজবংশীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। রাজবংশী নামটিও পরবর্তী কালের। কোচ রাজাদের আনুকূল্যে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আগমন ঘটে। মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালে শ্রীমৎ শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রচার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোচগণ রাজবংশী নামে এক হিন্দু জাতিতে পরিণত হন। এই যে বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ের স্রোতধারা একসময় প্রবাহিত হয়েছিল তারই পদচিহ্ন আমরা লক্ষ্য করি কোচবিহারের লোকসংস্কৃতিতে। এরই সঙ্গে এসে মিশেছে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুগণ, রাভাদের মত ছোট জনজাতির মানুষগণ। একদিকে সদাজাগ্রত ও ক্রিয়াশীল জনসমাজ, অন্যদিকে ভয়াল সুন্দর প্রকৃতি, বিচিত্র মিশ্র সংস্কৃতি এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোকসংস্কৃতির পশ্চাদপট তৈরী করেছে এই জেলায়। স্বভাবতই এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বাংলার অন্য অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিপ্রেমী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছে।

প্রথমেই এই জেলার লোকগীতি ভাওয়াইয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গানের সুরমাধুর্য ও উপস্থাপিত বক্তব্য অনবদ্য সাহিত্যিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। পশ্চিমবঙ্গের লোকসঙ্গীতগুলির মধ্যে ভাওয়াইয়াকে শিরঃভূষণ বলা যেতে পারে। মানুষের চিরন্তন দুঃখ বেদনার রূপকার এই লোকগীতির সৃজনকর্তাগণ। এছাড়াও আছে জাগ গান, চারযুগের গান, গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গান যা একান্তভাবেই এই অঞ্চলের নিজস্ব বলে দাবি করা যায়। গোপীচন্দ্রের দীর্ঘ বনবাস যাত্রার কাহিনী নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা মনে করিয়ে দেয়। সমালোচকগণ গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গানকে সুপ্রাচীন বলে উল্লেখ করেছেন। স্থানীয় বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস উঠে এসেছে এই লোকসঙ্গীতের আঙিনায়।

বাংলার লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে এই অঞ্চলের ব্রত, ব্রতের গানগুলি অবশ্যই বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এই ব্রতের গানগুলিকে ছোট ছোট একাঙ্ক নাটক বললেও ভুল হয় না। রাজবংশী সমাজের বিষহরী পূজার অনুষঙ্গে বা আলাদাভাবে যাইটল ব্রতের প্রচলন এখানে আছে। এই ব্রতে কাগজ ও শোলার মঞ্জুষা তৈরী করা হয়। এরপর ব্রতের প্রতিটি অঙ্গ নিয়ে রয়েছে গান— যা আসলে কামনা-বাসনার আর্তি। এছাড়াও সুবচনী ব্রত, কাতিপূজার ব্রত, মেছেনী ব্রত, হুদুম দেও ব্রত, কাত্যায়নী ব্রত উল্লেখযোগ্য।

হুদুম দেও বাংলার লোকসংস্কৃতিতে একটি বিরল সংযোজন। আমাদের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হবে কোচবিহারের ব্রত তার বর্ণবহুল স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাংলার ব্রতকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত কোচবিহারেও স্থানীয় লৌকিক দেব-দেবীর প্রাধান্য লক্ষণীয়, কোচবিহারের গ্রামে এখনও তেমন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে নি, এখনও সেখানে মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার অনুসারী স্থানীয় লৌকিক দেব-দেবীর অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত। মাসান, জুড়াবান্ধা, ঢেলঠাকুর, ডাংধরা দেবতা, চরকাটাকুয়া, যখাযখি, সাতবইনী, বুড়াঠাকুর, গেরামঠাকুর, জ্বরাসুর, বুড়াঢেল্লা এবং আরও অনেক লৌকিক দেব-দেবী কোচবিহারের গ্রামের মানুষের নিত্য সেবা পেয়ে আসছে। স্বভাবতই আমাদের আলোচনা এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ হয়েছে। বাংলার লৌকিক দেব-দেবীর সঙ্গে এখানকার লৌকিক দেব-দেবীর এই পরিচয় নিরর্থক নয়।

কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানকার লোকনাটক। পশ্চিমবঙ্গে অন্যত্র লোকনাটকগুলি ব্যাপক পরিবর্তনের প্রভাবে অবিকৃত থাকে নি। কিন্তু কোচবিহারের লোকনাটকের ক্ষেত্রে একথা বলা যায় যে এগুলি অধিকতর মৌলিক। এগুলিতে পরিবর্তনের স্পর্শ খুবই সামান্য। দিনাজপুরের 'খন' ও মালদহের 'গম্ভীরা'র মত প্রাত্যহিকের দিনলিপি এরা নয়। কোচবিহারের লোকনাটকগুলির মধ্যে সুদূর অতীতের পদধ্বনি আমরা শুনতে পাই। এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা বাংলার লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবে বলে আশা করি।

আমাদের আলোচনায় কোচবিহারের লোকাচার, লোকবিশ্বাস ও লোকপুরাণের প্রসঙ্গ ও এসেছে। এর পূর্বে এ বিষয়ে কোন আলোচনা আমরা লক্ষ্য করি নি। স্বভাবতই বাংলার লোকসংস্কৃতির এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে আমাদের ক্ষেত্রানুসন্ধানলব্ধ তথ্য কাজে আসবে। কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলের কথ্য লোকভাষার প্রসঙ্গও এসেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে "কামরূপী উপভাষা" বলা হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে এর একটি স্থানীয় চেহারা অঞ্চলভেদে বিভিন্নতাসহ লক্ষ্য করা যায়।

এখানকার এই লোকমুখের ভাষা অত্যন্ত সজীব ও সচল। এমন সচলতা বাংলার অন্য কোন জেলার লোকভাষায় লক্ষ্য করা যায় কি না সন্দেহ। লোকভাষা হচ্ছে লোকসংস্কৃতির হৃদয় অথবা বিস্তৃত ক্যানভাস। এর উদার আকাশেই লোকসংস্কৃতির বিচিত্র নক্ষত্ররাজি দীপ্তি পায়।

আমাদের সংগৃহীত বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির আঙ্গিক প্রসঙ্গে এই লোকায়ত ভাষা মূল সুরের মতই বার বার ফিরে এসেছে। বেশীরভাগ উদ্ধৃতি এই কথ্য ভাষাতেই গৃহীত হয়েছে, বাংলার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষার এই ঐশ্বর্য নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

দীর্ঘ সময় ধরে অনুসন্ধান, অনুশীলন, ক্ষেত্র-সমীক্ষা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আমরা জেনেছি এই অঞ্চলের বিচিত্র মৌখিক সাহিত্যের নমুনা, খাদ্যাভ্যাস, বিচিত্র লৌকিক খেলাধূলা, জনপ্রিয় লোককথা ইত্যাদি। সমস্ত গবেষণা নিবন্ধটি জুড়ে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাই বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছি। দীর্ঘ শ্রমের মূল্যে আমরা এই জেলার লোকসংস্কৃতির একটি মানচিত্র রচনা করেছি। সব সময় মনে হয়েছে সমুদ্রের নির্দিষ্ট একটি সীমানা আছে কিন্তু জনমানসের বিচিত্র জীবনচর্যার কূল কোথাও নেই। বক্তব্যকে যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল করার চেষ্টা হয়েছে। অনেক অনালোচিত বিষয় আমরা আলোচনার আঙিনায় নিয়ে এসেছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের অগোচরে বেশ কিছু জিনিস হয়ত থেকেই গেল। পরবর্তী সময়ে কোনো পরিশ্রমী লোকসংস্কৃতিপ্রেমী গবেষক সেই সব অনালোচিত বিষয় আলোকিত করে তুলবেন— এই আশা ব্যক্ত করছি।

শ্রদ্ধেয় লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর "বাংলার লোকসংস্কৃতি" গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শেষাংশে আক্ষেপের সুরে বলেছেন— "কৃষক সমাজের জীবন যাত্রার পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। ইতিপূর্বে তারা দীর্ঘকালব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করত ----- কিন্তু তার পরিবর্তে এখন তারা চলচ্চিত্রের মতন স্বল্পকালস্থায়ী এবং আগে থেকে তৈরী করা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী।"

কিন্তু কোচবিহারের গ্রামীণ মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের আক্ষেপ করার সময় এখনও আসে নি। এখানকার গ্রামীণ জীবনযাত্রা এখনও অনগ্রসর, অনেকটাই মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার বশবর্তী। এই অনগ্রসর মানসিক পটভূমিতে কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি এখনও চলমান জীবনের সঙ্গী। বাংলার লোকসংস্কৃতিতে এই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ও অবদান নিয়ে কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক আজও বহমান। আশা করব কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির এই আন্তরিক পরিচয় যা আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধের বিষয়বস্তু তা বাংলার লোকসংস্কৃতির জগৎকে সামান্য হলেও সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করবে।

পরিশিষ্ট — ক

খাদ্যাভাস

খান চৌধুরী আমানতুল্লা সাহেব "কোচবিহারের ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন, "ভাত এদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য। এ ছাড়াও ভাতের বিকল্প হিসেবে কাউন, চিনার, পায়রার গুড়া বা যবের ছাতু খাওয়ার প্রচলন ছিল।" ভাজা চালের ছাতু নিম্ন এবং সম্পন্ন অধিক পরিবার খেতেন। প্রাচীনকালে এবং বর্তমানেও কোচবিহারে সরষের তেল এবং মোষের ঘিয়ের সুনাম নেই, তেমন প্রাচুর্যও নেই। একদিন কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে লবণ সহজপ্রাপ্য না হলেও কলাগাছের বাকল পুড়িয়ে লবণের বিকল্প হিসেবে ক্ষার ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

কোচবিহারের লোকজীবনে বিশেষ করে স্থানীয় সমাজে শুধু অতিথি আপ্যায়নেই নয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, লোকউৎসব বা মেলা বিশেষ করে স্নান মেলায় তর্পণের পর কাঁচা দুধের দই ও চিড়া, আঁটিয়া (বীচি) কলা ব্যবহারের প্রাচীন ঐতিহ্য আজও সমানভাবে প্রচলিত। উল্লেখ করা যায় দুধের চেয়ে গরু ও মোষের দইয়ের প্রতি বেশী আকর্ষণ আজও আছে এখানে। দই চিড়া ও আঁটিয়া কলা কোচবিহারের দেব-দেবীর পূজার অর্ঘ্য হিসেবে আজও ব্যবহৃত হয়।

কোচবিহারে স্থানীয় লোকায়ত কৃষ্টি, বিশ্বাস ও ঐতিহ্য অনুযায়ী ৩টি জনপ্রিয় খাদ্য হল— শীদল, ছগকা, পেলকা।

পরিশিষ্ট — খ

মৌখিক সাহিত্যের নমুনা

বাংলা ১৩০৪ সনে কোচবিহারের ভূমিকম্পের বর্ণনা দিয়ে প্রাকৃতিক পট পরিবর্তন ও সঙ্গে মানুষের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে চাওডাঙ্গা গ্রামের লোককবি কালুরাম অধিকারী এই **হেটো কবিতাটি** লেখেন—

"ঝে ছিল মস্তকের উপর / সে হইল পরজার
সাক্ষী তাব অট্টালিকা সে ছিল ভাই উপরে
ভূমিকম্পে ভগ্ন হইয়া সড়কে গুড়া করে।
ছিল লাখ টাকার মাল সে হইল পয়মাল
এইরূপ মানুষের দশা হবে শেষ কালে।
শুন ভাই সেই দিন শনিবারে শনি লাইগাছিল
ডোডেয়ার ভর হাটোতে প্রমাদ ঘটিল।
হাটের হাটুয়া যত পুরুষ নারী।
জিনিস বস্তু ছাড়িনা সবে দোরী গেইছেন বাড়ী।।"

কোচবিহারে প্রচলিত **'সতী বেহুলা'** পালা গানে কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খাদ্যাভ্যাসের একটি অপূর্ব বর্ণনা আছে—

"ডিমার তরকারী রান্দিছে ঢোল মানকচু দিয়া।
অম্বল রান্দিয়া থুইছে শুকাতি মিশাইয়া।।
খেসারীর ডাইলোত দিচে শুকটার ফোরণ
পায়েস রান্দিচে দিয়া করকচ লবণ।।
সরবতে মিশিয়া দিচে সিদলের রস।
বিয়াই খাইয়া কত করিবে সুযশ।।
ট্যাংয়া দইয়ে কটকটা চুড়া।
আটিয়া কলার বিচি খাবে চাঁদ বুড়া।।"

খেতাওড়া মাসানের মন্ত্র—

"এস কালী বস চালে কথা কও কর্ণমূলে
কর্ণের কথা কর্ণে কও যত মিথা মনে খাবি
করম করম ধরম ধরম মাতালি পর্বত চালং
নরং লোকের নাম চালং মরা বর্তা মাসান
মাসান চালং মোর আসন কাটিয়া যাবু
এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পিরপরগমের মাথা খাবু।"
(ওঝা—ফুলেশ্বরী রায়, ত্রিমোহিনী, দিনহাটা, তাং-৫/১২/৯৯ ইং।)

নৌকাবাইচ উপলক্ষ্যে গীত (একটি সারিগান)—

"অল্প বয়সে খইস্যা পড়ল রাজার গলার মতিহার
বসন্ত কালরে আমার।।
যখন ও জন্মিল কইন্যা কর্ণ রাজার ঘরেরে
বসন্ত কালরে আমার।।
নয় বছরের কইন্যা দশ নাহি পুরে রে
বসন্ত কালরে আমার।।
নালিশও জানাইল কইন্যা বাপের হুজুরে
বসন্ত কালরে আমার।।"

ভান্ডানী পূজার গান —

"ও ভান্ডানী মা ও তোক ভক্তি বারে বার
ধ্বংস করেক কলির অসুর সহ্য হয় না আর
ভান্ডানী মা।
ও ভান্ডানী মা - - - - - - - - ভান্ডানী মা।।
দুর্যোধন দুঃশাসন মা আছে এ্যালাও দ্যাশে
ওমা আছে এ্যালাও দ্যাশে (২)
ওরে দ্রৌপদীরও বস্ত্রহরণ হচ্ছে পথে ঘাটে ভান্ডানী মা।
ও তোক ভক্তি বারে বার ধ্বংস করেক কলির অসুর
সহ্য হয় না আর
ভান্ডানী মা।
ও ভান্ডানী মা - - - - - - - ও ভান্ডানী মা।

জটিলা কুটিলা ও ভান্ডানী মা আছে এলাও ঘরে।
ও মা আছে এলাও ঘরে (২)
আর চক্ষু মেলি না দেখিস্ মা
আমার গুলার ভীতি ভান্ডানী মা।
ওরে তোক ভক্তি বারে বার ধ্বংস করেক কলির অসুর
সহ্য হয় না আর ভান্ডানী মা।
ও ভান্ডানী মা ও তোক -------- ভান্ডানী মা।।"

বিয়ের আংটি খেলার ছড়া —

আংটি না বাংটি
সড়া মাছক ঘুংটি
সরসরায় না মরমরায়
ডোমনা বেটা কোন্টে নুকাইল
করে কাউয়া কারটে।

এতদঞ্চলে বিবাহিত রমণীরা স্বামীর নাম উচ্চারণ না করেও ছড়ার মাধ্যমে বুঝিয়ে থাকেন। নিম্নোক্ত ছড়াটি তার দৃষ্টান্ত —

" তিন তেরো মইধ্যে বারো
নয় দিয়া তাক পুরণ কর
মোর সোয়ামীর এই নাম
পার করি দেও বাড়ী যাং।"

(স্বামীর নাম যাটি বা ষাইট)

ঘুম পাড়ানী ছড়া —

"আয় নিন (চান) আয়
আমার সোনা বাচ্চা বাপই
নিন যাবার চায়।"

কার্তিক মাসে ধানকে **হোন্দা খাওয়ানো** (গর্ভধারণের সময়) প্রচলিত ছড়া—

"আশ্বিন যায় কার্তিক আসে
আমার ধান ঘরে বসে।

ধান রে ধান হোন্দা খা
নাইচ্যা নাইচ্যা বাড়ী যা
ধান আমার গড়ের পাত
শিশু শিক্ষা আড়াই হাত।"

বর্ষাকালে ব্যাঙের ডাক শুনে কোচবিহারের গ্রামের শিশু যুবকরা ব্যাঙকে ব্যঙ্গ করে ব্যাঙের ডাকের অনুকরণে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে হাত দিয়ে নাক টিপে ধরে প্রচলিত এই **ছড়াটি** বলে—

"ঘ্যাং - ঘোং
গিরির ঘরের গাইটা
ঘাটাত বান্দিছে
প্যাটোতে পারাইছে
ভুরিটা বিরাইছে
ঘ্যাং - ঘোং।"

(কথক ঃ মন্টু বর্মা, গ্রাম — শিকারপুর, মাথাভাঙ্গা, তাং - ১০/৬/৯৯ ইং।)

এক সময় ব্যাঙ ধরে বিক্রির রেওয়াজ ছিল এখানে। সে সময় যারা ছোকা দিয়ে - হাতে লাঠি ও আলো নিয়ে রাতের বেলায় ব্যাঙ ধরতে বেরোতেন, সে সময় ব্যাঙের করুণ আর্তনাদকে অনুকরণ করে তাঁরা গান বেঁধে ছিলেন। যেমন—

"ব্যাঙে কয় মৈল্লং বাবা
হুর আসিল ছোকা ছাবা
হাতত লাঠি ঘারত ঝোলা
এ্যালা বুঝি জান বাচে না।"

(কথক ঃ মন্টু বর্মা, গ্রাম - শিকারপুর, মাথাভাঙ্গা, তাং ১০/৬/৯৯ ইং।)

পরিশিষ্ট — গ

লোকবাদ্য

লোকজীবনের সঙ্গে লোকবাদ্য যন্ত্রের একটি বিশেষ যোগ আছে। লোকবাদ্য যন্ত্রকে আমরা বস্তুধর্মী লোকসংস্কৃতির উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই বাদ্যযন্ত্রের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য আজও স্থানীয় লোকসংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রচলিত লোকবাদ্য যন্ত্রগুলির উপর নির্ভর করেই অসংখ্য লোকগীতি, লোকনাটক, লোকনৃত্য আজও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে স্থানীয় বহু লৌকিক অনুষ্ঠানে।

কোচবিহারে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য প্রাচীন লোকবাদ্য যন্ত্রগুলি হল— দোতরা, সারিন্দা, বেনা, ঢাক, ঢোল, বাঁশি, করকা, সানাই ইত্যাদি। জেলার বহু লৌকিক অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বণে বিশিষ্ট কয়েকটি লোকবাদ্যের ব্যবহার আজও সবার দৃষ্টি আর্কষণ করে, যেমন— লোকনাটক কুষাণের ক্ষেত্রে ব্যানা, দোতরা, পালাগানে দোতরা, মনঃশিক্ষার গানে সারিন্দা, বিষহরি পালাগানে মোখা বাঁশি, ষাইটল, হুদুম, মাসান পূজা ও কাতি নাচের ক্ষেত্রে ঢাক অপরিহার্য। কোচবিহারে প্রচলিত লোকবাদ্যগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রামীণ মানুষজন সহজলভ্য স্থানীয় উপকরণ দিয়ে এগুলি তৈরী করেন। বিশেষ করে বাঁশ ও কাঠ এর প্রধান উপকরণ।

কোচবিহারে রাভা উপজাতি সম্প্রদায়ের নৃত্য ও গীতে স্থানীয় উপকরণে নিজস্ব তৈরী লৌকিক বাদ্যযন্ত্রগুলি হল বাকক্ডিং বা ডিং ডং। এটি বিশেষ ধরনের বাঁশ দিয়ে তৈরী। ফালবাইশা বা কালবাইশা— এটি হচ্ছে চিকন বাঁশের নলের মত দেখতে। অনেক ক্ষেত্রে চার-পাঁচ হাত লম্বা। বিশেষ কায়দায় এটি বাজালে শব্দ হয় পুপু, উউ। কোচাহেম বা বিংশি— ঢাক ও ঢোলের মত ছোট আকারের বাদ্যযন্ত্রও এই সম্প্রদায় ব্যবহার করেন। কোচবিহারে ব্যবহৃত লোকবাদ্য যন্ত্রগুলি হল দোতরা, সারিন্দা, ব্যানা, ঢাক, ঢোল, বাঁশি, গোপিযন্ত্র।

পরিশিষ্ট — ঘ

জনপ্রিয় মেলার সারণী

(১) কোচবিহারের নদীভিত্তিক স্নান মেলা

ক্রমিক সংখ্যা	পূজাউৎসব ও মেলা	জেলা	মহকুমা / ব্লক	গ্রাম / স্থান	মাস / তিথি	নদী	স্থিতিকাল
১.	গঙ্গা পূজা	কোচবিহার	তুফানগঞ্জ	সাহেববাড়ী ঘাট	বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়া	গদাধর	১ দিন
২.	স্নান মেলা	”	”	পলিকা গ্রাম	মাঘী পূর্ণিমা	স্থানীয় পুকুর পোয়াতীবিল	১ দিন
৩.	”	”	”	পানিশালা নাটাবাড়ী	চৈত্র, অশোকাষ্টমী	গদাধর/ কালজানী	৩ দিন
৪.	”	”	”	ঘোগার কুঠি/ দড়িয়া বলাই	”	গদাধর	৩ দিন
৫.	”	”	”	দ্বীপর পার	চৈত্র মাস	রায়ডাক	১ দিন
৬.	গঙ্গাপূজা	”	”	উল্লার খেওয়া ঘাট	জ্যৈষ্ঠ	”	১ দিন
৭.	স্নান মেলা	”	”	ছান ফলা ব্রীজ	মাঘী পূর্ণিমা	খোড়া নদী	১ দিন
৮.	”	”	সদর	কালিঘাট	অশোকাষ্টমী	তোর্ষা	১ দিন
৯.	”	”	মাথাভাঙ্গা	বোচাগাড়ী	চৈত্র, অশোকাষ্টমী	তিস্তা	১ দিন
১০.	বারুণী স্নান	”	”	ভোমরাগুড়ি	”	”	১ দিন
১১.	স্নান মেলা	”	”	বোচাগাড়ী	”	উত্তর বাহিনী	১ দিন
১২.	”	”	”	পচাগড়, ভেরভেরী মানাবাড়ী মৌজা	”	মানসাই সুটুঙ্গার সঙ্গমস্থল	১ দিন
১৩.	অষ্টমী স্নান মেলা	”	দিনহাটা	রুয়ের কুঠি	”	বানিয়াদহ	১ দিন
১৪.	”	”	”	নিগমনগর	”	”	১ দিন
১৫.	বারুণী স্নান মেলা	”	সিতাই ব্লক	দেওঘাটা	চৈত্র	জলঢাকা	১ দিন
১৬.	”	”	”	”	”	পুকুর	১ দিন
১৭.	বারুণী স্নান মেলা	”	শিতলকুচি/ মাথাভাঙ্গা	মহিষমারী	”	ধরলা	১ দিন

ক্রমিক সংখ্যা	পূজাউৎসব ও মেলা	জেলা	মহকুমা / ব্লক	গ্রাম / স্থান	মাস / তিথি	নদী	স্থিতিকাল
১৮.	”	”	”	কুর্শামারী	”	”	১ দিন
১৯.	শকুনিয়া ছিলান মেলা	”	মেখলিগঞ্জ	ফুলকাডাবড়ি কাশিয়াবাড়ী	চৈত্র ,অশোকাষ্টমী	তিস্তা	১ দিন
২০.	বারুণী স্নান	”	”	জামালদহ	চৈত্র	সুটুঙ্গা	১ দিন
২১.	স্নান মেলা	”	সদর	খাগড়াবাড়ী	ফাল্গুন / চৈত্র	তোর্ষা	১ দিন
২২.	”	”	তুফানগঞ্জ	জোড়াই	”	জোড়াই নদী	১ দিন
২৩.	ভাতখাওয়া অষ্টমী মেলা	”	”	নাগরুরহাট	”	রায়ডাক	১ দিন

(২) উল্লেখযোগ্য পূজা-পার্বণ ও উৎসবভিত্তিক মেলা

ক্রমিক সংখ্যা	পূজাউৎসব ও মেলার উপলক্ষ্য	জেলা	মহকুমা	গ্রাম / ব্লক	মাস / তিথি	স্থিতিকাল
১.	মদনমোহন রাস যাত্রার মেলা	কোচবিহার	সদর	সদর	অগ্রহায়ণ রাস পূর্ণিমা	১৫ দিন
২.	শিব / মহাদেব	”	”	বাণেশ্বর	শিব চতুর্দশী	২ দিন
৩.	শংকরদেবের তিথি	”	”	মধুপুর ধাম	মাঘ শুক্লাপঞ্চমী তিথি	৩ দিন
৪	দুর্গাপূজা	”	”	শিবপুর গ্রাম	আশ্বিন	৪ দিন
৫	রাস, কালী, দোল, শিব চতুর্দশী	”	”	মাঘপালা	আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ	গড়ে ৭ দিন
৬	দুর্গাপূজা	”	”	নিশিগঞ্জ, ফলিমারি	আশ্বিন	৭ দিন
৭	দোল	”	”	হলদিমোহন চিলকির হাট	ফাল্গুন	১ দিন
৮.	পঞ্চমদোল	”	”	চড়কের কুঠি	”	১ দিন
৯.	শিবরাত্রি	”	”	ধলুয়াবাড়ী	ফাল্গুন শিব রাত্রি	৩ দিন
১০.	মহরম উৎসব	”	”	গুদাম মহারাণীগঞ্জ	কার্তিক	১ দিন
১১.	দুর্গাপূজা	”	”	চাতরা চেকাডেবা	আশ্বিন	৪ দিন
১২.	”	”	”	ধুমপুর বালাসী	”	৪ দিন
১৩	দোলযাত্রা	”	”	গোপালপুর	ফাল্গুন	১ দিন
১৪.	দুর্গাপূজা	”	”	ভূড়মারী	আশ্বিন	৪ দিন
১৫	”	”	”	বোকালির মঠ	”	৪ দিন
১৬.	জগদ্ধাত্রীপূজা	”	”	খোলটা	অগ্রহায়ণ	৫ দিন

ক্রমিক সংখ্যা	পূজাউৎসব ও মেলার উপলক্ষ্য	জেলা	মহকুমা	গ্রাম / ব্লক	মাস / তিথি	স্থিতিকাল
১৭	দুর্গাপূজা	,,	,,	চন্দন-চৌড়া	আশ্বিন	৫ দিন
১৮	,,	,,	,,	পুন্ডিবাড়ী	,,	৪ দিন
১৯	দোলপূর্ণিমা	,,	,,	অঙ্গারকাটা	ফাল্গুন পূর্ণিমা	৫ দিন
২০	রথ যাত্রা	,,	,,	শহর	আষাঢ়	১ দিন
২১	মহরমের খেলা	,,	,,	গুদামমহারাণীগঞ্জ	মহরম	১ দিন
২২	মদনমোহন	,,	তুফানগঞ্জ	তুফানগঞ্জ	ফাল্গুন দোলপূর্ণিমা	১৫ দিন
	গোপীবল্লভ			পৌর এলাকা		
২৩	বাইচমেলা	কোচবিহার	তুফানগঞ্জ	চৌকশীবলরামপুর	আশ্বিন, বিজয়া	১ দিন
২৪	মহরম	,,	,,	বালাভূত	আশ্বিন	১ দিন
২৫	রাসযাত্রা	,,	,,	কালীবাড়ী	কার্তিক, রাসপূর্ণিমা	১ দিন
২৬.	,,	,,	,,	ভান্ডিজালাস	রাসপূর্ণিমা	১৫ দিন
				হরির হাট		
২৭.	,,	,,	,,	জোড়াই	,,	১৫ দিন
২৮	শিবরাত্রি	,,	,,	ছোট মহাদেব ধাম	শিবচতুর্দশী	৩ দিন
				নাককাটিগাছ		
২৯	১২হাত কালী	,,	,,	শালভাঙ্গা	চৈত্র শুক্লাষ্টমী	১৫ দিন
৩০	জগদ্ধাত্রীপূজা	,,	,,	বালাকুঠি	অগ্রহায়ণ	৭ দিন
৩১	দুর্গাপূজা	.	,,	বক্সির হাট	আশ্বিন	৪ দিন
	মিলন মেলা					
৩২	রাধাচক্র	,,	,,	কামাতফুলবাড়ী	বৈশাখ,	১ দিন
					১ম মঙ্গলবার	
৩৩	দোলযাত্রা	,,	,,	রামপুর	ফাল্গুন	৩ দিন
৩৪	রথ যাত্রা	,,	,,	তুফানগঞ্জ পৌরএলাকা	আষাঢ়	১ দিন
৩৫	দুর্গাপূজা	,,	দিনহাটা	প বড়ভাঙ্গা	আশ্বিন	৪ দিন
৩৬.	কালীপূজা	,,	,,	ভে'বাস	কার্তিক	২ দিন
৩৭	দুর্গাপূজা	,,	,,	নাগরের বাড়ী	আশ্বিন	৪ দিন
৩৮	,,	,,	,,	২য় খন্ড সিতারেরকুঠি	,,	৪ দিন
৩৯.	জগদ্ধাত্রী	,,	,,	বোরোভাঙ্গা	অগ্রহায়ণ	২ দিন
৪০	জগদ্ধাত্রী, রাস,	.	,,	কইমের কুঠি	আ কা অগ্রহায়ণ	৭ দিন
	দুর্গাপূজা					
৪১.	দুর্গাপূজা	,,	,,	বেলবাড়ী বাজার	আশ্বিন	১ দিন
৪২.	দোলযাত্রা	,,	,,	শালমারা	ফাল্গুন	১ দিন
৪৩	দুর্গাপূজা		,,	বড়গাদালকোড়	আশ্বিন	৪ দিন

ক্রমিক সংখ্যা	পূজাউৎসব ও মেলার উপলক্ষ্য	জেলা	মহকুমা	গ্রাম / ব্লক	মাস / তিথি	স্থিতিকাল
৪৪	”	”	”	খট্টিমারী	”	৪ দিন
৪৫.	বাসন্তীপূজা	”	”	সিঙ্গিমারী	চৈত্র	৩ দিন
৪৬.	সন্ন্যাসীঠাকুরের পূজা	”	”	শিমুলবাড়ী	মাঘফাল্গুন	১ মাস
৪৭	দুর্গাপূজা	”	”	কুমারগঞ্জ	আশ্বিন	৪ দিন
৪৮	বারুণীস্নান	”	”	নগরভাঙ্গনি	চৈত্র	১ দিন
৪৯	দোলযাত্রা	কোচবিহার	দিনহাটা	বামনহাট	দোলপূর্ণিমা	৩ দিন
৫০	মহরমের মেলা	”	”	হলদিবাড়ী	মহরম	কয়েক ঘণ্টা
৫১	একরামুলহক দরগা/হুজুর সাহেবের মেলা	”	হলদিবাড়ী	হলদিবাড়ী	ফাল্গুন মাসের ৫/৬ তারিখ	৩ দিন
৫২	অন্নপূর্ণা পূজা	”	দিনহাটা	কোনাচাতরা	চৈত্র	৩ দিন
৫৩	কালীপূজা	”	”	কেশরীবাড়ী	কার্তিক	২ দিন
৫৪	দুর্গাপূজা	”	”	খামার সিতাই	আশ্বিন	৪ দিন
৫৫.	”	”	”	বালাপুকুরী	”	৪ দিন
৫৬	”	”	”	পানিখাওয়া	”	৪ দিন
৫৭	দুর্গা, মদন চতুর্দশী	”	”	গাবুরা	আশ্বিন/চৈত্র	৪ দিন
৫৮.	দুর্গাপূজা	”	”	চামটা	আশ্বিন	৪ দিন
৫৯.	চড়কের মেলা	”	মাথাভাঙ্গা	পাটছড়া	চৈত্রসংক্রান্তি	২ দিন
৬০	শিবরাত্রি মেলা	”	”	মাথাভাঙ্গা শহর	শিবরাত্রি	১১ দিন
৬১	চড়কের মেলা	”	”	চেঙ্গারখাতা খাগড়িবাড়ী	চৈত্রসংক্রান্তি	১ দিন
৬২	”	”	”	গিলাভাঙ্গা	”	১ দিন
৬৩	কামদেব পূজা ও মহরম	”	”	উনিশবিঘা	চৈত্র	২ দিন
৬৪.	দুর্গা পূজা	”	”	সিঙ্গিজানি	আশ্বিন	১ দিন
৬৫.	কালীপূজা	”	”	শিবপুর	কার্তিক	২ দিন
৬৬	চড়কের মেলা	”	”	পাটছড়া গোপালপুর	চৈত্র	২ দিন
৬৭	শিবরাত্রির মেলা	”	”	মাথাভাঙ্গা শহর	শিবরাত্রি	৩ দিন
৬৮	দোলযাত্রা	”	শীতলকুচি	কুর্শামারী	ফাল্গুন	১ দিন
৬৯	দুর্গাপূজা	”	”	আবুয়ারপাথর	আশ্বিন	১ দিন
৭০	রাসযাত্রা	”	”	ডাকালীগঞ্জ	কার্তিক	৪ দিন
৭১.	দুর্গাপূজা	”	”	রাজার বাড়ী	আশ্বিন	৪ দিন
৭২	দুর্গা, শিবরাত্রি	”	মেখলিগঞ্জ	মেখলীগঞ্জ	আশ্বিন / ফাল্গুন	৪ দিন
৭৩	ভান্ডানীর মেলা	”	”	নিজতরফ, রাণীরহাট, ভাঙার হাট	আশ্বিন/বিজয়া দশমীর পর দিন	৩ দিন

ক্রমিক সংখ্যা	পূজাউৎসব ও মেলার উপলক্ষ্য	জেলা	মহকুমা	গ্রাম / ব্লক	মাস / তিথি	স্থিতিকাল
৭৪.	ভাভানীর মেলা	"	"	কামাত চ্যাংড়াবান্দা	"	৬ দিন
৭৫.	দোলযাত্রা	"	"	ধুলিয়ামাল্লিশ	ফাল্গুন	৭ দিন
৭৬.	মাধাইখালের কালীখেলা	কোচবিহার	দিনহাটা	পাথরশোন/বামনহাট	চৈত্রমাসের অষ্টমী তিথির পর ১ম শনিবার	১০ দিন
৭৭.	রাসমেলা	"	"	গীদালদহ	রাসপূর্ণিমা	১০ দিন

(৩) কোচবিহারের উল্লেখযোগ্য লৌকিক উৎসব ও মেলা

ক্রমিক সংখ্যা	পূজাউৎসব ও মেলার উপলক্ষ্য	জেলা	মহকুমা	গ্রাম / ব্লক	মাস / তিথি	স্থিতিকাল
১	কাঠাম মেলা	কোচবিহার	মেখলিগঞ্জ	নালাবটাবি ও নিজতবফ	১লা বৈশাখ	১ দিন
২.	বাইচ মেলা	"	তুফানগঞ্জ (ক)	চৌকশী বলরামপুর	বিজয়া দশমীর পর দিন	১ দিন
৩	"	"	" (খ)	চিলাখানা বন্দর সংলগ্ন কালজানী নদীর ধারে	"	১ দিন
৪.	মাসান মেলা	"	দিনহাটা	আলোকঝারী	বৈশাখ	১ দিন
৫	সখীর মেলা	"	"	নগরভাঙ্গনি	অশোকাষ্টমী	১ দিন
৬.	বাঁশ পূজার মেলা (মদনকাম)	"	তুফানগঞ্জ	বারকোদালীর ভাবেয়া গ্রাম	চৈত্রমাস মদন চতুর্দশী	১ দিন
৭	"	"	দিনহাটা	(ক)সিতাই (ব্রহ্মোত্তরচাত্রা)	চৈত্র	১ দিন
৮.	হুদুমপূজার মেলা	"	তুফানগঞ্জ	ছাটভারেয়া	"	১ দিন
৯	বাঁশপূজার মেলা	"	দিনহাটা	(খ) খলিসা গোসামারী	"	৩ দিন
১০	"	"	মাথাভাঙ্গা	উনিশবিশা	"	১ দিন
১১	"	"	দিনহাটা	(গ) সিঙ্গীমারী মদনকুড়া	"	৩ দিন
১২	"	"	সদর	হাড়িভাঙ্গা	"	৫ দিন
১৩	সোয়াবী মেলা	"	তুফানগঞ্জ	নাককাটিগাছ	পঞ্চমদোল	১ দিন
১৪.	"	"	"	ভুরকুস	"	১ দিন
১৫	"	"	সদর	বানেশ্বর	"	১ দিন
১৬.	"	"	"	বৈকুণ্ঠপর	"	১ দিন
১৭	উপলক্ষ্যহীন চ্যাংড়াবান্দার মেলা	"	মেখলিগঞ্জ	চ্যাংড়াবান্দা	অগ্রহায়ণ	১ দিন

পরিশিষ্ট — ঙ

লোকশিক্ষা

লোকশিক্ষা বলতে সাধারণত বোঝায় লোকের শিক্ষা, অর্থাৎ যে শিক্ষা লোকের জন্য এবং সংগঠিত হয় লোকের দ্বারা। ফর্মাল (Formal), নন্ ফর্মাল (Nonformal) ও ইন ফর্মাল (Informal) এই তিনটি ধারা থেকে স্বতন্ত্র একটি ধারা হল লোকশিক্ষা। ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী তাঁর বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষগ্রন্থে বলেছেন— "লোকশিক্ষা Folk-Education এই শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার করা যায়। একটি মাস্ এডুকেশন বা জনশিক্ষা আর গণশিক্ষা অর্থে। সাক্ষর না হয়েও মানুষ শিক্ষিত হতে পারে। আর যে পদ্ধতির মাধ্যমে অগণিত মানুষ শিক্ষিত তাই লোকসংস্কৃতির মাধ্যম।"

সাধারণত বেশীরভাগ মানুষ শিক্ষিত হন প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষার বাইরে লোক সাধারণত শিক্ষিত হন লোকশিক্ষার মাধ্যমে। প্রথাগত শিক্ষায় আমরা যেমন দেখি চারটি উপাদান— শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠ্যক্রম এবং বিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু লোকশিক্ষায় শিক্ষার্থীগণ থাকেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। যেমন— অক্ষর জ্ঞানহীন কৃষক, মজুর, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ, কামার, কুমোর, জেলে, ঘরামি প্রভৃতিদের লোকশিক্ষার শিক্ষক হলেন লোকনাটকের মূল গীদাল, হেটো কবি, পটুয়া, কথক প্রভৃতি। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কোন বিদ্যালয় থাকে না। এক্ষেত্রে লোকশিক্ষার আলয় বা আশ্রয় হল কোন চন্ডীমন্ডপ বা মুক্তাঙ্গণ, লোকনাটকের আসর, লোকউৎসব বা মেলার অঙ্গণ বা ছায়াসুনিবিড় কোন বৃক্ষতল। স্বাভাবিক ভাবেই এই শিক্ষার ধরাবাধা কোন পাঠ্যক্রম নেই। চলমান জীবনের সমস্যা, তার সমাধান এবং প্রকৃতির কোলে বাস করে বোধ ও বুদ্ধির মাধ্যমে, উত্তরণের প্রচেষ্টায় যে শিক্ষা লাভ করে তা দিয়েই গড়ে ওঠে লোকক্রীড়া ও লোকনাটকের মত বিষয়।

কোচবিহারের লোকনাটকে, লোকগীতে, ব্রতকথায়, ছিলকায় সর্বত্রই লোকশিক্ষার উপাদান লক্ষণীয় ভাবে উপস্থিত ঃ

লোকগীত ঃ বাপো মায়ের কোপাল পড়া, মোর নারীর অল্প পড়া।
সেই জন্যই ভাল পাত্তর আইসে নাই।।

হেটো কবিতা ঃ কত মেয়ে নিয়ে ২ দায় ঠেকিয়ে আছে ঘরে ঘরে।
হাজার টাকা পণ না দিলে ছেলে নাই সংসারে।।

ছিলকা ঃ	গরম টেঙ্গা ঠান্ডা দুধ, তাক খায় নিবোধের পুত। (খাওয়ার স্বাস্থ্যসম্মত বিধান)
লোকনাটকের প্রবাদ ঃ	আদা খায় যায় ঝাল বুঝবে তায়। (দুবলাবালী পালা) চেড়া খুড়িতে বোড়া বিরাইল। (বিশ্বকেতু - চন্দ্রাবলী পালা)
হেঁয়ালী ঃ	হাতও নাই পাও-ও নাই গড়গড়েয়া যায় পিঠির চামড়া নাই সর্বলোকে খায়। (জল)

পরিশিষ্ট — চ

আলোক চিত্রমালা

১। হাতি মাসান, গ্রাম ঃ আক্রারহাট, সদর, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ২৭/০৬/১৯৯৮

২। লোক দেবতা "বুড়া ঢ্যাপ্লা", গ্রাম ঃ কাশিয়াবাড়ী হলদিবাড়ী, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ২৮/০৪/১৯৯৯

৩। পাগলাপীর, গ্রাম ঃ মাছুয়াটারী, নাটাবাড়ী, তুফানগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ০৭/১১/১৯৯৯

৪। চড়কের বৃক্ষ পূজার - দেওবংশী মান্ডা রায়, গ্রাম ঃ চেঙ্গারখাতা খাগড়িবাড়ী, মাথাভাঙ্গা, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ১৪/০৩/১৯৯৯

৫। লৌকিক দেবী ভাণ্ডানী, গ্রাম ঃ নিজতরফ, মেখলিগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ১৩/১০/১৯৯৭

৬। লৌকিক দেবী সাত বৈনী, গ্রাম ঃ বাঁশরাজা, তুফানগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ২১/০৩/১৯৯৮

৭। রাভা সম্প্রদায়ের গৃহ দেবতা থানশিরি (রণতুক), গ্রাম ঃ ভারেয়া, তুফানগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ১৪/১২/১৯৯৭

৮। হুজুর সাহেবের দরগায় "হুজুরের মেলা", হলদিবাড়ী, মেখলিগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ০৭/০৩/১৯৯৮

৯। তোর্ষা পীরের দরগা / মাজার, গ্রাম ঃ গুদাম মহারাণীগঞ্জ, সদর, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ০৭/০৫/১৯৯৮

১০। লৌকিক দেবী সতী মা, গ্রাম ঃ ঝিঙাপুনী, তুফানগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ২৮/০৩/১৯৯৮

১১। রাভা সম্প্রদায়ের মেয়েদের বীজ বোনার নৃত্য (হাঙ্গারমানী), গ্রাম ঃ ভারেয়া, তুফানগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ১৪/১২/১৯৯৭

১২। মেছেনী খেলার নৃত্য, গ্রাম ঃ মানিকগঞ্জ, হলদিবাড়ী, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ৩১শে বৈশাখ, ১৪০৫

১৩। নৌকাবাইচ, গ্রাম ঃ চিলাখানা, নদী ঃ কালজানী, তুফানগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ২৮/১০/১৯৯৮

১৪। মথন খেলা / নারকেল খেলা, গ্রাম ঃ শালবাড়ী, তুফানগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ০৭/০৮/১৯৯৯

১৫। সখীর মেলা, গ্রাম ঃ নগরভাংনী, দিনহাটা, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ০৪/০৪/১৯৯৮

১৬। দোল সোয়ারীর মদনমোহন, গ্রাম ঃ নাককাটিগাছ (ছোটমহাদেব ধাম), তুফানগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ১৫/০৪/১৯৯৮

১৭। শোলার 'কালী মুখোস', শিল্পী কণ্ঠেশ্বর বর্মন, গ্রাম ঃ শিমুলবাড়ী, দিনহাটা, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ১৩/০৪/১৯৯৮

১৮। শোলার 'পুতলা-পুতলি বিষহরি', শিল্পী অনিল মালাকার, গ্রাম ঃ ঘোগারকুঠি, তুফানগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ২৬/০৮/১৯৯৯

১৯। কাঠাম মেলায় "অর্জুন কাঠাম", গ্রাম ঃ নালারটারি, মেখলিগঞ্জ, শিল্পী ঃ প্রফুল্ল বর্মন, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ১লা বৈশাখ, ১৪০৬

২০। লোকবাদ্য 'দোত্‌রা', চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ২৮/০৬/১৯৯৮, সৌজন্যে ঃ দীনবন্ধু সংগ্রহশালা, শিলিগুড়ি

২১। নাথযোগী সম্প্রদায়ের 'গোপী যন্ত্র', চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ২৮/০৬/১৯৯৮, সৌজন্যে ঃ দীনবন্ধু সংগ্রহশালা, শিলিগুড়ি

২২। লোকবাদ্য 'সারিন্দা', চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ২৮/০৬/১৯৯৮, সৌজন্যে ঃ দীনবন্ধু সংগ্রহশালা, শিলিগুড়ি

২৩। ধানের চারা বোনা অনুষ্ঠান (গোছর পানা / গচি বোনা), গ্রাম ঃ পূর্ব অন্দরাণফুলবাড়ী, তুফানগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ১৫/০৭/১৯৯৮

২৪। ধানকাটা অনুষ্ঠান (আগ নেওয়া), গ্রাম ঃ পূর্ব অন্দরাণফুলবাড়ী, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৪০৪

২৫। বাঁশ পুজায় বাঁশ দৌড়ের প্রস্তুতি, গ্রাম ঃ ভারেয়া, বারকোদালি - ১নং অঞ্চল, তুফানগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ১২/০৪/১৯৯৮

২৬। মেখলি শিল্পী (ঝালক) মেনকা রায়, গ্রাম ঃ নালারটারী, মেখলিগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ১৩/১০/১৯৯৭

২৭। বাঁশ পুজার 'মদনকামে'র দল, গ্রাম ঃ বিলশী, তুফানগঞ্জ, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ১২/০৪/১৯৯৮

২৮। নক্‌সাযুক্ত 'কমলকোষ' পাটি, শিল্পী নারায়ণ চন্দ্র দে, গ্রাম ঃ ঘুঘুমারী, সদর, চিত্রগ্রহণ ঃ তাং ১২/১২/২০০০

(ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী পরবর্তী আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য)